

প্রকাশনায় : শ্রীমতী উষা মাহাত  
প্রতিম প্রকাশন  
'কিরণস্মৃতি', রঘুনাথপুর  
ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ।

প্রথম প্রকাশ : পৌষ সংক্রান্তি, ১৩৬৭

মুদ্রণে : শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র সাহা  
অমি প্রেস, ৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

উচ্চসংস্কৃতির তাঁর আকর্ষণে দিশেহারা পুত্রকে যিনি নিজস্ব  
ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির প্রতি আত্মসমর্পণে শ্রদ্ধাবান করে তুলেছেন,  
ঝাড়খণ্ডের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহে ও বিচার-  
বিশ্লেষণে যিনি নিরলস সন্নেহ সাহায্য করেছেন, এ গ্রন্থের প্রতি  
ছত্রে যঁার উপস্থিতি বর্তমান, সেই স্বর্গাদুচ্চতর পিতা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মাহাত

শ্রীচরণকমলেষু

তাঁর সামান্যতম পরিতৃপ্তি এবং সাত্বনার আশায় পুষ্পশ্রবকপ্রতিম  
এই গ্রন্থ পরম শ্রদ্ধায় সমর্পিত হল ।





## ভূমিকা

ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে ঝাড়খণ্ড নামটিই আলোচ্য অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং দীর্ঘস্থায়ী নাম। জঙ্গলমহল, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সী এবং ছোটনাগপুর নামগুলো অত্যন্ত অধুনা কালে ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক নামকরণ মাত্র। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঝাড়খণ্ডকে যেভাবে ভাঙা-চোরা করা হয়েছে (সম্ভবত ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলের ক্ষেত্রে বারবার এমন ভাবে অজ্ঞানি ঘটিয়ে ভাগবাঁটোয় করা হয়নি), তা অত্যন্ত অমানবিক এবং বেদনাময়। আদিবাসী মানসিকতা, ভাষা-সংস্কৃতি কিংবা জীবনচর্যার প্রতি কোনরকম দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি শাসকগোষ্ঠী। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা দেখা দিল; আদিবাসী সংস্কৃতির ওপর উচ্চসংস্কৃতির চাপ সৃষ্টি করা হল। ফলে, ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির সংহতি বিনষ্ট হল; সরকারি শাসন এবং প্রচার-যন্ত্রের তাড়নার কোথাও বঙ্গসংস্কৃতি, কোথাও বিহার-সংস্কৃতি, কোথাও উড়িষ্যা-সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করল। সুযোগ বুঝে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার বুদ্ধিজীবীরা তারস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন, আদিবাসীদের মধ্যে সংস্কৃতি-সম্বন্ধ ঘটতে শুরু করেছে; কিন্তু আসলে যা হল তা সম্বন্ধের নামে এক অদ্ভুত জগাধিচুড়ি। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ ব্রিটিশ যুগের মতোই অব্যাহত থাকল, তবে এবারে তীব্রতা শতগুণ বৃদ্ধি পেল। শুধু তাই নয়, শুরু হল আদিবাসীদের মগজখোলাই এবং তাদের ভাষা-সংস্কৃতি বিনষ্টের পাল। বিভিন্ন রাজ্যে ঝাড়খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে যাবার ফলে আদিবাসীদের পরিবার ও সমাজ-জীবন ভেঙে পড়তে লাগল। তাঁরা নিজেদের আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাষা-সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে ক্রমশই পরস্পরের অপরিচিত হয়ে পড়তে লাগলেন। আদিবাসীদের জীবনচর্যা এবং সংস্কৃতি-সংকট সম্পর্কে এতো গভীরে ভেবে দেখবার কথা আমাদের সমদৃষ্টিসম্পন্ন সরকার সম্ভবত বাহ্য মনে করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীও

ঝাড়খণ্ডী জনতার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং জীবনচর্চা সম্পর্কে দায়সারা গতানুগতিক ধারণা পোষণ করেন ; ঝাড়খণ্ডীদের যন্ত্রণা, হতাশা, অনিশ্চয়তা-বোধ এবং অসহায়তা সম্পর্কে কোনরকম সহানুভূতি দেখিয়ে গভীর চিন্তা করবার প্রয়োজন বোধ করেন না।

এই কারণেই আমি এই গ্রন্থে ঝাড়খণ্ডের একটি সামগ্রিক রূপরেখা অঙ্কন করতে প্রয়াসী হয়েছি। তবে এখানে আমি ঝাড়খণ্ডী বাঙলা উপভাষাভাষী পূর্ব ঝাড়খণ্ড বা জঙ্গলমহল অঞ্চলটিকেই বেছে নিয়েছি এবং 'প্রারম্ভিকা-তে এই অঞ্চলটির পরিচয় দেবার জন্য ছোটনাগপুর এবং সন্নিহিত পশ্চিম বাংলা নাম ব্যবহার করেছি। বিন্দুতে সিদ্ধুর স্বাদ লভ্য প্রবচনটি মেনে নিলেও স্বল্পপরিসরে অস্ট্রিকভাষাভাষী আদিবাসীদের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে তাঁদের প্রতি অবিচারের আশঙ্কায় আমি সে প্রয়াসে বিরত থেকেছি। এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে প্রবল অর্থসংকট দেখা দেওয়ার গ্রন্থের কলেবর সংকোচন করতে বাধ্য হয়েছি ; ফলে লোকগীতি এবং প্রবাদগুলো বহু ক্ষেত্রে একটানা গছের মতো সাজাতে হয়েছে—পাঠকের সুবিধার্থে প্রতিটি উপকরণের শেষে দু'টি দাঁড়ি দিয়ে সমাপ্তি বোঝানো হয়েছে। এর ফলে ব্যয়সংকোচ এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রচুর উপকরণের স্থান সংকুলান সম্ভব হলেও গানগুলো কবিতার অবয়ব হারিয়েছে। এ ক্রটি বিনীত-ভাবেই স্বীকার করি। গ্রন্থমধ্যে আলোচনার সময় প্রচুর পরিমাণে লোকগীতি উদ্ধৃত এবং সংকলিত হয়েছে বলে আলাদাভাবে কোন সংকলন দেওয়া হল না। পরিবর্তে কিছু নির্বাচিত শব্দের অর্থসহ একটি সূচী সংযোজিত করা হল।

আলোচ্য অঞ্চলের ওপর কিছু গতানুগতিক এবং পল্লবগ্রাহী আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে : ড. সুধীরকুমার করণ এবং ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহার গ্রন্থ দু'টি কিছুটা ব্যতিক্রম। গ্রন্থগুলি অল্পবিস্তর প্রয়োজন মেটালেও কোনটিই এখানকার লোকজীবন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তেমন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় নি। পূর্বসূরী গ্রন্থকারগণ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে ঝাড়খণ্ডের জনজীবন এবং সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেন নি। যে-কোন জনজীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হলে সেই বিশেষ জন-গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে দীর্ঘকাল বাস করবার একান্ত প্রয়োজন। শহরে আরামশযায় শুয়ে থাকলে কিংবা উঁচু সংস্কৃতির অহমিকায় নিজেকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব

নয়। আমি নিজে কাঙ্ক্ষণের একটি আদিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এ-অঞ্চলের লোকজীবন, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং আচার-সংস্কারের খনিষ্ঠ পরিবেশে পরিপালিত হয়েছি; তা সত্ত্বেও এখানকার লোকজীবন ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরবার প্রয়াস যে সর্বাংশে সফল হয়েছে এমন দাবি আমি করি না। ক্রটি মানুষের নিত্য সহচর, আমি তার ব্যতিক্রম নই। তবু আমার বিশ্বাস করবার সংগত কারণ আছে যে, কারো কারো কাছে এ গ্রন্থ অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় অধিকতর সম্পূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য মনে হতে পারে।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠকালে জামশেদপুরের সাপ্তাহিক 'নবজাগরণ' সংবাদ-সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয়তে একটি লোকসংস্কৃতিমূলক ক্ষুদ্র রচনা প্রকাশ এবং ১৯৫৭তে কলকাতার 'গাজেয়' পত্রিকায় একটি লোক-সাহিত্যসম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে আমার লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাব সূত্রপাত। তারপর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমার বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, যা আজো গ্রন্থবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। এসব কথা বলবার একটাই কারণ যে, নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করলেও রাতারাতি এ গ্রন্থ রচিত হয় নি, বরং এর পেছনে রয়েছে প্রায় ২০/২৫ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন চর্চার অভিজ্ঞতা এবং প্রস্তুতি। এই ২০/২৫ বছর 'ধরে' আমি নিরলসভাবে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহ করেছি। বিভিন্ন জনের সহায়তার ফলেও আমার পক্ষে বিপুল উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। অন্যত্র পৃথকভাবে আমি এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি।

গ্রন্থখানি মৌলিক কি না তার বিচারভার পণ্ডিতবর্গ এবং রসিক বিদ্বজ্জনের হাতে অর্পণ করা হল। তবে গ্রন্থখানি যে মৌলিক উপকরণের সাহায্যে যথাসম্ভব মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে রচনার চেষ্টা করা হয়েছে— একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই। গবেষণা-নিবন্ধ প্রায় ক্ষেত্রেই সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্ভাগ্য হয়ে থাকে; আবার কোন কোন গ্রন্থলেখকের ভাষার মনোহারিত্বে বিষয়বস্তুর অন্তঃসারশূন্যতাকে আড়াল করে রাখে; এই হুঁশ্বে এই দু'টি দিকই সম্বন্ধে পরিহার করা হয়েছে।

গ্রন্থটির মুদ্রণকালে আমি রাঁচি কলেজে অধ্যাপনা করতাম। কলকাতা থেকে অনেক দূরে থাকায় ডাকযোগে একমাত্র মেক-আপ প্রকৃ দেখবার

সুযোগ পেতাম। তাই মুদ্রণ প্রসাদ থেকে গেছে বহুদূর পরিমাণে; সব ভুল সংশোধন করবার অবকাশ নেই—তবু নির্বাচিত কিছু ক্রটির শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশিত করা হল। ‘কুলকেতু’ শব্দটি নিতান্ত অনবধানতাবশত দু’এক জায়গায় ‘কুলতিলক’ ছাপা হয়েছে। কয়েকটি শব্দের বানানে প্রচলিত দু’টি রূপই ছাপা হয়েছে। আহীরা গানের ৩৮-সংখ্যক গানের তৃতীয় পঙ্ক্তি ১৪৩ পৃষ্ঠার প্রথম পঙ্ক্তি—‘ছাগলে ত খুজে ভাল চৈত বৈশাখ গ কাড়ায় ত খুজে আষাড় মাস’—বাদ পড়ে গেছে। পটমদা (বরাজুম) ভুলবশত সেরাই-কেলা মহকুমার অন্তর্গত বলে ছাপা হয়েছে, হবে ধলভূম মহকুমার অন্তর্গত। এই সমস্ত ক্রটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আপাতত আর কিছু করবার নেই।

অগণিত খ্যাত-অখ্যাত, জাত-অজাত, জীবিত এবং পরলোকগত লোক-কবিদের প্রতি—ঈদের রচিত গানে এ-গ্রন্থ শুধু অবয়বই লাভ করেনি বরং অর্থময় হয়ে উঠেছে—আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। তাঁরাই ঝাড়খণ্ডের মনোলোক রচনার সার্থক রূপকার ও পথিকৃৎ।

শ্রদ্ধেয় ভাষাচার্য ড. সুকুমার সেন আমাদের মুখের ভাষাকে ঝাড়খণ্ডী উপভাষা অভিধায় ভূষিত করে এবং স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ঈরা আমাদের বিশেষ স্নেহভরে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেব (সম্পাদক, নবজাগরণ), প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী এবং বিশিষ্ট লোক-রত্নবিদ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার রায় (চতুর্কোণ, কলকাতা)—এর প্রতি আমি বিশেষ ঋণী। এঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য গবেষণায় অপরিমিত উৎসাহ দিয়ে আসছেন। রবীন্দ্র অধ্যাপক ড. হরপ্রসাদ মিত্র ঝাড়খণ্ডের জন-জীবন ও সাহিত্যসংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণায় নিরন্তর অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এঁদের দু’জনকেই শ্রদ্ধা জানাই।

আমার এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে অগণিত জন অত্যন্ত আগ্রহান্বিত—তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ঈদের অনুপ্রেরণা ছাড়া এ গ্রন্থের মুদ্রণ তো দূরের কথা, পাণ্ডুলিপি রচনাই বিলম্বিত হয়ে পড়ত, সেই অধ্যাপক-দম্পতি অগ্রজপ্রতিম ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা এম. এ., পি-এইচ. ডি, ডি. লিট.

(স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং শ্রীমতী প্রেরকণা সাহা এম. এ. (রাঁচি উইমেনস কলেজ)-কে আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

অমি প্রেসের স্বত্বাধিকারী বহুপ্রতিম শ্রীযুক্ত পৃথীশচন্দ্র সাহা অসীমধৈর্যের সঙ্গে তাঁর অপরিচিত উপভাষার এই গ্রন্থটিকে মুদ্রণের দায়িত্ব নির্ভর সঙ্গে পালন করেছেন। প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত পার্থ বন্দোপাধ্যায় শুধু প্রকৃৎ দেখার গুরুদায়িত্বই পালন করেন নি, এ গ্রন্থের সাফল্য সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত আশার বাণী উচ্চারণ করে আমাকে উৎসাহিতও করেছেন। এঁদের দু'জনকেই আমার আন্তরিক প্রীতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

সবশেষে বলা হলেও যাদের অবদান এই গ্রন্থ রচনার পেছনে নিতান্ত নগণ্য নয়, তারা হল আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী উষা মাহাত এবং শিশুপুত্র শ্রীমান প্রতীমসূর্য। পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিমান মাহাতব কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এদের সবাইকে আমার প্রীতি জানাই।

বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ সংগ্রহের ব্যাপারে আমি নিম্নলিখিতদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এঁরা ছাড়াও আরো অনেক নাম-না-জানা গাইয়ের অবদান এ গ্রন্থ প্রণয়নে বড়ো একটা কম নয়। বলতে গেলে, আলোচ্য অঞ্চলের সমগ্র জনসমাজই যেন এই গ্রন্থের প্রীতিটি পঙ্ক্তিতে সশরীরে বর্তমান; সবার আনন্দ-বেদনার কথাই এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত সুর। তাই সবার কাছেই আমি আমার ঋণ স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা জানাই।

**ধলভূম :** চাকুলিয়া : পাথরাঘাট—বাবা ও মা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মাহাত ও শ্রীযুক্তা কৌশল্যা মাহাত, বোন কুমারী মিনতি মাহাত, কামিনী পিসি, খুনিয়া, শ্রীকেশবনাথ মাহাত, শ্রীঠাকুরদাস মাহাত, শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাত্র। মাটিয়ারীঘাট—শ্রীরজনীকান্ত মাহাত, শ্রীনিরঞ্জন মাহাত, শ্রীভুবন মাহাত। মালকুন্ডি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মাহাত, গুঁড়ুর প্যতর, পিঁডবাশোল—দিদিমা, ছোট মামীমা, শ্রীজগন্নাথ মাহাত। চাকুলিয়া—শ্রীজহরলাল মাহাত। নরসিংগড় : খুকডাখুঁপি—শ্রীবৈষ্ণবচরণ মাহাত, ভুয়া। ঘাটশিলা : সিংপুরা—গুরুপ্রসাদ মাহাত, শ্রীমতী শশিকলা মাহাত, শ্রীমতী যশোদা মাহাত। বাঁকি—সৈরভীমালা মাহাত। আমাড়াবি—শ্রীকিরীটিভূষণ চিত্রকর। মুল্লিয়া : পায়রা গাউ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংসর্দার। বর্রাভূম : পটমদা : কুইয়া—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মাহাত। লাওয়া—শ্রীতুলসীচন্দ্র মল্লিক। দীঘি—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মাহাত। **পুরুলিয়া :** পুরুলিয়া—শ্রীযুক্ত সুবোধ বসুরায় ( সম্পাদক, ছত্রাক )। ডাবর—শ্রীপশুপতিপ্রসাদ মাহাত। রাজহুয়াগড়—শ্রীঅশ্বিনী লুতার। ঝালদা : তুড়দাগ—শ্রীঅধীরচন্দ্র মাহাত। ধানবাদ : শিখরভূম : ডুমুরজোড়—শ্রীচণ্ডীচরণ মাহাত। ঝাড়গ্রাম : সাঁকরাইল : পাথরা—শ্রীবিধানচন্দ্র মাহাত। পড়িহাটি : রাজপাড়া—‘কোকিলা মায়ু’। জামবনী—শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

## গাঠসঙ্কেত

বিপর্যস্ত ই এবং উ ধ্বনি দু’টিকে নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিপর্যস্ত ই=একটি উর্ধ্ব কমা। যেমন আইজ>আ’জ, কাইল->কা’ল।

বিপর্যস্ত উ=দুটি উর্ধ্ব কমা। যেমন চাউল>চা’ল, বেউল>বে’ল।

এছাড়া ক,=কথাস্তর, পা. টী.=পাদটীকা, সাঁ=সাঁওতালী ইত্যাদি

সঙ্কেতও ব্যবহৃত হয়েছে।

# সূচীপত্র

প্রারম্ভিক	...	...	৯-৪৮
ছোটনাগপুর এবং সন্নিক্ৰিত পশ্চিম বাংলার পরিচয়	৯		
ভাষা-সংস্কৃতি-অধিবাসী	২১	ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যঃ	
শ্রেণীবিভাগ ও বিষয়বস্তু	৩২		
প্রথম পর্ব	ঝাড়খণ্ডের লোকগীতি : ভূমিকা ও শ্রেণীবিভাগ		৪৯-৫৭
প্রথম অধ্যায়	ঋতু-উৎসবে ও নৃত্যরঙ্গে লোকসংগীত ...		৫৭-৮৬
	করম নাচের গান ৬৪ জাওয়া গীত ৭৮ জাঁত গান ৯৬ ভাদু		
	গান ৯৯ কাঁঠি নাচের গান ১০৫ আহীরা গান ১০৯		
	টুসু গীত ১৪৪ ছো নাচের গান ১৭৫		
দ্বিতীয় অধ্যায়	আচার সংগীত ...		১৮৬-২১৯
	বেহা গীত ১৮৭ বুমুজ গান ২০২ মন্ত্র গান ২০৬ সাখী		
	গান ২১১		
তৃতীয় অধ্যায়	ধর্মাচার-সম্পর্কিত গান ...		২১৯-২৩৪
	মাহরা গীত ২২০ টুয়া গান ২২৬		
চতুর্থ অধ্যায়	বারোমেসে প্রেমসংগীত ...		২৩৫-২৫৯
	ঝুমুর ২৩৭ ভাদরিয়া ঝুমুর ২৪৯ ঝুমুর গানের রং		২৫১
	রং ঝুমুর ২৫৩ উদয়া গান বা টাঁড় ঝুমুর ২৫৫		
পঞ্চম অধ্যায়	জীবিকাশ্রয়ী গান ...		২৫৯-২৬৭
	পাটি গীত বা পট গান ২৬০ বাঁদর নাচের গান ২৬৬		
দ্বিতীয় পর্ব	...	...	২৬৭-৩৮২
প্রথম অধ্যায়	ছড়া ...	...	২৬৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	খাঁধা ...	...	২৮৭
তৃতীয় অধ্যায়	প্রবাদ ...	...	৩০২
চতুর্থ অধ্যায়	বৃপকথা ...	...	৩২৭
পঞ্চম অধ্যায়	ব্রতকথা ...	...	৩৫১
ষষ্ঠ অধ্যায়	পুরাকথা ...	...	৩৬৭
তৃতীয় পর্ব	লোকসাহিত্যে প্রকৃতি, সমাজ ও জনজীবন		৩৮৩-৫৩২
	প্রকৃতি পর্যায় ৩৮৪ সমাজ ও জনজীবন পর্যায় ৩৯৩		
চতুর্থ পর্ব	বৃপ ও রীতি ...	...	৪৩৩-৪৪৯
পঞ্চম পর্ব	বিবরণবৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন	..	৪৫০-৪৭০
শেষপঞ্জী	...	...	৪৭১
নির্বাচিত শব্দসূচী	...	...	৪৭৩





# প্রারম্ভিকা

॥ এক ॥

## ছোটনাগপুর এবং সন্নিহিত পশ্চিম বাংলার পরিচয়

লোকসাহিত্য পৰিক্রমায় আমরা যে অঞ্চলটিকে নির্বাচিত করেছি, সেই অঞ্চলটিকে আধুনিক বাজনৈতিক মানচিত্রে পটভূমিতে সর্বজনবোধ্য কবে তোলবার জন্ত 'ছোটনাগপুর এবং সন্নিহিত পশ্চিম বাংলা' নামে চিহ্নিত করা যায়। এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বিহাবেব দানবাদ জেলা, সিংভূমেব ধলভূম ও সেবাইকেলা মহকুমাদ্বয়, বাঁচিৰ ব্রহ্ম-সিল্লি তামাণ সোনাহাতু আদি পাঁচ পৰগণা এবং অর্দ্ধদিকে পশ্চিম বাংলার পূবলিয়া জেলা, মেদিনীপুৰেব ঝাডগ্রাম মহকুমা এবং বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাঞ্চল। এ অঞ্চলের মাহুধ যে ভাষায় কথা বলে থাকে, তা বাঙলা ভাষাবেই একটি উপভাষ। শ্রদ্ধেয় ডঃ স্কুমাব সেন এই উপভাষাকে ঝাডপণ্ডী বাঙলা অভিধায় ভূষিত কবেছেন। প্রস্তাবিত লোকসাহিত্য-আলোচনার পৰিক্রমণ ক্ষেত্র হিসেবে এই উপভাষাঞ্চলটিকেই নির্দিষ্ট কবা হয়েছে। বাজাপূনর্গঠনের টানাপোডেনে এই ভাষাঞ্চলের কিছু অংশ চলে গেছে পশ্চিম বাংলায়, কিছু অংশ থেকে গেছে বিহারে যা ছোটনাগপুর মালভূমিৰ অন্তর্গত। পাহাড় অবগাময় টাইড-টিকব ভবা এই অঞ্চলা অঞ্চলা উষব ধূসব জনপদকে ষিবে ডাঙনের সূত্রপাত যে এই প্রথম, তা নয়। ইংরাজ আমলে এ-অঞ্চলের স্বাধীনতাপ্রিয় আদিম অধিবাসী-দের দৃষ্টি বিস্তোচে ব্যতিবাস্ত হয়ে বাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিৰ জন্ত ইটাইগুৱা কোম্পানী কতো বাব কতো ভাবে একে গণ্ডিত কবেছেন, তাৰ ইয়ত্না নেই।

আলোচ্য অঞ্চলটি ভাবত্ববেব প্রাচীনতম ভূগণ্ড বাঁচি-গণ্ডায়ানা মালভূমিৰ অন্তর্গত। গণ্ডায়ানা মালভূমিৰ সন্ধে জ্ঞানগ্ন থেকে একই ভাগ্য-সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে ছোটনাগপুর বা বাঁচি মালভূমি যা ক্রমশঃ অবনমিত হয়ে তার অঞ্চলা অঞ্চলা উষব ধূসব শাবীবচিত্রে রাঙামাটি আব কাঁকর পাথবেব প্রলেপ নিতে নিতে খণ্ডপূরেব প্রাস্তভূমি পর্যন্ত প্রসাবিত হয়েছে - গণ্ডায়ানাৰ বিদ্যা পৰ্বতমালা পূর্বদিকে অগ্রসব হতে হতে চাণ্ডিল-জামশেদপূরেব দলমা

পাহাড় স্পর্শ করে ঘাগরা গোটাশিলা পাহাড় হয়ে চাকুলিয়া—বেলপাহাড়ীর মধ্যস্থলে কানায়েশ্বর পাহাড়ের প্রাস্তসীমানায় অবসিত হয়েছে, উত্তরে বাঘমুণ্ডি অযোধ্যার পাহাড় ছাড়িয়ে বাঁকুডার গুপ্তনিয়া পর্যন্ত তা প্রসারিত। বলাবাহুল্য, ভারতের এই আদিম ভূমিখণ্ডে সেই গণ্ডোয়ানা থেকে খড়াপুর পর্যন্ত আদিম অধিবাসীদের বাসভূমি প্রসারিত, যাদের মধ্যে রয়েছে দ্রাবিড়, আদি-অষ্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোকেরা। কোন কোন গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা এখনো নির্বিকার ব্যবহার অব্যাহত রেখে নিজেদের স্বাভাবিক বজায় রেখে চলেছে। কোন কোন গোষ্ঠী নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে আঞ্চলিক গ্রহণ করে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করেছে। পর্বতগোষ্ঠী-গুলোর ভেতর ভূমিজ, মাল, খারিয়া, কুম্ভিনীহাত গোষ্ঠীগুলোই প্রধান।

অতঃপর এই অঞ্চলের নামের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে। মহাভারতে নিম্নোক্ত দু'টি শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায় :

অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাশ্চ শুণ্ডিকান্ মিখিলানথ ।

মাগধান্ কর্কথগাংশ্চ নিবেশ্চ বিষয়েহত্ননঃ ॥

আবশীরাংশ্চ যোধ্যাংশ্চ অহিষ্কত্রং চ নির্জয়ং ।

পূর্বাং দিশং বিনির্জত্য বৎসভূমিং তথাগতম্ ॥<sup>১</sup>

এখানে আমাদের আলোচ্য অঞ্চলটিকে মহাভারতকার ব্যাসদেব কর্কথণ্ড নামে অভিহিত করেছেন। বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা'য় ( ৬ষ্ঠ শতক, ১৪শ অধ্যায় ৫ম—৭ম শ্লোক ) 'কর্কট', মার্কণ্ডেয় পুরাণে ( ৬ষ্ঠ শতকের পরে ) 'কর্কটেশন' এবং পরাশরের ভূগোলে 'কর্কট' নামে প্রাচ্য অঞ্চলে একটি পর্বত রাজ্যের কথা বলা হয়েছে। নানা দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয়, তাঁরা অই নামের সাহায্যে আমাদের আলোচ্য অঞ্চলটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। ছোটনাগপুর পরবর্তী কালে কোকরা নামে-ও পরিচিতি লাভ করেছিল। "কথাসরিৎসাগর"-সম্পাদনায় Tawney বলেন বা মনে করেন যে কাহিনীর কর্কোট নামের নিবাস ব্রহ্মের আরাঙ্কানে ছিল। এই স্থান পর্বতময় হওয়ায় 'কর্কোট' সহ কর্কটের যোগ অসম্ভব নয়।<sup>২</sup> আমাদের বিশ্বাস, কর্কোট নামের দেশ ছোটনাগপুরই ছিল, এই অঞ্চলটি পর্বতময় হওয়ায় কর্কোট সহ

১. মহাভারত, দ্বিতীয়খণ্ড (সংবৎ ২-২৩ গোরখপুর) পৃ. ১৬৬৫ ; ২. রামপ্রসাদ মজুমদার : চতুর্কোণ আখ্যায়িক ১৩৭৮ পৃ. ১৬৮

কর্ষটের যোগ খুবই স্বাভাবিক এবং সম্ভাব্য ব্যাপার। টলেমির ভূগোল (২য় শতক)-এর কথা উল্লেখ কবে মানভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের ৪৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—Ptolemy's geography throws little more light on the subject beyond that he groups with Mandalai and Sutrara (the Monedas and Sauri of Plyn), Kokhenagai, a name which is perhaps traceable to Karkhotanaga, the country of Nabangsis and surviving still in the name Nagpur.

বলাবাহুল্য, এই নাগপুর বলতে চুটিয়া-নাগপুরকেই বোঝানো হয়েছে। নাগপুরের বাজাদেব রাজত্ব সম্পর্কে অল্পত্র বলা হয়েছে—Raja Phani Mukut Rai reigned over Bantha, Hazen Kharsawan to Badin, Ramgar', Changuriah, Gola, Palami, Tori to Mankeri, Burway.<sup>৩</sup>

কর্ষখণ্ডই যে কালপ্রবাহে 'কথেনাগাই' এবং 'কর্কোটনাগ'তে পরিবর্তিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৫। সি মজুমদার তাঁর *Aboriginals of Central India* গ্রন্থটিতে বলেছেন In all probability at a time not later than 6th century B. C. when the Anga country (for the south-eastern Bihar) and the province of Bengal lay outside the holyland of the people of Vedic traditions, the forest areas of Kalkavana formed the eastern boundary of Aryavarta. This Kalkavana obtained subsequently the designation of Jharkhand and this Jharkhand of indefinite extension lay to the south of Gaya, to the east of Shahabad, to the south of Bhagalpur and to the west of the districts of Bankura and Midnapur... The Santhal Parganas, Chutia Nagpur, the districts of Sambalpur and the native states adjoining Chutia Nagpur and Sambalpur fall within Jharkhand.<sup>৪</sup>

দেখা যাচ্ছে, ঝাড়খণ্ড নামে পৌঁছবার আগে এই অঞ্চলটি বৈদিক যুগে কালকাবন নামে-ও পরিচিত ছিল।

হিউ-এন-সাঙ যখন ভাবতবর্ষ ভ্রমণে আসেন, তখন তিনি আলোচ্য অঞ্চলটি-ও পরিক্রমণ করেন। তিনি এ-অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য যেমন

৩. P. B. Chakraborty B.Sc. BL : Chhotanagpur Raj, Pp. 2

৪. B. C. Majumdar : *Aboriginals of Central India*. Ch. V Pp. 217

লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তেমনি স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে-ও কিছু কথা বলে গেছেন। মানভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়াবতে এ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—  
 These (Huen Tsang's Accounts) as interpreted by Cunningham, show that between Orissa on the south, Magadh or Bihar (Buddhist manasteries are called Biharas) on the north, Champa (query Bhagalpur and Burdwan) on the east and Maheswara (i.e. Central India) on the west lay the Kingdom of Kie-lo-na su-fa-lana or the Kingdom of Kiranasuvarna, ordinarily identified with the Suvarna Rekha river. This, General Cunningham writes, must have comprised all the petty hill states lying between Midnapore and Surguja on the east and west and between the sources of Damodar and Vaitarani on the north and south.<sup>৫</sup>

অর্থাৎ হিউ-এন-সাঙের সময়ে দক্ষিণে উড়িষ্যা, উত্তরে মগধ, পূর্বে চম্পা (ভাগলপুর ও বর্ধমানভুক্তি) এবং পশ্চিমে মহেশ্বর (মধ্যভাবত) এবং মধ্য-বর্তীস্থলে কিবণসুবর্ণ নামক একটি বিশাল রাজ্য ছিল, যাকে বর্তমানে সাধারণভাবে সুবর্ণবেখা নদীর নামের সঙ্গে একীকরণ করে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেনাবেল কানিংহামের মতে, পূর্বে মেদিনীপুর পশ্চিমে সুরগুজা রাজ্য (বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত), উত্তরে দামোদর এবং দক্ষিণে উড়িষ্যার বৈতরণী নদীর উৎপত্তিস্থলের মধ্যবর্তী সমস্ত ছোটবড়ো অরণ্য পর্বতময় রাজ্যগুলো নিয়ে নিঃসন্দেহে এই কিবণ সুবর্ণ রাজ্যটি গড়ে উঠেছিল। আমাদের আলোচ্য অঞ্চলটি এই কিবণসুবর্ণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছোটবড়ো অরণ্যপর্বতময় রাজ্যগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। পরিত্রাজক হিউ-এন-সাঙ এসেছিলেন খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বৌদ্ধযুগে এবং তখন এই কিবণ সুবর্ণের রাজা ছিলেন বৌদ্ধদের পবন শত্রু দুর্দাস্ত শশাঙ্ক। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটলেও কিবণ সুবর্ণের ওপর তাব কোন প্রভাব পড়ে নি। আরো পরবর্তীকালে পাঠানবা যখন ভারতবর্ষে তাদের রাজত্ব বিস্তার করে, তখনো এই পার্বত্য অঞ্চল, বর্তমানের ছোটনাগপুর এবং সন্নিকট অঞ্চল, পাঠানদের আগমন এবং প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল।<sup>৬</sup> To

৫. Manbhum District Gazetteer : P. 46

৬. Chakraborty : Chhotanagpur Raj, P 4

the Mohammedan historians, the whole of Chhotanagpur and the adjoining hill states was known by the name 'Jharkhand.'

সমস্ত মুঘল যুগ ধরে এই অঞ্চলটি ঝাড়খণ্ড নামেই পরিচিত ছিল। আইন-ই-আকবরী, জাহাঙ্গীর নামা, তুজক-ই-জহাঁগীরী আদি গ্রন্থে ঝাড়খণ্ডের উল্লেখ আছে। যেহেতু বর্বর অসভ্য, দস্যু অভিধাতুযিত আদিবাসীদের রাজ্য এই ঝাড়খণ্ড কোনদিনই মুঘল সম্রাটদের কৃষ্ণিগত হয়নি, তাই এ-অঞ্চলকে মুঘল যুগে ভাঙা গড়াব কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন কোন রাজ্য, কখনো কোকরা (চুটিয়া নাগপুর), কখনো রামগড়, কখনো-বা পাঞ্চেতের ওপর মুঘলদের আক্রমণ ঘটেছে এবং কখনো কখনো এক-আধ বছরের জঘ্ন এই সব রাজ্য মুঘলসম্রাটদের রাজস্ব দিলেও মোটামুটিভাবে তারা স্বাধীন রাজ্য হিসেবেই থেকে গেছে। যেহেতু এই অঞ্চলটি সামগ্রিকভাবে ঝাড়খণ্ড নামেই চিরকাল পরিচিতি লাভ করেছে, তাই প্রাচীন গ্রন্থ থেকে শুরু করে আধুনিক ইতিহাসকারকে-ও এই অঞ্চলের সমগ্রতাকে বোঝাবার জঘ্ন ঝাড়খণ্ড নামটিই ব্যবহার করতে হয়েছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মল্ল এবং ব্যাভ্র মুখ নামে দুটি রাজ্যের উল্লেখ আছে। মল্ল বাজ্য বলতে মানভূমকে বোঝানো হয়েছে বলে মনে হয় (মল্ল > মাল > মান); অবশ্য রাজ্যগুলো 'ভূম' রাজ্য হিসেবে-ও পরিচিত। ব্যাভ্রমুখ পার্বত্য রাজ্য, তাই এটি বাঘমুণ্ডি-সংশ্লিষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ১৫শ—১৬শ শতকে রচিত ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে ববাভূমিব উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ববাভূমির (অতীতে মানভূম জেলাব দক্ষিণ সীমান্ত, বর্তমানে পুরুলিয়ার) একদিকে ছিল তুঙ্গভূম বাজ্য (বর্তমানে বাঁকুড়ার রাইপুর) অন্যদিকে শেখর পর্বতমালা (পাঞ্চেত বা পঞ্চকোটের পাহাড়)। সেই অতীতকালে এই ববাভূমি একটি বিশাল রাজ্য ছিল যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বরাভূম, সামন্তভূম এবং মানভূম (অতীতের মানভূম জেলার সদর মহকুমা) মহলগুলো। বলাবাহুল্য, এই সমস্ত রাজ্য ঝাড়খণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলা সাহিত্যে ঝাড়খণ্ডের প্রথম উল্লেখ সম্ভবতঃ খ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেই করা হয়েছে। এই গ্রন্থের বহু-উচ্চারিত সেই পংক্তিগুলো হল—

ঝাড়খণ্ড স্থাবর জন্ম আছে যত।

কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমতে উন্নত।...

মথুরা যাইবার কালে আসেন ঝারিগণ্ড ।

ভিন্ন প্রায় লোক তাঁহা পরম পাণ্ড৷ ॥

অষ্টাদশ শতকে রচিত কবি রামকান্ত রায়ের ধর্মমঙ্গলে ঝাড়খণ্ডী বাঙ্গনার উল্লেখ দেখা যায় । একটি প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকে ঝাড়খণ্ড অঞ্চল সম্পর্কে বলা হয়েছে—

অয়ঃ পাত্রে পয়ঃ পানম্ শালপত্রে চ ভোজনম ।

শয়নম খজুরীপত্রে ঝাড়খণ্ডো বিধীয়তে ॥

অর্থাৎ যেখানে লোক লৌহপাত্রে জলপান করে, শালপত্রে ভোজন করে । খজুরপত্রে ( চাটাই ) শয়ন করে, সেই দেশটিই হল ঝাড়খণ্ড । বর্তমান কালে জলপানের জল লৌহপাত্রেব পরিবর্তে পিতল এবং কাঁসার পাত্র এলেও এ-অঞ্চলের লোকেরা এখনো শাল পাতায় ভোজন এবং খেজুর পাতার 'চাটাই'তে শয়ন করে পাকে ।

প্রায় সমস্ত ইতিহাসকারই আলোচ্য অঞ্চলটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে একে ঝাড়খণ্ড নামেই চিহ্নিত কবেছেন । ( ত্রুট্য : Delhi Sultarate (vol. vi) ; History and Culture of the Indian People—Cambridge History of India ; History of Bengal and Bihar through Ages—Dr. Qanungo ; Mundas and their Country—S. C. Roy ; The Bhumij Revolt—J. C. Jha : প্রাঙমৌর্ধ বিহার—ডঃ দেবসহায় ত্রিবেদী, মুঘল সম্রাট হুমায়ূঁ—ডঃ হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব ইত্যাদি ) ।

এমন কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানীর শুরুতে শাসক এবং মিশনারী সাহেবেরা একে ঝাড়খণ্ড নামেই চিনতেন । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা বিহার উড়িষ্কার দেওয়ানী সনদ পাবার আগে পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ছিল । তাই ভৌগোলিক কিংবা রাজনৈতিক ডামাডোল অথবা অঙ্গ-চ্ছেদের কোন প্রস্নই সেদিন ছিল না । ঝাড়খণ্ডেব অঙ্গচ্ছেদ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নামকরণ-এর সূত্রপাত হয় ইংরাজদের হাতে অষ্টাদশ শতকের সপ্তম দশকে ।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাব মীরকাশিমের কাছ থেকে, পরবর্তীকালে যে-সকল অঞ্চল জঙ্গলমহল এবং ধলভূম ( যা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ) নামে পরিচিতি লাভ করেছিল, সেই সব অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের সনদ পেয়েছিল । তসয় রেশম, লাক্ষা এবং অস্ত্রাস্ত্র

অরণ্যজাত ব্রহ্মের লোক থাকলেও কোম্পানী দুর্দান্ত পার্শ্বত্যাগী আদিবাসীর পরাক্রমে এ-সব অঞ্চলে ঘাঁটি পত্তনের ভরসা পায় নি। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর ঝাড়াশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট বাংলা-বিহার- উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর মীরকাশিম প্রদত্ত অঞ্চলগুলোর ওপরও কোম্পানী তার পূর্ণ অধিকার অর্জন করে। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী এই সব দুর্গম অরণ্যরাজ্য গুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনবার জচ্ছ অভিযান চালায়। ঝাড়গ্রামের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রামগড়, শাঁখাকুলি (লালগড়), জাম্বনী, কাঁটিবনী (শিলদা) আত্মসমর্পণ করে। ক্রমে আমাইনগর (অধিকা নগর), সুপুর, মানভূম, ছাতনা, বরাভূম, সামন্তভূম, রাইপুর (তুঙ্গভূম), শ্রামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা কোম্পানীর আধীন্যে স্বীকার কবে। ধলভূম দীর্ঘকাল প্রতিরোধ রচনা করলেও শেষ পর্যন্ত তারও পতন ঘটে। কোম্পানী পশ্চিমে পাতকুম, তোড়াং, বুণ্ডু, মিলি, তামাড এবং উত্তরে 'ঝালদা, কাতরাস, ঝরিয়া' নওয়াগড়, পাঞ্চত (শিখরভূম) কাশীপুর আদি রাজ্যও দখল করে। ধলভূমকে বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত অরণ্যরাজ্যগুলোর সামূহিক নাম দেওয়া হয় জঙ্গল মহল। ঝাড়খণ্ড এই প্রথম তার কয়েক শো বছরের পুরাতন নাম হারিয়ে রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক দলিলে জঙ্গলমহল নামে চিহ্নিত হল। অরণ্যময় স্বাধীন ঝাড়খণ্ড এবার দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে পরতে বাধ্য হল। পরম্পর আত্মীয়তা সম্পর্কে আবদ্ধ ঝাড়খণ্ডের অরণ্যরাজ্যগুলোর অঙ্গচ্ছেদ যেমন ঘটেতে লাগল, তেমনি একবার এ জেলা একবার ও জেলার লেজুড় হিসেবে এদের জুড়ে দেওয়া শুরু হল। আলোচ্য ঝাড়খণ্ডী বাঙলা উপভাষাঞ্চল, কোম্পানী যাব নাম দিল জঙ্গলমহল এবং ধলভূম, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মেদিনীপুর শাসকের অধীনে থাকল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে শাসনের দায়িত্ব হস্তান্তরিত হল বর্ধমানের প্রাদেশিক কাউন্সিলের কাছে। আবার ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে যখন বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন করা হল, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পুনর্বার মেদিনীপুরের শাসকের হাতে ফিরে এল। ছোটখাটো পবিবর্তনও করা হল কিছু। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রাইপুর এবং ফুলকুসমাকে বর্ধমানের একত্রিত্বের নিষেধা হয়েছিল, এবারে শ্রামসুন্দরপুরকেও বর্ধমানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। অবশ্য ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের জাহাঙ্গীরী নাগাদ রাইপুর এবং শ্রামসুন্দরপুরকে মেদিনীপুরের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ছাতনাকে বীরভূমের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত



আঞ্চলিক শান্তি সংহত রাখার জন্য জুলাই নাগাদ ছাতনাকে মেদিনীপুরে  
কিরিয়ে আনা হয়েছিল।

এই দুর্দান্ত জঙ্গল মহলগুলোকে একই সূত্রে গ্রহিত করে শান্তি সংরক্ষণ  
এবং সুশাসনের জন্য কোম্পানী জঙ্গল মহল নামে একটি পৃথক জেলা সৃষ্টি  
করতে বাধ্য হয়। In 1805 the Government realized that for 'the  
maintenance of the peace and the support of the General police  
of that part of the country', it was essential to station an  
officer in the heart of the Jungle Mahals. They therefore  
passed Regulation XVIII of 1805.<sup>৮</sup>

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের এই অষ্টাদশ সংখ্যক ধারাকে আরো ব্যাপক অঞ্চলে  
কার্যকরী করা হল। কলে আরো কয়েকটি মহল এই নতুন শাসনযন্ত্রের  
নিয়ন্ত্রণে এল। বীরভূম জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল পাঞ্চত, বাঘমুণ্ডি,  
বাগনকুদর, তরক বালিয়াপার, কান্তরাস, হেসলা (বালাদা), ঝরিয়া, জয়পুর,  
মুকুন্দপুর, কিসমৎ নওয়াগড়, কিসমৎ চুটি, তোডাং, টুণ্ডি, নাগবকিয়ারী এবং  
পাতকুম। বর্ধমান জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হল শনপাহাড়ী, ভঞ্জভূম, শেরগড়  
এবং বিষ্ণুপুর; মেদিনীপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হল ছাতনা, বরাভূম, নুপুর,  
অধিকানগর, শিমলাপাল এবং ভেলাইডিহা। পুরাতন জঙ্গল মহলগুলোর  
সঙ্গে এই নতুন মহলগুলো জুড়ে দিয়ে এক বিস্তীর্ণ এলাকাকে আশ্রয় করে  
গড়ে উঠল নতুন জেলা জঙ্গল মহল। ধলভূম অরণ্যরাজ্য হলেও তাকে এবং  
বর্তমান ঝাড়গ্রাম মহকুমার কিছু অরণ্যরাজ্যকে জঙ্গল মহলের সঙ্গে না জুড়ে  
আগের মতোই মেদিনীপুর শাসকের নিয়ন্ত্রণেই রাখা হল।

১৮০২-০৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিজ বিদ্রোহ বা গঙ্গানারায়নী হাজামার পর  
কোম্পানী সরকারকে এই সব মহলকে নতুন করে টেলে সাজাতে হয়।  
১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন সরকার সিদ্ধান্ত নেয় এই সব মহলগুলোকে নিয়ে  
একটি Non-Regulation Area গড়ে তোলার, যার শাসন দায়িত্ব থাকবে  
দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক এজেন্টের হাতে,— যিনি এর কমিশনার  
হিসেবে কাজ করবেন। ২২শে ডিসেম্বর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সরকারিভাবে ঘোষণা  
করা হল, নতুন জঙ্গলমহল জিলা থেকে শনপাহাড়ী, শেরগড়, বিষ্ণুপুর এবং  
ধলভূম (মেদিনীপুর জেলা)-কে বাদ দেওয়া হল। বাঁকুড়া শহর অংশত:

বিষ্ণুপুর ( বর্ধমান জেলা ) এবং ছাতনা (এজেন্সীভুক্ত রাজ্য) থাকায় শেষ পর্যন্ত সংলগ্ন তিনটি গ্রাম সহ বাঁকুড়াকে এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই নতুন এজেন্সীকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের শুরুতেই তিনটি বিভাগে ভাগ করা হল : মানভূম বিভাগের ( যার সদর দপ্তর ছিল মানবাজার ) অন্তর্ভুক্ত করা হল নন্-রেগুলেটেড জঙ্গলমহলগুলো সহ ধলভূমকে ; লোহারদাগা বিভাগে রাখা হল বুড়ুসিলি তামাড আদি পাঁচপরগণাসহ চুটিয়ানাগপুব এবং পালামৌ ; হাজারিবাগ বিভাগে অন্তর্গত করা হল বামগড়, খড়কডিহা এবং পুরাতন বামগড় জেলাব বেগুলেশান বহির্ভূত রাজ্যগুলোকে। আমাদের পরিক্রমণ ক্ষেত্র মূলতঃ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সীর মানভূম বিভাগ হলেও অল্পবিস্তর ঝাড়খণ্ডী বাঙলাভাষী পাঁচপরগণাও আমাদের পরিক্রমণের দাবী করে। এজেন্সী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের দিপাঙ্গীবিদ্রোহ পর্যন্ত এই অঞ্চলে শাস্তিপূর্ণ শাসন পবিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মানভূমের সদর দপ্তর 'অরণ্যভূমির কেন্দ্রবিন্দু' পুরুলিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সিংভূম জেলার সৃষ্টি হলে ধলভূমকে সিংভূমেব সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তেব এজেন্ট ছোটনাগপুরেব কমিশনার এবং এজেন্টেব পুরুলিয়াস্থ মুখ্য সহকারী ডেপুটি কমিশনার পদে উন্নীত হন। জঙ্গল মহলের এতোদিনের কায়েমী নাম, ঝাড়খণ্ড নামেব মতোই, এজেন্সীর অন্তরালে হারিয়ে গেল। এবাব ধীরে ধীরে রাজনৈতিক মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল ছোটনাগপুব।

ঝাড়খণ্ডই বলা হোক কি জঙ্গলমহল কি ছোটনাগপুর, বাঙলাভাষী মহল এবং রাজ্যগুলোর ভাগ্যচক্রের আবর্তন খামে নি। ধলভূমকে সিংভূমের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ধলভূমের পূর্ব প্রান্ত ( বর্তমান পশ্চিমবাংলার গিধনি-পড়িহাটির পশ্চিম প্রান্ত থেকে বিহারসীমান্তঅবধি ) মেদিনীপুব জেলায় ধণ্ডিত অবস্থায় থেকে গেল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশেব ভারতবর্ষ ত্যাগের সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোলের ক্ষেত্রে এক বিপর্যয় ঘটে গেছে, দেখা যায়। বাংলা, বিহাব এবং উড়িষ্যা পৃথক পৃথক প্রদেশ হয়ে গেছে এবং বাঙলাভাষী জঙ্গলমহলগুলো বাংলা বিহারের বিভিন্ন জেলার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ধলভূম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বৃহত্তর অংশ বিহারের সিংভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ক্ষুদ্রতর অংশটা বাংলার মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে মিশে গেছে।

পাঁচ পরগণা—বুড়ু, সিলি, তামাড়, সোনাহাতু ইত্যাদি—রাঁচি জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জঙ্গলমহলগুলোর অধিকাংশ মহলের সমন্বয়ে বিহারের মানভূম জেলা গড়ে উঠেছে। ঝাড়গ্রাম, নয়াবসান, কল্যাণপুর, জামবনী লালগড়, রামগড়, ঝাঁটবনী আদি নিয়ে গড়ে উঠেছে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা। রাইপুর, সুপুব, সামন্তভূম, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, ফুলকুসমা, উজ্জভূম, ভেলাইডিহা, কুইলাপাল, ছাতনা আদি মহল নিয়ে গড়ে উঠেছে ঝাঁকুড়া জেলার পশ্চিম সীমাঞ্চল।

ঝাড়খণ্ড গিয়েছিল, জঙ্গলমহলও পূর্বনো দলিলে আশ্রয় নিয়েছিল, তবু অধিকাংশ জঙ্গল মহল ছোটনাগপুর নামের আড়ালে আশ্রয় পেয়েছিল। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে আবার অস্তিম এবং চরম ভাঙাগড়ার কাজ শেষ হল। মানভূম ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেল: বাঙলাভাষী অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে টানািপোড়েনে উত্তরের শিল্লাঞ্চল ধানবাদকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বিহারের একটি নতুন জেলার সৃষ্টি করা হল,—কাতরাস, ঝরিয়া আদি মহল থেকে গেল এই নতুন জেলার ভেতর; জামশেদপুর শিল্লাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখার জন্তু দক্ষিণ পশ্চিমাংশ জুড়ে দেওয়া হল সিংভূম জেলার নতুন মহকুমা সেরাইকেলার সঙ্গে, যার ভেতর থেকে গেল ভোড়াং পাতকুম আদি মহল এবং চাণ্ডিল পটমদা অঞ্চল; মধ্যাংশ এবং বৃহত্তর অংশ পুরুলিয়া নাম ধারণ কবে পশ্চিমবাংলার একটি নতুন জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল, যার মধ্যে রইল ববাজুম, পাঞ্চৈত, ঝালদা, বাঘমুণ্ডি, বাগনকৌদর, জয়পুর, মুকুন্দপুর, নয়াগড়, কাশীপুর, মানভূম আদি মহলগুলো। ঝাড়খণ্ড এবং জঙ্গলমহল মানচিত্র থেকে আগেই মুছে গিয়েছিল, এবারই মানভূম ও মুছে গেল। এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধলভূম-মানভূমের বাঙলাভাষী ধলভূম তার বিরাট শিল্লাঞ্চল নিয়ে আগের মতোই সিংভূম জেলার অগ্রতম মহকুমা হিসেবে থেকে গেল; ধলভূম-মানভূমের অবিচ্ছেদ্য রক্ত সম্পর্কের অস্তিত্বের ওপর রাজনৈতিক শবব্যবচ্ছেদ কার্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করা হল। পাঁচ পরগণার ভবিতব্য বছকাল আগেই রাঁচির ভাগ্যচক্রের সঙ্গে আর্ন্তিত হচ্ছিল, তার কোন পরিবর্তন হল না।

বাঙলাভাষী ঝাড়খণ্ড বলেই ডাকা হোক, কি জঙ্গল মহল অথবা ছোটনাগপুর, সেই হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসল খৃগের দুর্দান্ত স্বাধীন আদিবাসী অঞ্চলের

সংহতির বিনষ্ট ইংরাজ রাজত্বে সূত্রপাত হলেও স্বাধীন ভারতবর্ষে তা চরম ভাবে সংঘটিত হয়েছে।

বাংলা-বিহারে দ্বিধা বিভক্ত সেই সব বাঙলাভাষী আদিবাসী 'ভূমি' বা 'ভূম' রাজ্যগুলো আজ যেন আমাদের স্মৃতি থেকেও লুপ্ত হতে চলেছে। এই সব অঞ্চলের লুপ্ত গৌরবকে অস্তিত্ব: স্মৃতিতে সঞ্জীবিত করে তোলা যায়, যদি আমরা একে চিরপুরাতন চিরনূতন ঝাড়খণ্ড নামে অভিহিত করি। রাজনৈতিক ভূচিত্রে দ্বিধাবিভক্ত এই সব মহল একমাত্র তাহলেই তাদের পুরনো সংহতি ফিরে পেতে পারে। অস্তিত্ব: পক্ষে মনচিত্রে এইসব বিচ্ছিন্ন মহল-গুলোকে একটি সাধারণ নামের আশ্রয়ে সংহত করতে না পারলে আঞ্চলিক লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে সংহতি আশা যেমন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তেমনি রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে অবলম্বন করে আঞ্চলিক সংস্কৃতি-গত জীবনের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতিও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আমরা আমাদের প্রস্তাবিত অঞ্চলটিকে 'ছোটনাগপুর এবং সন্নিহিত পশ্চিমবাংলা' নামে অভিহিত করতে গিয়ে দ্বিধাষিত না হয়ে পারি না। এক তো এর সাহায্যে আদিবাসী জনজীবনের ব্যাখ্যা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়; দ্বিতীয়তঃ এই নাম এক এবং অভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বিচরণ করার পক্ষে শুধু অস্পষ্টতাই সৃষ্টি করে না, বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করে। তাই আমরা এর পরিবর্তে অবিচ্ছিন্ন প্রাচীন ঐতিহাসিক নাম 'ঝাড়খণ্ড' গ্রহণ করবার পক্ষপাতী; এর ফলে অতীতের স্বাধীনতাপ্রিয় দুর্দান্ত আদিবাসী বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এবং লুপ্ত গৌরবকে জীইয়ে রাখা ছোটো কাক্সই সহজে সম্ভব হবে।

বাঙলাভাষী ঝাড়খণ্ডের যে-সব রাজ্য এবং মহলের লোকসাহিত্য সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করব, তাদের মোটামুটি নাম-গুলো হল: বিহারের রাঁচি জেলার বুণ্ডু, সিলি, তামাড়, সোনাহাতু আদি পাঁচ পরগণা; পুরাতন মানভূম জেলার (বর্তমানে বিহারের ধানবাদ জেলা, সিংভূমের সেরাইকেলা মহকুমা ও পশ্চিম বাংলার পুন্ডুলিয়া জেলা) অন্তর্গত সমস্ত জঙ্গলমহল—পাঞ্চৈত, কাশীপুর, বাঘমুণ্ডি, বাগনকুদর, তরফ বালিয়াপার, কাতরাস হেসলা (ইলু) ঝালদা, ঝরিয়া, জয়পুর, মুকন্দপুর, নয়গড়, চুটি, ভোড়াং, টুণ্ডি, নাগরকিয়ারী, পাতকুম, মানভূম, বরাভূম ইত্যাদি; সিংভূম জেলার সেরাইকেলা এবং ধলভূম মহকুমা; পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলার

ছাতনা, ভঞ্জভূম, সুপুৰ, সামন্তভূম, অম্বিকানগৰ, কুইলাপাল, শিমলাপাল, ভেলাইডিহা, রাইপুৰ (ভুজভূম), শ্ৰামসুন্দৰপুৰ ফুলকুসয়া আদি সীয়াস্ত-বৰ্তী জঙ্গলমহল সমূহ এবং মেদিনীপুৰ জেলাৰ বাড়গ্রাম মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বাড়গ্রাম, নয়াবসান, কল্যাণপুৰ (দহিজুডি), লালগড় (শাঁকাকুলি), বামগড়, বাঁটিবনী (শিলদা), জামবনী আদি জঙ্গলমহল সমূহ। বলাবাহুল্য, এই সব জঙ্গল মহলকে তৎকালীন জয়েণ্ট কমিশনাৰ মি: ডেপুটী বাংলাভাষী অৱণ্যৱাজ্য বলে উল্লেখ কৰেছেন। ভূমিজ বিদ্রোহেৰ (১৮৩২-৩৩) পৰ জঙ্গল মহল ভেঙে বিভিন্ন জেলা পুনৰ্গঠনেৰ সময় তিনি এই অঞ্চলে সমস্ত সৱকাৰি কাজে কাবসী ভাষাৰ পৰিবৰ্তে বাঙলা ভাষাৰ ব্যবহাৰেৰ ওপৰ গুরুত্ব দেন। He urged that Bengali, the colloquial language of the hill areas, should be substituted for Persian in all public offices and he requested the Government to open a good school for the children of the Jungle Zamindars <sup>৯</sup>

মামলা মোকদ্দমাৰ ক্ষেত্ৰে আমলাৰ যাতে অন্তায় সুযোগ নিতে না পাবে অথবা অযথা দেবী না হয় তাৰ জন্তু অন্ততম জয়েণ্ট কমিশনাৰ ক্যাপ্টেন উইলকিনসন তাঁৰ নিৰ্দেশনামায় বলেন—The assistant was to maintain an English and a Bengali register of suits.<sup>১০</sup>

এসব থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, জঙ্গল মহলে সমস্তল বাংলাৰ বাঙালীৰ অনুপ্রবেশেৰ পূৰ্বে থেকেই বাঙলা ভাষা এখানকাব আঞ্চলিক ভাষা ছিল এবং বহু শতাব্দী ধৰে এই ভাষাতেই এখানকাব লোকসাহিত্য ৰচিত, কথিত এবং গীত হৰেছে।

৯ The Bhumij Revolt · J. C Jha, Pp 168

১০. Ibid

॥ দুই ॥

## ভাষা-সংস্কৃতি-অধিবাসী

ঝাড়খণ্ড সর্বাংশে আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল। এখানে আদি-অষ্ট্রেলীয় এবং- দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বহু সম্প্রদায় পরম আত্মীয়ের মতো ইতিহাসের ধূসর যুগ থেকে পাশাপাশি বাস করে আসছে। আদি-অষ্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর সাঁওতাল, কোল, হো, কোড়া, মাহলী আদি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ওরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, খাড়িয়া, বীরহোড়, কুর্মি আদি সম্প্রদায়গুলো একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উদ্ভব এবং বিকাশে সমান অবদান জুগিয়েছে। আদি-অষ্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর সম্প্রদায়গুলো এখনো তাদের নিজস্ব অস্ট্রীয় ভাষাকে বর্জন করে নি; কিন্তু দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা নিজস্ব ভাষা বর্জন করে ভারতীয়-আর্থভাষার কোন না কোন উপভাষাকে আশ্রয় করেছে এবং পৃথক পৃথক গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের উপযোগী এক একটা ভাষা-সংস্কার গড়ে তুলেছে। আমাদের আলোচ্য অঞ্চলে প্রধানতঃ ভূমিজ, খাড়িয়া, কুর্মি, বাগাল, কামার কুমোর ভূঞা আদি ভারতীয় আর্থ উপভাষা ভাষীদের যেমন বাস আছে, তেমনি অস্ট্রীয় ভাষী সাঁওতাল, কোড়া মাহলী আদির বাসও আছে। কুর্মি-মাহাত, ভূমিজ খাড়িয়া কামার কুমোর বাগাল আদি সম্প্রদায়-গুলো ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষাভাষী। এদের মধ্যে প্রচলিত লোকসাহিত্যের উপকরণগুলোই বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

প্রধানতঃ কুর্মি-মাহাত এবং ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত লোক-সাহিত্যের উপকরণ নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এই দুটি সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। ঝাড়খণ্ডের আলোচ্য অঞ্চলে কুর্মি-মাহাত সম্প্রদায়ের লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। ধানবাদ-রাঁচির পাঁচ পরগণা, সেরাইকেলা ধলভূম পুফলিয়া-ঝাড়গ্রাম-দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাঁকুড়ায় কুর্মির অত্যন্ত ঘনভাবে বসবাস করে আসছে। কুর্মিদের আদি বাসভূমি শিখরভূম, সেখান থেকেই তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের নিজস্ব ভাষা কুর্মালি এখনো পাঁচ পরগণা-ঝালদা-ধানবাদ আদি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্ততঃ কুর্মি মাহাতরা ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষায় কথা বলে, গান গায়, মৌখিক সাহিত্য রচনা করে। মাহাতদের ভাষা-সংস্কৃতিই আলোচ্য অঞ্চলের ভাষাসংস্কৃতির প্রধানতম উপাদান। ডঃ সুধীর

কুমার করণ যথার্থই বলেছেন, 'এদের বাদ দিলে সীমান্ত বাঙলাও থাকে না, সীমান্ত-সংস্কৃতিও থাকে না।' এদের সর্বগ্রাসী ভাষা-সংস্কৃতি ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী সমস্ত ঝাড়খণ্ডী উপভাষীদের প্রভাবিত করেছে। কোথাও কোথাও বহিরাগত হিন্দু বা বর্ণহিন্দুরা এদের ভাষার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মধ্যে একটা ভেদ বেধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। মাহাতদের সামুনাসিক বাকভঙ্গি নাসিকাক্ষনিটিকে বাদ দিয়ে এঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র বাণতে যৎসামান্য সফল হয়েছেন। নাসিকাক্ষনি-প্রধান ঝাড়খণ্ডী উপভাষা বহিরাগত বঙ্গজনের কাছে 'কুডমী ভাষা' বা 'মাহাত ভাষা' নামে পরিচিতি লাভ কবেছে।

কুমি সম্প্রদায়টি কুমিক্ষত্রিয় নামে খুবই সম্প্রতিকালে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু এই পবিচয়টা শুধু এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত এবং সম্পন্ন পবিবাবঙ্গলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সাধারণ কুমিবা নিজেদের 'কুডমি' বলেই পবিচয় দেয়। প্রতিবেশী সম্প্রদায়গুলো এদের 'কুডমি' বলেই জানে। আসলে এদের আত্মিক সম্পর্ক ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের সঙ্গেই। কুমিবা যে ড্রাবিড শাখারই একটি সম্প্রদায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুমিবা পেশায় কৃষিজীবী, এদের মতো কৃষি-বর্মে দক্ষ সম্প্রদায় শুধু ঝাড়খণ্ডে কেন, ভারতের অন্যান্য খুব বেশি নেই। কুমি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই 'মাহাত' বা 'মাহাতো' পদবী ব্যবহার করে থাকে। তাই ধলভূম-ঝাড়গ্রাম আদি অঞ্চলে এরা কুমি নামেব পবিবর্তে মাহাত নামেই সুপরিচিত। কুমিক্ষত্রিয় নামটি না এদের মধ্যে বহুল পরিচিত, না প্রতিবেশীদের কাছে।

কুমি-মাহাতবা ব্রাহ্মণ্য-সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত কোনদিনই ছিল না। আচারে-আচরণে, জীবনচর্চায়-সংস্কৃতিতে এদের মধ্যে আদিম জাতিত্বের চিহ্নগুলো যতো বেশি সুপ্রকট, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবজাত হিন্দুত্বের চিহ্ন তার সিকি অংশও লক্ষ্যগোচর হয় না। হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান, পাল-পার্বন এই সম্প্রদায়ের ওপর কোনই প্রভাব ফেলতে পাবে নি। অধুনা এদের মধ্যে বিবাহ, জ্ঞান এবং কিছু কিছু পূজানুষ্ঠানে কোথাও কোথাও গ্রাম্য পুরোহিত নিয়োগ করা হচ্ছে। 'কান ফুঁকা' বা কানে-কানে হরে কুক হরে রাম বৈষ্ণব মন্ত্রদানের অনুষ্ঠানও আছে। কিন্তু অই পর্যন্তই। হিন্দু সমাজব্যবস্থার অংশ লাভের প্রলোভন দেখিয়ে ব্রাহ্মণেরা ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী রাজা-জমিদার-

সামন্তদের ক্ষত্রিয়ত্ব দান করেছিলেন। আদিবাসী সামন্তদের নির্দেশেই কুম্ভি, ভূমিজ আদি উপজাতিদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়োগের সূত্রপাত হয়ে-যাকা খুবই স্বাভাবিক। ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি রাজবংশই যে আদিবাসী রাজবংশ, তা সে মুণ্ডা হোক, কুম্ভি হোক কি ভূমিজ হোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পঞ্চকোট, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম, বয়াভূম, পাতকুম যে-কোন রাজবংশের উদ্ভব কাহিনী একই ছাঁচে গড়া। সর্বত্রই উপকথা : আধাবর্তের কোন না কোন রাজ্যের রাজদম্পতি পুরীধামে যাবার পথে সজ্ঞাত শিশুকে প্রসব-স্থলেই কেলে চলে গেছেন ; এই শিশুই আদিবাসীদের হাতে লালিত হয়ে সেই রাজ্যের রাজা হয়ে ক্ষত্রিয় রাজবংশের সূত্রপাত কবেছে। কোথাও বা বন-থেকে কুড়িয়ে-আনা অজ্ঞাতকুলশীল শিশুই রাজা হবার পর ক্ষত্রিয় রাজবংশ প্রবর্তন করেছে। যেমন পঞ্চকোট রাজবংশ। আসলে আদিবাসীদের যজন-যাজনের প্রলোভন ত্যাগ কবতে না পেরে এবং নিজেদের সমাজে যাতে ব্রাত্য না হতে হয় এই কাবণেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা এই ধরনের উপকথার সৃষ্টি করে আদিবাসীত্ব ঘুচিয়ে রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্ব দান করেছিলেন। তাঁদের আসল লক্ষ্য ছিল শোষণ, এ ব্যাপারে তাঁরা ষোল আনাই সফল হয়েছিলেন। এই ব্রাহ্মণ্যবাদেব প্রভাবের ফলেই কুম্ভি-সামন্তদের নির্দেশে, ঝাঁদের মধ্যে শিখবভূমের রাজা বিশিষ্টম, কুম্ভিক্ষত্রিয়স্বের আন্দোলন ওঠে ; আদিবাসীমূলত কিছু খাচ-অভ্যাস এবং কুসংস্কার বর্জিত হয়। বহু লোক যজ্ঞোপবীত ধারণ কবে। কিন্তু এই ঘটনাটি খুবই সাম্প্রতিক। সংস্কৃতি সমন্বয়ের কথা বারবার বলা হয়েছে। যাবা গভীবে প্রবেশ কবে ঝাড়খণ্ডী আদিবাসীদের, বিশেষ করে কুম্ভিদের, আচার-সংস্কৃতি খুঁটিয়ে বিচার করে দেখবেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কথাটা নিতান্তই কাল্পনিক, কথামো-কথনো বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচার-ধর্মনি (প্লোগান) মাত্র। কুম্ভিরা কিংবা ভূমিজরা যেমন ক্ষত্রিয় নয়, তেমনি আর্ধ-অনার্ধ সংস্কৃতি-সমন্বয় কথাটিও সর্বাংশে সত্য নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ কিংবা বৈষ্ণব জীবনচর্চা এদের জীবন-ধারণ কোথাও কোথাও একটা ভাসা-ভাসা রূপ পেয়েছে মাত্র ; যতক্ষণ না কোন সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করা হয় ততক্ষণ সমন্বয়ের কোন প্রস্নই ওঠে না। ব্রাহ্মণ্যবাদ কিংবা বৈষ্ণব জীবনচর্চা কোনদিনই ঝাড়খণ্ডের হিন্দুকৃত আদিবাসী কুম্ভিদের মর্মস্থলে পৌঁছাতে পারেনি। অস্ত্রের ধর্ম কিংবা জীবনচর্চা অহংগের প্রতি কুম্ভিদের চিরকালই তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল। তাই এরা বৈদিক



ধর্ম, জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছিল ; মুসলমান ধর্মের চাপে পড়ে এরা একদা উত্তর ভারত থেকে ঝাড়খণ্ডে পালিয়ে এসেছিল, সে-কথা এদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী থেকে জানা যায় ; খ্রীষ্টান ধর্মের বর্ণময় প্রলোভনে পড়ে যখন অগ্রাগ্র আদিবাসীরা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে তখনো এরা তীব্র প্রতি-রোধ রচনা করে খ্রীষ্টান পাদরীদের সমস্ত প্রলোভনকে নির্বিকার প্রত্যাখ্যান করে। শুধু চৈতন্যদেবের শ্রেণীহীন জাতিহীন ধর্মব্যবস্থায় এরা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। এর কারণটাও এদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে নিহিত আছে। কুর্মিদের সমাজ-ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে আদিম কৌম ব্যবস্থার সাম্যবাদী চরিত্রকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। ভেদাভেদে অবিশ্বাসী সাম্যবাদী জীবন-চর্চায় বিশ্বাসী কুর্মিরা তাই একই পদবী 'মাহাত' ব্যবহার করে থাকে। আলোচ্য গ্রন্থে কুর্মিদের লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি পালপার্বন জীবনচর্চার কথাই মূলতঃ বলা হয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, কুর্মিদের সংস্কৃতি পালপার্বন সমস্তই আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্যগুলোকেই সুপরিষ্কৃত কবে তুলেছে।

এখানে কুর্মিদের সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নের অবকাশ নেই। অল্পকথায় তাদের সম্পর্কে অনধীত দিকটিতে আলোকপাত করাই আমাদের লক্ষ্য। এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে মুণ্ডা এবং কুর্মিরা সমসাময়িক কালেই ঝাড়খণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। প্রাচীন কালে মগধে চেরপাদ নামক উপজাতি বাস করত (ইমাঃ প্রজাপ্তিঃ সত্যায়মান্তানী মানী বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ। ঐতরেয় আরণ্যক। ২।১।১।৫)। তারাই পরবর্তীকালে ঝাড়খণ্ডে এসে মুণ্ডা এবং কুর্মি নামে দু'টি উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে থাকা স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ বিভিন্ন হওয়ায় এদের ভাষা সংস্কৃতি জীবনচর্চাতেও পার্থক্য ঘটতে থাকে কিন্তু মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোতে কোন পরিবর্তন ঘটেনা। মুণ্ডারা প্রধানতঃ ছোট নাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে তাদের বাসভূমি স্থাপন করে কিন্তু কুর্মিরা মগধ থেকে সাঁওতাল পরগণা হাজারিবাগ হয়ে মানভূমের মূল ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। কুর্মিরা দামোদর কংসাবতী এবং সুবর্ণ রেখার তীরবর্তী উর্বর অঞ্চলগুলোতে বাস করতে শুরু করে। একে তো কুর্মিরা কৃষিকর্মে সুদক্ষ, তার ওপর উর্বরা ভূমি তাদের অধিগত, তাই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মুণ্ডাদের থেকে অনেক বেশি স্বচ্ছল ছিল। স্বভাবতঃই কুর্মিরা মুণ্ডাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরবর্তী-কালে মুণ্ডাদের একটি শাখা কুর্মি-অধ্যুষিত অঞ্চলে এসে জমির মালিক হওয়ায়

তার ভূমিজ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং কুর্মিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আচারে-আচরণে ভাষায়-সংস্কৃতিতে তারা কুর্মিদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়; এদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কুর্মি শব্দটি কুর্ম (কচ্ছপ) টোটেম (কুলতিলক) বাচক শব্দ হতে পারে। শব্দটি অত্যন্ত প্রাচীন, বেদে ক্ষত্রিয়রাজ ইন্ড্রের প্রসংগে এই শব্দের ব্যবহার আছে। কুর্মি শব্দটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীবদ্ধ পরিবার-জীবনের সমার্থক 'কুটুম্ব' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে পণ্ডিতদের মত। ব্যাখ্যাটি বিশ্বাসযোগ্য এই কারণে যে এদের মধ্যে আদিম সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার জাতি-কুটুম্ব চরিত্র গুণটি এখনো অত্যন্ত সুপ্রকটভাবে দেখা যায়। 'মাহাত' বলে পরিচয় দিলে যে কোন কুর্মি পরিবারে কুটুম্বের মতোই আদরযত্ন লাভ করা যায়; আহার এবং আশ্রয়ের কোন অসুবিধা হয় না—এতো বেশি কুটুম্বপ্রিয় সম্প্রদায় খুব কমই দেখা যাবে। সংস্কৃত 'কুটুম্ব' শব্দটি ত্র্যবিভ শব্দ হওয়াই সম্ভব। প্রাচীন-কালেও যে এরা ভাবতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস কবত তার উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে মেলে। কুটুম্বিন, কুনবী, কুটুম্বি কুববী এবং সব শেষে কুর্মি একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নাম বিশেষ। সর্বত্রই এরা কৃষিনির্ভর উপজাতি হিসেবেই পরিচিত।

অধ্যাপক গুরের মতে, ঝাড়খণ্ডের কুর্মিরা ছত্তিশগড়ের গণ্ড এবং কামারদের চাপে পড়ে পূর্ব দিকে সরে এসে বাস করতে শুরু করে। ঝাড়খণ্ডের কুর্মিদের কৃষিকর্মের রীতিরেওয়াজ, উপকরণ, লাঙল-ফালের ধরন-ধারণ, ভাষা, গোত্র এবং সমাজ-ব্যবস্থার ওপর গবেষণা করে তিনি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন যে এদের সঙ্গে মধ্যভারতীয় উপজাতিদের মিলই সর্বাধিক। ডার্টন সাহেবও কুর্মিদের ঝাড়খণ্ডের প্রাচীনতম উপজাতিদের অন্ততম বলে স্বীকার করেছেন।

কুর্মিদের গোত্রনামগুলো কখনো পেশাগত কখনো টোটেম বা কুলতিলক-গত হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন এদের মধ্যে মাত্র বারোটি গোত্র বিদ্যমান। কথ্য ঠিক নয় বলেই মনে হয়। আমাদের পরিচিত কয়েকটি গোত্রের নাম দেওয়া হল: কাড়ওয়ার (মহিষ), কেশরওয়ার (কেশর বাস), কুরুম (কচ্ছপ), বাঘবানওয়ার (বাঘ), ছচ যুত্রা (মাকড়সা), ডুমুরওয়ার (ডুমুর গাছ), হাঁসতোওয়ার (হাঁস), টুডু, হিন্দোওয়ার আদি টোটেমজাত গোত্র এবং

পেশাগত গোত্র হল ডোমিয়ার, কাটিয়ার, তিরুয়ার, জালবুনার, বাশিয়ার, শাঁখোয়ার ইত্যাদি। গোত্রবিভাজন এবং নামকরণ রীতিটি সম্পূর্ণতঃ আদিম উপজাতির প্রথাসিদ্ধ রীতি। এদিক দিয়ে সাঁওতাল-মুণ্ডাদের সঙ্গে এদের সম্পূর্ণতঃ মিল আছে।

কুর্মিদের সঙ্গে সাঁওতালদেরও অনেক বিষয়ে মিল আছে। সাঁওতালরা কুর্মিদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে থাকে। সাঁওতালরা অল্প উপজাতির রান্না-করা খাবার গ্রহণ করে না, কিন্তু মাহাতদের রান্না অল্প গ্রহণ করে। মাহাতদের বিয়ের 'শিরি বারি ডালা' একদা সাঁওতালে বহন করত অনিবার্যভাবে। সাঁওতালদের মতোই কুমিরা ব্রাহ্মণদের অল্পও একদা গ্রহণ করত না। এখনো অনেকেই গ্রহণ করে না, নারীসমাজ তো কোনদিনই ব্রাহ্মণের রান্না খাওয়াব্রব্য ভক্ষণ করে নি। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দেব প্রাণঘাতী দুর্ভিক্ষের সময়েও বাঙালি ব্রাহ্মণদের রান্না-করা লঙ্গরখানার খাবার কুমি এবং সাঁওতালরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। কুর্মিদের এই খাওয়া-অভ্যাসও তাদের ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থা-বহির্ভূত আদিম উপজাতিত্বের প্রতীক ইঙ্গিত করে।

ব্রিটিশ শাসন কালে ১২৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুমিরা আদিম উপজাতি হিসাবেই পরিচিত ছিল। ১২৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে এই সম্প্রদায় কুমিক্ষত্রিয় নামে চিহ্নিত হয় এবং অল্পমত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। এ-প্রসঙ্গে ১২৩১ খৃষ্টাব্দে আদম সুলতানের প্রাক্কালে কুমি মহাসভা যে প্রচারপত্র বিলি করেছিল তা স্মরণ করা যেতে পারে। কুমি মহাসভার আবেদনক্রমে তৎকালীন ইংরাজ সরকার কুর্মিদের লোকগণনায় কুমিক্ষত্রিয় নাম ব্যবহার করবার অল্পমতি দিয়েছিলেন। প্রচারপত্রে সরকারী দুটি পত্রের বাংলা অনুবাদও ছিল। আমরা সেগুলো এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

নং এফ ৩৩৩। ১২৩০ পাবলিক

গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া হোম ডিপার্টমেন্ট।

প্রেরক : এ ছইটেকার এক্সোয়ার আই. সি. এস।

আণ্ডার সেক্রেটারী গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া।

নয়াদিল্লী ১৮ই নভেম্বর

মহাশয়,

আপনার ৩/১১/৩০ তারিখ ১২৪৫ নং পত্রের উত্তর দিবার জঙ্ক আমাকে

এই আদেশ করিয়াছেন যে আগামী সন ১৯৩১ সালের মনুস্মরণনাম আপনাদের স্বজাতি ভ্রাতৃবর্গকে কুর্মিক্ষত্রিয় জাতি লিখাইবার আদেশ দিয়াছেন। তাহাতে ভারত গভর্নমেন্টের কোন আপত্ত্য নাই।

ভবদীয়

( হস্তাক্ষর ) এ. ছইটেকার

আণ্ডার সেক্রেটারী ভারত গভর্নমেন্ট

দ্বিতীয় পত্রটিও অগিল ভারতীয় কুর্মিমহাসভার প্রধান সম্পাদককে ভারতের জন-গণনা কমিশনার মিঃ জে. এইচ. হটন লিখেছিলেন। তাঁর চিঠির সংখ্যা ছিল নং ৫ ই. এন. এম. এন. তারিখ দিল্লী ২৫শে নভেম্বর ১৯৩০। তিনি লিখেছিলেন, ‘মহাশয়, আপনার ৬।১।৩০ তারিখের ১৯৪৪ নং পত্রের উত্তর দিয়া অবগত করিতেছি যে সেনসাসের জেনারেল সিডিউলে অর্থাৎ রেকর্ডে কুর্মি জাতিকে কুর্মি ক্ষত্রিয় লিখাইবার আমার আপত্ত্য নাই, কুর্মিক্ষত্রিয় শব্দের অতিরিক্ত অর্থাৎ স্থানীয় জাতির নাম বা উপজাতির নাম দিয়া যথা রাজবংশীয়, কুনবি বা রেডিইত্যাदि। কেননা (তাহা না হইলে) পূর্ব মনুস্মরণনাম আপনাদের জাতিসংখ্যার সহিত আগামী মনুস্মরণনাম জাতিসংখ্যা মিলান সম্ভব হইবে না। সেনসাসের সমূহ সুপারিণ্টেণ্ডেন্টকে অবগত করান হইয়াছে।’

চিঠি দুটির প্রতিলিপি উদ্ধৃত করা হল এই কারণে যে এর কলে কুর্মিদের সম্পর্কে বর্তমানে দ্বিধাগ্রস্ত অনেকেই কুর্মিদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন। কুর্মিরা যে ক্ষত্রিয় নয়, চিঠিগুলো তা প্রমাণ করে; তাছাড়া কুর্মি, কুনবি বা রেড্ডীরা যে একই সম্প্রদায়ভুক্ত, তা’ও প্রমাণিত হয়। কুর্মিরা অনুরক্ত ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় উপজাতির প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে উপজাতিদের থেকেও পশ্চাৎপদ থেকে গেছে। বর্তমানে শিক্ষিত কুর্মি তরুণসম্প্রদায় বহিরাগত উন্নত সম্প্রদায়ের লোকেদের মুখোমুখি হতে গিয়ে রীতিমতো হীনমন্ত্রতা ভুগতে শুরু করেছে।

ডঃ সুধীর কুমার করণ বলেছেন, “সীমাস্ত বাঙলার সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হয়েও এরা কোনদিন রাজ্যস্থাপন করেনি। এদের উপকথায়, লোকগাথায়—কোন রাজবংশের কীর্তিকাহিনী নেই। মাহাতো রাজার কোন অস্তিত্বই জানে না ইতিহাস। পঞ্চকোটের রাজাই এদের একমাত্র রাজ্য...। বলা বাহুল্য, নির্বিरोধ এদের ইতিহাস; জন বিপ্লবের ভূমিকায় সীমাস্ত বাঙলার বাগদী-বাউরী, মাল, ভূমিজদের যে অবদান, সে অবদান এদের নেই।”

কুমিরা যে অন্ত্যায়দের তুলনায় প্রায় অনালোচিত থেকে গেছে, সব বকম সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং সব রকম রাজনৈতিক আন্দোলনের গৌরব থেকেও বঞ্চিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুমিদেব ইতিহাস সত্যিই বহুশ্রেণী টাকা পড়ে আছে; বাজনৈতিক কাবণে হোক বা যে-কোন কাবণে হোক কুমিদেব সম্বন্ধে কেউই উচ্চবাচ্য কবেন নি। ডঃ করণের মতে এটা কোন সইংস আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবেনি, ঝাড়খণ্ডের অতীতের বক্তৃক্ষয়ী সংগ্রামে এটা অংশগ্রহণ কবে নি। তিনি স্বীকাব কবেছেন এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়; বলা বাহুল্য অবস্থাপন্ন জমিদার শ্রেণীর লোক বলতেও ঝাড়খণ্ডীদেব মধ্যে এটাই অগ্রগণ্য। প্রাচীনতম উপজাতিদেব অতীতম এই কুমি সম্প্রদায়। অথচ তাবা কোন বাজধ স্থাপন কবেনি, সংগ্রামে অংশ গ্রহণ কবে নি এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপাব, অবাস্তব বললেও অতুক্তি কবা হয় না। আসলে ঝাড়খণ্ডের ইতিহাস অবাস্তব ইতিহাস, অস্তুতঃ কুমিদেব সম্পর্কে এখনো কেউ সত্যি কথা উচ্চারণ কবেননি। কুমিবা এখনো আদিম সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় অভ্যস্ত। দলনায়কের প্রসি তাদের অপবিসীম শ্রদ্ধা। ঝাড়খণ্ডের বাজা বা সামন্তবা যদি তাদের দলনায়ক না হয়, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কুমিরা কখনো তাদের দাসত্ব কবতে পাবত না। কুমিদেব জাতীয় চবিত্র ষাঁবা জানেন, তাঁরাই জানেন কুমিবা অতী সম্প্রদায়েব লোকেব কাছে জোড়হস্ত কিংবা নতজানু হয় না। তাহলে তাদের কোন বাজা ছিল না, এমন কথা কি খুব একটা সত্য-সম্মত মনে হয় ?

এবাবে ডঃ জগদীশ চন্দ্র ঝা-র দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্তাটাকে দেখা যেতে পারে। মূল দালল দস্তাবেজ, তৎকালীন সংবাদপত্র, ব্যক্তিগত সংগ্রহেব কাগজপত্রের ভিত্তিতে বচিত তাঁব গ্রন্থ *The Bhumij Revolt (1832-33)* থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার কবা যেতে পাবে। *Barabhum was inhabited predominantly by the Bhumijes with some Kurmis, Santhals and others.. (P32) It (Dhalbhum) was inhabited by Bhumijes (P38). The population of the pargana (Pachet) was almost entirely Bhumij (P44). This (Kasipur) was a Bhumij Pargana (53). The population (of Patkum) was again mainly Bhumij (P53). The population (of Bagmundi) was chiefly Bhumij (P59) The inhabitants (of Koilapal) were all Bhumijes (P61). The people (of Raipur) were Bhumijes (P63).* দেখা যাচ্ছে

১৮৩২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সারা ঝাড়খণ্ডের অধিবাসীরা ভূমিজ ; নামমাত্র কুর্মি এবং সাঁওতালের বাস। এবার ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মানভূমের সেন্সাস রিপোর্টে নজর দেওয়া যেতে পারে : মোট জনসংখ্যা ১৮,১০,৮২০ ; এর মধ্যে কুর্মি ৩,২৩,০৬৮, সাঁওতাল ২,৮২,৩১৫ এবং ভূমিজ ১,০৩,২০১। সারা ঝাড়খণ্ডে যদি ভূমিজদেরই বাস ছিল, তারা গেল কোথায় ? যদি ধরা যায় রাজপুতেরা ভূমিজদের হিন্দুকৃত তথাকথিত ক্ষত্রিয় শাখা, তাতেও সমস্তার সমাধান হয় না, কারণ রাজপুতের সংখ্যা ছিল ৩০৭৭৬। সমস্তাটি যে খুব সাধারণ সমস্তা নয়, তা যে কেউ বুঝতে পারবেন। আসলে অতীতে কুর্মিদেরই বার-বার ভূমিজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দৈনিক গঠন, আচার অনুষ্ঠান সব দিক দিয়েই প্রচুর ঐক্য বিদ্যমান। তাই কুর্মিদের ভূমিজ মনে করে বিভ্রান্ত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয় ; আর তা যদি না হয়, যদি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভূমিজরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে থাকে, তাহলে পরবর্তীকালে ভূমিজেরা কুর্মিসম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় ; কারণ উপজাতি সম্প্রদায়গুলোর সীমাবেধা যথেষ্ট কড়া-কড়ি ছিল। কুর্মিদের নিজস্ব ভাষা কুর্মালী ছিল, নিজস্ব সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা ছিল। সাঁওতালদের এবং মুণ্ডাদের পরগণাব মতো কুর্মিদেরও ২২টি পরগণা ছিল ; এমতাবস্থায় কুর্মিসম্প্রদায়ের মধ্যে ভূমিজদের স্থানলাভ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে কুর্মি এবং মুণ্ডা-সম্প্রদায়-উদ্ভূত ভূমিজদের মধ্যে অতীতে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকাও অসম্ভব নয়। দুটিই ঝাড়খণ্ডের তিনটি বৃহত্তম সম্প্রদায়েব অগ্রতম, দুটি সম্প্রদায়ই ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় কথা বলে থাকে ; দুটি সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে ঝাড়খণ্ডে সর্বপ্রথম গ্রহণ করে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নিয়োগ করে, ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করে এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। এদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে ভূমিজ এবং কুর্মি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই ঝাড়খণ্ডের সামন্ত রাজারা যে শুধু ভূমিজ ছিলেন না, অনেকেই কুর্মি ছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। চুয়াড় বিদ্রোহ ভূমিজ বিদ্রোহে কুর্মিদেরও যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে ভাবেই হোক কুর্মিদের অতীত ইতিহাসকে সংগোপন রাখা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের সব সম্প্রদায় সম্পর্কেই পণ্ডিতেরা আগ্রহ দেখিয়েছেন অথচ সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলটি সম্পর্কেই আশ্চর্য নীরব। সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত রহস্যে ঢাকা।

ঝাড়খণ্ডের অগ্রতম সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভূমিজ সম্প্রদায়ের কিছু কথা কুর্মি-সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। ভূমিজ সম্প্রদায় আসলে মুণ্ডা গোষ্ঠীরই একটি শাখা। ছোট নাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে এরা পূর্বদিকে সুর্বর্ণরেখার তীরভূমিতে বসবাস করতে শুরু করে। যারা জমির মালিক হল তারাই ভূমিজ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং কৃষিকে পেশা হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কিছুটা স্বনির্ভর হয়ে, ওঠে। মুণ্ডাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরাই পরবর্তীকালে হিন্দুত্ব গ্রহণ করে, ক্ষত্রিয় বা রাজপুত্র হিসাবে নিজেদের অভিহিত করে এবং উপবীত ধারণ করে। কেউ কেউ জৈনদের আচারাদ্বয় শূন্যে বর্ণিত বজ্রভূমির 'রুত্র' এবং বর্বর মানুষদের সঙ্গে ভূমিজদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছেন। আমরা রাঢ়ভূমির সঙ্গে ঝাড়খণ্ডকে একাকার করে দেখবার পক্ষপাতী নই বলে এই মতকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না।

ভূমিজ সম্প্রদায় হিন্দুসমাজের অস্তভুক্ত হবার চেষ্টা করলেও আদিম সমাজজীবনের রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক উপকরণই এদের এখনো অবলম্বন হয়ে আছে। এদের গোত্রবিভাজন রীতিতে টোটম বা কুলতিলকের অহুসরণ করা হয়েছে। এদের কয়েকটি গোত্রনাম হল নাগ, হেমরম, সাণ্ডিল্য, হাঁসদা, সালরিষি ইত্যাদি।

কুর্মি-ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোক ছাড়াও সাঁওতাল-খাড়িয়া-মুড়া কামার-কুমোর বাংগাল-ভূঞা আদি নানান শ্রেণীর উপজাতি ঝাড়খণ্ডে বাস করে। আলোচিতব্য লোকসাহিত্যের উপকরণ এই সব সম্প্রদায় থেকেও সংগৃহীত হয়েছে। সাঁওতালরা অষ্ট্রিকভাষী বলে তাদের কোন উপকরণই আলোচ্য গ্রন্থে স্থান লাভ করে নি।

এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য সহজেই নজরে পড়ে। পেশার বিভিন্নতা থাকলেও প্রায় সব সম্প্রদায়ই কমবেশি কৃষি-নির্ভর। তাই এদের সংস্কৃতিও কৃষিনির্ভর। ঋতুপর্ষায়ে রোহিন, গমা, চিত, করম, বিঁধা বীধনা, টুসু, সারহল, ভগতা পরব (চড়ক) যেমন আছে, তেমনি আছে দাঁড়শাল্যা বা পাঁতা নাচ, জাওয়া নাচ, কাঁঠি নাচ, ছো নাচ আদি নৃত্য; এরই সঙ্গে রয়েছে পাঁতা নাচের গান, জাঁত গান, আহীরা গান, টুসু গান, ছো-নাচের গান; আছে মন্ত্র, কুমুজ, সাখী গান; আছে চুয়া, কুমুর, উদয়া গান। বিপুল সংখ্যক বিবাহের গান এই অঞ্চলের অগ্রতম সম্প্রদায়। তাঁছাড়া ছেলে-

ভুলানো গান, ধাঁধা, রূপকথা, প্রবাদ, পুরাকথার প্রাচুর্য ঝাড়খণ্ডী জনতার চিত্তকে সব সময় রস-সম্পৃক্ত করে রাখে ।

আদিম জীবন-চর্চার ধারা এখানে এখনো অব্যাহত আছে। আদিম আচার-অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস-কুসংস্কার, আদিমতম ধর্ম-ভাবনা এখানকার সংস্কৃতির অঙ্গ। বৃক্ষপূজা, বুরু-পাহাড় পূজা, পশু-পাখির পূজাও এ-অঞ্চলে প্রচলিত। ঝাড়খণ্ডের ধর্ম বলতে আদিম ধর্মকেই বোঝায়। গাছপালা পশু-পাখি ধুলো পাথর নদী-নালা সব কিছুই দেবতার অস্তিত্বের কথায় একদা আদিম মানুষ যেমন বিশ্বাস করত, আজো একই ভাবে ঝাড়খণ্ডী মানুষ তা বিশ্বাস করে। দেবতা বলতে এখানে মনুনির্দেশিত কোন দেবতার দর্শন মেলে না। ঝাড়খণ্ডে 'ভূত পূজা'র সর্বাঙ্গিক প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয়। মাঠে-প্রান্তবে নদী-নালায়, বনেপাহাড়ে, গৃহকোণে, বাসস্থানে-জনপদে সর্বত্রই এই ভূতের পূজা করা হয়। 'গরাম দেবতা' সবার ওপরে অধিষ্ঠিত। গ্রামদেবতাদের মধ্যে গবাম, ধরম, কবম, বডাম, ক্ষেত্রপাল, শীতলা, মনসা, বড় পাহাড়, মারাং বুরু আদি বিশিষ্ট। তাছাড়া কুদরা, বাঘুং, গবয়া, ছয়ারসিনি, সাত বহনী আদি ভূত বা দেবদেবীর সংখ্যাও অনেক।

এই সব নৃত্যগীত আচার-অনুষ্ঠান ভূতপ্রেতের পূজা ইত্যাদির মধ্য দিয়েই ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের কুর্মি এবং ভূমিজদের সাংস্কৃতিক উপকরণগুলোকে ঝাড়খণ্ডের সাংস্কৃতিক উপকরণ হিসেবে নির্দিষ্ট গ্রহণ করা যেতে পারে। সমগ্র ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব প্রান্তের প্রধানতম শরিক কুর্মি সম্প্রদায়; পশ্চিম প্রান্তের মুণ্ডা শাখার প্রতিনিধি ভূমিজ সম্প্রদায়। তাই আমরা ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধানতঃ এদের ভাষাসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্যের উপকরণই গ্রহণ করেছি। সাঁওতালদের ভাষা ঝাড়খণ্ডী নয়, তারা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর সাঁওতালী ভাষায় কথা বলে থাকে; তাই তাদের লোকসাহিত্য নিয়ে আমরা এখানে কোন আলোচনা করি নি। তবে ভাষা-লোকসাহিত্য বাদ দিলে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের মধ্যে সংস্কৃতিগত একটি অখণ্ড যোগসূত্র আছে, যদিও সব সম্প্রদায়েরই কিছু কিছু সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে—যা ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতিতে বর্ণময় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।



॥ তিন ॥

## ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য : শ্রেণীবিভাগ ও বিষয়বস্তু

পাহাড়-পর্বত-বন-ডুংরি-টাড়ের দেশ ঝাড়খণ্ড নৃত্যগীতময়তায় সর্বদা চঞ্চল। সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলা তাদের সাহিত্য-শিল্পের মুখর আয়োজনে আসর প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে। কোথাও সংগীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে ; কোথাও বা রূপকথা, ছড়া, ধাঁধার আসব বসে। কোথাও গল্প-কথায়, প্রবাদে-প্রবচনে অরণ্য-জনতা সাঙ্ঘ্য-অবসর টুকুকে উপভোগ্য কবে তোলে।

ঝাড়খণ্ড খাছাঙ্গ সংগ্রহে বিব্রত হলেও মানসিক উপচার সংগীত-সাহিত্য নিতান্ত সহজ সাবলীলতায় সৃষ্ট এবং সঞ্চিত হয়ে ঝাড়খণ্ডের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আবহমান কাল থেকে পরিপুষ্ট করে বেখেছে। ঝাড়খণ্ডী বাংলার অরণ্যভূমি তাই লোকসাহিত্যের বিপুল সম্পদের অধিকারী।

লোকসাহিত্য এখনো অরণ্যভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত। শিক্ষাব প্রসার এ-অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লেও অরণ্যসন্তানেরা এখনো লোকসাহিত্যে তাদের আত্মার শাস্তি, ক্ষুধার নিবৃত্তি, মানসিক যন্ত্রণার অমৃত প্রলেপ খুঁজে পায়। লোকসাহিত্য তাদের জীবনের একান্ত সহচর, এমন-কি প্রাণবায়ু বললে-ও অত্যাঙ্কিত করা হয় না।

লোকসাহিত্য বলতে আমরা কি বোঝাতে চাইছি এবার তার আলোচনা প্রয়োজন।

লোকসাহিত্য শব্দটি দু'টি বিচ্ছিন্ন শব্দ 'লোক' এবং 'সাহিত্য'-এর যোগাযোগে গড়ে উঠেছে। 'লোক' বলতে সাধারণতঃ অশিক্ষিত অরণ্যপর্বতবাসী কিংবা গ্রাম্যজনতাকে বোঝানো হয়ে থাকে। উচ্চমানের সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্ব রুচি, ভাবনা এবং পরিবেশ মতো সমাজের সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্ত এক ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকে, তা-ই আসলে লোকসাহিত্য রূপে গড়ে ওঠে। এ সাহিত্য শিক্ষিত মানস-জাত শিল্প-সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই লোকসাহিত্যকে কেউ কেউ গ্রাম্যসাহিত্য কিংবা পল্লীসাহিত্য বলার পক্ষপাতী। আমাদের মনে হয় গ্রাম্য-, পল্লী-, বা লোক- সাহিত্য যে-নামেই এই সাহিত্যকে চিহ্নিত করা হোক না কেন চরিত্রগত তারতম্য, বড়ো

একটা ধটে না। অরণ্য, গ্রাম্য বা পল্লীর সাধারণ মানুষ এই সাহিত্য সমাজের সর্বসাধারণের আনন্দবিধানের জন্মই রচনা করে থাকে।

আদিবাসীদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে কয়েকটি পরিবার বা গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত যে জনসমাজ একটি সাধারণ নামে পরিচিতি লাভ করে, যারা একটি বিশেষ অঞ্চলে বাস করে, একই ভাষায় বা উপভাষায় বার্তালাপ করে, বংশপরম্পরাগত দল-নেতাকে মাজ্জ করে, বিবাহে এবং ধর্মচর্চায় কতকগুলো ঐতিহ্যানুসারী রীতিরেওয়াজ পালন করে, তারাই আদিবাসী। আমরা ‘লোক’ বলতে প্রায় এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করতে চাই। আদিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর লোকজন ভূমিজ-মাহলী-কুমি, মাল-মুণ্ডা-খাডিয়া, কামার-কুমোর-ভূঞা আদিদের একটি সাধারণ নাম ‘ঝাড়খণ্ডী’ অভিধায় চিহ্নিত করতে চাই যারা ঝাড়খণ্ড বা জঙগল মহল-খলভূমে বাস করে এবং ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় কথা বলে থাকে। এই অরণ্য-জনতার সমাজব্যবস্থা, বিবাহে এবং ধর্মচর্চায় ঐতিহ্যানুসারী রীতিরেওয়াজে অল্পবিস্তর প্রভেদ ছাড়া সর্বক্ষেত্রেই এক। অল্পকথায় আমরা বলতে পাবি, ঝাড়খণ্ডী জনতা একটি বিশিষ্ট সংহত সমাজের সৃষ্টি করেছে এই অরণ্যভূমিতে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ‘সংহত সমাজ’ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘যে সমাজ ইহাব অস্বভূক্ত মানব গোষ্ঠীর পারম্পরিক নির্ভরশীলতার ভিতর দিয়া চিরাচরিত প্রথায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অটুট রাখিয়া চলে, তাহাই মনে করা হইয়াছে।’ ঝাড়খণ্ডী জনতাব যে সমাজ, তার চেয়ে নিখুঁত আদর্শ ‘সংহত সমাজ’ আর কোথায় পাওয়া যাবে? এখানের বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসী-অর্ধআদিবাসী সম্মিলিতভাবে একই সাংস্কৃতিক পটভূমি গড়ে তুলেছে। একই ধরনের নৃত্যগীত-গল্পকথা-ভাষায় তারা এমনি একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে সবাই সমানভাবে আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে থাকে।

সংহত সমাজে যেমন ব্যক্তিসত্তার কোন অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় না, পরিবর্তে সমাজ-সত্তাই স্বীকৃতি লাভ করে, তেমনি ঝাড়খণ্ডী অঞ্চলেও সমাজই ব্যক্তিসত্তার উর্ধ্বে স্থান লাভ করে থাকে। প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার অবশেষ এখনো এইসব অঞ্চলে উপলব্ধি করা যায়। পরম্পরের প্রতি অন্ধা-

বোধ নির্ভরশীলতা এখনো ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী সমাজে লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রদায়গত বা সমাজগত জীবনই তাই সমস্ত মনোরঞ্জনের আসল লক্ষ্য। লোকসাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে তাই বলা হয়েছে, ‘ইহা সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নহে।’<sup>২</sup>

কিন্তু লোকসাহিত্য-রচনায় ব্যক্তিসত্তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। কোন রূপকথা কিংবা গান তার প্রথম স্তরে সমাজের দশজনের সাহায্যে রচিত হয় নাই বলেই মনে হয়। সৃষ্টির আদিতে শ্রষ্টা একজনই থাকে। তারপর শ্রষ্টার মুখ থেকে যখন তা সমাজেব আর দশজনেব কর্ণে এবং মুখে সম্প্রচারিত হয় তখন তা নানা ভাঙাগড়া পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের সৃষ্টিতে পরিণত হয়। তাই সমাজে প্রচলিত লোকসাহিত্যকে সামাজিক সৃষ্টি বলে স্বীকার করে নিতে আমাদের আপত্তি নেই; অন্তর্দিকে সৃষ্টির আদিতে যে ব্যক্তিসত্তা ছিল, তার অস্তিত্বকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে লোকবৃত্তের সব বিষয়ই ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি, কিন্তু সমাজের দশজনের হাতে পড়বার পর ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত সামূহিক সৃষ্টিতে পরিণত হয়। আমাদের মনে হয় এখানে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে কালে কালে বহুল পরিবর্তিত যে লোকসাহিত্য আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি তার আদিরূপ কি ছিল তা অনুমান করা একান্তই কঠিন। কিন্তু জগলগ্নে এক জন আদিশ্রষ্টা যেমন ছিল, তেমনি তার আদিরূপ-ও ছিল।

ব্যক্তি-ভাবনার কল যে সব সময় অসম্পূর্ণই হয় কিংবা সমূহ-ভাবনার রূপায়ণ যে সব সময় ব্যক্তি-সৃষ্টিকে মহত্তর পর্যায়ে পৌঁছে দেয়, এমন কথা ভাববার কোন কারণ নেই। টি. এস. এলিয়টের সেই মহৎ উক্তি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য : সংকবির হাতে অকবির উপকরণ-ও শাস্ত কবিতার রূপ লাভ করে, আবার অকবির হাতে সংকবির উপকরণ নিকৃষ্ট কবিতার জন্ম দিতে পারে (Bad poets deface what they take, and good poets make it into something better, or at least something better)।<sup>৩</sup> কাজেই ব্যক্তির সৃষ্টি সমষ্টির হাতে পড়ে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দুই-ই হতে পারে। আর

২. প্রাগুক্ত

৩. The Sacred Wood, PP 125

নিকৃষ্ট হলেই যে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এমন কথা ভাবা-ও সংগত বলে মনে করি না। কেন না শুধু কথাবস্তুর জোবে লোকসাহিত্য টিকে থাকে না। বলার ভঙ্গির ওপরে, সুরেব ওপরে, স্থান কালপাত্রের ওপরে এর নির্ভরশীলতা অনস্বীকার্য।

যে-কোন সমাজেব লোকসাহিত্যে সেই সমাজ তার সামগ্রিক রূপ নিয়েই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সেই সমাজেব আচাৰব্যবহার, বীতি-বেওয়াজ, উৎসব অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু, প্রেম-ভালোবাসা যৌনতা, খাচ্চ-পানীয়, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি সব কিছুই সর্গোরবে স্থান লাভ করে থাকে। শুধু সমাজ-ঘটিত প্রসংগগুলোই বা বলি কেন, পাবিপাখিক অবণ্য-প্রকৃতি, গাছপালা, জীবজন্তু, পাগি-পাপালি, গ্রাম নাম সব কিছুই লোকসাহিত্যেব বিষয়বস্তু হতে পারে। বলাবাহুল্য, যে-কোন লোকসাহিত্যেব আঞ্চলিক চারিত্রধর্ম এগুলোব মাধ্যমেই বক্ষিত হয়ে থাকে। কোন গাছপালা কি পাখি-পাখালির নাম উচ্চারিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে সেই অঞ্চলটির কথা উজ্জল করে তুলতে পারে।

সমাজেব অগ্রগতিব মানদণ্ডেব ওপরে ও লোকসাহিত্যেব গুণাগুণ নির্ভর করতে পারে। যে সমাজ শিক্ষায় দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নত এবং প্রাগ্রসব তাদেব লোকসাহিত্য যতোখানি শিল্পসম্মত হবে, ততোখানি শিল্পসম্মত লোকসাহিত্য অশিক্ষিত এবং অনগ্রসব সমাজের কাছ থেকে আশা করা উচিত নয়। প্রকাশ-ভঙ্গি, ভাষাব লালিত্য, ভাবেব গভীরতা, ভাষাব কলাকৌশল, সুরেব মাধুর্য দু'টি ক্ষেত্রে এক হবার কথা নয়। কিন্তু লোকজীবনের চিবস্তন সম্পদের পর্যাপ্তসম্ভার উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। মানুষেব সং গুণগুলো যেমন লোক সাহিত্যেব উপজীব্য, তেমনি তাব অসং গুণগুলোও। মৃত্যুঞ্জয়ী ভাবনাই লোকসাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুকে এতো আকর্ষণীয় করে রাখে। উন্নত অনুন্নত সব লোকসাহিত্যেই অমৃতময় মানুষেব জয়গান করা হয়ে থাকে। সমাজের পক্ষে যা কল্যাণকর, লোকসাহিত্যে তারই উজ্জল প্রকাশ। পাপপুণ্য, ধর্মাধর্মের হিসেবনিকেশ তাই লোকসাহিত্যেও মেলে।

তবে এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আদিম জনসমাজের লোক-সাহিত্যেও স্রষ্টার প্রতিভা, কবিত্ব, স্বল্প পরিসরে বিপুলের আয়োজন, রূপক বা সংকেতের গভীর তাৎপর্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বলা ভালো, লোকসাহিত্যের বিশেষ ধর্ম আদিমতা, অকৃত্রিমতা, সরলতা, প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা আদি

জগৎবলী অল্পমত সমাজের লোকসাহিত্যে যতো বেশি দৃষ্টিগোচর হয় ততো-  
খানি উন্নত সমাজের লোকসাহিত্যে পাওয়া যায় না। চিরন্তনতা বা শাশ্বত  
ধর্মের ওপরই লোকসাহিত্যের প্রাণস্পন্দন নির্ভর করে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, লোকসাহিত্য কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অলিখিত  
সাহিত্য। অর্থাৎ লোকসাহিত্য কোনদিনই কাগজে-কলমে লিখিত হয় নি,  
মুখে-মুখেই এর প্রচার এবং প্রসার। অল্প কথায়, লোকসাহিত্য যেমন  
অলিখিত সাহিত্য, তেমনি মৌখিক সাহিত্যও বটে। কিন্তু লিখিত হলোই  
লোকসাহিত্য তার লোকবৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে একথা স্বীকার করে নেওয়া  
যায় না। কাগজে-কলমে রচিত হলোই কি তা লোকসাহিত্য হবে না?  
আমরা তো জানি, ভবপ্রীতানন্দ ওঝা রীতিমতো শিক্ষিত ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত  
লোক। তিনি জনমানসে বিপ্লব সৃষ্টিকারী তাঁর রুমুর গানগুলো শুধু লিখিত  
ভাবেই রচনা করেন নি, পুস্তকাকারে মুদ্রিতও করেছেন। আমাদের প্রশ্ন,  
ওগুলো কি লোকসাহিত্য নয়? ওগুলো যদি লোকসাহিত্য না হয়ে থাকে  
তবে লোকসাহিত্য কি? আসলে আমরা লোকসাহিত্য সম্পর্কে একদেশদর্শী  
মনোভাব পোষণ করে থাকি। যে কোন স্রষ্টাই তার সৃষ্টিকে নিখুঁতভাবে  
সাধারণ্যে প্রচার করতে চায়। শাস্ত্র লোককবি যে খুব স্বাভাবিকভাবেই  
তার উদ্ভাসিত ভাবনার বাঙময় রূপকে লেখার বাঁধনে বেঁধে পরিমার্জিত রূপ  
দেবার চেষ্টা করবে, তাতে আর সন্দেহ কি!

কারো কারো মতে লোকসাহিত্য লিখিত হতে বাধা নেই কিন্তু তা 'অভিজ্ঞ  
বা বিশেষভাবে শিক্ষিত গবেষক কর্তৃক লিখিত হওয়া চাই।' এখানে যে-  
বক্তব্য তা, বলাবাহুল্য, লোকমুখ থেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহের প্রসঙ্গে বলা  
হয়েছে। কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান কোথায়? কোন লোককবির  
লিখিত সাহিত্য কি লোকসাহিত্য নয়? আমরা বিশ্বাস করি, তা'ও লোক-  
সাহিত্য। ঝাড়খণ্ডী জনতা অর্ধশিক্ষিত রুমুরকারদের এবং টুঙ্গু কবিদের গান  
সহৃদয়তার সাধে গ্রহণ করে থাকে, সমাজ-মানসে তা আনন্দেরসের সঞ্চার  
করে; কারণ সেই সব গানের মধ্যে সমাজমানসের চিন্তাভাবনা, রীতি-  
রেওয়াজ, সব কিছুই সঞ্চিত থাকে। লিখিত হলোই যে তা লোকসাহিত্যের  
দু'টি অনিবার্য গুণ 'প্রত্যক্ষতা' এবং 'স্বাভাবিকতা' থেকে বঞ্চিত হবে, তা  
ভাবা ঠিক নয়। প্রত্যক্ষতা এবং স্বাভাবিকতা না থাকলে লিখিত কি অলিখিত  
সব লোকসাহিত্যই জনতা নিঃসংকোচে বর্জন করে থাকে। লোকমুখে স্রষ্ট

এবং সংগৃহীত লোকসাহিত্যের একই বিষয়ের বিভিন্ন পাঠাস্তর অথবা রূপান্তর দেখা যায় বিভিন্ন গবেষক সংগ্রাহকের সংগ্রহ থেকে এবং এটাই যে সম্ভব এবং স্বাভাবিক তা আমরা স্বীকার করি। কেননা একই গান লোকমুখে পরিমার্জিত পরিবর্তিত হতে হতে তার বিভিন্ন পাঠ অথবা রূপ যে দেখা যাবে তাতে আর সন্দেহ কি। এই গানগুলো যদি রচনাকালেই লিখিত হয়ে থাকত, তাহলে তাব আসল রূপ এবং পাঠ খুঁজে নিতে আমাদের অসুবিধে হত না। সেখানে লিখিত হয়েও তা লোকসাহিত্যই থাকত এবং একটা আদর্শ রূপ আমাদের সম্মুখে সব সময় উপস্থিত থাকত। লিখিত অলিখিত সমস্ত লোকসাহিত্যই মুখে মুখে উচ্চাবিত হয়, তাই মৌখিক ধারাব লোকসাহিত্য আমাদের হৃদয়ের অন্দবমহলে বন্দো সহজে প্রবেশ করে থাকে।

লোকসাহিত্যের বড় ধর্মই হল সজীবতা, সচলতা। প্রচণ্ড প্রাণবেগে তা বিভিন্ন মানুষের স্মৃতিপথ বেয়ে লোকমুখে দেশকাল পাত্র ছাড়িয়ে ভবিষ্যতেব দিকে এগিয়ে চলে। আপন অস্তরের গতিবেগেই তা পরিবর্তিত হতে থাকে, লিখিত আদর্শরূপ থাকলেও সাধারণ মানুষ তা মিলিয়ে দেখে সংশোধন কবে না, বলা চলে তার প্রয়োজনই বোধ করে না। তবে লিখিত বা অলিখিত যে কোন লোকসাহিত্যই হোক না কেন তাব একটা গীত ও কথ্য রূপ আছে। তাব জন্ম শ্রাতা যেমন দরকার, তেমনি তার আসল পরিবেশ, সুব, বাচনভঙ্গি উত্থাদিরও প্রয়োজন। এর অভাব ঘটলেই লোকসাহিত্যের আসল বস থেকে আমরা বঞ্চিত হই। নাচনী নাচেব কুম্বুরেব রস এবং আবেদন হৃদযন্ত্রম করতে হলে রাভেব আবছা আলোর পরিবেশ, বাজনা, নাচনীর সূকঠে কুম্বুরেব বিশিষ্ট সুরঝংকাব, নাচনীর শারীরিক আন্দোলন এবং নযনভঙ্গি এবং বসাপ্তত জনতাব আনন্দোন্মাস থাকা একান্ত প্রয়োজন, অথবা শুক কাগজের পাতায় যতোই মধুব কুম্বুরেব পদাবলী লিপিবদ্ধ থাক না কেন, তা আমাদের তিলমাত্রও আনন্দবস পরিবেষণ করতে পারে না।

আগামী দিনে প্রাচীনকালের অনেক কিছুই লুপ্ত হয়ে যাবে। লোকসাহিত্যও যথাসময়ে সংগৃহীত না হলে প্রাচীন ঐতিহ্যের বহু সম্পদ লুপ্ত হবার সম্ভাবনা। তবে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হবার কোন উপায় আছে কি? সংগ্রাহক যা আমাদের উপহার দেন, তা কি সব সময় বিশ্বাসযোগ্য অথবা অর্ধবহ হয়ে থাকে? এ-ব্যাপারে সংগ্রাহকের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার যোগ্যতার মাপকাঠি কি হবে? আমরা আগেই দেখেছি,

গবেষকের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষভাবে শিক্ষা তার যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। কেননা অনভিজ্ঞ বা অসতর্ক লেখকের হাতে লোকমুখে প্রচলিত গান লিখিত হবার সময় বিকৃত হবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞ বা শিক্ষিত সংগ্রাহকের সংগ্রহ কি অবিকৃত এবং ঙ্গটমুক্ত হয়ে থাকে ?

বিশিষ্ট লোকশ্রুতিবিদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'বহিরাগত কোন গবেষক যদি স্বতন্ত্র কোন জাতির লোকসাহিত্য সংগ্রহ করিতে চাহেন, তবে তাহা সংগ্রহ করিবার যে বিশেষ শিক্ষা তাঁহার প্রয়োজন, কেহ যদি নিজস্ব লোকসাহিত্য সংগ্রহ রিতে চাহেন, তবে তাঁহার সেই বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন না-ও হইতে পারে। কারণ, ইহার খুঁটিনাটি সম্পর্কে তাঁহার যে স্বাভাবিক জ্ঞান থাকিবে, তাহা হইতেই তাহা নিখুঁতভাবে লিখিত হইতে পারে। তবে তাঁহার পক্ষেও লিখিবার সময় তাঁহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রসবোধ, বিচারবুদ্ধি ও সকল প্রকার স্বজনী প্রেরণা সংযত রাখা আবশ্যিক। একথা সত্য, তিনি যাহা লিখিয়া লইবেন, তাহা প্রচলিত লোকসাহিত্যের বিশেষ আর একটি রূপ হইবে। কিন্তু তথাপি যেহেতু তিনি সেই সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত এবং সেই সমাজের বিশিষ্ট প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত, সেই জন্তু তাঁহার লিখিত রূপ প্রচলিত রূপের বিশেষ ব্যতিক্রম হইবে না—যতটুকু একজনের মুখ হইতে আর একজনের মুখে প্রচারিত হইতে গেলেও হইয়া থাকে, ততটুকুই হইতে পারে মাত্র; অতএব তাহা একেবারে অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।'<sup>৪</sup>

ডঃ ভট্টাচার্য এখানে দু'শ্রেণীর গবেষক-সংগ্রাহকের কথা বলেছেন। প্রথম শ্রেণী বহিরাগত ভিন্ন জাতি বা সমাজভুক্ত, দ্বিতীয় শ্রেণী একই জাতি বা সমাজভুক্ত গবেষক-সংগ্রাহক। প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতার মাপকাঠি হল অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্তি। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্তু অভিজ্ঞতার দরকার পড়তে পারে, কিন্তু বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত না হলেও চলে। কেননা তার স্বজাতির ভাষা, বাগভঙ্গি, রীতি রেওয়াজ সব কিছুই নিখুঁতভাবে জানা থাকে। তবে তার ক্ষেত্রেও নিজস্ব রসবোধ, বিচার বুদ্ধি এবং স্বজনী ক্ষমতাকে সংযত রাখা প্রয়োজন; অবশি ডঃ ভট্টাচার্যের মতে সব কিছু নিখুঁত ভাবে সংগ্রহ করা হলেও মৌখিক এবং লিখিত রূপে পার্থক্য থেকেই যাবে।

আমি নিজে দ্বিতীয় শ্রেণীর গবেষক-সংগ্রাহক। কুর্মি (মাহাতো)-রা এই অরণ্যভূমি ঝাড়খণ্ডের অন্ততম আদিম অধিবাসী। ডাণ্টনের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রায় ৫৬ পুরুষ (প্রতি ২৫ বছরে এক পুরুষ) ধরে কুর্মিরা এখানে বাস করে আসছেন।<sup>৫</sup> আমি নিজে এই কুর্মি (মাহাতো) গোষ্ঠীভুক্ত। আমাদের সংগৃহীত লোকসাহিত্য মূলতঃ এই কুর্মিদেব এবং তাঁদের প্রতিবেশী ভূমিজ, খাড়িয়া, কামাব কুমোর বাগালদের লোকসাহিত্য। নিখুঁতভাবে সংগ্রহ কার্য সম্পন্ন করলেও সাক্ষ্যের বিচারের ভার সুধীস্বদের হাতেই অর্পণ করা হল। এর আগে ডঃ ধীবেন্দ্রনাথ সাহার ‘ঝাড়খণ্ডী লোকভাষা গান’ প্রকাশিত হয়েছে, যা এ অঞ্চলের সংগৃহীত ও মুদ্রিত লোকসংগীতের একমাত্র নিখুঁত সংকলন গ্রন্থের মর্যাদা পেতে পারে। ডঃ ভট্টাচার্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের, যারা নিজস্ব লোকসাহিত্য সংগ্রহ-গবেষণায় বত, শ্রেয়টুকু স্বীকার করেছেন। ‘যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাই যথাযথ লিখিতে হইবে, যাহা বুঝিলাম তাহা নহে।’<sup>৬</sup> একই গোষ্ঠীভুক্ত লোকের মধ্যে বোধ হয় শোনা এবং বোঝার মধ্যে একটা নিবিড় সামঞ্জস্য সব সময়েই থাকে। একই অঞ্চলের লোকের মুখের কথা উচ্চাবিত হতে না হতেই সেই অঞ্চলের লোকের পক্ষে তা শ্রবণ এবং অর্থ উপলব্ধি ক্রিয়া দু’টি যুগপৎ ঘটে থাকে বলে আমাদের বিশ্বাস। কোন নিষ্ঠাবান গবেষকই শর্ততার আশ্রয় নিতে পারেন না। তাই গবেষণার ক্ষেত্র স্বজাতি, স্বসমাজ বা স্ব-অঞ্চল হলেও উৎসর্গ-প্রাণ গবেষক কখনো চাতুর্বিব আশ্রয় নিতে পাবেন না; বরং যা তাঁদের ঐতিহ্য এবং জাতীয় সম্পদ তাকে নিখাদ নির্ভেজাল রূপে প্রকাশ করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করেই বিশেষ গৌরববোধ করে থাকেন।

প্রথম শ্রেণীর গবেষক-সংগ্রাহকদের হাতে পড়ে অল্প অঞ্চলের লোকসাহিত্যের কি চূর্ণদর্শা হতে পারে ডঃ ভট্টাচার্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ (p) হিসেবে স্বর্গত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র সংকলন ও সম্পাদনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, সেন মহাশয় বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত গবেষক না হওয়ার নিজের ইচ্ছেমতো ভুলরূপ দিয়ে গীতিকা-গুলোর মধ্যে কৃত্রিমতা স্থাপি করেছেন। কারণ সেন মহাশয় স্বতন্ত্র অঞ্চলের

৫. Descriptive Ethnology of Bengal

৬. বাংলার লোকসাহিত্য ১ম, পৃ ১৮



অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র রূপ ও প্রকৃতি এবং ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন।

এবার আমরাও ডঃ ভট্টাচার্যের কাছে একটি অভিযোগ বিনীতভাবে নিবেদন করতে চাই। তাঁর বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি নিজেকে 'অভিজ্ঞ এবং বিশেষভাবে শিক্ষা'র অধিকারী বলে মনে করেন এবং তাঁর সংগৃহীত সমস্ত লোকসাহিত্যকে অকৃত্রিম বলেও মনে করেন, তা না হলে গ্রন্থের কোথাও তিনি এ-ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করতেন। এখানে আমরা তাঁর আব একটি উক্তি উদ্ধার করতে পারি। গ্রামাঞ্চলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে লোকসাহিত্য সংগ্রহ কার্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : 'আমার এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ কবিবার কতকগুলি যে দুর্ভাগ্য সুযোগ ঘটয়াছিল, তাহাই এই কার্যে প্রয়োগ কবিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। একথা হয়তো অনেকেই জানেন, যে আমি আট বৎসরেরও অধিক কাল ভাবত সরকারের নৃতন্ত্র সমীক্ষা বিভাগে লোক-সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ডক্টর ডেবিষব এলউইনের পবেষণা সহযোগীরূপে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জসহ সারা ভাবতবর্ষে আদিবাসী গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ কবিয়া এই বিষয়ে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম।... সুতরাং এই অভিজ্ঞতা সকলের খাবিবার কথা নহে এবং স্বভাবতঃই এই সাফল্য সাধারণভাবেও লাভ করা যাইতে পারে না।' নিষ্ঠাবান, নিতুল, ক্রটিহীন গবেষক হিসেবে নিজেকে প্রচার করার জন্য তিনি যে এখানে সাহায্যকারী আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা কারো দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। তাঁর সাফল্যকে তিনি আশাতীত এবং অসাধারণ বলে ঘোষণা করেছেন। এইখানে আমরা আমাদের একটি বিনীত অভিযোগ পেশ করি। ডঃ ভট্টাচার্য কি মনে করেন ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে (যে-অঞ্চলকে তাঁরা পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ, রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চল ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করেছেন) নিতুল সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন? এ-অঞ্চলের ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি 'পবিচারিকা'র বারো এবং পনেরো পৃষ্ঠায় এলোমেলো ভুল তথ্য পরিবেষণা করেছেন। একজন নিষ্ঠাবান গবেষক হিসেবে তাঁর এ-ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি। তথাকথিত পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য তিনি যে বিপুল পরিমাণে

সংগ্রহ করেছেন, তা তাঁর বিপ্লবকার গ্রন্থগুলোর পাতা ওন্টালেই বোঝা যায়। কিন্তু যতো বিপ্লব তাঁর সংগ্রহ হোক না কেন, এলোমেলোভাবে যে-কোন ঝাড়খণ্ডী লোকগীতি কিংবা ধাঁধা তুলে নিলেই বোঝা যাবে তা কি-অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক বকমের বিকৃত। বহুক্ষেত্রেই হাশ্বকর ক্রটির সমাবেশ ঘটেছে, এবং এগুলো কোন ক্রমেই তাঁর দুর্লভ অভিজ্ঞতা, বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্তিব পরিচায়ক নয়। কিন্তু এখানে তাঁর সাফল্য আশাতীত কিংবা অসাধারণ তো নয়ই বরং তা তাঁর ঝাড়খণ্ডী উপভাষা সম্পর্কে পরিচয়হীনতা, প্রায় অজ্ঞতা, প্রমাণ করে। দু' একটি উদাহরণই যথেষ্ট বলে মনে কবি :

১. মোহনপুবে ঠেকাঠেকি কি কবে শুভাব একা

টিকটিকি ননদ পালাল

খোঁচাব মোহন খোঁচে শুকাল।

(বাংলাব লোকসাহিত্য ৩য়, পৃ ২৩৬)

২. শালগাছে শাল পংডা কদমগাছে কলি বে

মাদাব গাছে লাল গামছা চটক দেখে মরি বে। (ঐ, পৃ ২০২)

৩. আমাদের গাঁয়ে কুলিমুডায় সুরুমোটা বাল

বুট বহাঈল কুডায়ে খাইলি ছাগলেব দাড়ি।

৪. দে না ছোটকি, চাল গিল সেবাইঙ্গে

বডকাবা আমাদের আসিছে সিনাইঙ্গে

একে আমার জুঠা হাত বাচাঈং দেঙ্গে বাসি পাত

ঝুডি কাঠটা দে ন সলগায়েঙ্গে।

(লোকসংগীত বহুসংগ্রহ ৩য়, পৃ ১১৩৩)

প্রথম গানটির রূপ আমাদের সংগ্রহে এই রকম :

মহল পড়ে ঠেকাঠেকা কি কবে কুচাব একা

টিকটিকি দেখোই ননদ পালাল্য,

টাইডের মহল টাইডেই শুকাল্য।

মহল পড়ে অর্থাৎ মহল্যা পড়ে এর স্থানে যদি লেখা হয় 'মোহনপুর', তাহলে কোঁতুকরস ঘন হয় না কি? শেষাংশ ঠিক আছে ধরে নিলে-ও টিকটিকির পরে 'দেখো' এবং 'খোঁচের মোহন' যে খোঁচের মহল হবে তা বলে না দিলেও চলে। দ্বিতীয় গানটি তো ঝাড়খণ্ডী লোকগীতির তথাকথিত প্রখ্যাত শিল্পী অংশুমান রায়ের কল্যাণে গ্রামোফোন রেকর্ডে-ও শোনা যায়।

‘মাঝার গাছে লাল গামছা’ ব্যাপারটা হাস্যকর নয় কি, আসলে এটা হবে ‘ভাঁড়ার (বঁধার) গায়ে লাল গামছা’ মানে বঁধুর গায়ে লাল গামছা। তৃতীয় গানের শেষ পংক্তিটি হবে, ‘বুট বন্যে কুড়ায় খালি ছাগল লেদাড়ি।’ বুটের (ছোলা) সঙ্গে ছাগলের নাদের (লেদাড়ি) মিল আছে, তাই রসিকতা করে বলা হয়েছে যে তুই ছোলা ভেবে ছাগলের নাদ কুড়িয়ে খেলি ; সেখানে কেউ যদি বলেন, ছোলা ভেবে তুই ছাগলের দাড়ি খেলি, তবে তা শব্দ হাসির উল্লেখ ছাড়া আর কি করতে পারে? চতুর্থ গানটি আমাদের সংগ্রহে এই রকম :

দে ন ছটকী, চা’ল গিলা মেরাই গে।

বড়কারা আমদের ( হামদের ) আ’সছে সিনাই গে

একে আমার জুঁঠা হাত বাটা’ই দে গে বাসিভাত

ঝুড়ি কাঠটা দে ন সলগাঁই গে।

সহজেই বোঝা যাচ্ছে ডঃ ভট্টাচার্য এ-অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এখানকার উচ্চারণভঙ্গি অনুধাবন করতে না পেরে তিনি যেমন বিভ্রান্ত হয়েছেন, তেমনি তা লিখতে গিয়ে হিন্দীর ‘করেঙ্গে, মারেঙ্গে’র টঙে লিখে ফেলেছেন। সম্ভবতঃ তিনি জানেন না যে ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষাতে বোনদের ভেতরে এবং জা-দের ভেতরে ‘গে’ সম্বোধনটাই শিষ্ট রূপ। ভাই-ও বোনকে ‘গে’ সম্বোধন করে থাকে। এই গানটি প্রসঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্যের মন্তব্য : ‘বাংলা শব্দের মধ্যে মধ্যে নির্বিচারে হিন্দী বা কুর্মাণি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরুলিয়ার লোকসংগীতের ইহা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের নানা আদিম জাতির ভাষা কি ভাবে বাংলাভাষা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ক্রমে বাংলা ভাষার কুক্ষিগত হইয়াছে ইহা তাহার প্রমাণ। রাজনৈতিক প্রতিপত্তির দ্বারা ভাষার প্রভাব বিস্তার লাভ করে না, এই বিষয়ে যে ভাষার বিশেষ শক্তি আছে, সেই ভাষাই নিজের শক্তিতে প্রচার লাভ করে।’<sup>৮</sup> আশ্চর্য, ডঃ ভট্টাচার্য হিন্দী বা কুর্মাণি শব্দের ব্যবহারের কথা বললেন অথচ বললেন না যে এই রূপটাই আসলে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার রূপ? আগধী প্রাকৃত যে ভোজপুরী, মগহী, নাগপুরিয়া-কুর্মাণির স্তর পার হয়ে ঝাড়খণ্ডী বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে, এ-কথা এখনো কেউ বললেন না।

বৃটিশদের অরণ্যভূমিতে পদার্পণের আগে যে এ-অঞ্চলে রাঢ় বা সমতল বাংলার হিন্দু বাঙালীর বাস ছিল না তাতো বৃটিশ ইতিহাসকাবেরাই বলে গেছেন। দু'শো বছরেরও কম সময়ে যদি যুষ্টিময় বাঙালী একটি অঞ্চলকে ভাষাস্তরিত করে থাকতে পাবেন, তাহলে বৃটিশশক্তি ইংরাজীকে রাজভাষা করেও ভারতীয়দের ভাষাস্তরিত করতে পারল না কেন? ডঃ ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন, যে-ভাষার শক্তি বেশী তাই নিজের শক্তিতে প্রচার লাভ করে। তা না হলে সমতল বাংলার ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈষ্ণব বেনেরা কেন ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় কথা বলতে বাধ্য হবেন? সংখ্যালঘু হয়েও ঝাড়খণ্ডীদের শোষণ কবাবাব জন্ম এই উপভাষা ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। ঝাড়গ্রামের পূর্ব বাঙলাব উদ্বাস্তুদের মধ্যে ঝাড়খণ্ডী উপভাষা কি-বিপুল প্রভাব ফেলতে শুরু কবেছে তা যে কোন কৌতুহলী ব্যক্তিকে আমরা সবেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে বলি এবং এ-ও দেখতে বলি, পূর্ববাঙলার ভাষা এ-অঞ্চলে প্রভাব ফেলতে কতোখানি ব্যর্থ হয়েছে।

ডঃ ভট্টাচার্য সেনমহাশয়ের অনভিজ্ঞতা, শিক্ষণপ্রাপ্তিস্থিতার প্রতি কটাক্ষ কবেছেন এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকার' রূপ ও প্রকৃতি এবং ভাষা সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ ছিলেন, এমন দোষাবোপ করেছেন। আমাদের প্রশ্ন, ডঃ ভট্টাচার্য অভিজ্ঞ, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গবেষক হওয়া সত্ত্বেও ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির রূপ ও প্রকৃতি এবং ভাষা সম্পর্কে যে-অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা কেমন কবে সম্ভব হল? খুব সম্ভবতঃ তিনি 'যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাই যথাযথ লিখিতে হইবে, যাহা বুঝিলাম তাহা নহে' নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু তার কলে বহিবাগতের হাতে পড়ে লোকসাহিত্য যে-বিকৃত কদাকার রূপ পায়, তাকে তার স্বাভাবিক সুন্দর রূপে পুনর্গঠিত করার জন্ম যে আর একদল গবেষকের দরকার পড়তে পারে, তা'ও বোধকবি ভেবে দেখা দরকার।

ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য সেই আদিম যুগ থেকে আপন বেগে প্রবহমান। গানের ভাষার মধ্যেও কালান্তরে পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে। ভাষাও ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। আচারধর্মীয় গানে যে-ভাষা আমরা লক্ষ্য করে থাকি, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত গানে সে-ভাষা লক্ষ্যগোচর হয় না। দু'য়ের মধ্যে যে-বিবর্তনের ইতিহাস তা আমাদের দৃষ্টিব অগোচরে ঘটলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে দু'য়ের মধ্যে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে।

ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যে ঝাড়খণ্ড তার সামূহিক রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের আদিম ধর্মবিশ্বাস সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, সমাজ-বাবস্থা, ইতিহাস, অর্থনীতি সমস্তই এখানকার লোকসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানকার পাহাড়-পর্বত, বনডুংরি, গাছপালা, জীবজন্তু সবকিছুকে সাদরে স্থান দেওয়া হয়েছে গানে-গল্পে-কথায়-প্রবাদে-প্রবচনে। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের চবিত্ত্বধর্ম রাঢ় বা সমভল বাঙলার লোকসাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানকার মুক্তিকা যেমন কঠোর এবং অকরণ, তেমনি এখানকার মানুষ এবং মানুষের জীবনও। তাদের লোক-সাহিত্যে তাদের জীবন-মরণ সংগ্রামের কাহিনী, অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাণের দুর্বীর সংগ্রামের কাহিনী বিধৃত রয়েছে। কৃষিকর্ম, গৃহপালিত জীবজন্তু তাই লোকসাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে।

যে-কোন অঞ্চলের লোকসাহিত্যেই লোকগীতি সর্বাধিক অংশ দখল কবে থাকে। আনন্দে-বিবাদে, সুখে-দুঃখে, আশায়-নিরাশায় সবসময়ই গান মানুষের সহচর। ঝাড়খণ্ডী জীবনে সংগীত কখন ব্যবহার হয় না? ঋতুচক্রে আবর্তিত ঋষিভিত্তিক আনন্দ-উৎসবে নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সামাজিক উৎসব এবং আচার-অনুষ্ঠানের মুহূর্তগুলো সুরের স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে বিয়ের আসরে, মন্ত্রতন্ত্রের আসরে। আচার-ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও গান এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাহরা (মাহারায়) বা ধরমপূজার গান এই শ্রেণীভুক্ত। আবার কিছু কিছু গান আছে যা কোন উৎসব, কি সামাজিক অনুষ্ঠান, কি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গীত না হয়ে তা সারা বছর ধরে যখন খুশি গাওয়া চলে। ঝাড়খণ্ডে ঋতুচক্রের উৎসবসম্পর্কিত গান যখন তখন গাওয়া নিবিদ্ধ। কিন্তু বুয়ুর, ভাদরিয়া, টাঁড় বুয়ুর সব ঋতুতেই গাওয়া চলে।

গানের পরই ছড়ার নাম উল্লেখ করতে হয়। ছড়া নানান ধরনের হয়ে থাকে। আসলে ছড়া একদা আদিম মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। তার পূজা-অর্চনা, দেবতার প্রতি প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন থেকে শুরু করে সঙ্গীতও ছড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হত। শিশুদের জন্ম ছড়া তো ছিলই। আমরা এখানে ছড়া বলতে শিশুদের জন্ম রচিত ছড়ার কথাই বলতে চেয়েছি। এই সব ছড়ার মধ্যে সাধারণ ছড়া, ঘুমপাড়ানে ছড়া, খেলার ছড়ার কথাই বিশেষভাবে আলোচ্য।

গ্রাম্য মানুষের চিন্তা-ভাবনা বাঙময় রূপ নিয়ে প্রকাশ পেলেই তা লোক-

সাহিত্য হয়ে থাকে। এই বাঙময় রূপ সংগীত, ছড়া, রূপকথা, প্রবাদ-প্রবচন বা ধাঁধাও হতে পারে। ধাঁধা-ও লোকসাহিত্যের একটি অঙ্গবিশেষ। ধারা বলেন ধাঁধার ভেতরে শুধু কথার খেলা ছাড়া আর কিছু নেই, তাঁরা ধাঁধার প্রতি অবিচার করেন। ধাঁধার সৃষ্টিকার্যে হৃদয় এবং বুদ্ধি দুটোই সমানভাবে সক্রিয় থাকে। কবিত্ব, কল্পনা, চিত্রধর্মিতা, ইংগিত—সাহিত্যের বিশিষ্ট গুণ-গুলো ধাঁধার মধ্যে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

ধাঁধার পরে প্রবাদ-প্রবচন। প্রবাদ-প্রবচনগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বচিত হলেও এর মধ্যে লোকসাহিত্যের গুণ বর্তমান। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, চিন্তাভাবনা এখানেও সংক্ষিপ্ততম পরিসরে বাণীরূপ পেয়েছে। প্রবাদের মধ্যে দু'টি জিনিসের তুলনা, তাদের সামঞ্জস্য ইত্যাদি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। বহু কথা বলে যা প্রকাশ করা যায় না, কয়েকটি শব্দ দিয়ে বচিত একটি প্রবাদ তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

রূপকথা, উপকথা, লোককথা বা শুধুই কথা লোকসাহিত্যের একটি অগ্রতম জনপ্রিয় সম্পদ। কেউ কেউ বলেন, এই অরণ্যভূমিতে সত্যিকারের রূপকথার দর্শন মেলা ভার। আমরা এ-কথায় বিশ্বাস কবি না। আমরা কথা, উপকথা, রূপকথাব জন্ম একটি শব্দ 'রূপকথা' প্রয়োগ করার পক্ষপাতী।

আমাদের লোকসাহিত্য আলোচনার সর্বশেষ উপাদান হল ব্রতকথা, ইতিকথা এবং পুরাকথার সঙ্গে জড়িত কাহিনীগুলো। করম, জিতিয়া আদি ব্রতকথার কাহিনীর পাশাপাশি আমরা জীবজন্তু ইত্যাদির জন্মকাহিনীও আলোচনা করতে চাই। এগুলোর মধ্যেও আদিম মানুষের কল্পনার বিস্তার এবং কাহিনীগ্রন্থনের মুন্সিয়ানা সবিশেষ লক্ষ্যগোচর হয়।

এতোক্ষণে এটা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট হয়েছে যে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত অঞ্চলের লোকসাহিত্যকে বিচারবিশ্লেষণ ও অধ্যয়নের সুবিধার জন্ম কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি: (১) লোকগীতি (২) ছড়া (৩) ধাঁধা (৪) প্রবাদ-প্রবচন (৫) রূপকথা এবং (৬) ব্রতকথা-ইতিকথা-পুরাকথা সম্পর্কিত কাহিনী।

আমরা তৃতীয় পর্বে লোকসাহিত্যের ওপর বিশেষ ধরনের অধ্যয়নের প্রস্তাব রেখেছি। যে-কোন অঞ্চলের লোকসাহিত্য সেই অঞ্চলের জনতার সামগ্রিক রূপটিকে ধারণ এবং প্রকাশ করে থাকে। একটি সমাজের পরিপূর্ণ ছবি লোকসাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ধাপে-ধাপে পুনর্গঠন করা

এমন কিছু কঠিন নয়। এই ধরনের অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ অঞ্চলের জাতি-সম্প্রদায়ের বিচিত্র রীতি-রেওয়াজ, সমাজতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব খুঁজে বার করা সম্ভব। এসব জিনিষ যদিও সমাজতত্ত্ব ও নৃত্বতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, তবু লোকসাহিত্যের গবেষকের-ও এ সম্পর্কে কিছু করবার এবং বলবার আছে বলে আমরা মনে কবি। তাই প্রস্তাবিত তৃতীয় পর্বে ঝাড়খণ্ডের প্রকৃতি, গাছপালা, জীবজন্তু, সামাজিক রীতি-রেওয়াজ, বিবাহবন্ধনে নবনারী, বিবাহ বন্ধনের বহির্ভূত জীবনে নবনারী, প্রেমভালোবাসার গতিপ্রকৃতি, যৌনতা, খাদ্য ও পানীয়, বিধিনিষেধ, নিষিদ্ধ অভিপ্রায় আদি বিশিষ্ট বিষয়বস্তু ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যে যে-ভাবে প্রতিকলিত হয়েছে, তার উদাহরণসহ রেখাচিত্র অঙ্কন করা আমাদের লক্ষ্য।

সাধারণতঃ লোকসাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকেরা লোকগীতি ইত্যাদির আকার-প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করেন না। হয় তা বাহুল্য মনে করেন, নয় সে-কর্মটা ছান্দসিক এবং আলাংকাবিকদের এক্জিয়ারে পড়ে বলে মনে কবেন। আমরা বিশ্বাস কবি লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু যেমন আমাদের মধ্যে আদবগী, তেমনি আদবগী হওয়া উচিত এর আকার প্রকার ছন্দ কলা-কৌশল সব কিছুই। চতুর্থ পর্বে তাই আমরা লোকসাহিত্যের গঠনপদ্ধতি এবং ছন্দ-প্রকরণের ওপর আলোচনা করব।

লোকসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্য যেমন এক জিনিষ নয়, তেমনি এক মাপকাঠিতে এ দু'টির বিচার অর্যোক্তিক তো বটেই, অপ্রয়োজনীয়ও বটে। লোকসাহিত্যেরই ক্রমবিকশিত শিল্পসম্মতরূপ উচ্চসাহিত্য। লোকসাহিত্যের সর্ববিধ বিষয়বস্তু উচ্চসাহিত্যে সঞ্চারিত হয়েছে। উচ্চসাহিত্যের উৎস এবং ভিত্তিভূমিই হল লোকসাহিত্য। তাই লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু উচ্চসাহিত্যের শিল্পাদর্শ-অনুসারী হতে গিয়ে বারে-বারে বিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং পবিশীলিত হয়েছে। ফলে দু'টির মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। লোকসাহিত্যের মধ্যেও সাহিত্যিক সৌন্দর্য এখং মূল্য পুরোপুরি নিহিত আছে। আমরা পঞ্চম পর্বে এই দিকটি নিয়েও আলোচনা করব। বলা-বাহুল্য, লোকসাহিত্যের গবেষকরা ভ্রাস্ত্রবশতঃই হোক বা ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক এদিকটিকেও সম্পূর্ণতঃ এড়িয়ে গেছেন।

ঝাড়খণ্ডে উচ্চসাহিত্য বলে তেমন কিছু নেই, যা আছে তা এই লোকসাহিত্য। এখানকার মানুষ তাই তাদের ভাবনা-চিন্তা, কল্পনা ও স্বপ্ন, সৌন্দর্য-

বোধ ও শিল্পচেতনা, সমাজচিন্তা ও অর্থচিন্তা সব কিছুকেই লোকসাহিত্যেব সাধারণ বন্ধনে আবদ্ধ কবে রেখেছে।

আমাদের গ্রন্থভুক্ত লোকসাহিত্যেব সমস্ত উপকরণ প্রত্যক্ষক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরে ধানবাদেব পাঞ্চেত-কাভবাস-ঝবিয়া থেকে দক্ষিণে ধলভূম নয়াবসান গোপীবল্লভপুৰ, পূর্বে কলাইকুণ্ডা-সরডিহা-রাইপুৰ থেকে পশ্চিমে ঝালদা, বৃষ্টি সিল্লী, তামাড অঞ্চলের লোকসাহিত্য আমাদের সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজে সংগ্রহ কবেছি, কখনো কখনো বিশেষভাবে নির্দেশপ্রাপ্ত আঞ্চলিক সংগ্রাহকের সাহায্য নিয়েছি; দু'একটি ক্ষেত্রে অধ্যাপক ডঃ ধীবেন্দ্রনাথ সাহাব 'ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান' এবং শ্রীযুক্ত বাধাগোবিন্দ মাহাত-ব 'ঝাড়খণ্ডেব লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থদ্বয়ের সংকলন থেকেও উপাদান গ্রহণ কবেছি। এগুলো এখনকাব অবগ্য পাববেশ, মুক্তিকা এবং মালুবজনেব মতোই অকৃত্রিম, কক্ষসৌন্দর্যময়, সরল স্নানাত্মক রূপটি নিয়েই এগানে উপস্থিত। একমাত্র কপকথা ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই আদি এবং অকৃত্রিম কপটির মতো পবিবর্তন সাধিত হয় নি। স্বল্প পরিসরে কথালোকে পবিবেষণ কবাব জন্যই সেগুলোকে শিল্প বাংলাভাষায় রূপান্তরিত কবতে হয়েছে। লোকগীতি, ছড়া, প্রবাদপ্রবচন ইত্যাদিব ক্ষেত্রে ছবছ মুখেব দাবা, বিশিষ্ট উচ্চারণভঙ্গি বক্ষা কবে চলবাব চেষ্টা হয়েছে। ধনি-অনুসারী বিশিষ্ট লিখনপদ্ধতি এগনো ঝাড়খণ্ডী উপভাষার ক্ষেত্রে সর্ববাদীসম্মতক্রমে স্থিবীকৃত হয়নি। তবু আমবা চেষ্টা কবেছি তবছ উচ্চারণভঙ্গিকে, বিশেষভাবে বিপষস্ত ধনিপ্রবাহকে, মোটামুটি একটি নিখুঁত লিপিবন্ধনে আবদ্ধ কবতে।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষাব মধ্যে উচ্চারণগত কিছু তারতম্য মানভূম, ধলভূম-ঝাড়গ্রামে কর্ণগোচর হয়ে থাকে। আমবা আমাদেব সংগ্রহ কার্যে যখন যেখানে যে-উচ্চারণভঙ্গির সম্মুখীন হয়েছি সে-সংগ্রহে সেই উচ্চারণভঙ্গিই গ্রহণ করেছি। উচ্চারণ-পার্থক্যটা নিতান্তই ক্রিয়াপদে। 'করে', কবো, কবি' অসমাপিকা ক্রিয়াপদেব এই তিনটি রূপ খুব স্বল্প দুবন্ধে, এমন কি একই গ্রামের মধ্যেও, শোনা যায়, তাই কোন উচ্চারণভঙ্গি কোথাকাব, তা নির্দেশ করতে বাওয়াটাকে আমরা বাতুলতা এবং বাস্তব মনে করি। ঝাড়খণ্ডী জনতা সব রকম উচ্চারণভঙ্গিই অত্যন্ত সহজে অনুধাবন করতে পাবে এবং এই উচ্চারণভঙ্গি কখনো অঞ্চলভিত্তিতে কখনো গোষ্ঠীভিত্তিতে ঘটে থাকলেও



ঝাড়খণ্ডী জনতার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কিংবা আঞ্চলিকতার বিষ লক্ষ্য করা যায় না। তাই একই নৃত্যের আসরে সব ধরনের উচ্চারণভঙ্গির গান গাওয়া হয়ে থাকে, এবং তা কখনোই হাস্ত-পরিহাসের উদ্বেক করে না।

একই কারণে আমরা কোন গান বা উপকরণকে কোন বিশিষ্ট অঞ্চলের নামে চিহ্নিত করে ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের এক এবং অখণ্ড প্রবাহের মধ্যে বিভেদ এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকে সমর্থন করি না। ঝাড়খণ্ডী জনতা বেশ কয়েকটি আদিবাসী-অর্ধআদিবাসী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য ছাড়া এক এবং অখণ্ড পরিমণ্ডলের অংশীদার। কোন বিশেষ গানটি কুম্ভি-ভূমিজ-মাল-বাগাল-কামার-কুমোরের একান্ত নিজস্ব তা বলার ধুলুতা তারা যেমন কোনদিন দেখায় নি, আমরাও তা বলার ধুলুতা দেখাইনি। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য সমগ্র ঝাড়খণ্ডী জনতার। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য সমগ্র ঝাড়খণ্ডী অরণভূমির, এরচেয়ে বড়ো সত্য আর কি হতে পারে।

## প্রথম গর্ভ

### ঝাড়খণ্ডের লোকগীতি : ভূমিকা ও শ্রেণীবিভাগ

মানবিক প্রয়োজনেই লোকসংগীতের উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছিল। আনন্দে হোক বেদনায় হোক, প্রেমে হোক অপ্রেমে হোক, মানুষ তার হৃদয়ের গভীর অনুভূতিগুলোকে মিশ্রাণ কথা-রূপ দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি, অমল সুরের প্রাণধারায় তাকে সঞ্জীবিতও করেছিল। তারই ফলশ্রুতি হল লোকসংগীতের উদ্ভব। আর দশটি মিতানৈমিত্তিক প্রয়োজনের মতো সংগীতও অপরিহার্য এবং অনিবার্য রূপে দেখা দিয়েছিল। অচিরাতঃ সংগীত মানবিক অস্তিত্বে সদর্পেই প্রাণধারায় পরিণত হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেন, লোকসংগীত পবিত্রীকৃত মনের ফসল। তাই অসভ্য বর্ষর মানুষের জীবনে সংগীতের কোন স্থান নেই কিংবা ছিল না। একথা কোনক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। প্রতিটি মানুষ, সে বর্ষর হোক কিংবা সভ্য, নিজের সাধ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা এবং ক্ষমতা বা প্রতিভা প্রকাশের এবং প্রচারের চেষ্টা করে থাকে। লোকসংগীতের মধ্য দিয়েও এসব প্রকাশ এবং প্রচার করা সম্ভব। তাই বর্ষর অসভ্যও লোকসংগীতে যেমন নিজেকে প্রকাশ এবং প্রচার করেছে, তেমনি আনন্দ এবং সাস্বনার জন্যও লোকসংগীতের ব্যবহার করেছে। লোকসংগীত কোন সুপরিষ্কৃত কিংবা শিল্পাদর্শ-অনুসারী সংগীত নয়। স্বতঃস্ফূর্ততাই এর প্রাণধর্মের প্রধান লক্ষণ। যেসব লোকসংগীতে স্বতঃস্ফূর্ততা নেই সেগুলোকে খাঁটি লোকসংগীত হিসেবে স্বীকার করা যায় না।

লোকসংগীতের ধারাটি মৌখিক। যুগ যুগান্তর ধরে লোকসংগীত সাধারণ নিরক্ষর মানুষের মুখে-মুখে প্রচারিত হয়েছে এবং এইভাবেই তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। আদিযুগের সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল না; তারা গান রচনা করে তা চিরকালের মতো লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারত না। সম্ভবতঃ তার ফলেই খাঁটি লোকগীতির আয়তন দুই চারি পংক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্মৃতিতে থুব বেশি পংক্তিকে ধরে রাখাও সম্ভব নয়। তাই ছোটখাটো লোকগীতিও বিভিন্ন গায়কের মুখে বিবর্তিত হয়ে

নবতর রূপ ধারণ করে। বিবর্তনের ফলে লোকগীতির উন্নতি এবং অবনতি দুই-ই ঘটতে পারে।

সজীবতা লোকগীতির অগ্রতম প্রধান গুণ। এই গুণটির জন্মই লোকগীতি চিরপুরাতন হইবে ও চির নূতন। এ-প্রসঙ্গে জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন : **Indeed, a folksong is neither new nor old ; it is like a forest tree with roots deeply buried in the past but which continuously puts forth new branches, new leaves, new fruits.**<sup>১</sup> লোকগীতি নূতনও নয়, পুরাতনও নয়, লোকগীতি কালোত্তীর্ণ। লোকগীতিকে আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি তখন তাকে নবীনতর রূপেই দেখে থাকি, তার প্রাচীনতর রূপ আমবা কল্পনা করতে পারি কিন্তু প্রত্যক্ষ করতে পারি না। লোকগীতির প্রাচীনতর রূপ যা লুপ্ত এবং নবীনতর রূপ যা বর্তমান দুটোই সমান সত্য। **A folksong is always grafting the new on to the old.**<sup>২</sup> মূল লোকগীতির উপর বিভিন্ন গায়ক নিজ নিজ কবিত্ব-প্রতিভা প্রমাণ করবার জন্ম কিছু বর্জন কিছু সংযোজন করে নবতর রূপ দান করেছে। স্মৃতি-নির্ভর গায়ক কোন শব্দ বা পদ ভুলে গেলে নতুন শব্দ বা পদ জুড়ে গানটির উন্নতি বা অবনতি ঘটাবে এবং উভয়ক্ষেত্রেই মূল গানটির রূপান্তর ঘটবে। এখানেই লোকগীতির **communal growth**-এর প্রসঙ্গে আসতে হয়। **A folksong is neither new nor old because it is continually taking on new life ; it is an individual flowering on a common stem.**<sup>৩</sup> লোকগীতি বহুজনের মুখে ক্রমাগত বিবর্তিত হয়ে বহুজনের সৃষ্টিতে পরিণত হয়। এই **communal growth** বা সম্প্রদায়গত সৃষ্টি তত্ত্বটি অবশ্যই বিতর্কিত ব্যাপার। বহুজন মিলে মূল গানের সৃষ্টি করেছিল, এমন কথা বিশ্বাস করা যায় না। আদিতে কোন একজনই তার স্রষ্টা ছিল ; কিন্তু তার সৃষ্টিকার্য সম্ভব হয়েছিল সমগ্র সম্প্রদায়ের রুচি এবং অনুমোদনের ওপর। যা সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করতে পারে না বা অনুমোদন লাভ করে না তেমন লোকগীতির পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। লোকগীতি তাই ব্যক্তিস্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সমষ্টি-স্রষ্টার দাবীকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়। জনতার সম্পদে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে

১ R. V. Williams, 'Folksong', Encyclopaedia Britannica, 14th edn (1932) Pp. 448

২ Ibid

৩ *ibid*



উৎসব শেষ হলে সে-বছরের মতো জাওয়া গান নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অত্রাণ সংক্রান্তি থেকে বসন্তপঞ্চমী পর্যন্ত টুঙ্গু গান গাওয়া চলে, অত্র সময় গাওয়া নিষিদ্ধ। পেশাগত গানগুলোও পেশা-বহির্ভূত লোকের গাওয়া নিষিদ্ধ। পটুয়ার গান, বাদব নাচের গান, সাপ খেলানোর গান একমাত্র সেই সেই পেশার লোকেরাই গেয়ে থাকে। অত্রদের ক্ষেত্রে এগুলোকে নিষিদ্ধ বলা চলে।

লোকগীতি মূলতঃ পল্লীর মানুষের সৃষ্টি, তাই পল্লীজীবনের সমস্ত উপ-করণই লোকগীতির অন্তর্গত হয়ে পড়ে। এই কারণেই লোকগীতি সমস্ত পল্লীজনতাব অন্তরের সম্পদ। লোকগীতি মিলিত কণ্ঠের গান, তারই মধ্যে এর পরিপূর্ণতা। লোকসংগীত খুব কম ক্ষেত্রেই একক অনুষ্ঠান। সমষ্টিগত-ভাবে গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই লোকসংগীতে অংশগ্রহণ করে থাকে। ব্যষ্টিসত্তার অস্তিত্বকে ছাপিয়ে সমষ্টি-সত্তার অস্তিত্বই এখানে প্রধান হয়ে ওঠে। তার ফলে লোকসংগীতের আসবে একটি গোষ্ঠীব কামনা-বাসনা সামগ্রিকভাবে প্রতিকলিত হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির অধিকাংশই সমষ্টিগতভাবে গীত হয়ে থাকে। করম, জাওয়া, ভাদু, আহীরা, টুঙ্গু, বিয়ের গান সমষ্টি-সংগীতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

লোকগীতি প্রধানতঃ কোন না কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই গীত হয়ে থাকে। তাই প্রতিটি আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে কখনো নৃত্য-গীত, কখনো শুধু গীত অনিবার্যভাবে এসে যায়। মনসা পূজার জাঁত গান ; করম পরবে পঁাতাশালিয়া গান, জাওয়া গান ; ভাদু পরবে ভাদুর গান ; বীধনা পরবে আহীরা গান ; টুঙ্গু পরবে টুঙ্গুর গান এবং সর্বশেষে ভক্লা ( চডক ) পরবে ছো নাচের গান ; বিয়ের অনুষ্ঠানে বিয়ের গান ; ধরম পূজায় মাহ্‌রা ( মাহারায় ) গান—আমাদের বক্তব্যকে সপ্রমাণ করে।

বহু লোকগীতি আবার নৃত্য-নির্ভর। নৃত্যকে বাদ দিয়ে সাধারণতঃ এসব গান গাওয়া হয় না। এসব ক্ষেত্রে গীত এবং নৃত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এগুলোর পেছনে মাজিক বা জাদুবিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক। ঝাড়খণ্ডে এই ধরনের গান হল পঁাতাশালিয়া যা, করম নাচের সঙ্গে গাওয়া হয় ; মেয়েদের জাওয়া গান জাওয়া নাচের সঙ্গে এবং ছো নাচের সঙ্গে ছো গান গাওয়া হয়ে থাকে। লোকগীতিতে বাণ্যযন্ত্র অপরিহার্য নয়। ঝাড়খণ্ডে মূলতঃ নৃত্য-সম্পর্কিত গানে, জাঁত গানে, আহীরা গানে, সাথী গানে বাণ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

লোকগীতির বিষয়বস্তুও বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। লোকগীতি গ্রামীন সমাজ থেকেই উদ্ভূত এবং এই সমাজেই তাব প্রচার ও প্রসাব। গ্রামগুলো এখনো কৃষি-নির্ভর। গ্রামেব মানুষ সহজ সরল জীবনচর্চায় অভ্যস্ত। ঝাড়খণ্ডের জনজীবন এখনো পূর্বোপরি কোমবদ্ধ। কৃষি-নির্ভর মানুষগুলো সেই আদিম জীবনের বহু কিছু উপকরণ এখনো সযত্নে লালন-পালন কবে চলেছে। সেখানে ব্যক্তিস্বার্থ গোণ, সমষ্টি-স্বার্থই মুখ্য। কোমজীবনের গোষ্ঠীবদ্ধতা এখানে এখনো আদিম কালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখনকাব লোকগীতি তাই গ্রামজীবনের সমষ্টিগত ভাব-ভাবনায় পবিপূর্ণ।

তৎছাড়া খাঁটি লোকগীতিব জন্ম সাধারণতঃ অনাডম্বর, অশিক্ষিত এবং নিষ্ঠাচাবেব বজ্রহাঁটুনি-মুক্ত জনসমাজেই সহজে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। সহজ কথায় দু'চাব পংক্তিব মধ্যে এই সব লোকগীতি গভীর আবেগে স্ফুর্ষিত হয়। ঝাড়খণ্ডেব পথে-প্রান্তবে, বন-ডুংবি, গ্রামে-গ্রামান্তরে হাজারে-হাজারে এতো বিপুল পরিমাণে লোকগীতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যে তা কল্পনাও করা যাবে না। এহ সব লোকগীতিতে ঝাড়খণ্ড জনপদের সমগ্র রূপ আমবা সজ পট পাবি। হাঁস-কারা, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা, কামনা-বাসনা, যৌনতা-জাতু—সমস্ত বিষয়ই লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত। একটি সম্পূর্ণ অঞ্চল তাব সমগ্র ভাবনা, সমগ্র চেতনা এবং সমগ্র অস্তিত্বকে বৃষ্টি-বা এমন কবে আব কোন লোকসাহিত্যে নিব্ধিধায় অব্যাহত করে দিতে পাবে নি। কোমজীবনে মানুষেব কাছে দু'টি জিনিষেব প্রাধান্য ছিল : সন্তান ও শস্ত্র কামনা। এই দু'টি কামনা ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। এপানকাব আচাব অল্পষ্টানেও এই দু'টি জিনিষেবই প্রাধান্য। এখানে প্রেম-ভালোবাসা এবং যৌনতার মধ্যে কোন সীমাবেখা নেই। সেহেতু সন্তানকামনাব পশ্চাতে যৌনতা এবং প্রজননের ভূমিকাই মুখ্য, তাই এগুলো এখনো রূপকেব আডালে, কখনো-বা সরাসরি নগ্নতা নিয়েই উপস্থিত। কখনো-কখনো কামনা-বাসনাব অভিব্যক্তি এমন নগ্নতায় উপস্থিত যে তা অশ্লীল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শ্লীলতা বা অশ্লীলতা বিচাব কববার আগে যে-অঞ্চলে এগুলো প্রচলিত, সে অঞ্চলের জনতাব মানসিকতা, বীতীরেওয়াজ, সমাজব্যবস্থা ও জীবনচর্চা, কামনা-বাসনা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের সবিশেষ অরগত হবে।

লোকগীতিব মধ্যে বহুগীতিই পাওয়া যাবে যা সম্পূর্ণতঃ ধর্মাস্রিত।

লোকসংগীত এবং ধর্মসংগীতের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন যে লোকসংগীত সুবে এবং কথায় পরিবর্তন স্বীকার করলেও ধর্মসংগীত তা করে না; লোকসংগীত যেহেতু জীবনসম্পর্কিত, সুতরাং তা সাহিত্যপদবাচ্য এবং ধর্মসংগীত তদ্ব্যস্ত্রী, সুতরাং তা দর্শন। আচারধর্মী এবং জাদু-কেন্দ্রিক গানগুলোর ভাষা অবশ্য পরিবর্তিত হয় না; কিন্তু অগ্ৰাণ্ণ গানের ভাষা যে ক্রমান্বয়ে যুগোপযোগী ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে চলে, তাতে সন্দেহ নেই। সুবের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে কি না তা অবশ্যই বিতর্কিত ব্যাপার। ভাটওয়ালির বিশিষ্ট সুব যদি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে সে গানকে কি নামে ডাকবে? সুমুর যদি তার বিশিষ্ট সুব হারায় তাহলে তা কি সুমুব থাকবে? ধর্মসংগীতে তদ্ব্য অবশ্যই থাকে কিন্তু সে তদ্ব সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। দৈনন্দিন জীবনচ্যার পথে জীবনের যে-সব উপলক্ষি তাকে অগ্ৰ এক পুণিবী বা জীবনের কথা সচকিতে স্মরণ কবিয়ে দেয়, তাই তাবা লোকগীতির ভাণ্ডারে ধর্মচিন্তা হিসেবে সঞ্চিত কবে রাখে। এ ধর্মচিন্তা নিতান্তই লৌকিক ঘটনা। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধে বেডাজাল তো থাকেই না, বরং এই সব ধর্মচিন্তা যেন সেই সব বেডাজালকে ছিন্ন কববার জগ্ৰই উদ্যুত হয়। এইসব চিন্তা জীবনের রসে এমনিভাবে জারিত হয়ে থাকে যে তাতে নীরস ধর্মীয় দর্শন সম্পূর্ণ আডালে ঢাকা পড়ে যায়। রূপকের আডালে যা থাকে তা হয় তো সাধকের প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু গানের ভাষা, প্রকাশভঙ্গি এবং সুব সাধারণ জনতাব মনোরঞ্জন কবে থাকে যে-কোন সাধাবণ লোকগীতির মধ্য দিয়েই। তাই ধর্মাশ্রিত হয়েও এসব গান জীবনের উপকবণ এবং মানবিকতার সমন্বয়ে লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ঝাড়খণ্ডে যে লৌকিক-ধর্ম, তা একান্তভাবে তাদের নিজস্ব। এই ধর্মীয় অন্তর্ভব তারা 'যে ভাবে এবং ভাষায় গানে প্রকাশ করে তা সম্পূর্ণ জীবন-বস সম্পৃক্ত। এখানকার লোককবি যখন বলে,

মানু'জ'নম কিণ্ডা ফুলের কলি গ

সাঁথে ফুটে শকালে যায় ঝরি।

কিংবা,

দিনা চারি, ধনি ভবেরই বাজার গ,

তখন এর ভাব এবং ভাষা, এর উপমা এবং রূপক সরাসরি সাধাবণ নিরক্ষর মানুষের হৃদয়ের অন্তর্ভবের মূলে গিয়ে নাড়া দিতে সমর্থ হয়। তাই এখানকার বিভিন্ন গানে যে-ধর্মচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে, কিংবা ঢুয়া ( বাউল ) গানে যে-

সব রূপকাক্রমী চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে, কিংবা মন্ত্রতন্ত্রে যে-সব জাদু-চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে তার সমস্তই জীবনের জারক বসে জারিত হয়ে স্বাভাবিক-ভাবেই লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। চুয়া গান কিংবা মন্ত্রগল্প যদিও মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমিত থাকে তবু তার প্রতি সাধারণ মানুষের এক দুনিবার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্রগোষ্ঠির সম্পদ হলেও এগুলোও পটুয়ার গান, সাপুড়ের গানের মতোই ঝাড়খণ্ডের লোক-সংগীতে জাতীয় সম্পদ হিসেবে সঞ্চিত হয়ে আছে।

লোকগীতির একটি বিপুল অংশ জুড়ে আছে প্রেম-ভাবনা। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, যে-কোন দেশের লোকসংগীতের সর্বাধিক ব্যাপক বিষয় হল প্রেম। এইসব প্রেম-সংগীতে প্রণয়ী-প্রণয়িনীর পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ ইত্যাদির বিচিত্র মনোভাবের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। মিলনের চেয়ে পূর্বরাগ এবং বিরহ যেন বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। এর মধ্যে আবার বিরহই মুগ্ধস্থান অধিকার করে আছে। প্রেমের বেদনা, আশাভঙ্গ, উৎকর্ষ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি এই জাতীয় সংগীতগুলোকে উজ্জ্বল ছাতি দান করেছে। প্রেম এমন একটি বিশ্বজনীন অনুভূতি যা অসভ্য বর্বর থেকে শুরু করে সুসভ্য অভিজাত সমাজের লোকেব হৃদয়ে একই ধরনের মধুর স্পন্দন সৃষ্টি করে থাকে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের আপেক্ষিকতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকগীতিতে প্রেমের প্রকাশ ভাষায় এবং ভঙ্গিতে পৃথক মনে হতে পারে কিন্তু ভাব এবং অনুভবে কোন পার্থক্য থাকে না। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমসংগীত সমতল বাংলাদেশেও আছে, আবার ঝাড়খণ্ডেও আছে। তবে ঝাড়খণ্ডের লোক-গীতিতে লৌকিক প্রেমেরই প্রাধান্য। যেখানে রাধাকৃষ্ণের নাম ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানেও তা লৌকিক নায়ক-নায়িকার নামের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। একমাত্র ঝুমুরে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমসংগীতে বৈষ্ণব পদাবলীর কিছুটা উদ্ভারাদিকার অনুভব করা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের অনু-প্রবেশের ফলে লৌকিক প্রেমের আবেহে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান রচিত হয়েছে। অন্তর্গত ঝুমুরেও রাধাকৃষ্ণের যে-প্রেমের কথা বলা হয়েছে, তা স্বীকার করে নিতে হলে গোঁড়া বৈষ্ণবের হৃদকম্প উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়। এখানকার প্রেম-ভাবনা এখনো সেই আদিম যুগের দেহজ প্রেমের পরিমণ্ডল ছেড়ে নিষ্কাশ হতে পারেনি।

ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে কুবি-ভাবনাও বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। কোমল



জীবনে সামূহিক অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্তু শশুর প্রয়োজন ছিল। তাই বিভিন্ন পূজা-উৎসব, জাতু-আচার, লোকগীতি সর্বত্রই এই শশুর কামনা স্থান পেয়েছে। শশুর জন্তু বৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। এ সবার জন্তু আনন্দ-উচ্ছ্বাস যেমন গানে আছে, তেমনি কাতর আর্তনাদও আছে। অস্তিত্ব রক্ষার আদিম আগ্রহের মূলে এই শশু ও সন্তান কামনা ছিল। তাই এগুলোকে সাধারণ মানুষ লোকগীতির রূপ দান করে হৃদয়ের কামনা-বাসনাকে অব্যাহত করে দিতে পারত। লোকগীতির সৃষ্টির মূলে হয়তো এই বাসনাই ছিল। পরবর্তীকালে নিজেদের কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধকে বাণীরূপ দেবার জন্তু লোকগীতিকে তার মাধ্যম করে থাকবে। মেলা, উৎসব বা পূজাপার্বণকে কেন্দ্র করে লোকগীতি এক বিপুল আনন্দরসের উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল। লোকগীতি মস্তাচারের মতো গতানুগতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ না থেকে আলোকিত মুক্ত-প্রাঙ্গন রচনা করে এক আনন্দলোক সৃষ্টি করেছিল। যা ক্রমবিকাশের পথে বর্তমানের লোকগীতির ভূমিকা নিতে পেরেছে। একদা যে-লোকগীতি কৃষিকেন্দ্রিক লোক-উৎসবের অঙ্গনে নৃত্যসহ বিকশিত হয়ে উঠেছিল, বর্তমানেও সেই সব কৃষি-উৎসব থাকলেও লোকগীতির মধ্যে কৃষি-ভাবনার চেয়ে আনন্দ-ভাবনাই যেন বেশী গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা লাভ করেছে।

আমরা ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতভাবে করে আলোচনার প্রস্তাব রেখেছি :

১. ঋতু-উৎসব এবং নৃত্য-সম্পর্কিত সংগীত : ঋতু-উৎসব আসলে কৃষি-উৎসব। নৃত্য তার অনুষংগ। বলাবাহুল্য, এইসব উৎসব এবং নৃত্যের মাধ্যমে শশু এবং সন্তান কামনাই ব্যক্ত হয়েছে। গানগুলো যেন অই কামনার বাণীরূপ। এর মধ্যে জাতু-ক্রিয়াও যে নিভূতে সংগুপ্ত রয়েছে, তা আমরা পরবর্তী আলোচনায় বিশদভাবে দেখাতে চেষ্টা করব। আমরা এই করম নাচের গান (পাঁতাশালিয়া, দাঁড শালিয়া, পাঁতা নাচের গান), জাওয়া গীত, আহীরা গান, টুসু গীত, ছো নাচের গান ইত্যাদিকে এই শ্রেণীভুক্ত করেছি।
২. সামাজিক এবং আচারধর্মী অস্থানের গান : এই সব গান মূলতঃ আচারধর্মী, ব্যবহারিক। তাই গানের ভাষায় কোথাও কোথাও রক্ষণ-শীলতা দৃষ্টিগোচর হয়। বিয়ের গান, রুমুজ (ভাউ) গান, মন্ত্র গান, সাথী গান এই শ্রেণীভুক্ত।

৩. ধর্মাচার এবং পূজামুষ্ঠান সম্পর্কিত গান : লৌকিক ধর্মাচার বা পূজা-  
 মুষ্ঠানে এই সব গান গীত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে আছে মাহ্রা বা  
 ধর্মপূজার গান, চুরা গান ইত্যাদি।

৪. সর্ব ঋতু এবং কালের গান : এই সব গানের সাথে সামাজিক,  
 ব্যবহারিক, ধর্মীয়, ঋতুগত বা আচার্যগণের কোন অনুষ্ঠান জড়িত থাকে না।  
 দিনক্ষণ বা সময়-সীমানা দিয়ে এই সব গানকে সংকীর্ণ করে তোলা হয় নি।  
 স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই এসব গান সব ঋতুতে গেয়ে থাকে। বলাবাহুল্য,  
 এসব গান মূলতঃ প্রেমসংগীত। এই বিভাগটিকে পেমসংগীত নামে চিহ্নিত  
 কবলেও কিছু ভুল হবে না। আমবা কুমুর, ভাদবিবা, উদয়া বা টাঁড কুমুর  
 বা কবিগানকে এই শ্রেণীভুক্ত কবেছি।

৫. জীবিকাশ্রমী গান : জীবিকার্জনের জন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এসব গান  
 গেয়ে থাকে। বাদব নাচের গান, সাপুড়েদের গান, পুতুল নাচের গান,  
 এই শ্রেণীভুক্ত। পটগানকে ও এই শ্রেণীভুক্ত কব' যায। কেননা পটুযা'বা পট  
 দেখিয়ে এবং গান গেয়ে ভিক্ষারুত্তির সাহায্যে উদভাগ সংগ্রহ কবে থাকে।

## ঋতু-উৎসবে ও নৃত্যরঙ্গে লোকসংগীত

ঝাড়খণ্ডের লোকসংগীত বিভিন্ন ঋতু-উৎসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।  
 ঋতু-উৎসব মূলতঃ কৃষি কেন্দ্রিক। আসলে ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি উৎসব কৃষি-  
 কেন্দ্রিক। আমরা আগেই বলেছি, আদিম শ্রেণীহীন কোমসমাজে গোষ্ঠী-  
 বদ্ধতাই জনতার পবিচয় বহন করত। তখন তাদের মধ্যে শস্ত্র ও সন্তান-  
 কামনা, প্রধানতঃ এই দু'টি কামনাই প্রকাশ পেত। বিভিন্ন উৎসবের মধ্য  
 দিয়ে আদিম কোমবদ্ধ জনতা শস্ত্রের কামনা যেমন করত, তেমনি সন্তানেরও।  
 শস্ত্র এবং সন্তান দু'টোই আত্মসংরক্ষণের মূল বস্তু। তাই ঝাড়খণ্ডী জনতার  
 মধ্যে এখনো প্রাচীন কোমজীবনের শস্ত্র ও সন্তান কামনা ছাড়া অন্য কোন  
 কামনাই নেই।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের সুসমঞ্জস পবিণতি হচ্ছে শস্ত্র। প্রকৃতির

মধ্যে যে-বৈচিত্র্য তা শস্তোৎপাদনে যেমন সাহায্য করে, তেমনি ক্ষতিও করে। শস্তের জন্ম বসুন্ধরার অরুপণ দাক্ষিণ্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বৃষ্টির উদার করুণা। এই দু'য়ের সমন্বয়ে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে। আত্মসংরক্ষণের উপকরণ এই ফসলের জন্ম কতো না উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান। তাই শস্তের বপনের সময় থেকে আরম্ভ কবে শস্ত তুলে গোলাজাত করা পর্যন্ত ঋতু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বিচিত্র সব উৎসবেরও অনুষ্ঠান করা হয়। এই সব উৎসবে কখনো ভানো চারার জন্ম, কখনো চারাগাছের বৃদ্ধির জন্ম, কখনো বৃষ্টির জন্ম, কখনো প্রচুর ফসলের ফলনের জন্ম, আবার কখনো-বানতুন ফসলের জন্ম উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। মিচক সৌন্দর্যবোধ, কল্পনা কিংবা আনন্দের জন্ম এইসব উৎসবের সূত্রপাত হয় নি। ও-সব উন্নততর মানসিকতার পরিচয়। আদিম মানুষের কাছে আত্মসংরক্ষণের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন ছিল না। এখনো ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে এব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন কিছু নেই। কৃষি-উৎসবের প্রত্যক্ষ রূপটি বর্তমানে অবলুপ্ত হলেও পূজাপদ্ধতি আচার-অনুষ্ঠানে অস্তিত্ব রক্ষা কবে চলেছে। ঝাড়খণ্ডী জনতা বর্তমানে কৃষি-উৎসব সম্পর্কে খুব একটা সচেতন না থাকলেও কিংবা পূজাপদ্ধতি বা আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা না করলেও পূজার রীতি-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান যথারীতি গতানুগতিকভাবে পালন করে চলেছে। লোকগীতি যদিও বর্তমানে আনন্দেরস বিতরণ কবছে, তবু অতীতে যে এগুলো জাদুক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হত, তাতে সন্দেহ নেই। শস্তোৎসবকে কেন্দ্র করে একদা যে-সব লোকসংগীত রচিত হয়েছিল, আজ তা লোক-জীবনকে আনন্দেরসে সম্পৃক্ত করে তুলেছে। অথচ এই সব গানে এখনো সেই আদিম দু'টি কামনা বারে-বারে উচ্চারিত হচ্ছে বিচিত্র রূপ এবং রসের মধ্য দিয়ে। এই অধ্যায়ে আলোচিতব্য সব শ্রেণীর গানেই আদিম কামনা-বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। ঋতু-সন্তোগের প্রবল ইচ্ছার চেয়ে এই সব গানে একান্তভাবে জীবনসম্পর্কিত ভাব-ভাবনা, চাওয়া-পাওয়ার কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

এই সব ঋতু-উৎসবের অন্ততঃ কয়েকটি সম্পূর্ণতঃ কুমারী কন্যাদের উৎসব। তাদের নৃত্যগীত এবং কিছু পূজা-আচার এই সব ঋতু-উৎসব বা কৃষি-উৎসবের মূল উপকরণ। কুমারী কন্যাদের সাধারণতঃ উর্বরতাবাদের সঙ্গে জড়িত করা হয়। আদিম মানুষের সাধারণ বিশ্বাস হল, কুমারী

কন্যাদের মধ্যে প্রজনন-ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। তাদের মধ্যে শস্ত্র-উৎপাদন প্রজনন-ক্রিয়া ইত্যাদি উর্বরতাবাদের বিশিষ্ট গুণগুলো সংগুপ্ত থাকে। স্বভাবতঃই বিভিন্ন কৃষি-উৎসবের সঙ্গে কুমারী কন্যাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

জেমস ফ্রেজারের মতে, আদিম বিশ্বাস অনুসারে জাদু-ক্রিয়া সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করত। এই জাদু-ক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে যে-বিশ্বাসটি স্থান পেত, তা হল, প্রার্থিত কামনাব রূপায়ণের জন্য বিশ্বস্তভাবে কিছু আচার-অনুষ্ঠানকে অনুকরণ করলেই প্রার্থিত কামনাকে রূপায়িত করা সম্ভব। ঋতুচক্রে পালা-বদল, অঙ্কবোদাগম, লতা-গুল্ম-ওষধি বৃক্ষের জন্ম এবং মৃত্যু, সব কিছুকে আদিম মানুষ কোন অপদেবতা বা দেবতার জীবন কাহিনীর বিভিন্ন অধ্যায় বলে মনে করত। তা'বা বিশ্বাস করত, জাদু-ক্রিয়াগুলো নিখুঁতভাবে অনুকরণ করতে পাবলে যথাসময়ে বৃষ্টি এবং রৌদ্রের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলা যায়, যাব ফলে দেবতাব জীবনধারাকে সজীব চঞ্চল করে মানুষের কামনা-বাসনাব উপযোগী করে নেওয়া সম্ভব। আর এখান থেকেই প্রকৃতি দেবতার জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি জটিল আচারগত বিশ্বাসের জন্ম হয়। ঝাড়খণ্ডেও এই লোকবিশ্বাস বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসবের মধ্য দিয়ে আজো রূপায়িত হয়ে চলেছে। কোথাও তা নিশ্চয় কিছু আচার পদ্ধতিতে পর্যবসিত, কোথাও বা তা সমষ্টিগত নৃত্য-গীতে চঞ্চল এবং সজীব।

পয়লা মাঘে ঝাড়খণ্ডে যে-কৃষি বর্ষের সূত্রপাত, দে-অনুসারে ঝাড়খণ্ডের উৎসব-পরিক্রমায় প্রথমেই ভক্তা পরব (চডক পূজো) দিয়ে আরম্ভ করতে হয়। বৈশাখে বর্ষ আবস্ত হবে আমাদের আলোচনার সূত্রপাত করব। প্রথম লোক উৎসব 'রোহিন'। রোহিনে উৎসব আছে কিন্তু সমষ্টিগত কোন নৃত্যগীত নেই, যা আছে তা হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ মন্ত্রগান। বলাবাহুল্য, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে মন্ত্রগান সীমাবদ্ধ থাকলেও তা সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত। সমষ্টিগত লোকসংগীত নয় বলে একে ঋতু-উৎসবসম্পর্কিত গান হিসেবে গণনা করা সংগত মনে করিনি, পরিবর্তে একে আচারঅনুষ্ঠান-সম্পর্কিত গানের শ্রেণীতে রেখেছি। এর পরের কৃষি উৎসব হল রজঃশলা, অম্বুবাচী, গমা (রাগী পূর্ণিমা), চিত অমাবশ্যা, মনসা পূজা। এক মনসা পূজা ছাড়া অল্প উৎসবে কোন নৃত্যগীত চল নেই। মনসা পূজার সময় সার্থীগান শোনা যায়। এর সঙ্গে কিন্তু কোনরকম নৃত্য প্রচলিত নেই। এগুলোও সীমিত সংখ্যক লোকের

মধ্যে প্রচলিত বলে এগুলিকেও আচারঅনুষ্ঠান-সম্পর্কিত গানের শ্রেণীতে রেখেছি। এর পরের কৃষি-উৎসব হল ভাদ্র একাদশীতে করম পরব। বহু ব্যাপক লোক- উৎসব হিসেবে করম পরব সর্বজনীন। করম পূজাকে কেন্দ্র করে করম নাচ এবং গানে সারা ঝাড়খণ্ড মুখর হয়ে ওঠে। এই করম পরবের সময়ই কুমারী মেয়েদের জাওয়া পরব অনুষ্ঠিত হয়, যার অনুষ্ঠান হল জাওয়া গান ও নাচ। এব পর ভাদ্র সংক্রান্তিতে ভাদু পরব। ভাদুগান এর মুখ্য অঙ্গ। এটিও কুমারী মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি উৎসব। এর পর ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য উৎসব কার্তিক অমাবশ্যায় বাধনা পরব; আহীরা গান এই উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঝাড়খণ্ডের জাতীয় উৎসব বা শ্রেষ্ঠ উৎসব হল টুসু পরব বা পৌষ পবব। এটিও কুমারী কন্যাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কৃষিব্রত-মূলক একটি উৎসব। অবশ্য এই ব্রতের পেছনে কোন কাহিনী নেই। পূজার আচার-অনুষ্ঠান কিছু আছে আর আছে গান, অসংখ্য, অজস্র গান; জীবনবসে সমৃদ্ধ ব্যাপক বিপুল অভিজ্ঞতার কাহিনী সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে কি পরিমাণ জীবন্ত, অর্থবহ, হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে, তা আপামর জনসাধারণের ওপর এই গানের জাদু-প্রভাব থেকেই অনুমান করা যায়। সর্বশেষে 'ভক্তা' পববে অনুষ্ঠিত ছো নাচ এবং তার গান। যদিও এই নাচ এবং গান আচারমূলক, কয়েকজন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীই এর ধারক ও বাহক, তবু আমরা এ গানকে কৃষি উৎসব এবং নৃত্যসম্পর্কিত অধ্যায়ে সংযোজন করেছি এই কারণে যে এর মধ্যে কৃষি-ভাবনা যেমন আছে, তেমনি নৃত্যও আছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা করম নাচের গান, জাওয়া গান, ভাদু গান, আহীবা গান, টুসু গান, ছো নাচের গান আদি সম্পর্কে আলোচনা করব।

বিভিন্ন প্রকারের লোকগীতির আলোচনার পূর্বে লোকগীতি ও নৃত্যের সম্পর্ক নিয়ে দু'চার কথা বলা দরকার। আদিম শ্রেণীহীন সমাজে সব কিছু যৌথভাবে বা কোমবদ্ধভাবে সম্পন্ন করা হত। ব্যক্তির কোন মৌলিক অধিকার ছিল না, ব্যক্তির অস্তিত্ব অপেক্ষা সমষ্টির অস্তিত্বই সর্বাগ্রে বিচার্য ছিল। আমরা আগেই বলেছি, সৌন্দর্যভাবনা কিংবা শিল্পদর্শ লোকগীতি-সৃষ্টির মূলে ছিল না। নিছক প্রয়োজনেই লোকগীতির সৃষ্টি। কোন লোকগীতির একক স্রষ্টা থাকলেও সমষ্টির প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা হত বলে সমষ্টিগত ভাবে আদিম জনতাকেই স্রষ্টা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। লোকগীতি খুব কম ক্ষেত্রেই এককভাবে গীত হত। আসলে, লোকগীতি যৌথসংগীত।

আদিম সামাবাদী সমাজে কৃষির উৎপাদন অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে আদিম মানুষের সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হয়ে যেত। সমস্ত শ্রম-প্রচেষ্টায় তাই যৌথভাবে অগ্রসর হতে হত। ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কোন জিনিস ছিল না। যৌথ মালিকানার মধ্যে যৌথপ্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দেবতা অপদেবতার রোষ ইত্যাদি থেকে শস্তকে বাঁচানোর জন্তু, প্রচুর শস্তের ফলনের জন্তু, শস্তক্ষেত্রের উর্বরতা বাড়াবার জন্তু সেদিন তাদের অলৌকিক জাদুক্রিয়াকে আশ্রয় করতে হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই সময়ই যৌথসংগীত এবং যৌথনৃত্য জাদুক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, বিশেষ ধবনের সংগীত বা নৃত্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় ( অনাবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি ) বা অপদেবতার হাত থেকে শস্তকে রক্ষা, শস্তের দ্রুত বৃদ্ধি এবং ফলন বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে তাদের সাহায্য করতে পারে। এই আদিম বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে সেদিন যে সংগীত ও নৃত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে আদিম মানুষ নিশ্চিত হতে পেরেছিল, ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে আজো তাব প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ঋতু বদলের ফাঁকে-ফাঁকে বিভিন্ন শস্ত-উৎসবে নৃত্যগীত সমানে আজো সেই অলৌকিক জাদুক্রিয়ার পরম্পরাকে বহন করে চলেছে। নৃত্যগীতকে জাদুক্রিয়ার আচারঅনুষ্ঠান বলা যেতে পারে। এগুলোকে আচাব-নাটক বা **Ritual drama** ধরা যেতে পারে। **Ritual drama** সম্পর্কে লুইস স্পেন্স যে-কথা বলেছেন, তা এখানে বিচার্য: আচার-নাটকে দেবতার কিভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি করেন, জনতার সৃষ্টি করেন এবং পৃথিবীকে শিকার ও শস্ত ভরে তোলেন সেই সব কাহিনী রূপকের আশ্রয়ে বিবৃত করা হয়। *These plays or mysteries were repeated at the appropriate seasons when they were thought necessary for the quickening of those processes of nature which replenished the stock of game and caused the seed to grow. By the acts of imitative or symbolic magic rehearsed in them the gods of nature were believed to be roused to action beneficial to man.*<sup>১</sup> অন্ত্যকথায়, এই সব নাটক নির্দিষ্ট ঋতুতে আবৃত্তি করা হত। ভাবা হত যে এর ফলে প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন আনা

১. *The Outlines of Mythology—Lewis Spence, Premier Books 1961, P. 47.*

সম্ভবপর, যার ফলে প্রচুর শিকার পাওয়া যাবে এবং অস্তুরোদগম হয়ে শস্তবৃদ্ধি ঘটবে। দেবতাদের কর্মকাণ্ডের অনুকরণ অথবা প্রতীকাত্মক ম্যাজিকের মহড়াব সাহায্যে দেবতাদের কর্মোদ্যোগী কবে তুলতে পারলে দেবতার ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে মানবসমাজ উপকৃত হবার সুযোগ পাবে বলে তারা বিশ্বাস করত। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবে শস্তোৎপাদনকে কেন্দ্র করে যে সব নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান, আমাদের মনে হয়, তার লক্ষ্যও একই। দেবতাদের সম্বন্ধে করে শস্তোৎপাদনে সাহায্য লাভের জন্মই এই নৃত্যগীতের জাতক্রিয়া।

ডঃ সুধীরকুমার করণ বলেন, ‘এই অঞ্চলে যে ধরনের যৌগনৃত্য আছে তা শিল্পচর্চার অবকাশের মধ্যে সুপবিকল্পিত নয়; তাব মধ্যে সহজ প্রচেষ্টাব এবং সহজ ক্ষুদ্রিত্ব এক অস্পষ্ট চেতনা এবং এব মনোও কৃষিকার্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই ঋতু হিসাবে নাচ এবং গান পরিবর্তিত হয়।’<sup>২</sup> তিনিও স্বীকার করেছেন, পুবোপুরি না হলেও এব মনো কৃষিকার্য-সম্পর্কিত আদিম জাদু বিশ্বাস যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আদিম সমাজে যৌগসংগীত এবং যৌগনৃত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। নৃত্য-গীতকে আলাদাভাবে কল্পনাও করা যেত না। আদিম কোমলজীবনের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাব বাণীরূপ প্রকাশ পেত সংগীতে এবং নৃত্যের ভঙ্গিমায় তাকে শাবীবী রূপ দিয়ে প্রত্যক্ষ করে তোলা হত। শুধু নৃত্যকে জাদু-ক্রিয়ার আচার হিসেবে ধরলে তুল করা হবে, সংগীতও একই জাদু-ক্রিয়ার আচার ছিল। আচার-নাটকে যেমন শুধু কথাগুলো আবৃত্তি করলেই চলে না, অঙ্গভঙ্গি সহকারে তার অভিনয়ও প্রয়োজন। কথা এবং শারীরিক ভঙ্গিমা একীকরণ হলেই অভীষ্ট কামনা সফল হতে পারে; প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শস্তোৎপাদন এই দু’য়ের একীকরণের মধ্য দিয়েই প্রভাবিত হতে পারে। ঝাড়খণ্ডে আচার-নাটকের প্রচলন না-থাকলেও গীত-নৃত্যের প্রচলন আছে। তবে সব গানেই যে নৃত্য থাকে, এমন কথা নয়। বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিতব্য ‘আহীবা’, টুঙ্গু আদি গানে নৃত্যের প্রচলন দেখা যায় না।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, ‘যে সকল লোকনৃত্যের উদ্ভবের মূলে কোন ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্য কিংবা অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাহাই প্রধানতঃ

সঙ্গীতবিবর্জিত হয়, নতুবা লোকনৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাব সহিত সঙ্গীত যুক্ত থাকিবেই।<sup>৩</sup> আমাদের মনে হয় ডঃ ভট্টাচার্যের এই বক্তব্যে বিতর্কের অবকাশ আছে। করম নাচ ও জাওয়া নাচে পুরোপুরি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া এবং অলৌকিক বিশ্বাস বর্তমান আছে বলে আমরা মনে করি। এর মধ্যে ধাত্তরোপণের উপযোগী জমি প্রস্তুত, ধাত্তরোপণ, ধাত্তচ্ছেদন আদির ভঙ্গিমা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। শরৎচন্দ্র রায়, ডান্টন আদির মতে এই নৃত্য-ভঙ্গিমার মসৌ কৃষি-উৎসবের অবশেষ বর্তমান; প্রচুর শস্ত্র কামনার ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্যও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। অথচ এই নাচগুলো সংগীত-বর্জিত নয়, বরং প্রাণরসে পরিপূর্ণ আদিম অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত সহজ সাবলীল সংগীতে মুখর হয়ে ওঠে নৃত্যের আসর। কিছুটা উচ্চাঙ্গের নৃত্য কাঠি নাচ ও ছো নাচও সংগীত-বর্জিত নয়, বলাবাহুল্য, এ গুলোর মধ্যেও ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্য ও অলৌকিকতা বর্তমান। তাই লোকনৃত্যের উদ্ভবের মূলে ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্য কিংবা অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস থাকলেই যে তা সংগীত-বর্জিত হবেই এমন কোন কথা নেই।

সব সংগীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে নৃত্য জড়িত না থাকলেও সংগীত-বর্জিত নৃত্য ঝাড়খণ্ডে লক্ষ্য করা যায় না। যে কয়েক প্রকারের নৃত্য প্রচলিত আছে, সেগুলো হল: করম নাচ, জাওয়া নাচ, কাঠি নাচ এবং ছো নাচ। করম নাচের অনেক ক'টি আঞ্চলিক নাম আছে: দাঁড নাচ, পঁাতা নাচ, বুয়ুর নাচ। বলাবাহুল্য, প্রতিটি নাচের সঙ্গে অনিবাধ্যতঃ লোকগীতি গাওয়া হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে, লোকনৃত্য সব সময়েই লোকগীতির অঙ্গসারী। ঝাড়খণ্ডে নৃত্য মানেই যৌথনৃত্য। একক নৃত্য একমাত্র ছো নাচে দেখা যায়, তা'ও এ-ধরনের নৃত্য বিরল বললেই চলে।



॥ এক ॥

### করম নাচের গান

করম নাচের গান বিভিন্ন নামে পরিচিত। দাঁড়শা'ল, দাঁড়শালায়া, দাঁড় বুমুর, দাঁড়গীত, পঁাতাশালায়া, বিঙাফুলায়া, পঁাতা নাচের গান—একই গানের নানান নাম। প্রথম চারটি নামে 'দাঁড়' শব্দটি আদিতে সাধারণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'দণ্ড' শব্দ থেকে 'দাঁড়' শব্দের উদ্ভব, দণ্ডায়মান অবস্থায় যে-নৃত্য তার নাম দাঁড় নাচ; তার সঙ্গে যে-লোকগীতির সম্পর্ক তা স্বাভাবিকভাবেই স্থানভেদে প্রথমোক্ত চারটি নামে পরিচিত হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের কোথাও কোথাও বুমুর শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই দাঁড় নাচের গান দাঁড় বুমুর নামেও পরিচিত। কোথাও কোথাও এই নাচ 'দেঁউড়া', বা 'দেঁউড়া' নামেও পরিচিত। করম নাচ শ্লথ এবং দ্রুত উভয় গতিরই হয়ে থাকে। তবে দ্রুতগতির প্রাধাত্যই বেশী। সম্প্রদায় বিশেষে এই নাচে ষথেষ্ট তারতম্য আছে। খাড়িয়াদের করম নাচের গান যেমন অত্যন্ত দ্রুত লয়ের হয়ে থাকে, তেমনি তাদের নাচও। এক আদিম উদ্দামতা এবং উল্লাস যেন তাদের নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ-নৃত্য প্রায় দৌড়ানোর পর্থায়েই পড়ে। আমাদের মনে হয় 'দেঁউড়া' বা 'দেঁউড়া' নামের উদ্ভব এই নৃত্যের অগ্ন্যতম বৈশিষ্ট্য দ্রুতগতির মধ্যই নিহিত আছে।

করম নাচের গানের 'বিঙা ফুলায়া' নামটির মধ্যই তার নামকরণের ইতিহাস সংগৃহ্য আছে। এ-ফুল সঙ্কোবেলা ফোটে এবং সকালবেলা ঝরে যায়, অর্থাৎ একান্ত স্বল্পকালীন আয়ু। ('মানুষ জনম বিঙা ফুলের কলি। সাঁঝে ফুটে সকালে যায় ঝরি।') করম নাচের গানগুলো আকারে যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি গায়ন-কালও সীমিত। এই গানে ঝাড়খণ্ড যেন তার সামগ্রিক রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকে। এক কলি, দু'কলির গান, একবার দু'বার আবৃত্তির পরই শেষ হয়, আরম্ভ হয় নতুন গান। এ গানের শেষ নেই, উদ্দাম নৃত্যেরও শেষ নেই। অক্লান্ত অশ্রান্ত নৃত্যগীতের আসর সারা রাত্রি জমজমাট হয়ে থাকে। এ সব গানে ঝাড়খণ্ডের মানুষের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু থেকে আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধিও স্থান পেয়ে থাকে।

'পঁাতাশালায়া' নামটি খুব সম্ভবতঃ করম নাচের অগ্ন্যতম বৈশিষ্ট্য পংক্তি

নৃত্য থেকে এসেছে। পরসার হাত ধরাধরি করে একটি অখণ্ড নিটোল পংক্তিতে চক্রাকারে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমাদের বিশ্বাস, পাতাশাল্যা নাচ বা পাতা নাচ নাম দু'টি এই কারণেই এসেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'পাতা' শব্দটি ব্যবহার না করে 'পাতা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমি সর্বত্রই শব্দটিকে 'পাতা' উচ্চারণে শুনেছি, অস্তুতঃ ঝাড়খণ্ডী উপভাষা-ভাষী আদিম জনতার মুখে। ডঃ ভট্টাচার্য এই নৃত্য প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই অঞ্চলের আর এক শ্রেণীর নৃত্যের নাম পাতা নাচ। স্ত্রীপুরুষ উভয়ই ইহাতে মিলিত-ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য হইতেই একদিন আদিবাসীর সমাজজীবনের সখা কিংবা সখীত্ব পাতানো হইত, অর্থাৎ স্বামীস্ত্রী নির্বাচন করা হইত বলিয়া ইহাকে পাতা নাচ বলে। করম উৎসব উপলক্ষ্যে পাতাশুদ্ধ ডালকে কেন্দ্র করিয়া নৃত্য হয় বলিয়াও ইহার নাম পাতা নাচ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তবে কেবলমাত্র করম উৎসব উপলক্ষ্যেই যে এই গান গাওয়া হয়, তাহা নহে—অগ্ন্যঙ্ক উৎসবেও পাতা নাচের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আদিবাসীর সমাজ হইতেই ইহা হিন্দুভাবাপন্ন সমাজে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছে।'১ এর মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিতর্কিত ব্যাপার উত্থাপিত হয়েছে। প্রথমতঃ সামাজিক সখা বা সখীত্ব পাতানোর অনুষ্ঠান হিসেবে এর নাম পাতা নাচ ; দ্বিতীয়তঃ পাতাশুদ্ধ করম ডালের জন্য পাতা নাচ নাম ; তৃতীয়তঃ এ নৃত্য শুধুমাত্র করম উৎসব-কেন্দ্রিক নয় ; চতুর্থতঃ আদিবাসী সমাজ থেকে হিন্দুভাবাপন্ন সমাজে এর বিস্তার। আমরা করম নাচের মধ্যে পাতা নাচ, দাঁড় নাচ আদি শ্রাবণ-ভান্ডে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নামের নৃত্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। করম উৎসবকে কেন্দ্র করে যে নৃত্য, তা করম নৃত্যই। ভান্ডের একাদশীতে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হলেও এর আয়োজন চলতে থাকে সুদীর্ঘ কাল ধরে। নৃত্যের আসর বসে প্রতি সন্ধ্যায় শ্রাবণ মাস থেকেই, চলে মাঝরাত্রি অবধি। আমরা আগেই আলোচনা করে দেখিয়েছি, ঝাড়খণ্ডে নৃত্যগীত ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্য এবং অলৌকিক বিশ্বাসকে ত্বরান্বিত করবার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। করম উৎসব-কেন্দ্রিক এই নাচ ধান্তরোপণ থেকে শুরু করে ধান্তচ্ছেদন পর্যন্ত অর্থাৎ শ্রাবণ থেকে শুরু করে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সময়টা জমিতে শস্যোৎপাদনের সময়। বৃষ্টি,

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য়, পৃ ২০৫-২০৬

রৌত্র যেমন চাই, তেমনি অপদেবতার হাত থেকে শস্তুকে রক্ষাও করা চাই। তাই এই দীর্ঘকাল ধরে নৃত্যের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে জাদুক্রিয়া প্রকাশ করা হয়ে থাকে। করম-উৎসবের অনুষ্ঠান-সীমাকালও সুদীর্ঘ। ভাদ্র একাদশী থেকে আরম্ভ করে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা পর্যন্ত কবম ডাল পুঁতে করম ঠাকুরের পূজা করা হয় এবং নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই এই নৃত্য শুধু করম উৎসবের নয় বলে যে মস্তব্য কবা হয়েছে, তা ঠিক নয়। একমাত্র 'জিতিয়া' বা 'জিতা' যা করমেরই স্বগোত্র, তাতেও এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। 'করমগাড়া' ও 'জিতিয়াগাড়া' দু'টি উৎসব সম্পর্কেই বলা হয়ে থাকে। দুটোই কৃষি উৎসব; একটায় শস্তু-কামনা, অন্নটায় সন্তান-কামনা, প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই নৃত্যে পুরুষ-নারী উভয়েই যোগ দিয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন সম্প্রদায়ের নারীদের এই নৃত্যে পুরুষের সঙ্গে একত্রে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। কুমি (মাহাত) নারী সম্প্রদায় এর অন্তর্ভুক্ত। ডঃ ভট্টাচার্য হয়তো 'হিন্দুভাবাপন্ন' বলতে কুমিদের কথাই বলতে চেয়েছেন। কুমি-মাহাতদের সম্পর্কে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। কুমিবা এখানকাব আদিম সন্তানদের অগ্রতম, অগ্র কথায় তারাও একদা আদিবাসীই ছিল। এই অবস্থায় আদিবাসী সমাজ থেকে তাদের মধ্যে করম নাচ কিংবা গান আসেনি, তা তাদের পরম্পরাগত জ্রীতিহ। আদিবাসী বলতে যদি তিনি সাঁওতালদের বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বক্তব্য এ নৃত্য সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত নেই। এ নৃত্য মাহাত-ভূমিজ-মুণ্ডা-খাডিয়া-লোখা-কামার-কুমোর-বাগালদের মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ।

অতঃপর 'পাতা' নাচ সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। আগেই বলা হয়েছে, পংক্তি শব্দ থেকেই 'পাতা' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় 'পাতা' অর্থে পংক্তিই বুঝিয়ে থাকে। ডঃ সুধীর করণও একে পাতা নাচ বলেই উল্লেখ করেছেন।<sup>২</sup> সখা-সখীত্ব পাতানো থেকে কিংবা পাতাশুদ্ধ করম ডাল থেকে 'পাতা' শব্দের উদ্ভব কল্পনাকে কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। তাছাড়া শব্দটি 'পাতা' নয় 'পাঁতা'। যদি ধরে নেওয়া যায়, শব্দটি সাঁওতালী ভাষা থেকে এসেছে, তাহলে অবশ্য 'পাতা' শব্দটি গ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, সাঁওতালদের মধ্যে পাঁতা নাচ নেই, যা করমকেন্দ্রিক।

ওদের মধ্যে আছে ‘পাতা’ নাচ, যা একান্তভাবে মেলা বা উৎসবকেন্দ্রিক। ‘পাতা’র অর্থ সাঁওতালী ভাষায় মেলা বা পরব। ডঃ স্মৃধীর করণ সাঁওতালী নাচকে পাতা এবং পাতা উভয় শব্দ দিয়েই চিহ্নিত করেছেন, যা একান্ত বিভ্রান্তিকর।<sup>৩</sup> পাতা নাচও পংক্তি নৃত্য হলেও পাতা শব্দ বা নাচের সঙ্গে সাঁওতালদের কোন সম্পর্কই নেই। সাঁওতালদের পাতা নাচে অবশ্য ভাবী স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনের অবকাশ থাকে, কিন্তু ‘পাতানো’ শব্দ থেকে ‘পাতা’ শব্দের উদ্ভবের মীমাংসা তাতে হয় না। ডঃ করণ করম নাচকে দাঁড় নাচ এবং পাতা নাচ নামে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, ‘আগে স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিতভাবেই এতে অংশগ্রহণ করতো। ইদানীং বহু ক্ষেত্রে পুরুষরাই সারা রাত ধরে নাচে নাবীবিবর্জিত হয়ে।... মোটামুটিভাবে ধরে নিতে হবে যে সীমান্ত বাঙলায় সাঁওতাল ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী ছাড়া অল্প কোন হিন্দুধর্মী উপজাতিদের মেয়েরা নাচের আসরে যোগদান করেছে না আজকাল।’<sup>৪</sup> তিনি হিন্দুধর্মী উপজাতি বলতে কুমি-মাহাত-বাগাল-কামার-কুমারকেই বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছেন। পাতা নাচ-দাঁড় নাচ স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নৃত্য বলে স্বীকার করে নিয়েও ডঃ করণ আরো বলেছেন, ‘দাঁড়শাল নাচ বা দেউড়া নাচ শুধু পুরুষদের নাচ।... পাতা নাচে স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে নাচে।’<sup>৫</sup> পরম্পরবিরোধী মন্তব্যগুলো অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর।<sup>৬</sup>

আসলে করম, দাঁড়, পাতা একই নাচের বিভিন্ন নাম। এ নাচ স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নাচ। কোথাও এ নাচে নারীর ভূমিকা অস্বীকার করা হয়েছে, কোথাও সনাতন ধারায় অব্যাহত আছে। এ নাচ শুধু করম উৎসবেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যতোদিন মাঠের ফসল ধরে না আসছে ততোদিন এ নাচ আনন্দ-উল্লাসের অঙ্গ হিসেবে সজ্জোবেলা অহুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

করম উৎসব ঝাড়খণ্ডের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ শস্তোৎসব। নৃত্য-গীত এর মূল অঙ্গবস্তু। নৃত্য-গীত বাদ দিয়ে করম উৎসব বা ব্রতের আয়োজন কল্পনাই করা যায় না। প্রচুর শস্তোৎসবের জগৎ জাহ্নকিয়ার অহুষ্ঠান করা হত।

৩. প্রাগুক্ত পৃ ২২০

৪. প্রাগুক্ত পৃ ১১২

৫. প্রাগুক্ত পৃ ২৪৮

৬. প্রাগুক্ত পৃ ২২৬

নৃত্য-গীতানুষ্ঠান আসলে জাদুক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। ‘পণ্ডিতগণের অভিমত হচ্ছে এই যে নাচ হচ্ছে জীবনসার আহরণ ও সঞ্চারণ করার একটি পদ্ধতি বিশেষ।’<sup>১</sup>

ভাদ্রমাসে করম পরবের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শশ্তোৎপাদনের ক্ষেত্রে সময়টি একটি সন্ধিক্ষণ। একদিকে আউশ ধানের ‘লৌতন ভাত’ অন্তর্দিকে ‘শোল’ বা আমন ধানের রোপণ শেষ। করম পরব শশ্তবৃদ্ধির পরব, উর্বরতাবাদের পরব। কেননা এই পরবের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে কুমারী কন্যাদের জাণ্ডা পরব। করম পরবে দু’টি করম ডাল পাশাপাশি পূঁতে পূজো করা হয়। বলা যেতে পারে এয়েন করম রাজা ও করম রাণীর বিবাহ অনুষ্ঠান। করম রাজা সূর্য আর করম রাণী পৃথিবীর প্রতীক। দু’য়ের পরিণয়ের মধ্য দিয়েই প্রচুর শস্তসম্ভাবনা স্বাভাবিক হতে পারে। বিভিন্ন শশ্তোৎসব সূর্য আর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকারের সংযোগ এবং মিলনের অনুষ্ঠান মাত্র। করম পরবের আচারঅনুষ্ঠান এবং উপকরণগুলোর প্রতি নজর দিলে এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সূর্য এবং পৃথিবীর শুধু পরিণয়ই নয়, যৌন মিলনের প্রতীক অনুষ্ঠানও দেখতে পাওয়া যায়। এই উৎসব আদিম কোমজীবনের শস্ত ও সম্ভান কামনাকে সফল করে তোলার উৎসব। এই উৎসবের জাদুতন্ত্র হিসেবে যে-নাচ সেই করম নাচের মধ্যেও এই শস্তকামনাই ব্যক্ত হয়ে থাকে। করম নাচে শরীরের যে অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ পায়, তাতে ধান্ধরোপনের জন্তু মাটি কাঁদা করা, ধান্ধরোপণ, ধান্ধচ্ছেদন আদি বিভিন্ন মুদ্রা প্রকাশ পেয়ে থাকে।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মূলতঃ করম উৎসবকে কেন্দ্র করে যে নাচ তার নাম করম নাচ; এ-নাচের অনুষ্ক গান করম নাচের গান। এটাও দেখা গেল যে দাঁড় নাচ, পাতা নাচ আদি নামগুলো করম নাচেরই নামান্তর মাত্র; দাঁড়শাল, দাঁড়শালা, দাঁড়গীত, দাঁড়-ঝুমুর, ঝিঙাফুল্যা, পাতাশালা, পাতানাচের গীত, ভাদরিয়া গীত—সমস্তই করম নাচের গানেরই নামমালা মাত্র।

করম নাচের গানের সংখ্যার সীমা-পরিসীমা নেই। হাজারে হাজারে এই সব গান ঝাড়খণ্ডের জনতার চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। ঝাড়খণ্ডে এমন কোন নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ পাওয়া যাবে না, যার কণ্ঠে গান ধ্বনিত না

হলেও স্মৃতিতে ছ'চারটি করম নাচের গান সঞ্চিত হয়ে নেই। ক্ষণিকের আনন্দে কবিত্বের দোলায় বিদ্বৎ চমকের মতো এ-গানের সৃষ্টি। এ-গান দুই তিন, চার পাঁচ চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ-গান দু'টি চরণের মধ্যে সীমায়িত হয়ে থাকে। লোকায়ত গান বলতে যা বোঝায় করম নাচের গান সম্পূর্ণতঃ তাই। লোকগীতির চরিত্রধর্মই হল স্বল্পায়তন। অকৃত্রিমতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং প্রত্যক্ষতা—এগানের সর্বাঙ্গব্যবহাবে অবিলম্বেভাবে বিগুস্ত হয়ে আছে। আদিম জীবনের সামগ্রিক রূপ এর গঠনে এবং সুরে চিরকালের জগ্নু বিধৃত হয়ে আছে। আদিম বৈচিত্র্যহীন সুর যেমন এর অবলম্বন, তেমনি এ-গানের উপজীব্য বিষয়বস্তুও হল আদিম জীবনের শস্ত্র ও সন্তান কামনা। জীবন-ধারণের সমগ্র পরিবেশ-প্রতিবেশ যেমন গানে স্থান পেয়েছে, বংশানুক্রমিক আত্মগারক্ষণের ভাবনাও তেমনি প্রেম-ভালোবাসা-ধৌনতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যারা এ-গানের স্রষ্টা কিংবা যাদের জগ্নু এ-গান, তারা যেমন অলংকারবর্জিত, অনাডম্বর, সহজ সাবলীল জীবনে অভ্যস্ত, তেমনি জীবনের রূপচ্ছবি ধারণ করে আছে নিরলংকার সৌন্দর্যের বাণীমূর্তি এই গানগুলো। করম নাচের গান ঝাড়খণ্ডের মানুষের এতোই আপনার যে সুরে-দুঃখে-বেদনায়, কৃষিকর্মে পথশ্রমে সব সময়ই আনন্দের, সান্ত্বনার উৎসকে মুক্ত করে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। করম নাচের গান তাই শুধু আখড়ায় নয়, শস্ত্রক্ষেত্র, পথে-প্রান্তরে সর্বত্রই গাওয়া হয়ে থাকে। এগান শুধু করম-উৎসব নয়, শস্ত্রাংপাদনের সমস্ত সময় জুড়ে, সেই অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত, গাওয়া চলে।

করম নাচের গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা অগ্ন্যত্র হল'ভ। আদিম মানুষের প্রাণপ্রবাহের প্রতিটি ধারা যেন এসে মিশেছে এই গানে। সাদামাটা কয়েকটি শব্দ দিয়ে গড়া এক একটি গান। যা কিছু চোখে পড়েছে, যা কিছু মনে পড়েছে, তাৎক্ষণিক অমুভূতির ছোঁয়া লেগে তা গানে পরিণত হয়েছে। অগ্ন্যত্রায়, বাইরের দৃশ্যপুঞ্জ যেমন গানের বিষয়বস্তু, তেমনি অন্তরের অমুভূতিও। এ-অমুভূতি অমার্জিত, স্থূল ; দৃষ্টিকোণ অমুজ্জল, অপরিশীলিত। তাই চাষ-বাস, ঘরবাড়ি, বনজঙ্গল পাহাড়-ডুংরি, ফল-ফুল, পশু-পাখি, খাণ্ড-পানীয়, সামাজিক আচারঅমুঠান, বিধি-নিষেধ, প্রেম-ভালোবাসা-ধৌনতা সবকিছুই যৌথসংগীতের যৌথ-ভাবনায় মিছিলের মতো সমস্ত ব্যক্তিনাম-স্বাতন্ত্র্যকে মুছে দিয়ে এ-গানের মুক্তাঞ্চলকে কলরবে-

কোলাহলে মধুর হাস্ত-পরিহাসে মুখর করে রেখেছে। রুচিশীল মাহুষের শ্রবণে এ-গান অশ্লীল বলে মনে হলেও অবাক হবার কিছু নেই ; এ-গানের দুর্বীর বগ্নতা এখানকার মাহুষের মানসছবিটিকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। ঝাড়খণ্ডের সমাজজীবনে হিন্দু-প্রভাব পড়লেও এ-সমাজজীবন একান্তভাবে আদি-বাসীদেরই, যাদের মধ্যে এখনো কোমজীবনের অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের সমাজজীবনে যৌনতা, বগ্নতা, নিরাভরণ বাগভঙ্গি কোনটাই বর্জনীয় নয়, বরং তারই মধ্যে তাদের আত্মপরিচয় বিদ্যুত।

করম নাচের গানের সুবিশাল সংকলন হাতে তুলে দিলেও বুঝি-বা এর উদ্দাম, বগ্ন, চঞ্চল, অকৃত্রিম প্রাণপ্রবাহকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। এর সুর, নাচ, ঢোলধমসা-মাদলের বাজনা মেঘ-সিক্ত আকাশের তলায় এক গ্রাম্য আখড়ার পরিবেশে রাত্রির গহনে মাদকতার কুহকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিস্মৃত দিনগুলোকে পুনর্বীর সঞ্জীবিত করে তোলে। সেই অনির্বচনীয় পরিবেশে যিনি এই গান শোনে নি, তাকে কবম নাচের গান যে কি বস্তু তা কিছুতেই বোঝানো সম্ভব নয়।

১. মহলের ভিতরে থাকি জানালায় নয়ন রাপি

‘আমি শুব জানালার গড়াতে,

খঁচা দিয়ে উঠাবে আমাকে ;

২. তরেই লাগি আনাগনা তরেই লাগি জিহল খানা

তরেই লাগি রাইতে জুসুনা,

মাথার উপর উড়িছে ফুদুনা ;

গান দু’টির রসাস্বাদন শুক কাগজের পাতায় কি সম্ভব ? এর রসাস্বাদন করতে হলে এক বিচিত্র সিক্ত পরিবেশে আমাদের যেতে হবে। ওপরে মেঘসিক্ত আকাশ, নিচে বুষ্টিসিক্ত পৃথিবীর আখড়া, মদ-হাঁড়িয়া সিক্ত আদিম জনতার জিহ্বা, উদ্দীপনা-আবেগে সিক্ত চোখ এবং প্রেম-ভালোবাসা-যৌনভায় সিক্ত-মন নিকব রাত্রির অন্ধকারে এই গানের ভাষা নিঙড়ে যে-পরিমাণ রস প্রবাহের সৃষ্টি করতে পারে, তা সংকলনের পাতা থেকে পাওয়া যায় না।

এবারে করম নাচের গানের বিষয়বৈচিত্র্য এবং রসবৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে হলে ধারাবাহিক আলোচনার প্রয়োজন। আমাদের আলোচনার সুবিধের জগ্ন আমরা গানগুলোকে সুসংবদ্ধভাবে সাজিয়ে নেব। এ-থেকে কেউ যেন মনে না করেন, করম নাচের আসরে এমনিভাবে সাজিয়ে নিয়ে গান গাওয়া

হয়। গীতের আসরে অসংবদ্ধ এলোমেলো ভাবেই সাধাবণতঃ গান গাওয়া হয়। আখড়াস্থাপনা কিংবা বন্দনাব গান থাকলেও তা যে শুকতেই গাওয়া হয়ে থাকে, তা নয়। একটি প্রেমের গানের পাশাপাশি বৈরাগ্যের আধ্যাত্মিক গান আসতে পারে, দৈনন্দিন জীবনচরার গানের পব মুহূর্তেই চটুল অর্থহীন গান গাওয়া হতে পারে।

৩. করম কাটুকুটি আখড়া স্থাপনা করি  
গপিনী সব কবে একাদশী,  
আ'জ বে করম ভেল বাতি।

জালি দিহ গ ধনি বেশমের বাতি।

আখড়া সর্বজনীন নৃত্য-গীতের যৌথ পীঠভূমি। আদিম জীবনে আদিবাসী সমাজ যুগবদ্ধভাবে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই সর্বজনীন আখড়ার স্থাপনা এবং বন্দনা প্রাথমিক বীতি ছিল। কেউ কেউ গোপিনীর সন্ধান পেয়েই বাধাকৃষ্ণলীলার সম্ভাব্য প্রভাবের কথা ভাবেন। এ প্রসঙ্গে বাধাকৃষ্ণের কল্পনা নিতান্তই উদ্ভূত কল্পনা। লোককবিসে-অর্থে গোপিনী শব্দের প্রয়োগ করে নি, এখানকার আদিম বর্ণনা তাই নান্দ্য।

৪. আগেতে বন্দনা করি গায়ের গবাম হাঁব

তা পবে বন্দনা বেজনাবী,

ইঞ্জিতে মুম'ব লাগে ভাবী।

অতীত যাব বন্দনা প্রথমে কববার অনিবার্য বীতি চল আছে, সেই গণেশ ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে অনুপস্থিত। এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু দুগ কালী-ও। লোকায়ত গানে এদের দর্শন পাবার কথাও নয়। লৌকিক গানে গ্রাম-দেবতাব কথাই প্রথমে আসা স্বাভাবিক। এখানে হাঁব এবং ব্রহ্মনাবীর মধ্যে বাধাকৃষ্ণের অস্তিত্বের কথা ভাবা যেতে পারে সত্যি, কিন্তু লৌকিকতাব কারণে তা যেনে নিতেও দ্বিধা আছে। বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্প্রবেশের পব দ্বিতীয় পংক্তিটি প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে পারে।

অবণ্য পর্বতময় ঝাড়খণ্ডে চোখ মেললেই বন পাহাড় ডু'রি গাছপালা-ফুলফল-পশুপাখি নজবে পড়ে। তাদের কথাও খুবই নিষ্ঠাসহকারে লোককবি গানের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৫. বাগমুড়িব পাহাড়ে নানা বড়ের ফুল খুটে

দিদি গ, ডাঁটায়ে তুলিতে মন কবে।



খঁপা ভরি পর্‌হব খঁচল ভরি তুলব আর ভাঙিব ফুল ডাল ।  
 দু'হাজার ফুট উঁচু বাঘমুণ্ডি বা অযোধ্যা পাহাড় লোককবির দৃষ্টি বার  
 বার আকর্ষণ করেছে। লোককবিরা স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীরই ছিল। করম নাচ  
 স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নৃত্য। তাই নারী-সমাজও এর গান রচনা করেছে।  
 নারীদের সৃষ্ট গানের সংখ্যা পুরুষের গানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।  
 উদ্ধৃত গানটিও যে নারী রচিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৬. উটিল পুন্নিমার চাঁদ দেশ হল্য আল রে

রাজা, এই চাঁদে অযথ্যা শিকার।

আদিম মানুষ শিকার-নির্ভর ছিল। পরবর্তীকালেও বছরের একটি দিন  
 শিকার-উৎসবের দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। রাজা, সামন্ত, ভূস্বামী-  
 রাই এই শিকার-উৎসবের নেতৃত্ব করতেন। অযোধ্যা পাহাড় শিকারের  
 প্রশস্ত অঞ্চল হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল।

বাঘমুণ্ডির পাহাড় শুধু যে ফুল-ফলের জন্ম কিংবা হরিণ-বরাহ-খরগোশ  
 শিকারের জন্মই লোককবির কাছে এতো আকর্ষণীয় তা নয়, এ-পাহাড়  
 জীবনের রসদও জুগিয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডের বিপথগত অর্থনীতিতে হাসির  
 সঞ্চায় করতে পারে লাফার প্রাচুর্য; লাফার কল্যাণে দরিদ্র আদিবাসীদের  
 বেশভূষায় অভাবিত-পূর্ব পরিবর্তন আসতে পারে।

৭. বাগমুড়ির পাহাড়ে লাহার বড চটি রে

লাহার দৌলতে দাদার এড়ি-জঁথা ধুতি।

বনের বুনো ফুলও লোককবির কাছে সমানভাবে আদরনীয়। গৃহবাসের  
 ফলে আদিম জনতা অরণ্যবাসের যে বহু আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল,  
 কাষ্ঠ আহরণে কিংবা অল্প কোন কারণে অরণ্যে প্রবেশ করলে তারা সেই  
 জীবনের স্বাদ পুনর্বার পেয়ে থাকে। বিশেষতঃ রমণীসমাজ অরণ্যে গেলেই  
 আত্মহারা হয়ে পড়ে। বুনোফুলের রূপে গন্ধে সমাজের শাসনের বেড়ি যেন  
 খুলে খুলে পড়ে।

৮. বনে সামালি যখন জীবন হারালি তখন

বন ফুলে মন তুলে, আমাকে ভুলালি তরা কত ছলে।

সে বুনোফুলের গন্ধই বা কি? বনের সীমানা ছাড়িয়ে মাঠ প্রান্তর ভাসিয়ে  
 সে-গন্ধ এসে হানা দেয় গৃহ কোণে-কোণে। রমণী-মন উন্মন হয়ে ওঠে, গন্ধের  
 মাদকতায় চলতে গিয়ে পা টলমল করে।

৯. বনে ফুটল ফুল গাঁকে আলা বাস রে  
পথে চলিতে মন করে টলমল ।

ঝিঙাফুলিয়া গানে ঝিঙে ফুলেরও যে বিশিষ্ট স্থান থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি । ঝিঙে ফুল, যার শুধু হৃদয় রঙের বাহার আছে, গন্ধ বলে কিছু নেই, তাকে নিয়ে কাব্য করা বা গান রচনার কথা কি পরিশীলিত মন ভাবতে পারে? লোককাব্যি পারে, কারণ তার কাছে তুচ্ছ বলে কিছু নেই; যা তুচ্ছ তা'ও যেন তার কাছে পরম মূল্যবান বস্তু । ঝিঙে-ফুলের মালাব জড়ও তা'ব লোভ । একটি মালার বিনিময়ে একটি চূষন দান—এ শুধু অকৃত্রিম প্রাণের রমণীর পক্ষেই বলা সম্ভব ।

১০. ঝিঁগা ফুল গাঁথি দে ন মকে,  
হাতে ধরি চুম খাব তকে ।

'ঝিঁগা ফুল সারি সারি ডাহিন খঁসায়' শুধু শোভাই পায় না, 'ললকারি'-ও দেয় বই কি! সবাব ওপব সারি সারি ঝিঙে ফুল দেখে বিবহিনী নাট্যকার মনে প্রণয়ী'র অঁভাব যে কি নিদারুণ বাজে, তা'ও লোককাব্যি গানে'ব মনো গভীর নিষ্ঠায় প্রকাশ করেছে ।

১১. ঝিঁগা ফুল সারি সারি বঁধু বিনে রইতে না'বি  
আ'জ বঁধু র'হল কন খানে,  
সখি গ, আ'জ আমি র'হব কন খানে ।

গ্রামের পথ বা 'কুল্‌হি' যুবক-যুবতীর ক্ষণিক-দেখা এবং গভীর ইঞ্জিতে সদাচঞ্চলে । গৃহে গুরুজনের ভয়, গ্রামের পথে রসালাপে সমাজের ঞ্চোন দৃষ্টির ভয়, তাই প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষণিক দেখা সাক্ষাত, চকিত চাহনি এবং নির্দিষ্ট স্থানে অভিসারের গভীর অর্থবহ ইঞ্জিত গ্রামে'ব পথে যাতায়াতের সময়টুকুকে মধুর করে তোলে । তবু যুক্ত-প্রেমের আদিম সমাজে একটি মাত্র প্রেমে বঁধা থাকবে পুরুষরতন, এমন কথা প্রেমিকা কল্পনাও কবতে পারে না । তাই সংশয়ে সন্দেহে বুক ছুঁ ছুঁ করে । প্রেমিককে কাতব নিবেদন জানায়, অন্ম নারী যেন দুজনের মাঝে এসে তার বুক না ভেঙে ফেলে :

১২. কুল্‌হি কুল্‌হি যাইহ না কার পানে চাইহ না  
যাচিলে ফুলের মালা লিহ না,  
অবলাকে প্রাণে কাঁদাইহ না ।

প্রণয়রসে অস্থির প্রেমিকের চাহনি প্রেমিকাকে সংযমহার। করে তোলে ।

ইঞ্জিতে-আবেদনে সে-চাহনি এমনি তীক্ষ্ণ যে প্রেমিকাকে দিশেহারা যৌবন-জলধি যেন গ্রাস করতে চায়। বিনীত নিবেধের অল্পনয় যেন কাতর আর্ত-নাদের রূপ নিতে চায়, অথচ সে আর্তনাদ বাঁধ-ভাঙা পুলকের উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

১৩. কুল্হি কুল্হি যাতে ছিলি বঁধু করে ভালাভালি  
আঁখি ঠারা না বঁধু আঁখি ঠারা না,  
নবীন বয়সে আমার প্রেম মানে না।

করম গান প্রেমের বেদনামধুর অল্পভবে সজল, যে কোন হৃদয়কে স্পর্শ কবাব মতো ক্ষমতা এ-গানের আছে। বহুরূপে বহুভাবনায় বহু বিচিত্র চিত্রকল্প ও রূপকের আশ্রয়ে প্রেম এই গানকে জনচিত্তহারী করে তুলেছে। যৌবনবতী গরবিনী নারীর প্রতি বার্থ প্রেমিকের তীব্র স্নেহ ও এখানে স্থান পেয়েছে :

১৪. বাঁশ পাতের কাজললতা হাত লাড়ো ঘাঁছিস কুণা  
ভরা জৈবন মুখে নাই তরং কথাল,  
জৈবন গেলে হবি ঝিঁগা চপা।

কুল-কলঙ্ক-ভাবনাও তেমনি এ-গানে প্রকাশ পেয়েছে :

১৫. বাইদে বহালে কাঁশি বিটি ছায়ে বাজায় বাঁশি  
বিটি ছায়ের কুল রাখা হল্য দায়,  
পাছে কাঁশি ফুল ফুটো যায়।

তবে বিরহের কথা যেন অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে বিধৃত হয়েছে। প্রণয়ীব প্রতীক্ষায় শব্দী নায়িকা যে-কোন শব্দে সচকিত সতৃষ্ণ হয়ে উঠছে অথচ প্রণয়ীর দেখা নেই, শুধু তার শিস ভেসে আসে ; তাই এক মন-কেমন করা অস্থিরতায় সে অধীর :

১৬. তালপাতের আঙুড়টি হাড়াক-হুড়ুক করে  
আমার বঁধু শিলিক মারে মন কেমন করে।

প্রেমিকের অবহেলা, এড়িয়ে-চলার বেদনাতেও এ-গান বিধুর :

১৭. সডপ ধারে ঘর করোছি আলে গেলে সামাও না,  
কিসে তুমার মন ভাঙোছে আমায় থুল্যে বল না।

দেখাসাক্ষাতের স্থান, অভিসারস্থলে গেলে বিরহিনী নায়িকার চক্ষু ঝাপসা হয়, মন উন্নন হয়, স্বভারতঃই পদস্থলন ঘটে। তবু সব কিছুকে ছাপিয়ে প্রেমিকের স্মৃতি সারা চেতনাকে উদ্ভাসিত করে তোলে :

১৮. যবুনাকে জলকে গেলে পিছলে পড়ে পাল  
থাক্যে থাকো, মনে পড়ে আমার বঁধুয়া ল।

কবম গানে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণলীলায় যে সব দশার কথা পাই, তাই কোনটাই অল্পস্থিত নয়। অভিসারের গানও তাই সহজভাবেই করম নাচে এসেছে :

১৯. আমার বঁধু রা'তকানা বাড়ির পথে আনাগনা  
বাড়ির পথে যাই হ না ভাই উধারে বুচ্ছে গড়া ধান।

রা'তকানা বঁধুব অভিসাবেব কথা বলতে গিয়ে এখানে নায়িকা যেন কিছুটা বসিকতার আশ্রয় নিয়েছে। ঝাড়পণ্ডের প্রেম সর্বাংশে দেহজ প্রেম বললেও চলে। তাই দেহের ক্ষুধা সমাজ-শাসন মানে না; প্রেমের ক্রমঃবিকাশের ফলশ্রুতিও নয় এ দেহ প্রেম। পূর্বে আলাপ থাক বা না থাক যুবক-যুবতী-তন্তু সন্নিকটে এলে সৃষ্টিব অনিবার্য আনন্দে সংশ্লেষে নিবিড় হয়। ভ্রমসমাজের শালীনতা হয়তো এতে বিপণ্ড হয় তবু আদিম সৃষ্টির মাহাত্ম্য এতে ক্ষুন্ন হয় না। নায়িকার শরীবে দুঃসাহসী নায়কের হস্তস্পর্শ পড়লে আদিম নাবী তার গোপন পুলক লুকিয়ে বেখে কপট ভৎসনায় নায়ককে যেন আরো বেশি দুঃসাহসী কবে তোলে :

২০. এত যদি ছিল মনে আগে না বলিলি কেনে  
ঘুমের ঘোরে, ছঁড়া খেঁচরাই উঠালি মোরে।

নাবী কিন্তু তাই অভিসারে রাধার মতোই সমস্ত্রাব জালে জড়িত। মিলনেব জন্ম অস্তরে প্রবল আকৃতি, অথচ অভিসারের পথে দুরতিক্রম্য বাধার পাহাড় :

২১. আঙিনায় কুকুর ভঁকে রে ছুয়ারে প্রহরী জাগে রে,  
পায়ের নেপুর বাজে কমঝুম, কেইসে হামে বাইরাব রে।

বাইরে প্রেমিকের সংকেতময় বংশীধ্বনি, ভেতরে ঘরগেরস্থালির কাজ, দোটানায় নায়িকা-মন দ্বিধাবিভক্ত :

২২. কাড়াবাগাল কাডা খুলে বাঁশি-এ দেই শান,  
কি করে'য় বাইরাব বাগাল ঘরে কুটি ধান।

দেখা যাচ্ছে প্রেম তার সমগ্রতা নিয়ে এ-গানে উপস্থিত। আগেই বলা হয়েছে, ঝাড়পণ্ডের প্রেম সাধারণতঃ দেহজ প্রেম। আদিম কোমজীবনে দেহজ প্রেমেরই প্রাধান্য ছিল। প্রেমের মধ্যই নিহিত থাকে সন্তান-কামনা।

যৌনতাকে বাদ দিলে সে-কামনার পরিপূর্ণতা আসে না। যৌনতা তাই প্রেমের মধ্যে একীভূত হয়ে বিরাজ করে।

২৩. পগ'র কুড়ালে বঁধু না বাঁধালে ঘাট,  
ডালিম লাগায়ে বঁধু গেলে পরবাস।  
পাকিল ফাটিল ডালিম পরে ভাঙে খায়,  
ইদেশে পণ্ডিত নাই সঁয়াকে বুঝায়।  
পাকিল ফাটিল ডালিম চোরে ভাঙে খায়,  
আমাব বঁধু ঘরে নাই জৈবন বহ্যে খায়।

ঝাড়খণ্ডের লৌকিক প্রেমের গানে 'বাগাল' (গরুমোষ রক্ষক)-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কবম গান এবং মেয়েদের জাগুয়া গানে রমণীমন এই বাগালের জন্ম উৎকর্ষিত হয়ে থাকে। তার বাঁশির শব্দে নারীদেহে কদম্ব বিকশিত হয়; বাগাল তাব প্রেমিক, তার নাগর, তার বেগবতী যৌবন-নদীর অকুতোভয় কাণ্ডাবী। বাগালের জন্ম গুরুজনের গঞ্জনা, স্বামীব প্রহাব সমস্তই দৃচ্ছ হয়ে যায়। কে জানে, এই বাগাল কৃষ্ণের ছায়া নিয়ে এখানকার লোকায়ত গীতে আবির্ভূত, না কি বাগালের ছায়ায় বৈষ্ণব কবির বিভিন্ন গল্পভবের উপকরণ দিয়ে উদ্ভাসিত করেছেন এক নবতর চরিত্রে। আমাদের মনে হয়, আদিবাসী সমাজের বাগালই ছায়া ফেলেছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। কেন না বৈষ্ণব পদাবলীর উত্তরাধিকারী যুগ্মে বাগালের কোন ভূমিকাই নেই; শুধু মাত্র লোকায়ত গানেই বাগাল তার বিশিষ্ট ভূমিকায় সর্গোরবে সুপ্রতিষ্ঠিত। লোকায়ত গান বৈষ্ণব পদাবলীরও পূর্বসূরী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৈষ্ণববাদ ঝাড়খণ্ডের নারী সমাজে কোনদিনই প্রভাব ফেলতে পারে নি, অথচ এই নারীসমাজের গানে এবং কথায় বাগালের দর্শন মেলে—

২৬. কন্ঠিনে বাগালিয়া বাঁশি-এ দিল শান্ রে,  
কন্ঠিনে গুণমণি পাত্যেছিল কান রে ?  
কুল্হির মুড়ায় বাগালিয়া বাঁশি-এ দিল শান্ রে,  
বাঁধের ঘাটে গুণমণি পাত্যেছিল কান রে।

বৈষ্ণবধর্ম ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী অর্ধআদিবাসীদের জীবনেও প্রভাব ফেলেছে। যাদের হিন্দু-ভাবাপন্ন উপজাতি বলা হয় সেই মাহাত-ভূমিজ-কামার-কুমোর-বাগালদের মধ্যে এ-ধর্মের প্রভাব একেবারে নগণ্য নয়।

তাই তারাও গয়া গঙ্গা বারাণসীর লোভ না করে তুলসীতলাকেই মোক্ষধাম বলে জেনেছে—

২৫. কাশী যাব না গয়া যাব না আর যাব না বিন্দাবন  
ঘরে বশে ভজরে মন, দুয়ারে তুলসীর বন ।

বৈষ্ণবধর্মের গুরুবাদ, কৃষ্ণবাদ এবং বৈষ্ণববাদ ঝাড়খণ্ডের মানুষকেও প্রভাবিত করেছে । তাদের এ উপলব্ধিও লোককবি করম গানে বিধৃত করে রেখেছে ।

২৬. গুরু কিষ্ট বৈষ্টমেতে যার না হল্য মতি রে,  
কেমনে হইবে তার পরকালে গতি রে ।  
না লাগিবে ধনকড়ি না লাগে শক্তি রে,  
মনে মনে ভজিলে বৈকুণ্ঠে হবেক গতি রে ।

করম গানে কালা, কিষ্ট, শ্রামের উল্লেখ থাকলেও এর মধ্যে বৈষ্ণব পদা-বলীক কৃষ্ণ একেবারে অনুপস্থিত । ঝাড়খণ্ডীদেব লৌকিক জীবনের যে-কোন প্রেমিকই এই কৃষ্ণ বা শ্রামের ছদ্মবেশে উপস্থিত আছে বলে আগাদেব বিশ্বাস ।

২৭. আটল কালাচাঁদ ডাঁঢ়ায়ে ফিরিয়ে কেনে যায়  
দেখা দিতে অবসর-অ নাই ।  
কলসীতে জল নাই কি দিব ঢালিয়ে,  
শামচাঁদ ডাঁঢ়াই আছে ঐ পিরিত্তির লাগো ।

কোন কোন গানে ইতিহাসের কিছু স্মৃতিকথা যেন লুকিয়ে আছে । মুসলমান যুগে ঝাড়খণ্ড তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারলেও পাশ্বেত শিখব-ভূম অবধি মুসলমানরা অগ্রসব হয়েছিল । হয়তো সেই সময়ই কোন এক নৃত্যগীতের আখড়ায় মুসলমানরা হানা দিয়েছিল—

২৮. আখড়ায় সামালা জড়া মুসলমান,  
দেখ ভগবান, নিশি দাঢ়ি ছাতিব সমান ।

একদা বর্গীর হাঙ্গামা সারা পূর্বভারতে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল । বর্গীরা যে কখনো কখনো এই অবণাভূমিতেও হানা দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই ।

২৯. উপর কুল্‌হি ছলছল নাম কুল্‌হি কিসের গোল  
মাঝ কুল্‌হি, দাদা, বর্গী সামালা বে ।  
উপর কুল্‌হি হড়হডানি নাম কুল্‌হি ঢড়া  
কি করো পাইরাব দাদা দুই ঠেঙ্‌ খে খড়া ।

অ ননদী, দেখ, দেখ ল, বগী কত ধুরে,  
বগী আলা লক পালালা বগী কত ধুরে, ননদী দেখ, দেখ ল...

করম গানে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শও লেগেছে—

৩০. কিবা লয়ে আলি রে মন কিবা লয়ে যাবি  
এমন সুন্দর দেহ মাটিতে মিশাবি,  
বে মন, এ ভব সংসার ছাড়ো যাবি।

জীবন বড়োই ক্ষণস্থায়ী, এ-কথা জেনেও ঝাড়খণ্ডের মানুষেরা হতাশ হয় না। তারা হাসে, গায়, নাচে। তারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী; ঈশ্বর যা বিহিত করবেন, তাই হবে। তাই বলে জীবনকে উপবাসী বেখে রুচু সাধনায় প্রাণের সমস্ত কোলাহলকে নিস্তক্কর করে দিতে হবে, তা তারা স্বীকার কবে না :

৩১. মানুষ জনম ঝিঙা ফুলের কলি রে  
সাঁজে ফুটে সকালে যায় ঝরি।  
তবু ফুটে নাচে হাসে পিখীমকে ভালবাসে  
যাবাব বেলায় কাঁদে না রে ভরসা শুধু হরি ॥

॥ দুই ॥

## জাওয়া গীত

জাওয়া পরব এবং করম পরব একই দিন অর্থাৎ ভাদ্রমাসের পাইকৈকাদশী ব দিন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর চলনভূমি ছোটনাগপুর মালভূমির সর্বত্র; পূর্বে পশ্চিম বাকুড়া এবং মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম শালবনী এবং দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চল। অর্থাৎ যে-সব অঞ্চলে কুম্ভি-মাহাত-ভূমিজ-খাডিয়া কামার-কুমোর-বাগাল ইত্যাদি উপজাতির বাস সেই সব অঞ্চলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডের সর্বত্রই করম পরবকে কেন্দ্র করে এর অনুষ্ঠান হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল প্রধানতঃ পুর্নালিয়া জিলার পশ্চিমাংশে যেখানে কুম্ভালি উপভাষা প্রচলিত,

সেখানে বর্ষাকালীন একটি শশ্রোৎসবের নাম জাওয়া পরব। ইহা শশ্রোব জন্মোৎসব।<sup>১</sup> ডঃ ভট্টাচার্যের বক্তব্যের প্রথমংশ যে নিঃসংশয়ে ভুল তা জাওয়া পরবের চলনভূমি প্রসঙ্গে দেখা গেল। পুরুলিয়া জিলার পশ্চিমাংশ বলতে তিনি খুব সম্ভবতঃ ঝালদা-বাঘমুণ্ডি অঞ্চলকে বোঝাতে চেয়েছেন। ঝালদা অঞ্চলে কুমি-মাহাতরা কুম্মালি উপভাষায় কথা বলে থাকেন, স্বভাবতঃই তাঁদের গানও এই ভাষায় রচিত। শুধু ঝালদার কুমি-মাহাতরাই এই পরবে একমাত্র অংশীদার নয়। ঝাড়খণ্ডের প্রায় সমস্ত উপজাতিই (সাঁওতাল আদি বাদে) এই পরবে শরিক। আলোচনাকালে আমরা ঝালদা থেকে সংগৃহীত গানের নিদর্শনও উপস্থিত করব। জাওয়া গীতে, শুধু ঝালদায় কেন, সর্বত্রই কুম্মালি উপভাষার প্রভাব দেখা যাবে। আসলে জাওয়া গীত আচার-মূলক, তাই অনেকাংশে রক্ষণশীল। ঝাড়গ্রামেও যে জাওয়া গীত গাওয়া হয়ে থাকে তাতেও কুম্মালি উপভাষার স্বাভাবিক অবশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে।

জাওয়া পরব একটি শশ্রোৎসব। জাওয়া শব্দটি 'জাত' শব্দ থেকেই উৎপন্ন। তবে 'জাওয়া' না 'যাওয়া' এ নিয়েও মতভেদ আছে। এ গানে 'যাওয়ার' কথাই প্রাধান্য পেয়েছে, এ কথা ঠিক। তবে ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা যে পিতৃগৃহ থেকে স্বশুরালয়ে 'যাওয়ার' কথা বলেছেন,<sup>২</sup> মনে হয় তা ঠিক নয়। আসলে ভাজ্র মাসে করম পরবে ঝাড়খণ্ডের স্বশুর-গৃহে বন্দিমী বধুরা পিতৃগৃহে যাবার ছাড়পত্র পেয়ে থাকে; অবশ্য সব সময়ই যে অন্নমতি পেতে, তা নয়। নববিবাহিতা বধুবা ইদ-করমের দিন গুণে স্বশুরালয়ে সব দুঃখকষ্ট অন্নানবদনে সহ করে প্রতীক্ষা করে থাকে।

১. ইদ করম ল' জকাল্য ভাই আলা লিতে ল  
আশু ভাই বশু পিঁটায় বেউনী দল'াই দিব।

ইদ-করমে যে-বধু পিতৃগৃহে ফিরে যেতে পারল না, তাব মতো ভাগ্যহীনা আর কে আছে? তাই পিতৃগৃহে যাবার অন্নমতি না পেলে বধু ক্রোধে-ক্ষেপে ভেদিশেহারা হয়ে পড়ে :

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য়, পৃ ১২১
২. ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান, পৃ ১৮



২.           ইদ পরব ল' জকাল্য ভাই খাল্য লিতে গ  
খালভরা নাই দিল যাতে ।  
খালভরাকে খাতে দিলে চুল্‌হাশালে বসে গ  
উচিত কথা ব'লতে গেলে জুমটা কাঠে ধাশে ।

শুশুরালয় থেকে পিত্রালয়ে 'যাওয়া'র কথা থেকে গানের নাম 'যাওয়া গীত' বলা হলে আমাদের গ্রহণে আপত্তি নেই। তবে 'জাত' শব্দ থেকে 'জাওয়া' শব্দটির উদ্ভব তত্ত্বটিকেই আমরা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। এই উৎসব সত্যিই শস্যের সমৃদ্ধিকামনায় অহুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আচার-অহুষ্ঠানের উপকরণ থেকেও বোঝা যায়, এটা শুধু শস্য-কামনায় অহুষ্ঠিত হয় না, সন্তান-কামনাও এর পশ্চাৎপটে রয়েছে।

'জাওয়ার' উপকরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে এই অহুষ্ঠান অক্ষুরোদগমের অহুষ্ঠান। জাওয়া শস্য-কামনার উৎসব, উর্বরতাবাদ বা fertility cult এর মুখ্য পরিচয়। পার্শ্বকাদেশীর তিন কিংবা পাঁচ কিংবা সাতদিন আগে কুমারী মেয়েরা প্রত্যুষে শয্যাভ্যাগ করে বন থেকে শালের দাঁতন কাঠি ভেঙে নিয়ে আসে। তারপর স্নান করে ডালায় কিংবা চূপড়িতে পুকুর বা নদীর বালি ভরে তার ওপর মুগ, কলাই, অড়হর আদি রবিশস্য এবং ধানের বীজ ছিড়িয়ে দেয়। তার ওপর হলুদ গোলা জল ছিটিয়ে দাঁতন কাঠিগুলো ভেঙে কম্পাস কাটার মতো ডালার বালিতে পুঁতে দেয়। এই ডালাটিকে 'জাওয়া ডালি' বলে। ডালাটিকে সম্বন্ধে কোঠাঘরের ভেতরে কোন উঁচু জায়গায়, তক্তায় কিংবা শিকিতে বুলিয়ে রাখা হয়। 'জাওয়া ডালি'কে কোথাও কোথাও 'দোঁড়া'ও বলা হয়। এরপর প্রতি সন্ধ্যায় কুমারী মেয়েরা সবাই মিলে ডালাটির চারপাশে ধরে গান গাইতে-গাইতে আড়িনায় নিয়ে যায় এবং এই ডালাটিকে ঘিরে ওদের নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। পরস্পর হাতে-হাতে ঘন-সংবন্ধভাবে ধরাধরি করে বৃত্তাকারে এই নৃত্য অহুষ্ঠিত হয়। সাঁওতাল মেয়েদের নৃত্যের চেয়ে এর লয় একটু দ্রুত। একটু এগোনো একটু পিছানো এ নৃত্যের অগ্রতম বৈশিষ্ট্য। জাওয়া গীতে নৃত্য অপরিহার্য। নৃত্য এবং গীত এখানে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ধলভূম ঝাড়গ্রামে কোথাও এ নৃত্যে বাজনা বাজানো হয় না। পুরুলিয়ার কোথাও কোথাও, বিশেষভাবে ঝালদা অঞ্চলে, কোন কোন আখড়ায় বাছগন্ত্র ব্যবহার করা হয়। কুমারী মেয়েদের কণ্ঠে শুধু গান থাকে, পদযুগলে নৃত্যের মুহূ ললিত ছন্দ। জাওয়া পরব অবি-

সংবাদিতরূপে একটি শস্ত্রোৎসব। অঙ্কুবোদনামেব আয়োজন জাওয়ার ডালিতে। নৃত্য-গীত জাহুক্ৰিয়র অনুষঙ্গ বিশেষ। বৃত্তাকার নৃত্য প্রাচীনতম নৃত্যধারা। এই নৃত্যের মধ্যে আচার-ধর্মী জাহুক্ৰিয়া সংগুপ্ত আছে। আদিম মানুষ বৃষ্টির জন্ম বা শস্ত্রের জন্ম দেবতার মুখাপেক্ষী থাকত না, বরং নিজেরাই নৃত্যের মাধ্যমে প্রচুর বৃষ্টি এবং শস্ত্রের সম্ভাবনাকে স্তব্ধিত কবে তোলবার চেষ্টা করত। তাছাড়া, কুমারী মেয়েরা উর্বরশক্তি এবং প্রজনন-ক্ষমতার অধিকারিণী হিসাবে আদিম সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাই প্রতিটি শস্ত্রোৎসবের সঙ্গে কোন না কোন প্রকাবে কুমারী কন্যাদের একটা নিগুঢ় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

জাওয়া অনুষ্ঠানে যে সন্তান-কামনা ও লুক্কায়িত আছে, তা পূজার উপকরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। জাওয়া আসলে করম ব্রতেরই অঙ্গবিশেষ। করম পূজার সময় গৃহাঙ্গনে, দুটি পাশাপাশি বৃত্তাকার আল্লাব মধ্যে গর্ত খুঁড়ে, কোথাও বা মাটি খুঁড়ে সেই মাটি দিয়ে আয়তাকার পুষ্করিণী তৈরী করে তার দু'পাড়ে, দু'টি করম ডাল পুঁতে দুটোকে একটি সূতো দিয়ে গাঁঠছড়ার মতো বেঁধে দেওয়া হয়। করম রাজা এবং কবম রাণীর প্রতীক এই দু'টি ডাল আসলে সূর্য এবং পৃথিবীরও প্রতীক; এই অনুষ্ঠানটি তাদের বিয়েব অনুষ্ঠান। কোথাও কোথাও করম পূজামণ্ডপে সাপ ছেঁবে দেবার রীতি আছে; কোথাও কোথাও জনশ্রুতি আছে, করম ডালের আডাল থেকে সাপ বেরিয়ে থাকে। বিয়ে এবং সাপ দুটোই সন্তান-প্রজননের প্রতীক। পূজার উপকরণের মধ্যেও সন্তান-কামনা বিরাজিত পাকে। প্রধান উপকরণগুলো হল: সঙ্ঘোবেলা শালপাতার 'খালা' বা দোনায় তুলে-আনা বালি, মাটির প্রদীপ, সলতে এবং তা জ্বালাবার জন্ম দি, স্নানান্তে শুদ্ধ অবস্থায় তোলা একপাত্র জল, দুধ, চালের গুঁড়ো পিটুলি এবং সিদ্ধুর, চিঁড়ে, গুড়, মিষ্টি। এবং সব উপকরণের সেরা উপকরণ একটি কাঁকুড় বা শশা, কুমারী ব্রতিনীবা কাঁকুড়টিকে 'বেটা' (ছেলে)-র প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। 'বেটা'কে শোয়াবার জন্ম কাঁকুড় পাতা এবং ঢাকা দেবার জন্ম হলুদছোপানো টুকরো কাপড়ও উপকরণের অন্তর্ভুক্ত।

করম ব্রত এবং জাওয়াতে শুধুমাত্র কুমারী মেয়েরাই অংশগ্রহণ করতে পারে। বিবাহিতা মেয়েরা ব্রত উদ্‌ঘাপনে, জাওয়া রাখায় এবং পূজায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কোথাও কোথাও বিবাহিতা মেয়েরা বিয়ের

প্রথম বছরে মাত্র অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে বিবাহিতারা নৃত্য-গীতে স্বচ্ছন্দে অংশ নিতে পারে।

করম নাচ এবং গান শ্রাবণ থেকেই শুরু হয়ে থাকে। কোথাও শ্রাবণ-সংক্রান্তি থেকে, বেশির ভাগ অঞ্চলে পয়লা ভাদ্র থেকে, জাওয়া গান এবং নাচের মহড়া শুরু হয়। এই সময় জাওয়া ডালি থাকে না। মেয়েরা আড়িনায় গান গেয়ে বৃত্তাকারে নৃত্য করে শুধু। ভাদ্রমাস পড়লেই মেয়েদের কণ্ঠে জাওয়া গান আপনা থেকে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে।

জাওয়া পরব শস্ত্রোৎসব হওয়া সত্ত্বেও কারো কারো মতে জাওয়া গানে শস্ত্র সম্পর্কে কোন সংকেত পাওয়া যায় না। তাঁদের মতে, জাওয়া গানে শস্ত্র বা ফসল সম্পর্কে কোন গান প্রচলিত নেই। মনে হয়, তাঁদের সংগ্রহে শস্ত্র-সম্পর্কিত গান না থাকায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ শস্ত্র-সম্পর্কিত বহু গানই জাওয়া গানের সম্পদ। বহু জাওয়া গান করম গান বা পঁতা নাচের গান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডে এক শ্রেণীর গান স্বচ্ছন্দে অথ শ্রেণীতে গৃহীত হয়ে থাকে, অথবা বলা ভালো, অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে। তবে এই ঝাঁকটা সাধারণতঃ পুরুষদের মধ্যেই থাকে। নারীসমাজ সব ব্যাপারেই রক্ষণশীল। তাই বর্তমানে যে-নাচ একান্তভাবে পুরুষের, সেই করম নাচের গান গ্রহণ করে জাওয়া গানের মধ্যে আত্মসাৎ করে নেওয়া হয়েছে, এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ছো নাচের গান-ও রমণীসমাজ কখনো জাওয়া গানের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে না। অথচ জাওয়া গানে প্রচলিত এমন বহু গান পঁতা নাচে এবং ছো নাচে ব্যবহার করতে দেখা যায়। যা হোক, জাওয়া গানে শস্ত্র-সম্পর্কিত গানের অভাব নেই। নিদর্শন হিসেবে দু'একটি গান আপাততঃ উদ্ধৃত করা যায় :

৩. বায়গণ বাড়ি রুঁধ দাদা রুঁধ চারিধার রে  
রাখি দিহ খিড়িকি দুয়ার ;
৪. উপর খেতে হাল দাদা নাম খেতে কামিন রে  
কন্ খেতে লাগাব দাদা কামিন কাজল ধান রে।

জাওয়া গানের রচনা সর্বাংশে নারীসমাজের। অথ গান যেমন করম গান, টুঙ্গ গান ইত্যাদিতে নারীপুরুষের সম্মিলিত রচনা থাকলেও জাওয়া গানে পুরুষের কোন অধিকার নেই, তাই রচনায় অংশগ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না। যেহেতু এ-গান একান্তভাবে নারীসমাজের তাই এ-গানে নারীসমাজের ছবি

সামগ্রিকভাবে ফুটে উঠেছে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধক্যের নারী-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, ঘর-গেরস্থালী, হিংসা-দ্বेष সব কিছু আশ্চর্য উজ্জলতায় জাওয়া গানে চিত্রিত হয়েছে। এমন সরাসরি তীক্ষ্ণ ঋজু লোকগীতি খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। রক্তমাংসের মাল্লুষের মতো এতো সজীব ভাবনা আর কোথায় পাওয়া যাবে? লোকগীতির অকৃত্রিমতা, সরলতা, প্রত্যক্ষতা এবং স্বাভাবিকতা গুণধর্মগুলো খুব কম লোকগীতিতেই এমন করে ফুটে উঠেছে। করম গান কিংবা টুঙ্গু গান, যা ঝাড়খণ্ডের সর্বাধিক প্রচারিত গান, তার মধ্যেও এমন সহজ সুন্দর নিরলংকার শোভন গান বিরল বললেই চলে। আসলে জাওয়া গান একান্তভাবে গৃহকোণেব নিপীড়িতা, নিগৃহীতা, অথচ বসুন্ধরার মতো আশ্চর্য সহনশীলা নারীসমাজের সুখ-দুঃখের কথা প্রতিলিপি; পরস্পরের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-বেদনা নিয়ে অক্ষুটস্বরে যে আলাপ তাই যেন এ গানে অবিকল ভাষা-রূপ পেয়েছে। ঝাড়খণ্ডে বিবাহবন্ধন যেন সম্মান-উৎপাদনের জন্মই সংঘটিত হয়ে থাকে। যৌনতাই যেন নরনারীব সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু। নিতান্ত ভাত-কাপড়ের লোভে কোন নারী স্বামীর ঘর করে না। তবু নারী যেন এখানে ক্রীতদাসী। তাব উপব যা খুশি ব্যবহার করা চলে, অকথ্য কথা বলা চলে, প্রহারে জর্জবিত্ত করা চলে, যে-কোন মুহূর্তে হাতেব নোয়া গুলে নিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো চলে। নারী এখানে বড়ো অসহায় জীবন যাপন করে। তবু সে সর্বসহা বসুমতীর মতোই বলতে পারে ‘মা বাপকে বলো দিবে বড় সুখে আছি।’ এমন বেদনাবিধুব সজল পংক্তি অথচ এমন সহজ উচ্চারণ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে।

জাওয়া গান তাই নারী সমাজের দৈনন্দিন জীবন-চর্চাব বেদনা-মধুর ভাষা। সুখের কথা চেয়ে দুঃখের কথাই যেন এ গানের মূল উপজীব্য। ‘অশ্রু যেন প্রবল অভিমানে জমে কঠিন বরফ হয়ে গেছে, অথচ তাব সজলতা তাকে তখনো বেষ্টন কবে আছে। স্বপ্নরগৃহ তো সুখের গৃহ নয়, যেন কারাগৃহ। বন্দিনী রমণীর দু’চোখে অগ্নিশিখা দপ্ দপ্ করে জলে ওঠে, আর সেই আগুনে শশুব শাশুড়ী ভাসুর স্বামী দেবর ননদের সঙ্গে যে সম্পর্ক মধুর হতে পারত, তা ভস্ম হয়ে যায়। তাই জাওয়া গানে স্বপ্নরগৃহের প্রতি তাকিলা, নিন্দা, কটাক্ষ মূর্ত হয়ে ওঠে। স্বপ্নর-গৃহে কেই-বা ভালো; তাই বলে সব গানেই যে এই বিতৃষ্ণা এবং তিক্ততা

প্রকাশ পেয়েছে, তা নয়। বহু গান শ্বশুরগৃহের বর্ণনাতেও মধুর। পিতৃ-গৃহের স্মৃতি বহুবর্ণ লোভনীয় পদার্থের মতো তাকে আকর্ষণ করে। পিত্রালয় তার কাছে স্বর্গের প্রতিচ্ছবি। তাই জাওয়া গানে পিত্রালয়ের স্মৃতিরসে জারিত গানগুলো বড়োই মধুর। পিতামাতা ভাই দাদা সবার ছবি যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

জীবনের কথা এমন আশ্চর্য বাণীরূপ পেয়েছে বলেই জাওয়া গান সরল এবং সজল। এ গান আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, ভাবায়, কাঁদায়, আনন্দ দেয়। কাব্যবস এখানে অত্যন্ত ঘন হয়ে দানা বেঁধেছে। লোকগীতি হিসেবে জাওয়া গান সত্যিই সম্পদবিশেষ। নাবী সমাজকে তার সামগ্রিক ভাবনার ক্ষেত্রে একযোগে কোথাও পেতে হলে জাওয়া গানের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

জাওয়ার জন্ম প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে জাওয়া দেওয়া হয়। তাবপর জাওয়াব চাবা যাতে ভালো হয়, তাব জন্ম বিবিধ আচার-নিয়মেব পালন কবতে হয়, কবম পরবের দিন উপবাস করতে হয়। এই কথা-গুলোকেই তাবা গানে বেঁধে চারাগাছ দ্রুত বেড়ে ওঠাব জন্ম আচাবমূলক মন্ত্র বা প্রার্থনা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে :

৫. কাঁসাই লদীর বালি আগে জাওয়া পাতিব ল  
আমদের জাওয়া উঠবে বাগে তাল গাছেব পারা ল।  
সুকজ উঠে খিন খিন আমার জাওয়া উঠে না  
তুমার লাগি দিব এক উপাস।  
সাত দিন জাওয়াব লাগি নিয়ম পালন করি গ  
তবু আমরা জাওয়া তুলিব।

জাওয়া দিলেই যে ভালো চারা হবে, এমন কোন কথা নেই। কারো ভালো চারা দেপেই হলুদের কথা মশন পড়ে। হলুদগোলা জল ছাড়া চারার বৃদ্ধি ঘটে না। তাই প্রশ্ন :

৬. জাওয়া যে দিলে তবুহা হল'দ কুথায় পালে গ  
তদের জাওয়া লহকে বাঢ়িল।

গানগুলোর ভিতর যে শশু-কামনার ঐঙ্গ্জালিক লক্ষ্য নিহিত আছে, বিচার করে দেখলেই তা বোঝা যায়। এই জাওয়া ডালা বা 'দৌড়া'কে প্রতিদিন' সন্ধ্যার সময় ঘরের ভিতর থেকে ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে আঙিনায়

নিয়ে আসা হয় এবং জাওয়া ডালাকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়। জাওয়া ডালা গৃহাঙ্গনে নিয়ে আসবার সময় গাওয়া হয়—

১. আওসিনি যাওসিনি দৌড়া ল  
দৌড়ার ভিতরে মাঝ্যান বেহলা ল।
৮. ডহর ডহর ডহর দাদা ডহর কত ধুরে,  
তুলা কানা রতনপুর দেশ কত ধুরে।
৯. এক পইলা সুরঙ'জা বুনলম গটা গড়া,  
পাতে ত শিগির বিগির ফলে বেহলা।

এই গানগুলোকে আমরা জাওয়া গীতের ডহরিয়া গান ( ডহর=পথ ) বলতে পাবি। জাওয়ার ডালি ঘর থেকে আঙিনায় এবং আঙিনা থেকে ঘরে নিয়ে যাবার সময়ই এগানগুলো গাওয়া হয়ে থাকে। এগুলো পুরোপুরি আচারধর্মী গান। প্রতিটি শব্দ অপরিবর্তনীয় থাকা উচিত ছিল, কিন্তু যৌথসংগীতের ধর্মই হল তা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে; লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে তা কখনো উন্নতি কখনো বা অবনতি লাভ করে থাকে। এখানে প্রথম গানটিতে যে অবনতি ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; অবনতি ঘটলেও যে আচারধর্মী গান সমাজ বর্জন করে না এটি তার নিদর্শন। বলা বাহুল্য, এগানগুলো কুমালি থেকে ঝাড়পুঞ্জী উপভাষাতে রূপান্তরিত হবার পথে বিপর্যয় ঘটেছে।

আঙিনায় জাওয়া নৃত্য-গীতের প্রারম্ভে যে গানটি ক্রটিগোচর হয়, তা'ও অনেকটা আচারধর্মী। এ গানটিতেও কৃষির প্রসঙ্গ আছে পাহাড়ে-প্রান্তরে কর্মরত মুনিসের ( জনমজুর ) উল্লেখ :

১০. অতি অতি যাও কিয়া কিয়া যাও  
যাও ল মা এক পাঁতা সর পাঁতা হর'ণা রাঁডা।  
চরচরি গেলা রে হরি রাবু রাবু, সুরো রোজি গেলা,  
সরবরতে হ'ট গেলা গজলা ঘটির পানী।  
পাহাড়ে আছে সাত মুনিস  
সাত মুনিসকে বাবা সাত ঘটি জল।  
ছ বহ রাণী এক বহ কানী  
কানীকে দিওল বাবা গয়লা ভরি পানী।

কারো কারো মতে জাওয়া পরব শশ্রোংসব হলেও জাওয়া গীতে শশ্রুর

কোন প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায় না। 'জাওয়া গানের মধ্য দিয়া কোন শস্ত্রের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।'<sup>৩</sup> 'শস্ত্রের সম্বন্ধ কামনার গুচ আবেদনই এই গানের উৎস কি না নিতুর্ভূলে নির্ণয় করা কঠিন।'<sup>৪</sup> তাই আমরা কৃষি বা শস্ত্রসম্পর্কিত বয়েকটি গান দিয়েই জাওয়া গীতের আলোচনার সূত্রপাত করব।

১১. কদ বাড়িতে কদ বাড়িতে সাটনা চল্যে যায় গ  
পণ্ডিত ঘরের মাঝলী বহু বাস্তাম নিয়ে যায়।  
মাথায় ত মুড়িঠেকা কাঁখে গাগরা গ  
কামিনবা ত খুজে বালিগুড়।  
মা' চলা তলের ঘাঁস গিলি করে লহলহ গ  
পণ্ডিত ঘরের মাঝলী বহু বাস্তাম নিয়ে যায়।  
মাথায় বাস্তাম বাটি কাঁখে গাগরা গ  
মুঁনিসবা ত খুজে মাছেব ভেকা।

গানটিতে কদ শস্ত্রের কথা আছে।

নিম্নোক্ত গানটিতে বৃষ্টিব অভাবে কসলের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বুক-ফাটা চাপা আর্তনাদের আভাস পাওয়া যায়।

১২. পাঁচ পঞ্চম মাসে জল হল্যে নাই শরাবনে  
হালের গরু পালে চর্যে থায়।  
খার বঠে হিড় চাস তাব বা কিছু আশ-বাস  
বাইদ খান চাষার অ গ পরাণ উড়ে যায়।

কিন্তু জমিতে যদি ভালো ফসল হয়, তাহলে কৃষক গৃহিনীর আনন্দের অন্ত থাকে না। চুল আঁচড়ে খোঁপা বেঁধে সিঁদুর পরে মনের সূখে পাড়া বেড়াতে বার হয় :

১৩. খান কা'টলম হালা হালা মাথা বাঁধলম ডালা গ  
এক খাড়ি বুঁরা সিঁদুর পর্যে বাইরাব পাড়া।

খানের অতিরিক্ত অগ্ন্যাগ্ন চাষ-বাসের আভাসও পাওয়া যায় :

১৪. আলতি রুইলম সারি সারি কলা রুইলম মাঝারি।  
বাছে বাছে কলা কা'টবে কা'ল যাব খুঁশুর বাড়ি।

৩ বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য়, পৃ ১২২

৪ ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান, পৃ ১৮

‘বায়গণ বাড়ি রুঁধ দাদা রুঁধ চারিধার,’ ‘বাড়ি নাময় স’রষা বুঁলম স’রষা  
বালমল করে,’ ইত্যাদি পংক্তিগুলোতেও চাষের প্রসঙ্গই আছে।

জাওয়া গীতে সাধারণতঃ নারীর বিবাহিত জীবনের কথাই প্রাধান্য পেয়ে  
পাকে। তবু এরই মধ্যে কখনো কখনো কোন গানে ছেলেবেলার স্মৃতি-  
বামস্তন আছে, অতীতের সেই আনন্দময় দিনগুলোর জন্তু দীর্ঘশ্বাস আছে।

১৫. বনি চলে খিচিব বিচিব জয়ী চলে খাতা গ  
কবে পড়ল ভাদর মাস।  
ভাদর মাসে গাদর জস্থা’র লাল টুপায় খাব গ  
আর কি ছালা জনম পাব।  
বনি চলে খিচির বিচির জয়ী চলে খাতা গ  
কবে পড়ল ভাদর মাস।  
ভাদর মাসে গাদর জস্থা’র আশিন মাসে খই গ  
কার্তিকে জস্থা’ব লেট তায় চেঁকা দই।

ভাই বোনের অশ্রুবদ্ধ ছবি জাওয়া গীতের অগুতম বিশিষ্ট বিষয়বস্তু। বলা  
যতে পারে, এ-গানের এইটাই মধুবতম বিষয়। ভাই-বোনের গভীর  
ভালোবাসার কথা, দাদার প্রতি বোনের অসীম শ্রদ্ধা এবং আশ্রুগতা,  
দাদার ওপব অটুট বিশ্বাস সমস্তই এ-গানে নিখুঁত তুলির টানে চিত্রিত  
হয়েছে। একই মাতার গর্ভজাত দুই সন্তান তারা। অথচ বিধাতা পুরুষেব  
একি নিষ্ঠুরতা, দু’জনের বিদিলিপির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। বোন ভাই  
শান্তিমাণে দাদার কাছে তার অবুঝ হৃদয়ের অভিযোগ তুলে দবে :

১৬. এক মায়ের এক বাপের ভাই-অ বহিন গ  
টঁঘরি টঁঘরি খায় দুধ।  
তরই খাওয়ান ভাই রে দহি দুধ ভাত বে  
আমারই খাওয়ান পাখাল ভাত।  
তরই জনম ভাই রে বাবু দরশন রে  
আমারই জনম পরের ঘর।  
আমি কি লিখোছি বহিন বিধাতা লিখোছে রে  
বিধাতা লিখোছে পরের ঘর।  
পরেরই ঘরে বহিন খাট-লুটি খাও রে  
রাখি দিহ বাপের ভায়ের নাম।



বড় নদী অর্থাৎ সুবর্ণরেখার ওপারে দূরে বোনের বিয়ে দেবার জন্ত বোন মর্মস্পর্শী ভাষায় তার অভিযোগ-অনুযোগ নিবেদন করে, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার এতো দিনের হাজারো স্মৃতিভরা বাড়ি তার কাছে বহু দূরে সরে যায়। তাই দাদাকে বলে :

১৭.           বেহা যে দিলি ভাই রে বড় লদীর পারে রে  
                  আনা লেগা কে করিবে আর।  
                  বাপ যদি মরে মায়ের দিশা হারায় রে  
                  আনা লেগা কে করিবে আর।  
                  ভাই যদি আনে লেগে মোর ভা'জ থুতুনা ফুলায় বে।  
                  ফুলাও ফুলাও ফুলাও ভা'জ নাই যাব তব গৃহবাসে গ  
                  মোর ঘরে আছে কাঁচা জল।

১৮.           শশুরবাড়ি যাবার বেলা দেওয়া কলম পাড়বি পগার গ  
                  সেহ পগার গাছ হইল।  
                  গাছ হইল পগার ফুল ফুটিল গ  
                  তবু দাদা আ'নতে না গেল।  
                  আ'নতে যে গেলি দাদা মাগ মাসের মুড়ায় বে  
                  ছ দিনের কড়ার দিয়ে ছমাসে গেলি।

দাদা তার কথা রাখে নি ; ছ'দিনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার কথা কিন্তু ছ'মাস বাদে একেবারে মাঘ মাসের শেষে বোনকে আনবার জন্ত তার শশুর বাড়িতে গেছে। দাদাও কি বোনের কথা ভোলে ? তারও মনে আছে, শশুর বাড়িতে তার বোন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে, ঠিক যেমন কচি বাঁশ বেড়ে ওঠে, তেমনিভাবে। গানটিতে বোনের প্রতি অবহেলার জন্ত দাদার মনে দুঃখ এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে, স্নেহরসও এখানে প্রবল।

১৯.           বাঁশ ঝাড়ে উঠল লহ লহ বাঁশ গ  
                  শশুর ঘরে লহরয়ে বহিনী আমার।  
                  কেসি করি আনবে লহলহ বাঁশ গ  
                  কেসি করি আনবে বহিনী আমার।  
                  গাড়ি জুড়ি আনব লহলহ বাঁশ গ  
                  পিঠা হাঁড়ি দিয়ে আনব বহিনী আমার।  
                  কাঁহা আমি রাখব লহলহ বাঁশ গ

কাঁহা আমি রাখব বহিনী আমার ।

ছাঁচা কলে রাখব লহলহ বাঁশ গ / মাঝ্যাধরে রাখব বহিনী আমার ।

কিয়া কিয়া খাওয়াব লহলহ বাঁশ গ / কিয়া কিয়া খাওয়াব বহিনী আমার ।

ছাঁচার পানী খাওয়াব লহলহ বাঁশ গ / দহিছুধা খাওয়াব বহিনী আমার ।

২০. আশুয় আশুয় তিত্তির মেজুর রে / তাহার পেছু সহোদর ভাই ।

আশুয় আশুয় ভার ভারতী তাহার পেছু ডালা রে

ডালার ভিতর আছে সাদা লুঁ'গা ।

শাউড়ী লিল আ'ড় পা'ড় আম্কে দিল সাদা রে

আঁচলে ত নাই দিল লেখা ।

করম ডালা আসলে তত্তের ডালা । করম ডালার ভেতরে থাকে কাপড়, কাঁকুড়, কাঁকুড় পাতা, হলুদ মাথানো চাল, অডহব, মাষকলাই, তিসি, ছোলা ইত্যাদি । ভার বা বাঁকে করে চিঁড়ে মুড়কি এবং পিঠে-সন্দেশ পৌঁছানো হয় । ভালো কাপড়চোপড় শাউড়ী নিয়ে নেয়, এব জন্ম কিশোরী বধুর মনে ক্ষোভ জমে ।

২১. যন বনে যন বনে চিমটি না চলে রে/সেহ বনে দাদা আলায় লে'গতে বে ।

আস দাদা বস দাদা মাচিলার উপরে রে

কহ ভাই দুখের সুখের কথা রে ।

কিয়া কহব বহিন দুখের সুখের কথা রে / ভা'জ মরল তিনমাস রে ।

বোন দাদার খাবারের আয়োজন করে । কিন্তু দাদা বোনের বাড়িতে মহা সুখে ভূরিভোজে যোগ দিতে পারে না । তখনো বোনকে চরম দুঃখের সংবাদটি দিতে বাকি :

লেহ দাদা পানী লেহ, লেহ দাদা পিঁতা রে/খাখে লেহ দহি দুধ ভাত রে ।

নেহি খাওয়াব বহিন দহি দুধ ভাত রে / মা-অ মরল ছয়মাস ।

মা-অ মরল দাদা খবর-অ না দিলি রে

আমি হলি রে দাদা জনমের টুঅর রে ।

দাদাকে তাই সে সরাসরিই বলে ফেলে, মা নেই, এবার আমি সারা জীবনের জন্ম অনাখিনী হলাম । এ-গানটি সত্যিই হৃদয়স্পর্শী এবং ঝাড়খণ্ডের সমাজজীবনের একটি বেদনা-বিধুর দিককে আলোকিত করে তুলেছে ।

বোনকে নিতে-আসা দাদার মুখে মায়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনে মুহূর্তের মধ্যে বোনের দু'চোখ থেকে আলো নিভে গিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই ।

দাদা তো তার কাছে দাদাই ; শিশুকাল থেকে স্নেহ দিয়ে আগলে রেখেছে ;  
অভায়ে-অভিযোগে স্মৃতে-দুঃখে দাদা ছিল তার বন্ধু । তাই দাদা এবং স্বামীর  
ক্ষেত্রে আচার-ব্যবহারে সে তারতম্য না দেখিয়ে পারে না ।

২২ দাদাকে খাতে দিব দহি ছুধ ভাত গ  
সঁয়াকে খাতে দিব খেড়ী গুঁদলীর ভাত ।  
দাদাকে শুতে দিব লাল পালংখ গ  
সঁয়াকে শুতে দিব গুঁদলু পুয়াল ।  
দাদা মোর আনি দেয় ত গাছি গাছি শাঁথা গ  
সঁয়া মোর আনি দেয় ত লেড়পী সতীন !  
ভাঙি-চুরি যাবে ত দুই হাতের শাঁথা গ  
জনম যুগ রহি ষায় ত লেড়পী সতীন ।

সপত্নীর কথা নারী-সমাজের কাহিনী, গান ইত্যাদিতে একটি বিশিষ্ট স্থান  
পেয়ে এসেছে । সপত্নী-বিচ্ছেদের জালাযন্ত্রণাভরা অভিজ্ঞতা যে-নারীর জীবনে  
ধাকে, সেই জানে সতীন বস্তুটি কি । বধু-জীবনে এবে চেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা  
আর কিছু হতে পারে না ।

২৩ ডুডুরি কে ধারে ধারে এক তাঁতির ঘর গ  
দিহ তাঁতি অসার-বিসার শাড়ি ।  
পাইড়ে লেখিবে তাঁতি চাঁদ সুরজ গ  
আঁচলে লেখিবে তাঁতি জডা সতীন ।  
পাইড় দেখে হাঁসব আঁচল দেখে কাঁদব  
তখন শাসুর নয়ন বহে লর ।

জাগ্রা গীত একান্তভাবে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সংসারের ছবি । দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার  
ওপর বিন্দুমাত্র রং চড়ানো হয়নি এ-গানে । বধুর চতুর্পার্শ্বে শশুয়ালয়ের  
যেসব আত্মীয়স্বজন রয়েছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক, সংঘর্ষ তার জীবনে প্রতি  
দিন নূতনতর অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে । তার সে অভিজ্ঞতা সাধারণতঃ যন্ত্রণার  
রক্তিম বর্ণচ্ছটায় বিষণ্ণ, বিধুর ।

স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল নয় । ঝাড়খণ্ডের নারীর জীবন ক্রীতদাসীর  
জীবন বললেও চলে । উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে লাঞ্ছনাগঞ্জনা, গালাগালি  
এবং প্রহার । বধু বুঝেছে তার উচিত অহুচিত সব কথার একটাই পুরস্কার :  
প্রহার ।

২৪ বালি ছাতুর তরকারি বাস্তাম দিতে যাব ল/খালভরাদের হাল কত ধুরে ।  
খালভরাকে খাতে দিলে চুলুহাশালে বসে ল  
উচিত কথা ব'লতে গেলে পয়না নিয়ে উঠে ।

জাওয়া গানে শাশুড়ী চরিত্রটিকে অত্যন্ত নীচমনা, স্বার্থপর এবং বধুপীড়ক রূপে দেখতে পাওয়া যায়—

২৫ শাসু কাদেশে বাবা ঢাকল ঢাকল পাত গ/শাসুয় বাঁটে মুঠা খানেক ভাত ।  
বাঁট বাঁট বাঁট শাসু আপন কা ভাত গ/নহর গেলে পাব দুধ ভাত ।

বধু ভাবে শাশুড়ীকে যদি বাঘে পেল, তাহলে সব ল্যাঠা চুকে যেত :  
বনে যে গেলে শাসু বাঘে নাহি খালা গ/বাঘে খালে হতে আউদান ।

খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই শাশুড়ী বধু-নিগ্রহ করে থাকে :

শাউড়ী খায় ডা'ল ভাত শাউড়ী খায় ডা'ল ভাত

হামে খাই তিতা লাউ রে করলা ।

পোশাকআশাকেও শাশুড়ীর জন্ম ভাল শাড়ি, বধুর জন্ম হেঁড়া কঞ্চল :

শাস পিঁধে লীল শাড়ি দিদি পিঁধে লাল শাড়ি

হামে গ পিঁধে হামে পিঁধে ছিঁটল কঞ্চল ।

নৃত্য-গীতের আখড়ায় গিয়ে বধু নাচবে, তাব উপায় নেই । শাশুড়ীই জালায়  
তাই তাকে কপাট কোণেই নাচতে হয় :

শাস নাচে আখড়ায় দিদি নাচে অঁগনায়

হামে গ রই হামে রই টাটি কণায় ঠাড় ।

দাদা বোনকে তার স্বস্তুরালয় থেকে নিয়ে যেতে এসেছে । পিত্রালয়ে ফেরার জন্ম তার মন চঞ্চল । তাই সে দ্রুতহস্তে ঘরগেরস্থালির কাজ শেষ করল । রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে সবাইকে খাইয়েদাইয়ে এবারে সে বিদায়ের উদ্যোগ আয়োজন করে । ক্রমাগত স্বস্তুর, শাশুড়ী, ভাসুর, জেঠানী, ননদ দেওর সবাই কাছের সে বিদায়ের অন্তিমতি চাইতে গেল । সবাই জানাল তারা কেউ কিছু জানে না । স্বস্তুর বলল শাশুড়ীর কাছে যেতে, শাশুড়ী বলল ভাসুরের মত নিতে ইত্যাদি :

২৬ চা'রকুণ্ডা পথ'রটি শান-বাঁধা ঘাট গ / চারাকুনে উঠে মাগুর মাছ ।

জালে ধরব মাছ আঁচলে ভরব গ / ঝাল বাঁটনা দিয়ে লহকে রাঁধব ।

লহকে রাঁধব মাছ মহকে খাওব গ / হাত ধুয়ে স্বস্তুর মাচিলায় বসবে ।

মাচিলায় বসিয়ে স্বস্তুর তুমি বড়লক গ / দেহ স্বস্তুর আমারে বিদায় ।

আমি কি দিব বহু তুমারে বিদায় গ / বুঝ্যো লিহ আপন শাশুড়ী ।

মাচিলায় বসিয়ে শাসু তুমি বড় লক গ / দেহ শাসু আমারে বিদায় ।

আমি কি দিব বহু তুমারে বিদায় গ / বুঝ্যো লিহ আপন ভাণ্ডর ।

এমনভাবে গানের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে । একে-একে ভাণ্ডর জেঠানী ননদ দেওর একই কথা বলে এবং পরবর্তী জনের কাছে তাকে পাঠিয়ে দেয় । তার বিদায়ের ব্যাপারে তারা মতামত দেবার কেউ নয় । তবু বিভিন্ন গানে এই ধরনের পুনরাবৃত্তি দেখে অনুমান করা যেতে পারে, আদিম সমাজব্যবস্থায় বধূকে সবার কাছেই অনুমতি প্রার্থনা করতে হত । সবার কাছেই সে যেন নিতান্ত আঞ্জাবহ দাসীমাত্র ছিল । যাহোক, সর্বশেষে বধু তার স্বামীর কাছে গেল বিদায়ের অনুমতি চাইতে । অমনি তার স্বামী ক্রোধে ঝাঁঝিয়ে উঠে লাঠি হাতে প্রহাবের চমকি দিল :

মাচিলায় বসিয়ে সঁয়া তুমি বড় লক গ / দেহ সঁয়া আমাবে বিদায় ।

আন গ মজুরা ভাণ্ডো দিব ঠেঙ গিলা / ছাড়াই দিব মহবা কা আশ ।

তাব মনে হয় নারীজন্মটাই বৃথা, কেননা পবের ঘরে তাদের বুক পুড়ে যায়, অস্তুর কাঁদে বেদনায় :

২৭ ক'লকা ফুল ক'লকা ফুল ফুটে লালে লাল গ

ঝি ছানাব মিছা জন্ম কাঁদছে অস্তব ।

ঝাডথণ্ডের নারীসমাজেব একমাত্র বিধিলিপি হল ক্রীতদাসী'ব জীবন যাপন করা । লাঞ্জনা-গঞ্জনা, গালাগালি, প্রহাব, অঙ্গহানি—খণ্ডরবাড়ীর লোকের, বিশেষ করে স্বামী'ব, খেয়াল খুশি'ব ওপর নির্ভর করে । তবু ঝাডথণ্ডী নারী সর্বসহা ধরিত্রীর মতো সব কিছু নিঃশব্দে মুখ বুজে সহ্য করে, চোখের অশ্রুকে পাথর কবে বুক'বে বেদনাকে আড়ালে ঢেকে জীবনাতিপাত করে থাকে । নিচের গানটি এখানকা'ব সর্বসহা বধূর এমন এক অন্ধেষ ছবি ফুটিয়ে তুলেছে যা কচিং কদাচিং খণ্ড কোন লোকগীতিতে মেলে । প্রচণ্ড উৎপীড়ন অত্যাচারের মধ্যেও যে-নারী বলতে পারে 'মা-বাপকে বল্যো দিব বড় সূথে 'আছি', এমন নারী'ব দর্শন খণ্ড কোন দেশের লোক-সাহিত্যে পাওয়া যায় আমরা জানি না ; তবে এমন চরিত্র শুধু যে দুর্লভ তা নয়, বিরলও । অথচ এই 'বড় সূথে 'আছি' কথাটুকুর মধ্যে যে কি বুকভাঙা যন্ত্রণা, কতো অশ্রু কতো কান্না লুকিয়ে আছে, তা শুধুমাত্র তারাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, যাদের সঙ্গে তার আত্মার সম্পর্ক । বলা বাহুল্য, তার এই খবর শুনে মা-বাপ ভাই-এর চোখ

ছলছল, মন কেমন-কেমন করে উঠল। মা ভালো মানুষের মেয়ে, তাই কথাটা শুনে কেঁদেই ফেলল। শ্বশুরবাড়িতে প্রহারে অত্যাচারে অনাহারে উৎপীড়নে এতোই দুর্বল যে স্নানের ঘাটে যাওয়া-আসার পথে দম নেবার জগ্নু বসে পড়তে হয়। তবু যেখানে 'শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি' সেখানে লোকজনের মাঝে তার ভাইকে বুক-ভাঙা বেদনার কথা বলতে পারে না। সে শুধু বলে, 'মা বাপকে বলো দিবে ভাই বড় সুখে আছি রে।' এমন মর্মস্পর্শী অথচ গভীর অর্থবহ পঙক্তি অগুত্র দুর্লভ; এ-পঙক্তি আমাদের আবিষ্ট কবে, আনন্দে-বেদনায় এমন রমণীকে শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছে করে :

২৮ একদিনকার হল'দ বাঁটা তিনদিনকার বাসি গ

মা বাপকে বলো দিবে বড় সুখে আছি।

মা শু'নল বাপ শু'নল শু'নল সাধেব ভাই গ

মা বড় সুজাতের বিটি কাঁদতে লাগিল।

একদিনকার হল'দ বাঁটা তিনদিনকার বাসি গ

ববুনাকে নাহতে গেলে পথের মাঝে বসি।

মা-বাপকে বলো দিবে ভাই বড় সুখে আছি বে।

মা শু'নল বাপ শু'নল শু'নল সাধেব ভাই গ

আর শু'নল জন্মের সংগতি।

শ্বশুরবাড়ি থেকে বধু স্বচ্ছন্দ সাদর বিদায় পেয়েছে, এমন গান আমাদের সংগ্রহে নেই। আমবা ধরে নিতে পাবি, বধু চিরকালের মতো শ্বশুরালয়ে বন্দি হয়ে থাকেনি। দাদার সঙ্গে পিত্রালয়ে ষাবার সুধোগ সে পেয়েছে। কোন বধু হয়তো ফিরে গিয়ে তাব মাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে যপরীতি দেখা হয়েছে। পিত্রালয়ে সে নিজে আর বধু নয়, ভ্রাতৃজায়াব ননদ। কাজেই সেখানে সেও হয়তো 'কালভাঁড়কী ননদিনী'তে পরিণত হয়। যা হোক, 'ননদ-ভাজে দেখাদেখি' হয়, 'কার কেমন দশা' হয়তো দু'জনেই বুঝে দেখার চেষ্টা করে। সঘ্ন স্বামীগৃহ থেকে ফেরা ননদকে হয়তো-বা ভাজ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে : 'কি-অ যে কাঁদ ননদ শুকুরে শুকুরে গ।' ফু'পিয়ে-ফু'পিয়ে কাঁদতে নিষেধ করলেও কি উৎপীড়িত, লাক্ষিত মন প্রবোধ মানে! পিত্রালয়ে এসে সে শাস্তি পায়, সান্ত্বনা পায়, সন্দেহ নেই। খাওয়া দাওয়া, বেশ-বাসে পরিবর্তন আসে :

২৯ তেঁতুল পাতে ধান ঘাঁটলম পায়রা খদবদ করে গ

নহর গেলে তেল পালে খঁপা ঝলমল করে ।

কিন্তু সাজসজ্জায় যতোই উজ্জ্বলতা আশুক না কেন, ভালোমন্দ খাবারের সুযোগ পাক না কেন, স্বস্তুরবাড়ির গালাগালি সে কিছুতেই ভুলতে পারে না, প্রতি মুহূর্তে তা যেন তীক্ষ্ণমুখ সূচের মতো তার হৃদয়ে বিদ্ধ হতে থাকে :

৩০ শাগ তুললম লতাপতা মাছ ধ'রলম গঁতা গ

স্বস্তুর ঘরে গা'ল দি'ইছে হিয়ায় আছে গাঁথা ।

ননদ-ভাজের সম্পর্ক কোনদিনই মধুর হয় না । স্বস্তুরবালয়ে বধূজীবনে সে যেমন ননদের খোঁটা, কুংসা, পীডন ভোগ করেছে হয়তো পিত্রালয়ে সেও একই ধরনে ভাজদের খোঁটা, কুংসায় বিভ্রত করে তোলে । হয়তো বড়ভাজকে বলেই বসল,

৩১ হাত ভরি ভরি সুরু শাঁথা মুখ ভবি ভরি পান গ

বড় বহুর ঝাট্যান পাট্যান কাম ।

ঝাট্যান পাট্যান ধান বহু কাকে দিয়ে' আলি গ

পাছে বহু চিড়া কিনে' খালি ।

চিড়া কিনে' খালি বহু দই কুথায় পালি গ / তকে বহু দেয় তর ভাই ।

তীব্র এবং তীক্ষ্ণ খোঁটার উপস্থিতিটা সহজেই অনুভব করা যায় । দই চিঁড়ে ঝাড়খণ্ডের বিলাসের খাওয়াস্বস্ত । স্বস্তুরবালয়ে বধূব তা পাবার উপায় নেই । সে কিছু অপরাধ করুক বা না করুক খোঁটা, মিন্দা সহ্য করতেই হয় । গানের ভেতর দিয়ে ননদের খোঁটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে । প্রথমাংশে দেখা গেল, ঘবের ধানচাল গোপনে পাচাব করে খাবার জোগাড়ের প্রতি ইঙ্গিত এবং খোঁটার সাথে-সাথে আবেগ কিছু সন্দেহ আছে । পরবর্তী অংশে এর তীব্রতা ক্রমবর্দ্ধমান ।

হাত ভবি ভরি সুরু শাঁথা মুখ ভরি ভরি পান গ

বড় বহুর ঝাট্যান পাট্যান কাম ।

ঝাট্যান পাট্যান ধান বহু কাকে দিয়ে' আলি গ

পাছে বহু পান কিনে' খালি । / পান খাইলি বহু খয়ের কুথায় পালি গ

তকে বহু দেয় পাড়ার লকে ।

পাড়ার লোকে বিনা স্বার্থে বধূকে কোন কিছু দিতে পারে না ; অতএব এই ইঙ্গিতটুকু যথেষ্ট কটু, কুংসিত এবং বধুর চরিত্রহননের অপচেষ্টা—সহজেই বোঝা যায় ।

জাওয়া গীতে নারীর বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক, অসন্তোষ কিংবা

তার তিক্ত অভিজ্ঞতা, যন্ত্রণাবেদনা ইত্যাদি প্রধান অংশ দখল করে থাকলেও তার ঘর-গেরস্থালির টুকিটাকিও এর অন্তর্গত হয়ে আছে। ‘মাছ রাঁধোছি চাকা চাকা,’ ‘বালি ছাতুর তরকারি,’ ‘লাল লট্যা লীল লট্যা মেশাই রাঁধিব’ ‘ইচলা মাছের বোল,’ ‘ছাগল ঠেঙের পিঠা পড়া,’ ‘পস্তু বাঁটি ঘসর-ঘসর মুগ-কলাই-এর ডা’ল’ ‘আঁশ পাল্‌হা বাঁশ পাল্‌হা ছলকাই রাঁধব’ ‘পস্তু দিয়ে রাঁধব গৌতা মাছ,’ ‘ঝাল বাঁটনা দিয়ে লহকে রাঁধব/লহকে রাঁধিব মাছ মহকে খাওব,’ ‘ঝিঙা তুলি ডালি ডালি আরই ঝিঙার জালি/ফলুক বাছা রাঁধব তরকারি’ ইত্যাদি পঙ্ক্তিতে এবং বাক্যাংশে ঝাড়খণ্ডী রমণীর রন্ধনভাবনার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব ছবি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

জাওয়া গীতের বিষয়বস্তুতে তেমন কোন বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-গান একান্তভাবে নারীসমাজের হওয়ার ফলেই সম্ভবতঃ বিভিন্ন অল্পভবের বর্ণসমারোহ এই গীতে দেখা যায় না। সম্পূর্ণ ঘরগেরস্থালির কথাই এতে স্থান পেয়েছে। পারিবারিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-বেদনা জাওয়া গীতের আকাশকে কখনো আলোকিত কখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন কবে রেখেছে! শ্বশুর বাড়ির প্রসঙ্গে রমণী-মন যেমন কঠোর হয়েছে, তেমন পিতৃগৃহের কথায় কোমল হয়েছে। পিতৃগৃহের প্রসঙ্গে মা-বাপের চেয়ে ভাই বা দাদার প্রসঙ্গ অনেক বেশি উজ্জ্বল অন্তরঙ্গ ভাষায় গীতবদ্ধ হয়েছে। মূলতঃ ঘরোয়া বিষয়-বস্তুই এ-গীতের উপজীব্য হলেও স্বল্প রেখার টানে অন্য কয়েকটি বিষয়বস্তুও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ‘আ’খ বাড়ির ধারে ধারে কাহার ছালা কাঁদে গ / আস ছালা কলে লিব বড় দয়া লাগে’, গানটিতে বাৎসল্য রসের আমেজ আছে। জাওয়া গীত নারীসমাজের হলেও, আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এ-গানে বাৎসল্যরস-সমৃদ্ধ সন্তানপ্রসঙ্গ একেবারেই নেই।

জাওয়াগীতে প্রেমের প্রসঙ্গও সম্পূর্ণ অল্পপস্থিত। প্রেমের গান বলা যেতে পারে এমন গান সত্যিই বিরল। তবে বাগালদের জন্ম নারীমনের কোণে যে একটু স্থান থাকে, তা বিভিন্ন ঝাড়খণ্ডী লোকগীতিতেই প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও একটি গীতে প্রেমের সামান্য আভাস মেলে—

৩২ ষাটাবাধির কাড়াবাগাল দখিন দিগে খুলে গ  
হাতে লাঠি কাঁধে ছাতা চলল বাগালি।  
ষাটাবাধির কাড়াবাগাল দখিন দিগে খুলে গ  
হাতে লাঠি কাঁধে ছাতা টুইলা বাজাছে।



হাঁসিতে খেলিতে বাগাল লাগাল্য মহিনী গ / লাগি যায় ত জগমহিনী ।

আমরা জাওয়া গীতের আলোচনা একটি বিশেষ অল্পষ্টানের প্রসঙ্গ দিয়ে শেষ করব। করম পূজার দিন সারাদিনে যেমন ষোলবার নাচবার নিয়ম আছে, তেমনি পাশের গ্রামে গিয়ে জাওয়া নৃত্য-গীতের নিয়মও আছে। কোথাও কোথাও আবার কোন একটি মাঠে পাঁচসাতটি গ্রামের মেয়েরা জড়ে হয়ে নৃত্যগীতের আসর বসায়। ফলে রেধারেষি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। প্রতিপক্ষ দলকে ঘায়েল করবার জন্তু গানে-গানে গালাগালি, নিন্দা কুৎসা অব্যাহত ভাবে বর্ষিত হয়। জাওয়া শস্ত্রোৎসব। শস্ত্রের বৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের কামনায় একদা বিভিন্ন আদিম সমাজে গালাগালি, অঙ্গীলগান ও বাক্যালাপের রীতি প্রচলিত ছিল। এর ফলে শস্ত্রকে অপদেবতার হাত থেকে বাঁচানো যায় বলে লোকবিশ্বাস ছিল।

৩৩ পাথরাঘাটির ছানাগিলাব গঁছা গঁছা চু'ল গ  
 মচড়ায়ে বঁধোছে মাথা রেশম গেঁদা ফুল ।  
 মালকুঁড়ির ছানাগিলার বিচু রিচু চু'ল গ  
 মচড়ায়ে বঁধোছে মাথা যেমন ফুচির ডিম ।  
 পাথরাঘাটির ছানাগিলার চু'ল গঁছা গঁছা গ  
 চুয়াচন্দনে ঘঁষা মাথা ।  
 মালকুঁড়ির ছানাগিলার চু'ল কেনে জঁটা গ  
 টিলে শুঙনে করে বাঁসা ।

॥ তিন ॥

### জাঁত গান

জাঁত গান বলতে ঝাড়খণ্ডে মনসামঙ্গলের গানকেই সাধারণতঃ বোঝানো হয়ে থাকে। মনসামঙ্গলের গানকে 'মনসা-জাঁত,' এমন-কি শুধু 'জাঁত'-ও বলতে শোনা যায় ('জাত' শব্দটিও কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে)। জাঁত বা জাত শব্দটির ব্যুৎপত্তি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। উৎপন্ন অর্থে যে জাত শব্দ তাব সঙ্গে জাঁত বা জাত শব্দের কোন অর্থসামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

মনসা পূজা উপলক্ষ্যে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল পুঁথি থেকে গান করা হয়। ঢাকী (ডব্বরু জাতীয় যন্ত্র) বাজিয়ে একটি বিশিষ্ট সুরে এই গান গাওয়া হয়। একটি ধ্রুবপদ বা ধুয়ো কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে সুর এবং তালমান ঠিক করা হয়। এই ধ্রুবপদটিই জাঁত নামে পরিচিত। জাঁত গান সব সময় মূল কথাবস্তু অর্থাৎ মনসা চাঁদ সদাগর বেহলা-লখিন্দর সম্পর্কিত হবেই এমন কোন কথা নেই। বহু ক্ষেত্রেই মনসামঙ্গলের কাহিনীর ধ্রুবপদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই জাঁত গানগুলো কখনো কাহিনী-সম্পর্কিত, কখনো রাধাকৃষ্ণ-সম্পর্কিত, কখনো বা লৌকিক জীবন-সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এই জাঁতগুলো খুবই স্বল্পায়তনেব হয়ে থাকে, অনেকটা কবম নাচের গানের মতো; আয়তনে চরিত্রে মেজাজে খুব একটা পার্থক্য ধরা পড়ে না। কখনো কখনো করম নাচের গানও সরাসরি মনসামঙ্গলের জাঁত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রধানতঃ লৌকিক জীবন-সম্পর্কিত জাঁত গান গুলোরই আলোচনা করব।

প্রথমে দু'একটি মনসামঙ্গলের কাহিনী-সম্পর্কিত জাঁত গান উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

১. তাই গুড় গুড় বাজনা বাজে কন গাঁয়ের বর।

চাঁদ সদাগরের বেটা ভালাই লখিন্দর ॥

২. তাই গুড় গুড় বাজনা বাজে নিছনি নগরে।

চাঁদ বাগ্গার বেটার বেহা সায় বাগ্গার ঘরে ॥

ওপরের গানগুলোতে বেহলা-লখিন্দরের বিয়ের প্রসঙ্গ রয়েছে। 'মনসার ডরে / সাঁতালি পর্বতে বাগ্গা লহার বাসর গড়ে।' কিন্তু তবু শেষ রক্ষা হয় না; কাল নাগিনীর দংশনে বিযজ্জর লখিন্দর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বেহলার সক্রম কারা আর দীর্ঘখাস লোহার বাসর ঘরের চার দেয়াল ছাপিয়ে সাঁতালি পর্বতের সীমানা ছাড়িয়ে ঝাড়খণ্ডের জন-মানসেও তা ছড়িয়ে পড়ে আর এখানকার মানুষগুলোকেও বেহলার কারার দোসর করে তোলে।

৩. আমার প্রাণনাথে ঘেরিল কালিয়ার গরলে।

আমার এ রূপ যৌবন গেল বিফলে ॥

৪. আমি কার কাছেতে যায়ে ডাঁচাব।

আমার সাধের পরাণপতি কেমনে পাব ॥

স্বামী নেই, কাছে দাঁড়াবার কোন লোক নেই। বেহলার মনে তাই শোকোচ্ছ্বাসিত প্রশ্ন : আমার সাধের পরাণপতি কেমনে পাব। তার এই বেচনা দরদী হৃদয়ে অনাবৃত অকুণ্ঠ সহানুভূতির সঞ্চার করে :

৫. বেহলা ভাঁসে রে ভাঁসে রে অগম দরিয়ায়

অভাগিনী বেহলার নাই রে গাছের তলা ॥

এই সব গানে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ থাকলেও বৈষ্ণব পদাবলীর নায়ক-নায়িকার সঙ্গে খুব বেশি মিল নেই, বরং লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকা হিসেবেই এদের পরিচয় সবিশেষ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

৬. কন বনে বাজিল বাঁশি শুন গ মরম সই।

বিনা সূতায় হার গাঁথোছি কালা আলায় কই ॥

৭. শামের বাঁশি বাজে ল কাল্যার বাঁশি বাজে ল কদমতলায়

চল সজ্জী জলকে ঘাব কলসী কাঁথে আয় ॥

৮. সখি, অই বনে কে বাজায় বাঁশি।

আয় গ সখি চল গ তরা দেখো আসি মনচরা

বরং কুল রয় রবে কুল যায় যাবে দেখো আসি ॥

এ-প্রেম-ভাবনা নামে রাধার, আসলে কোন লৌকিক নায়িকার। বংশীধ্বনি ঝাড়খণ্ডের লৌকিক প্রেমগীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বংশীধ্বনি গৃহকোণে আবদ্ধ কুলনারীদের বুকে গভীর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, দুর্বার বিজ্রোহিনীর মতোই তখন তারা বলতে পারে : ‘বরং কুল রয় রবে কুল যায় যাবে দেখো আসি।’ প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে তাদের মন কেমন-কেমন করে :

৯. কাক ডাকে ককিলা ডাকে আর ডাকে কে রে

ককিলার সুরে, মন আমার কেমন কেমন করে ॥

জঁাত গানের মধ্যে লোকজীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখের রুখাও রূপ লাভ করেছে। মাঝে মাঝে এক একটি গান আমাদের উপভোগে কৌতুক রসের সঞ্চার করে। লোকজীবনের অন্নচিন্তা থেকে শুরু করে প্রেম-ভাবনা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই জঁাত গানের বিষয়বস্তু হতে পারে। মনসামঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে এই সব জঁাত গানের কোনই সামঞ্জস্য থাকে না, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। মনসামঙ্গলের ধ্রুবপদ হিসেবে এই সব গান গাওয়া হয়।

১০. বনে পাঁকল পিয়াল।

যত ছানার গুণগোলে পালাল্য শিয়াল ॥

১১. মাসী দঁড়বি গ দঁড়বি গ কাওয়ায় জন্হা'র থাছে ।  
বাডি বাটে থে'দতে গেলে পি'দাড় বাটে যাছে ॥
১২. মশা কামড়িল কামড়িল খরৎশা গায় ।  
যত ছেল্যা মিলে তারা তাল কুড়াতে যায় ॥
১৩. ঘরে ভাত নাই ভাত নাই শাগ তু'লতে গেছে ।  
বাডি-এ আছে সনলা মুড়া গাঁড়র লাগো গেছে ॥
১৪. বেহাই যাছ হে বাস্তাম খায়ে যাও ।  
কেদকুঁটা মরিচ শু'ডা গাঁইঠে বাধো লাও ॥
১৫. জামাই ভাত খায়ে যাও, জামাই ভাত খায়ে যাও, লইতন তরকারি ।  
শিল ভাজা নড়াপুড়া জাঁতার চড়চড়ি ॥

॥ চার ॥

## ভাছ গান

ভাছপূজা পূর্ব মানভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম জেলার অংশ বিশেষ এবং মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার উত্তর সীমান্ত জুড়ে সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রাচীন ঝাড়খণ্ডের বেশ কিছু অংশ এই বিশিষ্ট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হলেও ভাছ-উৎসব কোন ক্রমেই ঝাড়খণ্ডের উৎসব নয়। নিম্নবর্ণের বাগদী-বাউরী-ডোমের মধ্যে ভাছপূজার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও এ-পূজায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ভাছগানের ভাষায় ভাষাতত্ত্বের বিচারে ঝাড়গণ্ডী উপভাষার প্রভাব একেবারেই লক্ষ্য করা যায় না। অন্ততঃ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুধীর কুমার করণ, সুভাস বন্দ্যোপাধ্যায় আদির সংগ্রহ থেকে আমরা এ-ধরনের নিদর্শন খুঁজে পাই নি। ভাছগান শুধু যে ঝাড়খণ্ডের লোকসংগীত হিসেবেই গ্রহণযোগ্য নয়, ভাছগান ঝাড়খণ্ডী লোকভাষাতেও রচিত নয়, তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি ডঃ ধীরেন্দ্র নাথ সাহা এই গানের জন্ম তাঁর গ্রন্থ 'ঝাড়গণ্ডী লোকভাষার গান'-এ সামান্যতম স্থানও দেন নি।

ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট আদিবাসী-অর্ধআদিবাসী ঝাড়খণ্ডী উপভাষী লোকে-

দের মধ্যে প্রধানতম হল মাহাত এবং ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা। এর পরই কামার কুমোর বাগাল কুইরী মাল খাড়িয়া লোধা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ঝাড়খণ্ডের এই সব আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ভাদুপূজার প্রচলন নেই। তবু যেহেতু এই ভাদু-উৎসব ঝাড়খণ্ডের মাটিতে অহুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাই ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য পরিক্রমায় ভাদু গানের আলোচনা স্বল্প পরিসরে হলেও অপরিহার্য।

ভাদু উৎসব ভাদ্রমাসে অহুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভাদু নামের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, ভাদ্রমাসের উৎসব বলে এর নাম ভাদু; আবার কেউ-বা বলেন, পঞ্চকোট রাজকণ্ঠা ভদ্রেশ্বরী বা ভাদুরানীর নাম অনুসারেই এর নাম ভাদু। আমাদের মনে হয় দ্বিতীয় মতটিই ঠিক। ঝাড়খণ্ডে মাসেব নামানুসাবে পূজা-উৎসবের নামকরণ করা হয় নি। তাছাড়া ভাদুপূজা খুব বেশি প্রাচীনতার দাবি করতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে রাজা নীলমণি সিংহদেব পঞ্চকোটের রাজা ছিলেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করেন এবং ইংরাজ সরকার কড়ক বন্দীও হন। তাঁরই কণ্ঠা অপরূপা সুন্দরী ভদ্রেশ্বরীর অনুঢ়া অবস্থায় অকালমৃত্যুকে কেন্দ্র করে টুঙ্গু পূজার অনুকরণে ভাদুপূজার সূত্রপাত করা হয়। তবু এই পূজা একটি বিশিষ্ট অঞ্চলে এবং কয়েকটি গোষ্ঠী ছাড়া বিশেষ প্রসার লাভ করে নি। অথচ ঝাড়খণ্ডের অগ্ণাণ লোক-উৎসব রোহিন, রজঃশলা, চিত্ত, গোমা, মনসা, করম, জাওয়া, বাঁধনা, টুঙ্গু, ভক্তা ( চৈত্র পরব ) সামগ্রিকভাবে সর্বত্র সাধারণ মানুষের প্রাণকে স্পর্শ করে থাকে। এই সব উৎসবই ঝাড়খণ্ডের সত্যিকার লোক উৎসব, আঞ্চলিক উৎসব বা জাতীয় উৎসব। আসলে ভাদুপূজার মধ্যে নায়ক-পূজার সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান। পর্বটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক পর্ব। তাই এটি একদিকে যেমন জন-উৎসব হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তা শশ্রোৎসব হিসেবেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি।

ডঃ আগুতোষ ভট্টাচার্য ভাদু উৎসবকে ‘আদিবাসীরই করম উৎসবেরই একটি হিন্দুসংস্করণমাত্র’ বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা তাঁর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি না। করম উৎসব আসলে বৃক্ষপূজা, করম উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শশ্রোৎসব। হিন্দুপ্রভাববশতঃ করম উৎসবই বঙ্গীয় সমাজে ভাদু উৎসবের রূপ নিয়েছে, ভাবা চলে না। করম উৎসবের মতো ভাদু

উৎসব বৃক্ষ-পূজার উৎসবও নয় কিংবা শশোৎসব-ও নয়। ভদ্রেণরী বা ভাদুরানীর নামানুসারেই মনে হয় এই উৎসবের দিনক্ষণ স্থির হয়েছে ভাদ্র-সংক্রান্তিতে এবং ঝাড়খণ্ডের সর্বাধিক প্রাণচঞ্চল জাতীয় উৎসব টুসুর অমুকরণে সারা ভাদ্রমাস জুড়ে কুমারী কন্যাদের ভাড়াগান গাওয়ার রীতিও প্রচলিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, টুসু গানের সুর এবং কথাও সরাসরি অপরিবর্তিতভাবে ভাড়াগানে গ্রহণ করা হয়েছে। ডঃ ভট্টাচার্য কিভাবে ভাড়াগানের সুরে টুসু গান গাওয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, আমরা তা অনুধাবন করতে পারি নি। ভাড়া যদি শশোৎসবই হত এবং ভদ্রেণরী-সম্পর্কিত কাহিনী যদি নিত্যন্তই কিংবদন্তী হত তাহলে তা সংকীর্ণ অঞ্চল এবং গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত না। জনজীবনকে সামগ্রিকভাবে যে-উৎসব স্পর্শ বা প্রভাবিত করতে পারে না, তা লোক-উৎসব হলেও প্রাচীন কোন শশোৎসব হতে পারে না। তার উৎস এবং আবির্ভাব তাই খুবই সম্প্রতিকালের হওয়াই সম্ভব। তবে বহিরাগত বঙ্গীয় হিন্দুসম্প্রদায় যদি করম জাওয়ার অমুকরণে ভাদ্রমাসের উৎসব হিসেবে ভাড়ুর প্রবর্তনা করে থাকে, তাহলে বলার কিছু থাকে না। অবশি সেদিক দিয়ে বিচার করলেও ভাড়াউৎসবের আবির্ভাব খুবই সম্প্রতিকালের হওয়াই স্বাভাবিক। করমের পর ইদের মতো ভাড়ু-বিসর্জনের দিন ছাতা পরব এ অঞ্চলে অমুষ্ঠিত হয় যা ইদেরই অমুকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। ছাতা পরব ভাড়ুর মতোই ধলভূম-ঝাড়গ্রামে অমুষ্ঠিত হয় না।

টুসু গান যেমন সারা পৌষমাস ধরে গাওয়া হয়ে থাকে এবং পৌষ সংক্রান্তিতে টুসুর বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে গীতোৎসবের সমাপ্তি ঘটে থাকে, ভাড়ুর ক্ষেত্রেও তেমনি সারা ভাদ্রমাস জুড়ে ভাড়ুপ্রতিমা সন্মুখে রেখে কুমারী কন্যারা গানে-গানে রাত্রির প্রথম প্রহরকে মুখর করে রাখে এবং ভাদ্রসংক্রান্তিতে ভাড়ুপ্রতিমার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এর-ও গীতোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে। এ-উৎসবের প্রধান অমুষণ হল সংগীত। পূজা-অর্চনা ভাড়ু উৎসবের অপরিহার্য অমুষণ নয়।

ভাড়ু গানের মধ্য দিয়ে নারীসমাজের নানাবিধ কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কারো কারো মতে, ভাড়ুগানে কুমারীজন্মের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাই রূপায়িত হয়ে থাকে। আরম্ভে হয়তো তাই ছিল, কিন্তু বর্তমানে ভাড়ুগানে সব প্রশ্নই স্থান লাভ করে থাকে। টুসু গানের মতো ভাড়ু গানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দেখা যায়।

তাই স্বাভাবিকভাবেই গানের মধ্য দিয়ে নিন্দা, কুৎসা রটনা, এমন কি অশ্লীল কেচ্ছাকাহিনীও প্রকাশ পেয়ে থাকে। দু'টি প্রতীকদ্বন্দ্বীদল যে একে অণ্ডের ভাঙুকে আক্রমণ করবে, নিন্দা করবে, কুৎসা রটাবে তাতে অবাধ হবার কিছু নেই, বরং টুঙ্গ ও ভাঙুগানের এটা একটা অনিবার্য এবং অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এ-ধরনের গানে অনেক সময়ই গ্রাম্যতা এসে যায়, যা পরিবেশ প্রতিবেশের কথা মনে রাখলে স্বাভাবিক বলেই মনে হবে :

১. ও পাড়াতে দেখে এলাম চিপসে ভাঙু গড়েছে।

নড়ে না চড়ে না ভাঙু সন্নিপাতে ধরেছে ॥

তদের ভাঙু অনামুখী লো, ভেবে দেখ মনে মনে।

তপড়াগালী চেপটাবুকী পান্ডাখাকী তার সনে ॥

আমার ভাঙুর স্বর্গশোভা লো, তোদেব পাতাল ভুবনে।

সত্য মিপ্যা দেখ না চেয়ে চোপ থাকিতে অন্ধ কেনে ॥

ভাদ্রমাসের প্রথম দিন থেকে কুমারী কন্যারা ভাদ্রপ্রতিমা সম্মুখে বেখে সংগীত-চর্চা শুরু করে। আগমনী গান ভাঙু গানে অপরিহার্য রূপে ঢুকে পড়েছে। বলাবাহুল্য, বাঙালীর উচ্চ সংস্কৃতির দুর্গাপূজার প্রাক্কালে যেমন আগমনী এবং আবাহনী গীত গাওয়া হয়ে থাকে, তেমনি গিবিকন্যা উমার পিত্রালয়ে ফেরার মতো ভাঙুর পিত্রালয়ে ফেরার কথাই যেন গানে-গানে ঘোষিত হয় :

আদরিণী ভাঙুরাণী এল আজি ধরকে।

২. ভাঙুব আগমনে, / কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে।

ভাঙু আজি ধরে এলো গো এলো গো শুভদিনে।

মোবা, সাজি ভক্তি ফুল তুলেছি যত সব সঙ্গিগণে ॥

মোরা, সারা রাত্তি করব পূজা গো ফুল দিব গো চরণে।

আনব সন্দেহ খালা খালা খাওয়াব ভাঙুধনে ॥

কাশীপুরের রাজকন্যা ভাঙু সোনার খাটে বসে রূপোর খাটে পা রেখে হীরে দিয়ে দাঁত মেজে থাকে :

৩. কাশীপুরের রাজার বিটি সোনার খাটে বসন।

রূপার খাটে চরণ দিয়া হীরায় দাঁত ঘঁষণ ॥

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজকন্যা ভাঙু আর কাশীপুরের রাজ-অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে থাকে না। সে ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে, দেশে-দেশান্তরে। রাজবাড়ি ছেড়ে সোজা গিয়ে হাজির হয় বাগদী বাড়িতে।

৪. কাশীপূবের বাজার বিটি বাগদী ঘরে কি কর ।

হাতের জালি কাঁখে লয়ে সুখ-সায়রে মাছ ধর ॥

মাছ ধবণে গেলে ভাছ ধানের গুছি ভাঙিও না ।

একটি গুছি ভাঙলে পরে পাঁচ সিকা জরিমানা ॥

ভাছ যেন কোথাও আবদ্ধ থাকে না । সে গ্রাম থেকে শহরে চলে যায় এক নিমেষে । তার বিয়েরই বা কি বিচিত্র আয়োজন ।

৫. বেডো বাঁধে বেডো বাঁধে বেডো বাঁধে কে তুমি ।

শেওড়া গাছে ডগ মেলেছে হবতকী তলায় আমি ॥

আমার ভাছুর বেডোয় বিহা পঞ্চকোট শ্বশুর ঘর ।

পুকুলিয়ায় বাজবাজনা আসনশোলে বাসরঘর ॥

বলাবাহুল্য, কিংবদন্তীর ভাছুরানীর অনুঢ়া অবস্থায় অকালমৃত্যু হয়েছিল । ভাছুরানী ছিল রাজাবানীর নয়নের মণি, প্রজাসাধারণের ভালোবাসার ধন । তাকে তারা আদরে ভালোবাসায় ধরে রাখতে চেয়েছিল :

৬. বেডা যাণ পদ্ম আনব বেনাই দিব সিংহাসন ।

তাব ভিতরে খেলা কবে রাজকুমারী ভাছুধন ॥

কিন্তু রাজকুমারী ভাছুধন সিংহাসনের মায়া কাটিয়ে ভালোবাসার বাঁধন ছিঁড়ে অজানা লোকে যাত্রা করল । শোকাক্ত প্রজাসাধারণ তাই ভাছুর স্মৃতি-পূজার আয়োজন করল । আর সেইস্মৃতি পূজার গানের মাধ্যমে অন্ততঃ তারা ভাছুরানীর বিয়ের প্রসঙ্গকে টেনে আনল । ভাছুগানে তাই বিয়ের প্রসঙ্গ একটি অপরিহার্য বিষয়বস্তু । বলা বাহুল্য, টুঙ্গু গানও এর ব্যতিক্রম নয় ।

অপরূপা রূপবতী ভাছুবানী । রমণীসৌন্দর্যের বুদ্ধির জগু হনুদের স্বর্ণ রঙের যোগসাজস প্রয়োজন । ভাছুর তার প্রয়োজন পড়ে না । তবু লোকের প্রশ্নের মুখে তাকে বলতেই হয়, শাশুড়ী ননদ হনুদ-মাথা পছন্দ করে না ।

৭. হনুদ বনে ছিলে ভাছু হনুদ কেনে মাথ না ।

শাশুড়ী ননদী বলে হনুদ মাথা সাজে না ॥

ভালোবাসার ধন ভাছুকে সাজাবার কতোই না কামনা-বাসনা গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে । ভাছু যেন ধরের মেয়ে ; পরের ধর করতে যাবে, সেখানে সে কি পরবে, কি থাকে ইত্যাদি চিন্তা মা-বাপের অস্থির করে তোলে । তাই মেয়ের সাধ মিটিয়ে নিজেদের সাধ্যমতো গহনা-পত্রে মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে শ্বশুরালয়ে পাঠায় বিচ্ছেদকাতর মা-বাপ :



৮. কি কি গয়না লিবি ভাছু বল না গো আমারে ।  
 পায়ে লিব নেপুর তোড়া সাজাবো গো বাহারে ॥  
 আর-কি কি গয়না লিবি ভাছু বল না গো আমারে ।  
 নাকে লিব নথের টানা সাজব গো বাহারে ॥  
 কি কি শাড়ি লিবি ভাছু বল না গো আমারে ।  
 কদমফুল্যা শাড়ি লিব শায়া লিব বাহারে ॥

এমনিভাবে ভাছুকে কেন্দ্র করে নিজেদের কামনা-বাসনার কথা গানে-গানে প্রকাশ করতে করতে ভাদ্রমাস ফুরিয়ে যায়। আসে সেই অমোঘ বিদায় বা বিসর্জনের দিনটি। মাসাবধি যে মুন্সয়ী প্রতিমাকে তাবা পূজা করে এসেছে, যার সম্মুখে নিজেদের হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার কথা গানে-গানে প্রকাশ করেছে, এবার সেই ভালোবাসার ধন ভাদুরানীকে বিদায় দেবার পালা। মাটির প্রতিমাও হৃদয়ে মোচড় দিয়ে বেদনার সৃষ্টি করতে পারে, এই মুহূর্তে তারা তা অহুভব করতে পারে। বুক-ভাঙা বেদনায় গান গাইতে-গাইতে প্রতিমাগুলো বয়ে নিয়ে তারা কোন পুষ্করিণী বা নদী-তীরে যায়। এ অনেকটা বিজয়ার বিসর্জনের মতো ব্যাপার, বেদনার পরিমাণও তাই কোন অংশে কম থাকে না। এতো কালের স্মৃতিবিজড়িতা ভাদুরানীকে বিসর্জন দিতে গিয়ে তাই সংগীত যেন আতঁহাহাকাতে পরিণত হয় :

৯. প্রাণে ধৈর্য ধরে / প্রাণের ভাছু বিদায় দিই কেমন করে ॥  
 সারা বছর কেঁদে-কেঁদে গো পেয়েছি বছর পরে ।  
 স্মৃথের হাট ডুবাই কেমনে বিপদেরি সাগরে ॥  
 স্মৃথের বাদী হয়ে সদা দুঃখ দেয় কঠিন অন্তরে ।  
 জুড়াইব দুঃখজ্বালা গো কাহার চাঁদবদন হেরে ॥

॥ পাঁচ ॥

## কাঠি নাচের গান

কাঠি নাচ বা কাঠি নাচের অল্পশীলন সাধারণতঃ করম পরব শেষ হবার পরই শুরু হয়ে থাকে। আখড়ায় প্রধানতঃ কিশোরবয়সী ছেলেদের এই নাচে সুশিক্ষিত করে তোলা হয়। তবে সর্বসাধারণ্যে সেজেগুজে নৃত্যাহুষ্ঠান শুরু হয় দুর্গাষষ্ঠী-দিন থেকে এবং বিজয়াদশমী পর্যন্ত চলে। এই দিনগুলোতে নৃত্যকারীরা নিজেদিগকে স্ত্রীলোকের বেশবাসে সজ্জিত করে থাকে। পরিধানে থাকে শাড়ি, যা মেয়েলি ঢঙে না পবে মালকৌঁচা করে পরা হয়ে থাকে। কখনো কখনো আবরণ দিয়ে মাথাটি ঢেকে চুলের অভাব লোকচক্ষু থেকে আড়াল করা হয়। সর্বশরীরে রমণীদের অলংকার শোভা পায়। কানে দুলা, নাকে ফুল, গলায় হার বা সোনার মাদুলির ছড়া, হাতে চুড়ি এবং পায়ে ঘুড়ু-ব অথবা নুপুর। দুই করতলে ধরা থাকে দু'টি রুমাল, যা নৃত্যের তালে-তালে হাতের মুদ্রায় বাতাসে ওড়ানো হয়ে থাকে। সুদূর বা অদূর অতীতে যদি এই নৃত্য সম্পূর্ণতঃ নারীসমাজের এক্জিয়ারভুক্ত থেকে থাকে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। কাঠি নাচ করম নাচ বা জাওয়া নাচের মতো সহজ তালমান-লয়ের নয়। স্বভাবতঃই এর মধ্যে উচ্চমার্গের নৃত্যকলার সন্ধান মেলে। তবে ক্লাসিক্যাল নৃত্য বলতে যা বোঝায়, কাঠি নাচ মোটেই তা নয়, লোকনৃত্যের সমস্ত লক্ষণ এর মধ্যে বর্তমান; কখনো-কখনো উচ্চাঙ্গ নৃত্যের কিছু কিছু লক্ষণ আভাসিত হয়ে থাকে মাত্র। ছো নাচের মতো পরিশ্রমসাধ্য নৃত্য নয় কাঠি নাচ, আবার জাওয়া নাচের মতো বিলম্বিত লয়ের রমণীসুলভ নৃত্যও নয় এটা। বলা যেতে পারে, করম নাচ এবং ছো নাচের মধ্যবর্তী দেহকলাগত নৃত্য হল কাঠি নাচ। কাঠি নাচের বৈশিষ্ট্য হল হাত এবং পায়ের বিভিন্ন মুদ্রার গতিভঙ্গি।

বর্তমানে কাঠি নাচে কাঠির ব্যবহার একেবারে কমে এসেছে। তবু কাঠি নিয়ে এক আখড়া নাচ এখনো অল্পশীলিত হয়; বলা চলে, অতীতের জের টেনে দেখতেই হয়। দু'হাতে কাঠি নিয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ের ভঙ্গিতে নৃত্য করতে হয়। বাজনার তালে-তালে দ্রুত গতিতে একে অঁত্রের কাঠির আঘাতকে প্রতিরোধ করে আত্মরক্ষা করে থাকে, এরি মধ্যে মাথা বাঁচিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে গলে পার হয়েও যেতে হয়। খুব সম্ভব, অতীতে এটি

যুদ্ধেই নৃত্য ছিল। অন্ততঃ লাঠিয়ালদের লাঠি খেলার সমস্ত লক্ষণই এই কাঠিসহ নৃত্যের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। কারো কারো মতে যুদ্ধনৃত্য সামন্ত রাজাদের বৃত্তিভোগী পাইকরা দুর্গোৎসব এবং অগ্রাণ্ড সময় রাজা জমিদারদের সম্মুখে প্রদর্শন করত। আমরা এই মত আংশিকভাবে এইটুকু মানতে পারি যে, এটি অতীতে যুদ্ধনৃত্যই ছিল, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এর অল্পাংশের কথা মেনে নেওয়া যায়না। কেননা কাঁঠি নাচ করম পরবের পর থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত অল্পাংশ হয়ে থাকে, তারপর এ নাচের অল্পাংশ নিষিদ্ধ। কিংবদন্তী শোনা যায়, এই নৃত্য রাম-বাবণের যুদ্ধের স্মৃতিতে অল্পাংশ হয়ে থাকে। কাঁঠি নাচ বামেব সৈন্যদের নৃত্য এবং সীংতালদের দর্শায় বা ভূষণ নাচ বাবণের সৈন্যদের নৃত্য। এ. কিংবদন্তী অলীক কিংবদন্তী ছাড়া কিছু নয়; তবে এর সার নির্ধারিত, সৈন্যদের নৃত্য বা যুদ্ধনৃত্য যে এই কাঁঠি নাচ তা অস্বীকার করা যায় না। পববর্তীকালে এই নৃত্যের ওপর বৈষ্ণব প্রভাব য পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমানে কাঁঠি নাচের গান হিসেবে সাধারণতঃ বৈষ্ণব পদাবলী গাওয়া হয়ে থাকে, কখনো-কখনো বামাগণ-মহাভারতের কাহিনী-ভিত্তিক গানও গাওয়া হয়ে থাকে। নৃত্যগীতে আনুষ্ঠানিক বাগধার হিসেবে মাদল এবং করতালই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পদাবলীগীতি-মুখরিত রমণীবেশভূষায় অল্পাংশ এই নৃত্যের ওপর রাসনৃত্যের প্রভাব পড়ে থাকারও অসম্ভব নয়।

কাঁঠি নাচ হাতে-হাতে ধবধবি কবে অল্পাংশ হয় না। এই নৃত্যে নৃত্যকারীরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে, কিন্তু নৃত্যের সময় অর্ধবৃত্তাকার পঙ্কতি যথাসম্ভব রক্ষা করে চলতে হয়। এই বৃত্তাকার নৃত্যও ঘড়ির বিপরীত নিয়মে (anti-clockwise) অল্পাংশ হয়ে থাকে। কাঁঠি নাচে নৃত্যকারীর মুখ সাধারণতঃ পঙ্কতির বৃত্তরেখার দিকে অর্থাৎ সম্মুখের লোকটির পিঠের দিকে ঘোরানো থাকে। তবে নৃত্যের প্রয়োজনে তালে-তালে নৃত্যকারীকে কখনো ডাইনে কখনো বামে যেতে হয় এবং আবার পুরনো পঙ্কতিতে ফিরে আসতে হয়। এ ছাড়াও কয়েকটি আলাদা পঙ্কতি রচনা করে নৃত্যের অল্পাংশ আছে, কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত একই পঙ্কতিতে ফিরে আসতে হয়।

কাঁঠি নাচে কিছুটা উচ্চাঙ্গের ভাব কিংবা বৈষ্ণব প্রভাব থাকলেও মূলতঃ এ নৃত্য লোকনৃত্যই। ঝাড়খণ্ডের প্রাতিটি নৃত্যগীতই সাধারণতঃ ক্লিউৎসব বা শস্ত্র-কামনার সঙ্গে জড়িত। ঝাড়খণ্ডে দুর্গাষ্টমী বা 'বড় পূজা'র দিনে

‘পেটরান’ বা শস্তগর্ত ধানের গাছগুলোকে সাধভক্ষণ করানো হয়ে থাকে এবং প্রচুর ফসল কামনা করা হয়ে থাকে। এই দিনই ধানের ক্ষেতে পিটুলি ছিটিয়ে সাধ খাওয়ানোর মতোই ঘরে ঘরে রঙ্গ-রসিকতা সম্পর্কের যুবতী বধুদের শরীরেও পিটুলির হোলিখেলা শুরু হয়। এই সময় যৌনতার বিধিনিষেধে কিছুটা শৈথিল্য দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রজননশীলতা এবং প্রচুর ফলনশীলতার কামনা আভাসিত হয়ে উঠেছে। তাই এই কৃষি-উৎসবের সময়ে অনুষ্ঠিত কাঠি নাচও যে কৃষি-সম্পর্কিত নৃত্য তা এর গতিভঙ্গি মুদ্রা ইত্যাদি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। কাঠি নাচে আঁধারের মুহূর্ত বাতাসে ‘আন্দোলিত সুপুষ্ট ধানের গাছের মুদ্রা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। এ যেন শস্তগর্ত ধানের গাছের পদিপূর্ণতার আনন্দে আন্দোলনেবই নৃত্যরূপ।

কাঠি নাচ যে পদিপূর্ণতঃ লোকনৃত্য এবং শস্যকামনা-সম্পর্কিত তা এর সঙ্গে পাতা নাচের অন্তর্ধান লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। যতোক্ষণ ধরেই কাঠি নাচের ‘অন্তর্ধান হোক না কেন, অন্তর্ধানের শেষে পাতা নাচের একটা অপরিস্রব এবং প্রথাসিদ্ধ ভূমিকা আছে। কাঠি নাচ সাধাৎতঃ এক আধটি পাতা নাচের ‘অন্তর্ধানের মাধ্যমেই শেষ করতে হয়। এই পাতা নাচ যে শস্যকামনার সঙ্গে জড়িত, সে-কথা আমরা পাতা নাচের গান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

বাদ্যপণ্ডের অগ্ণাণ নৃত্যের মতো কাঠি নাচ-ও গান সহযোগেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে নৃত্যকারীরা নিজে নৃত্য এবং গীত যুগপৎ পরিবেশন করে না। কর্ম নাচ, জাওয়া নাচে শাবীরিক পবিশ্রম কম বলে নৃত্যকারীরা নৃত্য এবং গীত দুটোই পরিবেশন করতে পারে। কিন্তু পবিশ্রমসাধ্য নৃত্য বলে নৃত্যকারীরা কাঠি নাচ এবং ছো নাচে স্বয়ং গান পরিবেশন করতে পারে না। সঙ্গীত পরিবেশনের জন্তু আলাদা লোক থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, কাঠি নাচের গান হিসেবে বর্তমানে বৈষ্ণব পদা-বলীই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবু এই নাচের ‘রং’ হিসেবে যেসব গান ব্যবহার করা হয় তা একান্তভাবেই লৌকিক জীবনের কথাবার্তায় প্রাণবন্ত। এই ধরনের গানের সংখ্যা কম হলেও এ গান প্রাণরসে সঞ্জীবিত। সাধারণ মানুষের বিচিত্র ভাবনাও এসব গানে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

গানগুলো অনেকটা ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত। ছন্দ-দোলায় ‘ছড়ার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ রূপ লক্ষ্যগোচর হয়; এমনকি ছড়ার মতোই একটি পঙ্ক্তির সঙ্গে আর একটি পঙ্ক্তির সুস্বম সাদৃশ্য নজরে পড়ে না।

কোন কোন গানে জীবনের অভিজ্ঞতা সাদামাটা শব্দে সুন্দরভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। মাকাল ফলের রূপৈশ্বর্য গুণৈশ্বরের অভাবে মানুষের আদর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, এ কথা সবারই জানা। ঝাড়খণ্ডের সাধারণ মানুষের চোখে এই উপলব্ধিই এনে দিয়েছে পাট জাতীয় শগ গাছের ফুল। সোনার বরণ হলে কি হবে, তার না আছে গন্ধ, না আছে গুণ, বরং সুস্থ কণ্টক তার বৃন্ত ঘেঁষে জেগে থাকে। সুন্দর ফুল দেখলে ঝাড়খণ্ডের নর-নারী তা তুলে নিয়ে কানে কিংবা খোঁপায় গৌজার লোভ সামলাতে পারে না। কিন্তু শগ ফুলের গুণহীনতার জন্ম এ ফুল কানে গৌজবার জন্ম উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না কেউ। আসলে গুণহীন ব্যক্তি কিংবা রূপবান, কেউই এ-পৃথিবীতে আদর পায় না; গুণের জয় সর্বত্র, গুণের আদর সর্বত্র। এই উপলব্ধিই নীচের গানটিতে পবিষ্কৃত :

১. সনার বরণ শগ ফুলটি কানে কেন্ নাই পবে।

অস্তরে যার গুণ নাই রূপে কিবা করে ॥

কখনো বা কোন গানে ভাই তাব সত্বে বিবাহিত দাদাব অপরূপা রূপসী বধুব প্রশংসায় মুখর :

২. মরিচের তলে তলে সুরু সুরু বালি।

আমার দাদা বউ আছোছে যেমন রূপের ডালি ॥

কোন কোন গানে বিষন্ন, বিরহ-ক্লিষ্ট প্রণয়ীর করুণ বেদনা বাণীরূপ পেয়ে থাকে। স্মৃতি যেন সে গানে চাপা কাঠায় হাহাকার করে ওঠে। জলের ঘাট, তা সে পুকুর বা নদীর ঘাট যাই হোক না কেন, সাধারণতঃ প্রেমের উদ্গম এবং বিকাশের বিশিষ্ট স্থান হিসেবে গানে-গল্পে স্থান পেয়ে এসেছে। আবার এই জলের ঘাট কখনো-কখনো প্রেমের সমাধিস্থল হিসেবে, অথবা নিষ্করণ স্মৃতিমণ্ডল হিসেবে, বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় প্রেমিকাকে উদ্ভ্রান্ত অগ্রমনস্ত করে তোলে; তার চোখের দৃষ্টি থেকে বাস্তব জগৎ হাবিয়ে গিয়ে স্মৃতির প্রেমময় পৃথিবী যেন তাকে বিভ্রান্ত কবে। নীচের গানটিতে সোক কবি স্বল্প-পবিসরে আশ্চর্য ব্যঞ্জনায এক প্রেমরিক্ত বিরহিণী নায়িকার হৃদয়ে স্মৃতিসর্বস্ব প্রেমকে ভাস্বর করেছে :

৩. কুল পথ'রে নাইতে গেলে হ'ডকে পড়ে পা।

থাক্যে থাক্যে মনে পড়ে আমার বঁধুয়া ॥

কাঁঠি নাচের গানেও বৈষ্ণব প্রভাব সহজেই নজরে পড়ে। এখানেও বংশী-

ধ্বনি রাধা রাধা বলে অনন্তকাল ধরে বেজে চলেছে। আসলে এই বংশীধ্বনি শাস্ত্রত প্রেমের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছু নয়। এ রাধা বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা নয়, এ যেন নিতাস্তই ঝাউথণ্ডের মুক্ত প্রেমের লৌকিক নায়িকা, যার জন্তু প্রণয়ীর কণ্ঠস্বর চিরকাল আকুল আস্থানে ধ্বনিত হয়ে চলেছে এবং বিবাহ-বেদনায় দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হচ্ছে :

৪. বাঁশ নাই বাঁশলি নাই রে তরল বাঁশের ধজা।  
বিনা ফুঁকে বাজে বাঁশি বলে রাধা রাধা ॥

॥ ছয় ॥

## আহীরা গান

আহীরা গান ঝাউথণ্ডের সুপ্রাচীন জনপ্রিয় লোক উৎসব 'বাঁধনা' বা 'বাঁদনা' পরবকে উপলক্ষ্য করে গীত হয়ে থাকে। স্বভাবতঃই আহীরা গান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বাঁধনা পরব সম্পর্কে আলোচনা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

বাঁধনা বা বাঁদনা পরব গো-পূজার উৎসব। এই উৎসব কা্তিক-অমাবশ্যায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অমাবশ্যার রাত্রে জাগরণ, প্রতিপদের দিন পূর্বাঙ্কে গোরৈয়া পূজা, দ্বিতীয়ার দিন মধ্যাহ্নে 'বুটী বাঁধনা' এবং তৃতীয়ার দিনও মধ্যাহ্নে 'দেশ বাঁধনা' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অমাবশ্যা এবং প্রতিপদের অনুষ্ঠানগুলোতে মূলতঃ গো-বন্দনা করা হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে বিচার করলে এ উৎসবের 'বাঁদনা' (<বন্দনা) নামটি সার্থক। অত্রদিকে দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়ার মূল অনুষ্ঠান হ'ল গরু-কাড়া (মোষ) কে গ্রামের রাস্তায় বা মাঠে ময়দানে শক্ত খুঁটি পুঁতে তাতে বেঁধে খেলানো। গরুকাড়াকে বন্ধন করে খেলানো থেকে 'বাঁধনা' নামটি আসা অসম্ভব নয়। আবার ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, কোন অল্পপ্রাণ অক্ষর যেমন মহা-প্রাণিত হতে পারে, তেমনি মহাপ্রাণ অক্ষর অল্পপ্রাণিত হতে পারে। স্বভাবতঃই 'বাঁধনা' এবং 'বাঁদনা' শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোন সূক্ষ্ম এবং সূনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়, বরং তা অপ্রয়োজনীয়ও বটে। আমাদের মতে, দুটো শব্দই

গ্রহণযোগ্য, তবে 'বীধনা' শব্দটি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতিতে বন্দনা আদি অহুষ্ঠানগুলো আর্থ সংস্কৃতির প্রভাবের অতিরিক্ত কিছু নয়।

তবে এই উৎসবটি যে গো-পূজা বা গো-বন্দনা-সম্পর্কিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই গো-পূজা কতো প্রাচীন, তা নির্দিষ্ট দিনক্ষণ স্থির করে বলা সম্ভব না হলেও এটুকু বলা যেতে পারে যে আদিবাসী অনার্থ সমাজে আর্থপূর্ব যুগ থেকেই এ-পূজা প্রচলিত হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে আর্থবা অনার্থদের অনুকরণে গো-পূজার সূত্রপাত করে। তাব জন্ম নির্দিষ্ট তিথিক্রম গোপাষ্টমীর অবতারণা করা হয়। তবে এই ঘটনা যে কোনক্রমেই ইতিহাস-পূর্ব যুগের নয়, এ-ব্যাপারে পণ্ডিতগণ স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পেরেছেন। গো-খাদক অনার্থরা কেন এহু পূজার অহুষ্ঠান শুরু করে? কিংবা গো-খাদক আর্থগণও কেন এই পূজার অনুকরণ শুরু করে? এ-সম্পর্কে পণ্ডিত গণের মত এই যে, পঞ্চগব্য গোমুত্র আদি যেহেতু জাদুক্রিয়ার অমূল্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাই এই পূজাটিও জাদুক্রিয়াচারের অহুষ্ঠিত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। আদিম মানুষ জাদুক্রিয়ায় বিশেষ বিশ্বাসী ছিল। আত্মসংরক্ষণ এবং বংশবৃদ্ধির জন্ম জাদুক্রিয়ার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আদিম মানুষের আগ্রহ খাত্তবস্ত্র এবং সন্তানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। মানুষকে বাঁচতে হলে খাত্তবস্ত্র প্রয়োজন; তার বংশের ধাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে প্রয়োজন সন্তানের। ডঃ ফ্রেজার ঠিকই বলেছেন, *To live and to cause to live, to eat food and to beget children, these were the primary wants of man in the past, and they will be the primary wants of man in the future so long as the world lasts.* ফলে খাত্ত এবং সন্তান কামনায় আদিম মানুষ ঋতুপর্যায়কে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্ম জাদুক্রিয়ার অহুষ্ঠান না করে পারত না। গো-পূজাও একটি জাদুক্রিয়ার অহুষ্ঠান। গরু ঋষিজীবী মানুষের জীবনে অপরিহার্য। শস্য উৎপাদনের জন্ম গরুর শ্রম যেমন প্রয়োজনীয়, খাত্তবস্ত্র হিসেবে গোমাংসও তেমনি প্রয়োজনীয় ছিল। ঋষিজীবী মানুষের কাছে ষাঁড় বা বলদের পবিত্রতা অত্যন্ত বেশি। ষাঁড়ের ওপর সম্রাদায়ের সমস্ত লোকের কামনা-বাসনা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। ষাঁড় তাদের কাছে পবিত্র বস্ত্র; এর কাছ থেকে বিশেষ ধরনের প্রাণনা এবং ক্ষমতালভের তীব্র

ইচ্ছাবশতঃ ষাঁড়কে সশ্রদ্ধায় সরিয়ে রাখা হয়। পবিত্র ষাঁড়ের স্পর্শ থেকে সবাই প্রাণপ্রাচুর্য এবং ক্ষমতা লাভ করে থাকে। এই পবিত্র জীবকে বলি দেওয়া হত এই কারণে যে, এর মাংস সস্ত্রদায়েব লোকেরা ভক্ষণ করতে পারবে এবং ষাঁড়ের পবিত্রতাসহ প্রাণ এবং ক্ষমতারও অধিকারী হবে। ষাঁড়কে বলি দেওয়া হত এই কারণেই যে, এই পবিত্র জীবটি পুনর্জন্ম লাভ করবে।<sup>১</sup> এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে গোপূজার একটা বিশেষ অর্থ সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। আমাদের বিশ্বাস, ঝাড়খণ্ডের বাঁধানা পরব অনেকাংশে এই লোক-ভাবনাব ওপব ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এ ছাড়াও কার্তিকী অমাবশ্যায় গো-পূজা সম্পর্কে যে পুরাকাহিনীটি চল আছে, তাও বিচার করে দেখা দরকার। পশুপালন এবং কৃষিকার্যের সূত্র-পাতের যুগের কথা। একবার গরু-মোষের দল কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মানুষের জন্তু তাদের পরিশ্রমের অন্ত নেই, অথচ অক্লান্ত মানুষ তাদের শুধু দৈহিক নিপীড়নই নয়, ঋতুঘটিত ব্যাপারেও নিপীড়নের চূড়ান্ত করেছিল। তারা তাদের এই অভিযোগ মহাদেবের (মারাং বুক, মারাং বোড়া বা বড পাহাড়) কাছে পেশ করেছিল। তাদের এই অভিযোগের কথা শুনে মহাদেব তাদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, অমাবশ্যার গভীর অন্ধকারে নিজের চোখে তিনি ব্যাপাবটা তদন্ত করে দেখবেন। সমস্ত ঘটনাটা, যে কোনভাবে হোক, মানুষের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। মহাদেব আসবার আগেই তারা ঘর-দোর পরিষ্কার করে গরুমোষকে ঘষে-মেজে স্নান কবিয়ে তেল মাগিয়ে প্রচুর খাবার খেতে দিল। মহাদেব গভীর বাত্রে এসে দেখলেন, গরুমোষের অভিযোগ মিথ্যা। গরুমোষের যত্ন-পরিচর্যার অন্ত রাখে নি মানুষ। মহাদেব গরুমোষকে চিরকাল মানুষের ঘরে খেটে খাওয়ার-অভিশাপ দিয়ে গেলেন এবং মানুষকে লক্ষ্মীলাভ করবার আশীর্বাদ কবে গেলেন। ঘটনাটি, শ্রমজীবী মানুষের ওপব পূঁজিবাদী মানুষের সুকৌশলী ষড়যন্ত্র এবং শোষণের সঙ্গেই তুলনীয়। এই পুরাকাহিনীটিকে পুনর্জীবিত করার জন্তু কার্তিকী অমাবশ্যায় গো-জাগরণের অনুষ্ঠান অস্বাভাবিক নয়। ডঃ কুক মনে করেন, পুরাকাহিনী এবং জাদুক্রিয়া প্রায়শঃ একে অণ্ডের ওপব প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে।<sup>২</sup> এখানে পুরাকাহিনীটিকে

১. J. E. Harrison : Ancient Art and Ritual : III, P 98

২. Dr. Cook : Religion of the Semites, 3rd Edn. 1917



পুনর্জীবিত করবার জ্ঞান কার্তিকী অমাবস্তার রাত্রে জাগরণের এই যে জাহ্নু-অহুষ্ঠান তা গরুমোষের ওপর তাদের কর্তৃত্ব রক্ষা এবং লক্ষ্মীলাভের বাসনা থেকেই সংঘটিত হয়ে থাকে বলে মনে হয়।

কার্তিকী অমাবস্তার রাত্রি জাগরণের রাত্রি হিসেবে চিহ্নিত। শহর-কলের মতো গৃহাঙ্গন আলোকমালায় সজ্জিত করা না হলেও গোয়ালে মাটির প্রদীপ টিমটিম করে সারা রাত ধরে জ্বলে। যারা গরুকে গান গেয়ে জাগায়, তারা ঘরে-ঘরে ঘুরে গানে-বাজনায় শুধু গরুমোষকে জাগিয়েই ক্ষান্ত হয় না, গৃহস্থ বাড়ির সবাইকে যেন জাগিয়ে রাখতে চায়। মনে হয় একদা এই রাত্রে মহাদেবের আশীর্বাদ লাভ করবার জ্ঞান সদর দরজা খোলা রেখে সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করত। জাগরণের রাতে মানুষজন জেগে থাকবে না, তা হতেই পারে না। কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীদেবীর যেমন জ্যোৎস্না-লোকিত রাত্রে গৃহস্থের ঘরে-ঘরে গিয়ে ‘কে জেগে আছে’ ( কঃ জাগর্তি ) প্রশ্ন করে ধনসম্পদ দানের পুরাকাহিনী প্রচলিত আছে, কার্তিকী অমাবস্তায় গভীর নিকষ রাত্রে মহাদেবের লক্ষ্মীলাভ আশীর্বাদ দানের পুরাকাহিনীও একই অর্থে প্রচলিত আছে। কার প্রভাব কার ওপর পড়েছে, তা বিতর্কিত ব্যাপার। তবে আমাদের মনে নয়, গো-জাগরণের পুরাকাহিনীই প্রাচীনতর। গরু-মোষ মানুষের জীবনে প্রথম সম্পদ, তার পরই লক্ষ্মী-ভাবনার জন্ম—যে লক্ষ্মী আদিকালে আদিম জনতারই দেবী ছিলেন। অমাবস্তার সারা রাত জেগে থাকলে গো-সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে থাকে, তা একটি আইরা গানে ( জাগরণের গান ) সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

জাগ মা লক্ষ্মীনি জাগ মা ভগবতী / জাগে ত আমাবস্তা রা’ত।

জাগে কা পতিফল দেবে মা লছুমন ( ক. মহাদেব )

পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই যে ॥

গরু-মোষ কৃষিকার্ষের অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। তাই এই ঋষি-উৎসবে গরু-মোষের ভূমিকাই সবিশেষ নজরে পড়ে। গরু মোষের উন্নতি, উৎকর্ষ-সাধন এবং বংশবৃদ্ধির জ্ঞান বাঁধনা পরবের পূজা অহুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আসলে এই উৎসব গো-মহিষাদির প্রজননের উৎসব। গো-মহিষের প্রজননের জাহ্নু অহুষ্ঠান এই উৎসবে পালন করা হয়ে থাকে। গো-মহিষাদির প্রজনন-ক্ষমতা, উৎপাদিকা শক্তি এবং উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির কামনায় ঝাড়খণ্ডের মানুষ কার্তিকী অমাবস্তায় এই কৃষি তথা পশু উৎসবের অহুষ্ঠান করে থাকে। এই সময়ে

গো-মহিষের প্রজননের সময় হিসেবে এই বাঁধনা পরবের অনুষ্ঠান। বাঁধনা পরবটি আসলে গো-মহিষাদিব বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। বলাবাহুল্য, বিবাহ মানেই বন্ধন, এবং বংশবৃদ্ধির জন্তু প্রজননের প্রাথমিক অনুষ্ঠান। আমাদের মনে হয়, বাঁধনা পরবের আসল উদ্দেশ্য এবং রহস্য গো-মহিষের বংশবৃদ্ধির জন্তু প্রজননের জাদু অনুষ্ঠানের মতোই নিহিত। অনুষ্ঠানের মধ্যে বাঁড় এবং গাভীর, কাড়া (পুং মোষ) এবং মোষের বিবাহ-আচার পালন করা হয়ে থাকে। মানব সমাজে দম্পতিকে গাঁঠি ছড়ার বাঁধনে বেঁধে 'নিমছান' (<নির্মছন) এবং 'চুমান' (<চুম্বন=আশীর্বাদ) হয়ে থাকে, তেমনি গো-মহিষ দম্পতিকেও দড়ি দিয়ে 'বাঁধনা' (<বন্ধন) করে বিয়ের গান গেয়ে 'নিমছান এবং 'চুমান' হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এই অনুষ্ঠানটি থেকেই 'বাঁধনা' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে, যেহেতু এইটাই বাঁধনা পরবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান।

এবারে কার্তিক-অমাবস্তায় বাঁধনা পরবের অনুষ্ঠানের উৎস বিচার করে দেখা যেতে পারে। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, 'যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে আছে, মাঘ কৃষ্ণাষ্টমীতে উত্তরায়ণ হয়। তদনুসারে জানিতেছি, আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে আটমাস ও তদনন্তর আট দিন পরে কার্তিক গুরু প্রতিপদে শরৎ ঋতু আরম্ভ হইত।'<sup>৩</sup> অর্থাৎ মাহাত-ভূমিজ-কামার-কুমোর-বাগাল-ভূঞাদের বাঁধনা পরব প্রাচীন শরৎ ঋতু এবং শরৎবর্ষের স্মৃতিবাহী উৎসব। কার্তিক গুরু প্রতিপদ বাঁধনা পরবের মুখ্য দিন। এই দিন 'গোরৈয়া' পূজা করা হয়ে থাকে। এই দিনটি প্রাচীনকালে শরৎবর্ষ এবং ঋতুর প্রথম দিন হিসেবে প্রচলিত ছিল। স্বভাবতঃই কার্তিকে অনুষ্ঠিত বাঁধনা পরব নববর্ষের অনুষ্ঠান। নববর্ষ উৎসবের লক্ষণ বাঁধনা পরবেও দেখতে পাওয়া যায়। 'খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে যজুর্বেদ প্রণীত হইয়াছিল।' কার্তিক গুরু প্রতিপদে যে শরৎবর্ষ আরম্ভ হত, তা যজুর্বেদ প্রণীত হবার কিছু আগে থেকে চলে আসছিল, ধরা যেতে পারে। এদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে কার্তিকের বাঁধনা পরব কম পক্ষে পাঁচ হাজার বছরের পুর্বনো স্মৃতিকেই অনুসরণ করে চলেছে।

সাধারণতঃ তিন, পাঁচ, সাতদিন ধরে গরু-কাড়ার শিং-এ তেল মাখাতে হয়। অমাবস্তা, প্রতিপদ এবং দ্বিতীয় তেল তো দিতেই হয়, তারো আগে

অর্থাৎ অমাবস্তার দু'দিন বা চারদিন আগে থেকেও গরু-কাড়ার শিং-এ তেল দিতে হয়। বলাবাহুল্য, গরু-কাড়ার শিং-এ একবার তেল পড়লে তাদের পূর্ণ কর্মবিরতি এসে যায়। তখন আর গরু-কাড়াকে দিয়ে লাঙল বা গাড়ি টানানো হয় না। সারা দিন গরু-কাড়াকে বনে জঙ্গলে চরানো হলেও সন্ধ্যাবেলায় গোয়ালে ঘাস পেতে দেওয়া হয়।

গরু-কাড়ার শিং-এ তেল দেবারও বিশেষ নিয়ম আছে। গরুর শিং-এ তেল দেবার আগেই বাড়ির লোকজনদের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতে হয়। এঁটো-কাঁটা পরিষ্কার করে কেলতে হয়, ঘরের কোণে উচ্ছিষ্ট বস্তু রেখে তেল দেওয়া নিষিদ্ধ। হাত পা ধুয়ে পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন হতে হয়। সাধারণতঃ গরুর শিং-এ 'কুজুরী' (কুজবী) নামক এক ধবনের বুনো লতায ফল থেকে নিষ্কাশিত তেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে, গরুর শিং-এ কুজুরী তেল দেওয়াই নিয়ম। বর্তমানে বনজঙ্গল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কুজুরীর তেল আর পাওয়া যায় না, তাই যে কোন তেলের সঙ্গে দু'চারটি কুজুরী ফল মিশিয়ে সেই তেল গরুকে মাখানো হয়। প্রথমে বাড়ির 'শিরিবরদা' বা শ্রীবলদ এবং 'শিরিগাইয়া' বা শ্রীগাই (গাভী)-এর শিং-এ তেল দেওয়া হয়, তারপর অন্ত্যাত্ম গরু-বাছুরের শিং-এ দেবার নিয়ম। গরু-বাছুরের হয়ে গেলে 'শিব কাড়া' এবং 'শির মইবিণী'র শিং-এ তেল দেবার নিয়ম এবং তারপর অন্ত্যাত্ম মোষের শিং-এ দিতে হয়। গরুর আগে মোষের শিং-এ তেল দেওয়া নিষিদ্ধ।

এই দিন গরু-বাগালের 'গঠ' (<গোষ্ঠ) পূজা করে থাকে। কোথাও এই পূজা দুপুরের আগে, কোথাও দুপুরে, কোথাও বা বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের সমস্ত গরু নিয়ে বাগালেরা গোরুবাথানে উপস্থিত থাকে। পূজার উপচার দুধ গুড় ঘি আতপচাল সিঁদুর ধূপধুনো ইত্যাদি। এই পূজা সাধারণতঃ 'লায়া' (<রায়া <রাজা) বা গ্রামের পূজারীই করে থাকে। কোথাও কোথাও একে 'দেহরী' বা 'দেহুরী' (<দেবগৃহী) বলা হয়ে থাকে। লায়ার গঠ-মাঠে একটি বৃত্ত আঁকে এবং তারই মধ্যস্থলে পূজা করে। বলা-বাহুল্য, এই পূজা মূলতঃ বাঘুত্ দেবতার; ছাঁদন দড়ি বাঁধন দড়িও পূজা পেয়ে থাকে। গরু বাছুর সব সময় বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কোন মুহুর্তে বাঘের আক্রমণ ঘটতে পারে কিংবা সাপের বিষাক্ত ছোবল নেমে আসতে পারে; তাই এই বাঘুৎ দেবতার পূজা। দুর্গম অরণ্যের লতায়

অনেক সময় গরু বাছুরের শিং, লেজ কিংবা পা এমনিভাবে জড়িয়ে যায় যে সহজে সেই বাঁধন ছিঁড়ে গরুবাছুর ঘবে ফিরতে পারে না : তাই ছাঁদন দড়ি বাঁধন দড়ির পূজা। বায়ু পুরুষ দেবতা, তাই এর পূজায় মোরগ বলি দেওয়া হয়, কচিং ক্ষেত্রে পাঁঠা। এই পূজার অগ্রতম উপকরণ হল হাঁস বা মুবগীব একটি ডিম। পূজা শেষ হয়ে গেলে এই ডিমটি পূজাস্থান থেকে দূরে বেখে দিয়ে গরু পাল তার ওপর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যে গরু ডিমটিকে মাড়িয়ে বা পায়ের আঘাতে ভেঙে ফেলে তার বাগাল সেবা বাগাল তো বটেই, গরুর মালিক সে-বছবেব ভাগ্যবান লোক। তাই ভাগ্য-বানকে কাঁধে তুলে হৈ-হৈ করে সবাই তার বাড়িতে যায়। সেখানে সে তার সাধ্যমত সবাইকে ভালোমন্দ খাবার পরিবেশন করে। ভাগ্যবানের গরুটিকে কাঁচাধানের 'মোড়' ( মুকুট ) পরিয়ে তাকেও সম্মানিত করা হয়।

সন্ধোবেলায় কাঁচি-জীউবী অনুষ্ঠান। চালের শুঁড়ো গরুর দুধে মেখে পিণ্ড তৈরী করা হয়। নতুন কাঁপাসের গুটির তুলো দিয়ে ছোট ছোট সলতে পাকানো হয় এবং তা ঘিখে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। টুকরো টুকরো গুড়ির পিণ্ড কাঁচা শাল পাতার ওপর বসানো হয়, এবং তাতে একটি করে সলতে গুঁজে দেওয়া হয়। 'মডদা' ঘাসের ছোট ছোট আঁটি তৈরী করা হয়। প্রথমে তুলসীতলায় এবং তারপর কুল্‌হি-দুয়ারে গোবরের পিণ্ডের দু'পাশে দু'টি বাতি এবং দু'মুঠো মডদা ঘাস রেখে প্রণাম করতে হয়। তারপর প্রতিটি দরজায় এবং জানালায় দুটো করে বাতি এবং দু' আঁটি মডদা ঘাস দিতে হয়। কুয়োতলায়, গোবব গাদায়, সজ্জি খেতে, ফসলের খেতে একটি করে বাতি এবং এক আঁটি মডদা ঘাস দিয়ে প্রণাম করতে হয়। এই বাতি জ্বালানো গুঁড়ির পিণ্ডগুলো অগ্র বাড়ির ছেলে-মেয়েরা সংগ্রহ করে এবং কুল্‌হি-তে আশুন জ্বলে শালপাতায় মুড়ে পিঠে পুড়িয়ে খেয়ে থাকে। লোক বিশ্বাস আছে, এই পিঠে খেলে খোসপাঁচড়া হয় না। তবে নিজের বাড়ির কাঁচি-জীউবী গুঁড়ির পিঠে খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।

কাঁচি-জীউবীর চালের শুঁড়োর পিণ্ডের ওপর দীপ জ্বালানো এবং তার সঙ্গে মডদা ঘাস দেবার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। মডদা শব্দটি আমাদের মেন্‌টা দাহ-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রায় ছ' হাজার বছর আগেকার নববর্ষোৎসবের স্মৃতি দোলযাত্রা। দোলপূর্ণিমার আগের দিন বহুৎসব, সেদিন রাতে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে

ছাগ বা মেঘরূপী মেন্‌টাসুরকে দাহ করা হয়ে থাকে। মেন্‌টাসুরের রূপ কোথাও গৃহ, কোথাও পশু, কোথাও নরমূর্তি, কোথাও বা পিঠালি নির্মিত মেঘ। এই মেন্‌টা যেন আপদ বিশেষ, তাই এই মেন্‌টাদাহ অনুষ্ঠানে বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা যায়।<sup>৪</sup> দোল যাত্রার সঙ্গে নানান দিক দিয়ে বাঁধনা পরবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাঁধনা পরব ও নববর্ষোৎসবের স্মৃতি। দোল পূর্ণিমার আগের দিন অর্থাৎ নববর্ষের পূর্ব দিন মেন্‌টাসুর দাহ করা হয়। একদা কীর্তিক শুল্ক প্রতিপদে নববর্ষ আরম্ভ হত, তার পূর্বদিন অমাবস্যার রাত্রে ঝাড়খণ্ডেও মেন্‌টাসুর দাহ অগ্ন্যুৎসব পালিত হয়ে আসছে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিদ্যানিধি মহাশয় পিঠালি দিয়ে কোথাও কোথাও মেন্‌টাসুরের মূর্তি বচনার যে-কথা বলেছেন, তা ঝাড়খণ্ডের স-দীপ শুঁড়ির পিণ্ড এবং মডদা ঘাস ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়ে উঠেছে বলে আমরা মনে করি। এই পিণ্ডগুলো সংগ্রহে ব্যাপারে ঝাড়খণ্ডের গ্রামে গ্রামে অমাবস্যাব সন্ধ্যায় ছেলেদেব মধ্যে বিপুল হর্ষোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। এই পিণ্ডগুলো সংগ্রহ করে ছেলেরা গাঁয়ের রাস্তায় আশুনে জেলে পুড়িয়ে গেয়ে থাকে। আগেই বলা হয়েছে, সামান্য বিধি-নিষেধ দাপেক্ষে এই শুঁড়িপিণ্ডের পোড়ানো পিঠে গেলে চর্মরোগেব প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। অমাবস্যার রাত্রিটি জাগরণের রাত্রি, যা নববর্ষ পালনের একটি পবিত্রিত রীতি। সারারাত্রি ধবে পাট ও শনকাটি পুড়িয়ে অগ্ন্যুৎসব করা হয়। তাছাড়া প্রতিটি গৃহস্থের আঙিনায় সারারাত্রি বডো 'মুচা' কাঠ (< মুণ্ড) জালিয়ে রাখতে হয়, এটি এই উৎসবের একটি অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠান। 'মডদা' যে মেন্‌টাদাহর সঙ্গে সম্পর্কিত, ওপরের আলোচনা থেকে আমরা তা স্পষ্টীকরণের প্রয়াস পেয়েছি। হয়তো মিলটা নিতাস্থই আপাত মিল, তবু আপাত-মিলের ওপর ভিত্তি করেও আমরা যে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কাঁচি জীউরীর পর ঘরে ঘরে তেলে-ভাজা পিঠে 'ছাঁকা পিঠা,' তৈরী করা হয়। সেদিন আর ভাত রান্না করা হয় না, পেট-ভরতি পিঠে খায় সবাই। তারপর এঁটোকাঁটা তুলে গরুমোষেব শিঙে তেল দেওয়া হয়। অন্তদিন থেকে এই দিনের নিয়মে কিছু পার্থক্য থাকে। প্রথমে শির বলদ

এবং গাভীর শিঙে তেল দিয়ে গরুবাছুরকে দেওয়া হয়। তারপর শির বলদ এবং গাভীকে একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে, অনেকটা গাঁঠছড়ার মতো, পূর্বমুখে পাশাপাশি দাঁড় করানো হয়। তারপর ঝাড়খণ্ডের বিবাহ-অনুষ্ঠানের চুমানো আচারটি গরুর ক্ষেত্রেও পালন করা হয়। বাড়ির গৃহিণী খোয়া কাপড় বা নতুন কাপড় পরে কুলোয় ধানদুর্বা দীপ ধূপধুনো এবং হাতে হলুদ-গোলা জলের ঘটি, তাতে একটি স-পল্লব আত্রশাখা নিয়ে চুমোবার জন্তু বেরিয়ে আসে। প্রথমে হলুদ-গোলা জল ছিটিয়ে গো-দম্পতির পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর একটি 'ভেলা' পাতার দোনায়ে ধূপধুনো জ্বলে সেই দোনাটি গরুগুলোর মাথার ওপর ঘুরিয়ে বাড়ির গৃহিণী দু'পায়ের ফাঁকে গলিয়ে তিনবার এঁব পুনরাবৃত্তি কবে। তাবপর সেটি বাগালের হাতে তুলে দেয় এবং সে সেটি নিয়ে গোয়ালের গরু বাছুরের মধ্য দিয়ে যুবে কুলহি দুয়ারে গিয়ে দোনাটি উপুড় কবে পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'নিমছান' (নির্মঞ্জম)। এর ফলে ভূত প্রেত অশুভ অপদেবতা সব কিছু থেকে গরুবাছুব মুক্ত হয় বলে ওরা বিশ্বাস কবে। ভেলা পাতা অশুভ অপদেবতা, কুনজর ইত্যাদির প্রতিষেধক হিসেবে ঝাড়খণ্ডে সব সময় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিমছানো হয়ে গেলে কুলো থেকে আতপচাল ধান দুর্বা ঘাস তিনবার করে ছিটিয়ে স-আত্রপল্লব ঘট থেকে দু'পাশে একটু একটু জল ঢেলে গৃহিণী গো-দম্পতিকে ভক্তির ভরে প্রণাম করে। সাধারণতঃ পরিবারের তিন জনকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়। একে 'চুমান' (<চুমন) বলা হয়। আমাদের মনে হয় এই অনুষ্ঠানটি যেন গায়ে-হলুদের আশীর্বাদ বিশেষ। চুমানো হয়ে গেলেই এই আচারটিরও সমাপ্তি ঘটে। যার বাড়িতে মোষ-কাড়া থাকে, সেখানে গরু চুমানোর পর অল্প কুলোয় উপকরণ এনে একই ভাবে মোষ-কাড়াকেও চুমানো হয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে চারপাশে আহীরা গান বিভিন্ন লোকের কর্তে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন গৃহ থেকে শব্দধ্বনি উঠতে থাকে। বোঝা যায় সব বাড়িতেই চুমানো হচ্ছে। চুমানোর পরই আঙিনায় দুটা কাঠের আগুন জ্বলে দিতে হয়। এর পর শুরু হয়ে যায় জাগরণের রাত, আহীরা গানের রাত। সমস্ত ঝাড়খণ্ড যেন আহীরা গানে গানে মেতে ওঠে। বন-ডুংরি কাপিয়ে ঢোল ধমসা মাদলের গুরুগভীর আওয়াজ চারপাশে শোনা যায়। নববর্ষের পূর্ব রাত্রের প্রতিটি লক্ষণ যেন ফুটে ওঠে। মানুষজন ভাং সিদ্ধি গাঁজা খেয়ে

সারারাত নেশা করে। অগ্নিকুণ্ডের আলোকে আঙিনা যেমন আলোকিত হয়ে ওঠে, তেমনি অগ্নুৎসবের খেলা গ্রামের রাস্তায়-রাস্তায় জমে ওঠে। এই সময় যৌনতার ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা দেখা যায়। গানের ভেতবে কখনো কখনো গ্রামাতা এবং অশ্লীলতাও দেখা যায়। সারারাত্রি জাগরণেব রীতিও আছে।

গরু চুম্বানোব পবে গোয়ালে-গোয়ালে প্রচুব তেল ভরে দীপ জেলে দেওয়া হয়। দীপটির প্রতি মাঝে-মাঝেই নজর দিতে হয়। দীপটি যেন বাত্রিবেলা কোনক্রমেই নিভে না যায়। এই বাত্রে বাড়ির সদবে দরজা খোলা রাখা হয়। আশ্চর্ষেব ব্যাপার, রাতটি দীপাবলীৰ রাত হলেও সৰ্কত্র দীপ জালানো হয় না; শুধুমাত্র গোয়াল ঘরে এই দীপ জলতে থাকে। এ-প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখিত পুৰ্বাকাহিনীটি স্মরণ কৰা যেতে পাবে। মহাদেব গরুবাজুরেৰ দুঃখদুর্দশা স্বচক্ষে তদন্ত কবতে এসেছিলেন একদা। তাবই স্মৃতিতে এখনো বাড়িব সদবে দরজা খোলা বেখে গোয়াল ঘরে দীপ জালিযে রাখা হয় বলে আনাদের মনে হয়।

এর পরই গরু জাগানোব পালা শুরু হয়ে যায়। আহীরা গান গেয়ে এংং টোল ধমসা মাদল পাঁজিযে খাবে ঘবে গরু জাগানো হয়। আহীৰা গান অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌকিক গান হয়ে থাকে। গানের ভাষায় মগহী-মৈথিলীৰ ছাপ আছে। আসলে কুর্মিদের নিজস্ব ভাষা কুর্মালিব সঙ্গে মগহী মৈথিলী ভাষার আঙ্গিক যোগ আছে। যেহেতু আহীরা গান আচার-সঙ্গীতের অন্তর্গত, তাই রক্ষণশীলতা এই গানে সমধিক লক্ষ্যগোচর হয়। উৎসবের প্রতিটি আচাবে যেমন নিখুঁতভাবে পালন করতে হয়, তেমনি গানগুলোর কাৰ্বকারিতা রক্ষার জন্য এর ভাষাও সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। তবে ধলভূমে ঝাড়গ্রামে এসে গানগুলোর ভাষা যে কিঞ্চিৎ পবিবর্তিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুর্মি-মাহাতরা নিজেদের আদিভূমি ছেড়ে দক্ষিণ পূর্বে ছড়িয়ে পড়েছে ধলভূমে-ঝাড়গ্রামে-ময়ূরভঞ্জে। সংস্কৃতির অনেক কিছু বহন করে নিয়ে গেলেও তাৰা কুর্মালি ভাষা ব্যবহার না করে ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় কথাবার্তা বলে থাকে। স্বভাবতঃই এই সব আচারধর্মী গানেও ভাষা-গত কিছুটা পরিবর্তন অবশ্যই সাধিত হয়েছে। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আহীরা গান কুর্মালি উপভাষাতেই বচিত হয়েছিল। আহীরা গানের প্রচার এবং প্রসার কুর্মি-মাহাতদের সাহায্যেই সারা ঝাড়খণ্ডে ঘটেছে।

এ-গান বার বার রচিত হয় না, মস্তেব মতো, বিয়ের গানের মতো এগুলোকে স্মৃতিতে সংবক্ষিত করে রাখা হয় মাত্র। বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বিশেষ সময় ছাড়া এ-সব গান গাইবার রীতি নেই। আহীরাগান প্রধানতঃ প্রমোত্তর মূলক, কোথাও বা কথোপকথন মূলক। দু'পঙক্তির বিস্তৃতি থেকে সুদীর্ঘ পালার আকাবেও এক একটি গান দেখতে পাওয়া যায়। আহীরা গানে সুরের বৈচিত্র্য তেমন লক্ষ্যগোচর হয় না, মুখ্যতঃ দুতিনটে স্ববহঁ এর অবনমন।

গো-জাগরণের রাত বলে শুধু যে গরুবাল্লুরকেই জাগানো হয়, তা নয়। এ রাত মাল্লুসজনেরও জাগরণের রাত। এই রাতে জেগে থাকলে লক্ষ্মীলাভ হয়, গো-সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে।

গরুবাল্লুরকে যারা জাগিয়ে থাকে, তাদের বলা হয় 'ধাঁগড়িয়া'। শব্দটি 'ধাঁগড়' বা 'ধান্গর' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ চাকরবাকর বা ভৃত্য। মূলতঃ বাগাল-ভাতুয়া-মুনিসেরাই গো-জাগরণে অংশগ্রহণ করে থাকে। কঠে গান আর উল্লাসের ধনি আর বিবিধ বাডপণ্ডা বাচ্যস্বের সম্মিলিত বাজনা সহ এরা গৃহস্থের গৃহে ঢোকে। তারা আড়িনায় পৌছুবাব সঙ্গে সঙ্গে তাদের আসন দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। গান গেয়ে গরু-জাগানো হয়ে গেলে ধাঁগড়দের পিঠে, মুড়ি ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে মদ বা হাঁড়িয়া। তবে রাত্রিবেলা সাধারণতঃ গাঁজা, ভাং বা সিদ্ধির চলটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। গান-বাজনা কিন্তু খামে না, গৃহস্থের আড়িনায় তারা যতোক্ষণ থাকে ততোক্ষণ গান-বাজনায় ঘর-বাহির গমগম করতে থাকে। কোন গৃহস্থের বাড়িতে গরু-জাগানো শেদ হলে বিদায়ী কিছু পয়সাকড়ি তারা পেয়ে থাকে। এইভাবে গ্রামের প্রতিটি গৃহে গিয়ে গরু-জাগানো হয়। এই সময়কার গানগুলোকে 'গরুজাগায়া' গান বা জাগরণের গান বলা হয়ে থাকে। ধাঁগড়িয়ারা বা ঘিঁগুয়ানিরা গৃহস্থের আড়িনায় ঢুকেই প্রথমে গরুবাল্লুরকে জাগানো গান গেয়ে থাকে।

১. জাগ মা লক্ষ্মী জাগ মা ভগবতী জাগে ত আমাবস্তা রাই ত রে।

জাগাকে পতিফল দেবে মা লক্ষ্মী পাঁচপুতায় দশ ধেহু গাই রে।  
 ঝাড়খণ্ডে গরুবাল্লুরকে লক্ষ্মী-ভগবতী বলা হয়ে থাকে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু গরুবাল্লুরকেই নয় আমাবস্তা রাতকে জাগিয়ে রাখাও তাদের উদ্দেশ্য। গৃহস্থবাড়ির মাল্লুসজন জেগে থাকলে তার পুরস্কার হিসেবে পাঁচপুত্রের জন্ত দশটি 'ধেহু গাই' লাভ করবার সম্ভাবনা থাকে।



২. কুল্হি কুল্হি যাতে ছিলি রাজার শহরে রে তরই বড়দার ডাকিয়ে

ঘুরাল্য রে ।

চল বাছা আমার গলা ঘর ।

বসিতে দিব ভালী অলগ অলগ মাচিলা সেহি লাগি দেয় ত গুয়া পান ॥

৩. গঙ্গাগহালে জলে ভালী ভাচাক ভুচুক রে মানমীর চাওহা নাহি মিলে ।

মানমী কা ঘরে ভালী সুরহি রে বাবু হ রনঝন বাজে সারাবা'ত ॥

গোয়ালে টিমটিম করে দীপ জলে কিন্তু মানুষজনের সাড়া মেলে না । মানুষের ঘরেই সুরভি অধিষ্ঠান করে আছে, তার গলায় থেকে থেকে রুঝুঝু ঘুঙুর বেজে ওঠে ।

৪. রিমঝিমঝি রিমঝিমঝি পানী বরষে যে

আঙিনায় ত কাই পড়ি যায় ।

কতই আমরা নাচিব কতই আমরা খেলিব

আঙিনায় ত ধূলা উড়ি যায় ।

রিমঝিমঝি বৃষ্টি হয়েছে, তাতে আঙিনায় শেওলা পড়ে গেছে । তারই ওপর আমরা কতোক্ষণ ধরে নাচ-খেল করছি, আঙিনার শেওলা কাঁদা শুকে ধুলে উড়তে আরম্ভ করেছে ।

৫. নিতি নিতি মাগয়ে ভাটভিখারী রে আইজ ত মাগে ধেঙ্গুয়ান রে ।

ধেঙ্গুয়ানকে দিলে ভালী জলে নাহি পড়য়ে যুগে যুগে রহি যায় ত নাম রে ॥

পয়সাকেরি বাত অহীরা রিঝি বুঝি দিহ রে হামে যাব দসর দুয়ার রে ।

নাহি যদি আঁটয়ে নাহি যদি জুটয়ে স্মৃথে করবে বিদায় রে ॥

নাহি যে আসি ভালী ভাতেকেরি লভে রে নাই আসি পয়সাকেরি লভে ।

তরি যে ঘরে আছে দশ মুড় কাঁশি ফুল তাহাদিগে জাগাতে আসোঁছি ॥

নাহি যে আসি অহীরা পিঠাকেরি লভে রে নাহি আসি ধুতিকেরি লভে ।

গঙ্গা গহা'লে আছে কপিলী সুনন্দরী গ চান্দে সুরুজে টলমল ॥

রোজ রোজ ভাটভিখারী ভিক্ষে নিতে আসে, ধেঙ্গুয়ানরা শুধু আজকের মতোই কিছু চায় । ওদের দান করলে সে দান জলে পড়ে না, যুগে-যুগে দাতার নাম থেকে যায় । পয়সার কথা, যা দেবার তা খুশি মনে দাও, আমরা অঙ্ক বাড়িতে চলে যাই ; আর যদি দেবার মতো কিছু না থাকে, তাহলে ভালো মনে আমাদের বিদায় দাও । আমরা ভাত কিংবা পয়সা পাবার লোভে তোমার ঘরে আসি নি ; তোমার গোয়ালে ধেঙ্গু গাই আছে, ওদের জাগাবার

জন্মই এসেছি। আমরা পিঠে কিংবা ধুতির লোভে আসি নি; তোমার গঙ্গা-গোয়ালে কপিলা-সুন্দরী আছে, চাঁদ, সূর্যের আলোয় সে টলমল করছে আমরা তাকেই জাগাতে এসেছি।

৬. কন ঠিনে জাগয়ে চাঁদ সুরুজ রে কন ঠিনে জাগে বসুমাতা রে।

কন ঠিনে জাগয়ে বাঁশ কা লরা রে কন ঠিনে জাগে খেচু গাই রে ॥

সরগে হি জাগয়ে চাঁদ সুরুজ রে পাতালে ত জাগে বসুমাতা রে।

ঘরে হি জাগয়ে বাঁশ কা লরা রে গহা'লে ত জাগে খেচু গাই রে ॥

ওরে গোয়লা, কোথায় চাঁদ-সূর্য জেগে থাকে, কোথায় বা বসুমতী জাগে; কোথায় বাঁশের রোলা জাগে, কোথায় বা খেচুগাই জাগে। স্বর্গে চাঁদ-সূর্য জেগে থাকে, পাতালে বসুমতী; ঘরে বাঁশের রোলা জাগে, গোয়ালে খেচুগাই জাগে।

৭. গিরিপর্বতে চটি নাম্‌হি গেল কপিলা ঠেসি গেল গঙ্গা কী কিনার।

হা হা রে কপিলা মতি পানী জুটবে তুহে কপিলা বড়ই অপরাধী ॥

শউষহি কপিলা গঙ্গায় মিনতি রে শুনি লিহ কানেকে লাগাই রে।

পানী পিয়তে দেবে গঙ্গা হৃদয় জুড়াব তবে গঙ্গা নব ত বাতাব ॥

শুনহি শুনহি কপিলার বচন রে তুহে গঙ্গা বড অপরাধী।

মরা যে খা'স গঙ্গা জীয়ত যে খা'স রে পচা মড়া বহিস বারবার ॥

শুনহি শুনহি কপিলার মিনতি রে শুনি লেহ কানেকে লাগাই।

হামারা বেটা গঙ্গা আঙহালে চলে গে বেটি ত চল্যে যায় বৌজুক ॥

ওপরে উদ্ধৃত গানটিতে কপিলা এবং গঙ্গার মধ্যে দ্বন্দ্ব-এর কথা আছে। গঙ্গার চেয়ে কপিলার কৌলীন্দ্ৰ এবং পবিত্রতা যে বেশি তা'ও এই গানটির বিষয়বস্তু। ঝাড়খণ্ডী লোকমানসে কপিলার স্থান অত্যন্ত উচ্চে; তার পবিত্রতা প্রস্রাভীত রূপে সব দেবতার ওপরে। গানটি কপিলাগাভী সম্পর্কে লোকমুখে প্রচলিত সুদীর্ঘ পালার অংশবিশেষ বলে মনে হয়। লৌকিক কাহিনীই গানটির উপজীব্য। পুরাণে কোথাও এর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৮. চন্দ্রমা দপদপ ভুরকা উঠিল রে সুরঙ্গী ত হুঁকে রে কাঠাড়।

উঠ রে পূতা জাগ রে পূতা চল্যে যাও ত সুরঙ্গী মইলান ॥

নাহি হামে জাগব নাহি হামে উঠব নাহে যাব সুরঙ্গী মইলান।

জাড়ে শিশিরে ডালা আট অঙ্গ ভিজে রে আর ভিজে মাথাকেরি কেশ ॥

পায়ে যে দিব পূতা কচুমুচু জুতা রে গায়ে ত দহটি চাদর।

মাথায় ত দিব পুতা ষোল হাতের পাগড়ী চলো যাও ত সুরঙ্গী মইলান ॥  
 কথায় যে পাবি ভালা রুচুমুচু জুতা রে কথা পাবি দহটি চাদর ।  
 কথায় যে পাবি ভালা ষোল হাতের পাগড়ী নাহি যাব সুরঙ্গী মইলান ॥  
 মুচিঘরে পাব পুতা রুচুমুচু জুতা রে জল্হা ঘরে দহটি চাদর ।  
 শেট ঘরে পাব পুতা ষোল হাতের পাগড়ী যাহ পুতা সুরঙ্গী মইলান ।  
 কিয়া করো দিবি ভালা রুচুমুচু জুতা রে কিয়া করো দহটি চাদর ।  
 কিয়া করো দিবি ভালা ষোল হাতের পাগড়ী নাহি যাব সুরঙ্গী মইলান ॥  
 ছুধ বিকো দিব পুতা রুচুমুচু জুতা রে দই বিকো দহটি চাদর ।  
 ঘিয়া বিকো দিব পুতা ষোল হাতের পাগড়ী যাহ পুতা সুরঙ্গী মইলান ॥  
 নাহি যে লিব ভালা রুচুমুচু জুতা রে নাহি লিব দহটি চাদর ।  
 নাহি যে লিব ভালা ষোল হাতের পাগড়ী নাহি যাব সুরঙ্গী মইলান ॥  
 পায়ে যে লিব ভালা পিয়াল কাঠের খড়ম বে গায়ে ত ভিড়ী কা কঞ্চল ।  
 মাথায় ত লিব ভালা বাঁশেরি কা ছাতা রে তবে হামে সুরঙ্গী করব

মইলান ॥

গানটিতে গরু-বাগালদের দুঃগেব কথা বর্ণিত হয়েছে । একবার শিশিব পড়তে শুরু করলে ভোর বাস্তিরে গরু-কাদা পুলে মাঠে নিয়ে যাওয়া ভীষণ কষ্টকর হয়ে পড়ে । ঝাড়খণ্ডের লোকেরা অত্যন্ত গরীব, ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাদের পায়ে না থাকে জুতা, না থাকে গায়ে শীতের পোষাক । প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই সমস্যাটিই গানটিতে রূপায়িত হয়েছে । গানটিতে কোথাও কল্পনার স্পর্শ নেই, বেদনাময় নিষ্ঠুর বাস্তবের সোচ্চার উপস্থিতি আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না । আসলে আহীরা গানে কোথাও কল্পনাব ছিটে-ফোঁটা দেখতে পাওয়া যায় না । বাস্তব কাহিনী, বাস্তব বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা, বাস্তব নায়ক-নায়িকা এ-গানের উপজীব্য । প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব গান রচিত হয়ে থাকে । অনেকটা ধাঁধার মতোই । কিন্তু ধাঁধার সঙ্গে এ গানের পার্থক্যটাও সহজেই মজরে পড়ে । ধাঁধা স্বল্পায়তনের হয়ে থাকে, তার বাঁধুনি অত্যন্ত আঁটোসাঁটো । ধাঁধার উত্তরটা বাস্তব বস্তু হতে পারে কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গি রীতিমতো কবিত্বময়, সৌন্দর্য-বোধের এবং কল্পনার পরিচয় যত্রতত্র সর্বত্রই মেলে । ধাঁধায় কখনো উত্তরটা বলে দেওয়া হয় না, অনেকটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ধাঁধাকে প্রতিপক্ষের সামনে পেশ করা হয় এবং জনশ্রুতিমূলক উত্তরটা না দিতে পারা পর্যন্ত

সমাধান হয় না। কিন্তু আহীরা গান কখনোই ধাঁধার মতো স্বল্পায়তনের হয় না। গান বলে আহীরা গান সুববন্ধ এবং বিশেষ একটি ছন্দের বাঁধনে বাঁধা; বলা-বাহুল্য, এ বাঁধুনি খুব একটা আঁটোসাঁটো নয়। আহীরা গানের প্রস্তোত্তরের বিষয়বস্তু সব সময়ই বাস্তব হয়ে থাকে, প্রকাশভঙ্গি ক্বচিৎ কদাচিৎ কবিত্বময়, সৌন্দর্যবোধ এবং কল্পনার দর্শন লাভ অত্যন্ত বিরল ঘটনা। সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা নিরাবরণ এবং নিরাভরণ শব্দে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। শুধু মানুষই নয়, পশুপক্ষী গাছ-পালাব জীবনের কথাও এ গানের উপজীব্য। এ গানে বৈচিত্র্য আছে বিষয়বস্তুতে, ঝাড়পেঁগের বাস্তব সংসারের বিভিন্ন খুঁটিনাটি কথা এর অন্তর্ভুক্ত। আহীরা গানে প্রেমের কথা থাকবে কথা নয়, তাই এ গান প্রেম-গীতি বিবর্জিত। তা সত্ত্বেও আহীরা গান জীবনরসে সমৃদ্ধ গান। জীবন-ধর্মিতার দিক দিয়ে ধাঁধার চেয়ে আহীরা গানই বেশি পরিপুষ্ট। আহীরা গানের প্রশ্নে উদ্ধত আক্রমণ পাকে না, উত্তরটাও জনশ্রুতিমূলক নয়, নিতান্তই শব্দিজ্ঞতাপুষ্ট বাস্তব জীবনের টুকিটাকি বস্তুই এর উত্তর। আসলে আহীরা গানে প্রস্তোত্তরের মাধ্যমে বয়োজ্যেষ্ঠদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বয়োনিষ্ঠদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত পবিচিত্র বস্তুই আহীরা গানের বিষয়বস্তু। সেগুলো পরিবারের ভাবী কর্ণধারবা কতোটুকু জানে বা বোঝে তা জানবার জুইই যেন ধাঁধার আকারে প্রশ্ন করা হয়, পরে তার উত্তরটাও জানিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ওপরের গানটিতে প্রস্তোত্তরের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, মুঁচির কাছে জুতো মেলে, তাঁতির কাছে চাদর মেলে, শেঠের কাছে পাগড়ি মেলে; জুতোর চেয়ে চাদরের দাম বেশি, চাদরের চেয়ে পাগড়ির দাম বেশি—এই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে দুখের চেয়ে দই-এর দাম বেশি, দই-এর চেয়ে ঘি-এর দাম বেশির তুলনা দিয়ে।

২. কন ঠিনে রে অহিরা গাইয়া চরালি রে কন ঠিনে পানিয়া পিয়ালি  
কন ঠিনে রে অহিরা গাইয়া বাখালি রে কন ঠিনে বাশিয়া বাজালি ॥  
রনে-বনে রনে বনে গাইয়া চরালি রে মালাদহয় পানিয়া পিয়ালি ।  
বোরি তলে রে অহিরা গাইয়া বাখালি রে ডালে বসোঁ বাশিয়া বাজালি ॥  
কিয়া লাগি রে অহিরা গাইয়া চরালি রে কিয়া লাগি পানিয়া পিয়ালি ।  
কিয়া লাগি রে অহিরা গাইয়া বাখালি রে কিয়া লাগি বাশিয়া বাজালি ॥

দুধ লাগি রে অহিরা গাইয়া চরালি রে পিয়াস লাগি পানিয়া পিয়ালি ।

সাহার লাগি রে অহিরা গাইয়া বাথালি রে ঝিঝলাগি বাঁশিয়া বাজালি ॥  
বাগাল গোচারণ থেকে ফিরে আসবার পর তাকে জিগেস করা হল, রে গোপ, তুই কোথায় গরু চরালি, কোথায় গরুকে জল খাওয়ালি, কোথায় গরুর বাথান (গোষ্ঠ) করেছিলি, কোথায়ই বা তুই বাঁশি বাজালি ।  
বাগাল জানাল, গভীর অরণ্যে গরু চরিয়েছি, মালাদহে জল খাইয়েছি, বটতলায় গরুর বাথান করেছি আর সেই গাছের ডালে বসে বাঁশি বাজিয়েছি ।  
আবার প্রশ্ন করা হল, রে গোপ, কিসের জন্তু তুই গরু চরালি, কিসের জন্তু গরুকে জল খাওয়ালি, কিসের জন্তু গরুর বাথান করেছিলি, কিসের জন্তুই বা বাঁশি বাজালি ।  
বাগাল জবাব দিল, দুখের জন্তু গরু চরিয়েছি, তৃষ্ণার জন্তু গরুকে জল খাইয়েছি, সার-গোবরের জন্তু বাথান করেছি আর খুশিতে বাঁশি বাজিয়েছি ।

১০.

কেইসে চড়ি নামে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে কেইসে চড়ি নামে রে গুসাঁই ।

কেইসে চড়ি নামে ভালা নন্দ গুয়ালা রে মাথায় তার কুমুগুল পাগ ॥

কড়ম চড়ি নামে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে ঘড়ায় চড়ি নামে রে গুসাঁই ।

কাড়ায় চড়ি নামে ভালা নন্দগুয়ালা রে মাথায় তার কুমুগুল পাগ ॥

কথায় কথায় বলে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে কথায় কথায় বলে রে গুসাঁই ।

কথায় কথায় বলে ভালা নন্দগুয়ালা রে মাথায় তার কুমুগুল পাগ ॥

কুল্‌হিমুড়ায় বলে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে গাঁয়ে গাঁয়ে বলে রে গুসাঁই ।

মাঠে মাঠে বলে ভালা নন্দগুয়ালা রে মাথায় তার কুমুগুল পাগ ॥

কিয়া লাগি ঘুরে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে কিয়া লাগি ঘুরে রে গুসাঁই ।

কিয়া লাগি ঘুরে ভালা নন্দ গুয়ালা রে মাথায় তার কুমুগুল পাগ ॥

গাঁজা লাগি বলে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে বার্ষিক লাগি বলে রে গুসাঁই ।

কপিলা লাগি বলে ভালা নন্দ গুয়ালা রে মাথায় তার কুমুগুল পাগ ॥

গানটিতে তিনটি চরিত্র স্থান লাভ করেছে : ঈশ্বর মাহাদেব, গুরু গোস্বামী

এবং নন্দ গুয়ালা । মাহাদেব গ্রাম রক্ষা করে থাকেন বলে লোকবিশ্বাস

আছে । তিনি ষড়ম পান্নে সারা রাত গ্রাম পাহারা দিয়ে থাকেন ; এক

ছিলিম গাঁজার জন্তুই তাঁর গাঁয়ের মাথায় ঘোরাঘুরি । এখানে গাঁজা ভাং-

খোর শিবই যেন উপস্থিত হয়েছেন । বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের কালে এখানেও

গুরুবাদ দেখা দেয়। গোস্বামীরা কান ফুঁকে অর্থাৎ কানে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়ে পরিবর্তে শিশুদের কাছ থেকে বেশ মোটা পাওনাই আদায় করে থাকেন। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত আদিবাসীদের শোষণ করে তাঁরা যে পুষ্টি হয়ে ওঠেন তা তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেই সুপরিষ্কৃত। বার্ষিক পাওনা আদায়ের জন্তই তিনি ষোরেন কথ্যাটিতে কিঞ্চিৎ জ্বল থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। তৃতীয় চরিত্র নন্দ গোয়াল। ব্রজের নন্দ গোপালক, বাংলার মাটিতে সে নন্দ ঘোষ। মোষের পিঠে চড়ে নন্দ গোয়াল গরু মোষ চরিয়ে বেড়ায়। সে ঝাড়খণ্ডের এতোই পরিচিত একটি চরিত্র যে তার গুরুত্ব আমাদের দৃষ্টি সহজেই এড়িয়ে যায়।

১১. কার ত বঠে ভালা বনজঙ্গল রে কার ত বঠে খেড় ঘাঁস।

কার ত বঠে ভালা ভৈঁস ধনির পাল রে ঠড়কা ঠুঁকিয়ে বনে যায় ॥

বাজার ত বঠে ভালা বনজঙ্গল রে পবুজার ত বঠে খেড় ঘাঁস।

নন্দগুয়ালার বঠে ভৈঁস ধনির পাল রে ঠড়কা ঠুঁকিয়ে বনে যায় ॥

কিয়া হইল ভালা বনজঙ্গল রে কিয়া হইল খেড় ঘাঁস।

কিয়া হইল ভালা ভৈঁস ধনির পাল রে ঠড়কা ঠুঁকিয়ে বনে যায় ॥

কাটে কুটে গেল ভালা বনজঙ্গল রে ডুঁড়কিয়ে গেল খেড় ঘাঁস।

মরে হারাই গেল ভালা ভৈঁস ধনির পাল রে ঠড়কা ত রহলা টাংগাই।

গানটিতে কয়েকটি জিনিষ লক্ষণীয়। বনজঙ্গলের ওপর রাজার অধিকার। কিন্তু পশুখাত্ত বুনো ঘাসে প্রজার অধিকার। গরুমোষের দল একদা গভীর জঙ্গলে কাঠঘন্টা বাজাতে বাজাতে বুনো ঘাস খেয়ে বেড়াত। রাখাল-বাগাল এই ঘন্টার শব্দে বুঝতে পারত গরুমোষের পাল কতো দূরে রয়েছে; শব্দ অনুসরণ করে গরুমোষের পাল খুঁজে বার করতে মোটেই অনুবিধে হত না। এই কাঠঘন্টার শব্দ শুনেই একদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছোটনাগপুরের জঙ্গলে চমকিত হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে অথবা কাটাকুটির ফলে বন-জঙ্গল ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘাসও শেষ হয়ে গেছে। গোচারণের জঙ্গল নেই, মাঠ নেই, তাই আজ ঝাড়খণ্ডে গরুমোষের পাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ এই সেদিন অবধি প্রতিটি গৃহস্থেই গোয়াল-ভরা গরুমোষ ছিল, এখন শুধু হালের গরু-কাড়াই যা সম্বল। শুধু পুরনো দিনের প্রচুর পশুসম্পদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এখনো দেয়ালের গায়ে অজস্র কাঠঘন্টা বুলে আছে। তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে

বেদনাময় স্মৃতি জেগে আছে। পশুসম্পদসর্বস্ব মাল্লুয়ের বেদনাডরা দীর্ঘশ্বাস গানটিতে লুকিয়ে আছে। বনজঙ্গল, গরু-মোষ আদির প্রতি এদের যে কি মমতা, তা গানটি থেকে আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি।

১২. কাঁহা হারালে কালু ঝিরিহিরি বাঁশি কাঁহা হারালে ধেলু গাই।  
 কাঁহা হারালে কালু নবরঙ্গা রসিকা কাঁহা হারালে দশ ভাই ॥  
 বাজাইতে হারালি ঝিরিহিরি বাঁশি চরাতে হারালি ধেলু গাই।  
 আখড়াহিঁ হারালি নবরঙ্গা রসিকা দরবারে হারালি দশ ভাই ॥  
 কেইসে চিন্হবে কালু ঝিরিহিরি বাঁশিরে কেইসে চিন্হবে ধেলু গাই।  
 কেইসে চিন্হবে কালু নবরঙ্গা রসিকা কেইসে চিন্হবে দশভাই ॥  
 ফুঁকেতে চিন্হব ঝিরিহিরি বাঁশি দাগে চিন্হব ধেলু গাই।  
 আখডায়হিঁ চিন্হব নবরঙ্গা রসিকা মহডায় চিন্হব দশ ভাই ॥  
 কেইসে আনবে কালু ঝিরিহিরি বাঁশিবে কেইসে আনবে ধেলু গাই।  
 কেইসে আনবে কালু নবরঙ্গা রসিকা কেইসে আনবে দশ ভাই ॥  
 লুটি আনব বাবু ঝিরিহিরি বাঁশি গোদি আনব ধেলুগাই।  
 আখডায়হিঁ আনব নবরঙ্গা রসিকা দরবারে আনব দশ ভাই ॥

ওপরের গানটিতে একটু লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। অহিরার পরিবর্তে এখানে যেন কালু বিনে গীত নেই কণাটির যথার্থ্য প্রতিপন্ন কববার জন্যই কালুর আবির্ভাব ঘটেছে। এ-কালু কিন্তু নৈফব পদাবলীর কালু নয়। নিতান্তই লৌকিক কালু, ঝাডখণ্ডের গরুমোষ-বাগাল। এই কালু বনে-জঙ্গলে বাঁশি বাজাতে গিয়ে তাব ঝিরিহিরি বাঁশি হারিয়ে ফেলেছে, গভীর অরণ্যে গোচারণে ধেলুগাই হাবিয়েছে, নাচের আখডায় রসিককে হারিয়েছে আর রাজদরবারে বিচারে তার দশ ভাইকে হারিয়েছে। কালু কিন্তু হতাশ হযনি। সে বাঁশিতে ফুঁ দিলেই তার ঝিরিহিরি বাঁশি চিনতে পারবে, আর অমনি সে তার বাঁশি ছিনিয়ে আনবে। বনে-অরণ্যে গরু হারালেও সে যে কোন গরুর পালের ভেতর থেকে তার গরুর গায়ের দাগ দেখে চিনে নিয়ে ধেলুগাইকে তাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনবে। নাচের আখডায় নাচের ধরন দেখে সে তার রসিককে চিনতে পারবে এবং তাকে ফিরিয়ে আনবে। দরবারে দশভাইয়ের মুখের আদল আর গলার স্বরে তাদের চিনে নেবে, আর নতুন কবে বিচার করিয়ে তাদের দরবার থেকে বের করে আনবে।

কয়েকটি গানে পরিবারের বিভিন্ন জন সম্পর্কে সরস কথা আছে। নিচের

গানটিতে পরিবারের তিন ভাই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বডোকে মানায় দালান কোঠা, মেজকে মানায় দরবারে আর ছোট ভাইয়ের মানায় বাড়ির দুয়ারে ঘোড়া বেঁধে রাখা।

১৩ কনে ত সাজে ভালা উঁচু-উঁচু বাথ'ল কনে ত সাজে দরবার।

কনে ত সাজে ভালা দুয়ারে ঘড়া বাঁধা ছটয় বড়য় করে নমস্কার ॥

বড ভাইকে সাজে ভালা উঁচু-উঁচু বাথ'ল মাঝ্য ভাইকে সাজে দরবাব।

ছটভাইকে সাজে দুয়ারে ঘড়া বাঁধা ছটয় বড়য় করে নমস্কার ॥

পরের গানটিতে মা-বোনের কথাও এসেছে। বোনের আদর-যত্ন, মায়ের হাতের অঙ্গুল কেউ কি ভুলতে পারে? তাই বোনের বিয়ে হলেও বোনকে পববে ফিরিয়ে আনবার কথা যেমন আছে তেমনি মায়ের মৃত্যু হলেও তাঁকে অমৃত জল খাইয়ে পুনর্জীবিত করার ঘোষণার কথাও আছে। তাছাড়া একজন ঝাড়খণ্ডী বাগালের আর দুটি সহচর—লাঠি এবং বাঁশি—নষ্ট হয়ে গেলেও নতুন করে বানাবার কথা অথবা বিশেষ উপায়ে সংরক্ষিত করার কথা আছে। একজন বাগালের কাছে মা-বোন লাঠি আর বাঁশির চেয়ে বড়ো আর কি আছে।

১৪ কেও যে দিবে ভালা পানী যে পিঁটা রে কেও যে দিবে অঙ্গুল।

কেও যে বাবু তোরি সঙ্গে সঙ্গে ফিরয়ে কনে ত দেয় ত রে হংকার ॥

বহিনে যে দেয় ত ভালা পানী যে পিঁটা রে মায়েত দেয় রে অঙ্গুল।

পাড়'রই ঠেঙা ভালা সঙ্গে সঙ্গে ফিরয়ে বাঁশিয়ায় ত দেয় ত রে হংকার ॥

তর-ই যে মা বাবু মরি হার'ই যাবে রে বহিন ত যাবে শশুর ঘর।

ভাঙিটুটি যায় ত বাবু পাড়'রই ঠেঙা রে বাঁশিয়ায় ত লাগি যাবে ঘূণ ॥

অমৃত পানী আনব মাকে যে খাওয়াব বহিনকে ত ফিরাব পরবে।

পাড়'রই ঠেঙা ভালা দুসরা যে কুঁদাব বাঁশিয়াকে হিঙ্গুলায় বাঁধাব ॥

পরবর্তী গানের বিষয়বস্তু হল, পিতার মৃত্যু হলে মানুষ নাবালক শিশুর দশা প্রাপ্ত হয়, মায়ের মৃত্যু হলে অনাথ হয়। ভাই-এর মৃত্যু হলে তার বাহুবল নষ্ট হয় এবং স্ত্রীর মৃত্যু হলে গৃহ শূণ্য হয়।

১৫ কেহ মরলে অহিরা কাঙ্কি-কুঁয়ার রে কেহ মরলে রে টুঅর।

কেহ মরলে ভালা বাঁহি-বল টুটয়ে কেহ মরলে ঘর শূন রে ॥

বাপ মরলে অহিরা কাঙ্কি-কুঁয়ার রে মা-অ মরলে রে টুঅর।

ভাই মরলে অহিরা বাঁহি বল টুটয়ে মেহরানু মরলে ঘর শূন ॥



স্ত্রীর মৃত্যু হলে গৃহশূন্য হয় বলে ওপরের গানটিতে বলা হলেও তার পতিভক্তি নামক বস্তুটি যে একেবারেই থাকে না এবং স্বামীর শোকে লোক-দেখানো কাতরতা ছাড়া গভীর বেদনায় সে আচ্ছন্ন হয় না, পরের গানটিতে স্বল্প কথায় তা বলা হয়েছে। মা কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে আজীবন শোকে কান্নাকাটি করেন ; বোন অস্তুতঃ ছ মাস শোকে কাতর হয়ে থাকে।

১৬ কেহ ত কান্দে অহিরা জনম জনম রে কেহ ত কান্দে ছয় মাস।

কেহত কান্দে অহিরা ডেড় পহর রা'ত সিঁদুরে কাজলে টলমল ॥

মা'ই ত কান্দে অহিরা জনম জনম রে বহিনী ত কান্দে ছয় মাস।

মেহরালু ত কান্দে অহিরা ডেড় পহর রা'ত সিঁদুরে কাজলে টলমল ॥

এমনিভাবে নানান গানে গুরুজাগানো হয়ে থাকে। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি, রাত ভোর হবার আগে গ্রামের সব ক'টি বাড়ির গুরুকে জাগাতে হয়। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি যাবার পথে এক ধরনের টুকরো টুকরো অহীরা গান গাওয়া হয়ে থাকে। এগুলোকে ডহরিয়া গান বলা হয়। ডহর শব্দের অর্থ পথ। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে যাবার পথে এই সব গান গাওয়া হয়ে থাকে। স্বল্প দুরত্বের পথ। তাই স্বল্প কথার গান ; সুরেও দ্রুত লয় গুরুজাগানো গান থেকে এগুলোকে পৃথক সত্ত্বা দিয়ে থাকে।

১৭ তুঁইও আলি মুঁইও আলি ঘরে আছে কে ?

ঘরে আছে মীনার মা হাঁড়্যা পাঁকাইছে ॥

১৮ দে ন প সীম দুটি র'স ন হে থাম,

কুটুম জন আশ্তেঁছে ভজকট থাম ॥

১৯ পরবে পরবে পিঠা দিলি না,

পরব পাইরালে পিঠা বাব না।

পিঠা নাই দিলেই কি,

পরব পাইরালে পিঠা ক'রব কি ॥

এক বাড়ি থেকে অল্প বাড়ি যেতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। তাই ডহরিয়া গান যেমন খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তেমনি এ-গানের বিষয়-বস্তুও নিতান্ত নগণ্য হয়ে থাকে। এগান অনেকটা তাত্ক্ষণিক সৃষ্টির কসল। এতে না থাকে চিন্তার গভীরতা, না থাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার তেমন কোন

উল্লেখযোগ্য কথা। উচ্চল মুহূর্তেব উচ্চল সৃষ্টি। সুর আর ছন্দের দোলা ছাড়া এখানে লক্ষণীয় কিছুই নেই। অত্যন্ত চপল, অনেক সময় অর্ধহীন, কথাবস্তুরই এর উপজীব্য। এ গানের সঙ্গে ছড়ার যথেষ্ট মিল আছে। অসংগতি, অর্ধহীনতা, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, দ্রুত লয় এবং সুর উহবিয়া গান এবং ছড়াকে একসূত্রে বেঁধেছে বলে আমাদের মনে হয়।

যখন সারা গ্রামের সব বাড়ির গুরু-জাগানোর পালা শেষ হয়, তখন এক প্রাস্ত থেকে গ্রামেব অগ্র প্রাস্ত পর্যন্ত ধাঁগড়িয়াবা গান গেয়ে নেচে খেলে গাঁয়ের বাস্তায় খুলো উড়িয়ে চলে যায়। সাবা রাত্রি জাগরণের ফলে তাদের বিশ্রান্ত বেশবাস, নেশার ঘোরে টলমল উচ্ছ্বংখলতা, অসংবৃত নৃত্যকলা, কখনো কখনো অঙ্গীল-এবং গ্রাম্যতা-প্রধান সংগীত এই সময় স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। গাঁয়ের এক প্রাস্ত থেকে আব এক প্রাস্ত পর্যন্ত এইভাবে নেচে খেলে গান গেয়ে কিছুটা অসংবৃত অঙ্গভঙ্গি করে যাওয়ারকে ‘মাছি খেদা’ বা ‘মাছি বাট্যানা’ (বাট=পথ) বলা হয়ে থাকে। ঝাডথঙে মশা শঙ্কের চল নেই বললেই চলে। মাছি শব্দটিই তাহ বৃহত্তব অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। মশাব কামড়ে মাহুবজন গক বাছুব অস্থিব হয়ে থাকে। তাছাডা মশা মাছি ধানেব ফসলেরও ক্ষতি কবে থাকে। এই জগ্গই এই অনুষ্ঠানটির এই নাম। তবে আবে গভীবে প্রবেশ কলে বোঝা খাবে, এই অনুষ্ঠানটি ভূত প্রেত অপদেবতা অশুভশক্তি আদির বিভাডনের অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। আগেই বলা হয়েছে, নববর্ষেব পূর্বে এমনি ধবনের অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দেখা যায়। এর সঙ্গে অসংবৃত নৃত্য, গ্রাম্যতাভাবা সংগীত—কখনো কখনো তাতে যৌনতার আভাস, সমস্তই নববর্ষ প্রবেশেব লক্ষণ বিশেষ। বিজয়া দশমীর শবরোৎসব এই একই লক্ষণাক্রান্ত। ‘মাছি খেদা’ অনুষ্ঠানে যখন ধাঁগড়িয়াবা গাঁয়ের বাস্তা নৃত্য গীত করে পার হয়ে যেতে থাকে তখন বিভিন্ন বাড়ির কুলবধুরা বাটি ভরে পিটুলি-গোলা জল নিয়ে বেরিয়ে এসে রঙ্গ-রসিকতাসম্পর্কিত লোকেদের গায়ে দোল যাত্রার আবির-গুলাল খেলার মতো ছিটিয়ে থাকে। বলাবাহল্য, যুবক পুরুষরা পান্টা আক্রমণও করে থাকে। তারা কুলবধূদের হাত থেকে বাটি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের গায়েও পিটুলি-গোলা জল ঢেলে দেয়। অনেক সময় এই ধ্বস্তাধ্বস্তি শালীনতার সীমাও ছাড়িয়ে যায়। আগেই বলা হয়েছে, যৌনতার ক্ষেত্রে এই উৎসবে কিছুটা শিথিলতা দেখা দেয়। পিটুলি গোলা জল ঢালাঢালির মধ্য দিয়ে

তা আভাসিত হয়ে ওঠে। বর্তমানে রঙ্গ-রসিকতাসম্পর্কিতদের মধ্যেই এই পিটুলিগোলা জল ছোঁড়া ছুঁড়ি সীমাবদ্ধ থাকলেও অতীতে নারী সম্প্রদায় পুরুষ নির্বিশেষে, সবার সঙ্গেই এই খেলা খেলত, মনে হয়। পিটুলির ছিঁটে লাগা শাদা দাগগুলোকে রঙ্গ করে বলে 'বক শু-এর দাগ।' অর্থাৎ শরীরকে অশুচি করাই যেন অমুষ্ঠানটির লক্ষ্য। সারা বছর যাতে কোন বিপদ-আপদ অপদেবতার উপদ্রব না ঘটতে পারে, তাই আচারটি পালন করা হয়ে থাকে।

'মাছিখেদা' অমুষ্ঠানের গানগুলোর মধ্যে অশুচিবস্তুর উল্লেখ ঘন ঘন পাওয়া যায়। বিশেষভাবে বিষ্ঠা প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বৎসরের শেষ দিনে নববর্ষের প্রাক্কালে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে অঞ্জলি ক্রীড়াকৌতুক, অঞ্জলি গীত ও খেউড় অজ্ঞাবধি চলে আসছে। পুরাণে-শাস্ত্রে এর বিধান আছে। তাই ঝাড়খণ্ডের এইসব গানে কুরুচি বস্তু প্রসঙ্গ কোন ক্রমেই নিন্দনীয় নয়। এই গান একটি প্রাচীন রীতি-ধারাকেই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। ধাগড়িয়ারা নেচে-গেয়ে যেতে-যেতে মাঝে-মাঝেই ধুয়োব মতো করে ছুড়া কাটে :

২০. লে হাগি, লে হাগি/মাহত ঘরের চুলহায় হাগি।

এখানে কুকুরকে ডেকে গ্রাম-প্রধানের উম্মনে মলত্যাগ করা উপদেশ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য একই, যা কিছু এতোদিন শুচি ছিল, তাকে অশুচি করা। যমদূত, অপদেবতা, অশুভ দৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

২০. কুল্‌হি মুডায় কুল্‌হি মুডায় নাচ লাগোছে।

সেহ শুন্তে রে ভাই বড বহ চুল্‌হায় হাগোছে ॥

নিয়ন্ত্রিত গানগুলোতে সরাসরি যৌনতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এর মধ্যে যৌনতার ইঙ্গিত অবশ্যই আছে।

২১. শালার বাড়ি-এ নানা রংগের ফুল ছুটে

শালার বহিন যাতে মানে নাই।

দে ন হে শালা বুঝাই-মানাই পাঠাই দে

তর বহিন যাতেই মানে নাই ॥

২২. শুধনি শাগ শুধনি শাগ কতই সিঝাব।

দিদির ভাতার খালভরাকে কতই বুঝাব ॥

ধাগড়িয়ারা গ্রামের শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্তার অমুষ্ঠান শেষ হয়। শুরু হয় গুল্লা প্রতিপদের অমুষ্ঠান, যার মধ্য দিয়ে প্রাচীন নববর্ষের

ধারা এখনো অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। লাঙল, জোয়াল, মই আদি কৃষি যন্ত্রপাতি পুকুর থেকে ধুয়ে নিয়ে আসা হয়। তারপর গর'য়া পূজা শেষ হলে এগুলোকে মাচার ওপর মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলে রাখা হয়। 'হাল পূণ্য' এর আগে (পয়লা মাঘ) এই সব কৃষি যন্ত্রপাতিকে মাটিতে নামানো নিষিদ্ধ। এই অস্থানটি ঝাড়খণ্ডের কৃষি-ভাবনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যন্ত্রপাতি-গুলো ধুয়ে এনে তুলে রাখার অর্থ হল, চলতি বছরবে মতো চাষের কাজ শেষ হল। নতুন বছরবে আগের হালচালনা নিষিদ্ধ। মনে হয়, এই অঞ্চলে অতীতে একটাই কসল তোলা হত।

গব'য়া পূজার দিন সবকিছুই ধুয়ে বাকঝকে কবে নিতে হয়। রাত থাকতেই স্ত্রীলোকেরা 'গোবব বাকড়'-এর কাজ শুরু কবে দেয়। পূর্বনো উন্নত ভেঙে নতুন উন্নত কবা হয়। পূর্বনো হাঁড়ি ফেলে দিয়ে নতুন হাঁড়ি কাডতে হয়। নতুন ঠেকা-কুলো আমদানি কবতে হয়। একটু বেলা হলেই কুল-বধূবা নতুন ঠেকা-ডালা-কুলো নিয়ে পুকুরে স্নান কবতে বেবিয়ে পড়ে। নতুন কুলোয় নিয়ে যায় আতপ চাল। স্নান কবে ডালা-কুলো আতপ চাল ধুয়ে ঘরে ফেরে। আসবার সময় পুকুর থেকে এঁটেল মাটি নিয়ে আসে। এই মাটি দিয়ে তিনটে স্তম্ভ গড়ে উন্নত বানানো হয়। গব'য়া পূজার পিঠে এই উন্নতনে ভাজা হয়ে থাকে। যন্ত্রকুণ্ডের জালানির মতো এই উন্নতনের জালানিব জন্তু শাল কাঠের কূচাব প্রয়োজন পড়ে। শুড়-ধি মেখে পিটুলি বানানো হয়। বলাবাহুল্য, গরু গোয়ালের দেবতার জন্তু, আসলে এই দেবতাই গর'য়া, গাওয়া ধি দিয়ে এই সব ছোট ছোট পিঠে ভাজতে হয়; মোষ গোয়ালের পূজোর পিঠে মোষ ধি দিয়ে ভাজতে হয়। গরু-মোষের পূজোর পিঠে আলাদা আলাদা উন্নতনে ভাজবার নিয়ম। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় অবশ্য 'পিঠা ছাঁকা' বলা হয়ে থাকে।

ওদিকে গৃহস্থামী অথবা তার পুত্র উপোষ কবে থাকে পূজো করবার জন্তু। আয়োজন সম্পূর্ণ হলে সে পুকুর থেকে স্নান করে আসে, জমি থেকে খানিকটা মাটিও নিয়ে আসে। এই মাটি দিয়ে গোয়াল ঘরে গর'য়া খুঁটোর সামনে একটি পিণ্ড তৈরী করে তার ওপর একটি শালুক ফুলের কুঁড়ি শুঁজে দেওয়া হয়। এটি যে যৌনমিলনের প্রতীক, প্রজননের প্রতীক তা অর্হুধাবন করতে আমাদের অসুবিধে হয় না। গর'য়া খুঁটোর সামনে আতপ চালের শুঁড়ে দিয়ে নয়টি ঘর তৈরী করা হয়। এই পূজোর সম্মান অহুসারে পরপর ন'টি

ঘরে বিভিন্ন দেবতার ক্ষেত্র স্বীকার করে নেওয়া হয়। কোন ক্রমেই দেবতাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা উচিত নয়। ওপরের তিনটি ক্ষেত্রে বাম থেকে দক্ষিণে অধিষ্ঠান করেন যথাক্রমে গর'য়া, গুসাঁই, কালাপাহাড়, পবের সারিতে বড় পাহাড় ( মারাং বুরু, মাহাদেব ), ছাঁদন দড়ি, বাঁধন দড়ি; শেষের সারিতে বায়ুং, গবাম এবং অবশিষ্ট দেবদেবী। ন'টি ঘরে ন'টি তুলসী পাতা দেওয়া হয়, তাবপব ওগুলোব ওপর আতপ চাল, গব'য়া পিঠে ইত্যাদি দিয়ে দেবতাদের পূজা করতে হয়। শালুক ফুলের কুঁড়ি আর মাটিব পিণ্ডে সিঁদুঁব এবং পিটুলি লেপন করতে হয়। পূজা শেষ হয়ে গেলে গোয়ালঘবে এবং অগ্ন্যস্ত্র ঘবের কড়িকাঠে শালুক ফুল ঝুলিয়ে দিতে হয়। গরু'ব গলাতে বা কপালেও শালুক ফুল বেঁধে দেওয়া হয়। এব পব ফুল পাতা দিয়ে বলিব পশুকে 'চরান' হয়। গব'য়া স্ত্রী দেবতা, তাহ এই পূজোয় পাঠা বলি দেওয়া নিষিদ্ধ, এই পূজোয় 'পাঠা' ( অক্ষতবোমি ছাগী ) বলি দেওয়া হয়। যে-পাঠাটিকে বলিব জন্তু মিন্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, তাব ওপব দীর্ঘদিন ধবে নজব রাখা হয়। অস্তঃসত্বা ছাগী বলি দেওয়া শুধু নিষিদ্ধ নয়, মহাপাপ এর' অবল্যাণকব। এ পূজাব আসল লক্ষ্য গো-প্রজনন। এটি প্রজননের উৎসব। উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিব উৎসব। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, কুমাবী মেয়েরা ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাব অধিকাবী হয়ে থাকে, কুমারী কণ্ঠাদেব মধ্যে প্রজননেব ক্ষমতা যেমন সবাধিক থাকে। তেমনি তাদেব মধ্যে উর্বরতা এবং উৎপাদিকা শক্তিও থাকে অপবিমিত। তাই সমস্ত কৃষি-উৎসবেব মূল অহুষ্ঠানগুলো এই সব কুমারী মেয়েদেব ব্রত হিসেবে অহুষ্ঠিত হত। কবম পববে জাওয়া এবং পৌষ পরবে টুসুপূজো কুমাবী মেয়েদেব ব্রত। সধবাবা এই সব অহুষ্ঠানে যোগ দিলেও জাওয়া দেওয়া কিংবা টুসু পূজো কববাব অধিকার একমাত্র কুমারী মেয়েদেবই থাকে। দু'টি উৎসবই ঝাড়খণ্ডেব অন্ততম প্রধান কৃষি উৎসব বা শস্তোৎসব। একই কারণে প্রজনন ক্ষমতা, উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিব জন্তু শস্ত ক্ষেত্রে, গোয়ালে দেবতাব সম্মুখে আদিম কালে কুমারী কণ্ঠাদেব বলিও দেওয়া হত। আমাদের মনে হয় সুদূর অতীতে গর'য়ার সামনে কুমাবী কণ্ঠা বলি দেওয়া হত। যে গৃহস্থেব পাঠা বলি দেবার ক্ষমতা থাকে না, সে 'কাটুল' ( কুমারী ) মুবগী বলি দিয়ে থাকে। গোয়ালপূজোয় অসংখ্য কাটুল মুবগী বলি দেওয়া হয়ে থাকে। গরুগোয়ালের পূজা শেষ হলে মোষ গোয়ালে পূজো দেবার নিয়ম। তবে গরু-গোয়ালের পূজাই আসল পূজা।

পূজো শেষ হয়ে গেলে গৃহস্থামী ধানের শীষের মোড় বা মুকুট তৈরী করে। এই ধানের শীষ বপন করা-‘কান্তিকা’ ধানের ক্ষেত থেকে কান্তে দিয়ে কেটে নিয়ে আসতে হয়, বোপন-করা ধানের শীষ দিয়ে মোড় বানানো নিষিদ্ধ। তুলসী বৃক্ষের সন্মুখে ধোয়া চাটাই পেতে শুদ্ধ হয়ে বসে মোড় বানাতে হয়।

বিকেলে ‘গরু চূমানো’ অন্নুষ্ঠানটি পালিত হয়। এই অন্নুষ্ঠানটিকে উৎসবের প্রধান অন্নুষ্ঠান বললেও অত্যাক্তি করা হয় না। চূমানো শব্দটি চূষন শব্দ থেকে উদ্ভূত। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় এর অর্থ আশীর্বাদ করা বা পূজো করা। আসলে বরকনেকে চূমানো হয়ে থাকে। গরু চূমানো অন্নুষ্ঠানটিতেও নব-বিবাহিত গোদম্পতিকে আশীর্বাদ করা হয়। বরকনেকে যেমন গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে থাকে, এই অন্নুষ্ঠানেও শিবগাই ও শিববলদকে এক সাথে ‘বাঁধনা’ (<বন্ধন) কবে চূমানো হয়ে থাকে। আমবা আগেই বলেছি, এই ‘বাঁধনা’ অন্নুষ্ঠানটি থেকেই এই উৎসবের নাম ‘বাঁধনা পবন’ হয়ে থাকা সবচেয়ে সঙ্গত কাব্য।

সাধারণতঃ প্রথমে গ্রাম-প্রধানের বাড়িতে গরু চূমানো হয়। প্রতিবেশিনীরা সবাই এসে জড়ো হয়। আড়িনায় শিববলদ ও শিবগাইকে একটি দড়িতে বেঁধে বরকনের নিয়মমতো পাশাপাশি দাঁড় কবানো হয়। গৃহস্থামিনী নতুন কুলোয় করে চূমানোর উপকরণ নিয়ে আসে। আগের দিনের মতো একটি ঘটিতে সআত্মপল্লব হলুদ-গোলা জল থাকে। প্রথমে হলুদ-গোলা জল ছিটিয়ে গাই ও বলদের পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর ভেলাপাতাব দোনায় ধূপধুনো দিয়ে আগের দিনের মতোই ‘নিমছানো’ (<নির্মহন) হয়। তারপর গৃহস্থামিনী গাভী ও বলদের শিঙে এবং কপালে তেল মাখিয়ে দেয়, এরপর শিঙে ও কপালে সিঁছুর লেপন করা হয়, গাভী ও বলদের মাথায় ‘মোড়’ (<মুকুট) পরিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে চূমানো অন্নুষ্ঠানটি শেষ হয়। এক বাড়িতে চূমানো শেষ হয়ে গেলে সব প্রতিবেশি মিলে অন্ন বাড়িতে যায়। এই চূমানো অন্নুষ্ঠানটি যে বিবাহ-অন্নুষ্ঠান তা এর বিভিন্ন আচার থেকে সহজেই বোঝা যায়। বিবাহের অন্নুষ্ঠান ঘোঁন মিলনের, প্রজননের প্রতীক অন্নুষ্ঠান।

যতোকর্ণ ধরে চূমানো অন্নুষ্ঠান চলতে থাকে ততোকর্ণই প্রতিবেশিনীরা গান গেয়ে থাকে। আহীরা গান পুরুষেরাই সাধারণতঃ গেয়ে থাকলেও

এই অল্পষ্টানের গানগুলো কুলবধুরাই গেয়ে থাকে। তাদের পরণে থাকে নূতন বস্ত্র, মুখে থাকে পান। এই সব গানকে 'চুমানোর গান' বলা যেতে পারে। এই গানগুলো আহীবা গানেব স্নবে গাওয়া হয় না; অল্পষ্টানটি বিবাহঘটিত, তাই চুমানোর গান বিয়েব গানেব স্নবে গাওয়া হয়ে থাকে। কতকগুলো চুমানোর গান উদ্ধৃত করা হল।

২৩. ডিগিমিগি ডিগিমিগি বাজ বাজনা বে বেঁধা রাজা সাজল বৈবাত বে।  
 গাটার ভিতরে মশা যে গুঞ্জরে আমি দাদা যাব রে বৈবাত ॥  
 কতি ধুবে আঙয়ে হাতি বল ঘড়া বে কতি ধুবে আঙয়ে রে বৈবাত।  
 কতি ধুবে আঙয়ে ময়না সুন্দর সনা চাঁদ সুকজে বলমল ॥  
 আশি কশে আঙয়ে হাতি বল ঘড়া বে যা'ট কশে আঙয়ে বে বৈবাত।  
 চল্লিশ কশে আঙয়ে ময়না সুন্দর সনা চাঁদ সুকজে বলমল ॥  
 কেইসে হিঁ বাথবে হাতি বল ঘড়া রে কেইসে বাথবে বে বৈবাত।  
 কেইসে বাথবে ময়না সুন্দর সনা চাঁদ সুকজে বলমল ॥  
 বকুল তলে বাথব হাতি বল ঘড়া বে ছামড়া তলে বাথব বৈবাত।  
 মাঝা ঘবে রাখব ময়না সুন্দর সনা চাঁদ সুকজে বলমল ॥  
 কেইসে বধাবে অহিবা হাতি বল ঘড়া রে কেইসে বধাবে বে বৈবাত।  
 কেইসে হিঁ বধাবে ময়না সুন্দর সনা চাঁদ সুকজে বলমল ॥  
 ডালে-পাতে বধাব হাতি বল ঘড়া রে মুটি চিডায় বধাব বৈবাত।  
 কচ্ছাদানে বধাব ময়না সুন্দর সনা চাঁদ সুকজে বলমল ॥
২৪. কনে ত দেয় ত ভালা ঝিলিমিলি শাড়ি গ কনে ত দেয় ত খেয়ুগাই।  
 কনে ত দেয় ত ভালা দুই কানের সনা গ কনে দেয় সী'তাকে সিন্দুব ॥  
 বাপে যে দেয় ত ভালা ঝিলিমিলি শাড়ি গ মায়ে ত দেয় ত খেয়ুগাই।  
 খণ্ডবে দেয় ত ভালা দুই কানেব সনা গ তার পুতায় সী'তাকে সিন্দুব ॥  
 কেইসে বাথবে ভালা ঝিলিমিলি শাড়ি গ কেইসে রাখবে খেয়ুগাই।  
 কেইসে রাখবে ভালা দুই কানেব সনা গ কেইসে রাখবে রে সিন্দুব ॥  
 পেডি-এ যে রাখব ঝিলিমিলি শাড়ি গ গহা'লে রাখব খেয়ু গাই।  
 কানে রাখব ভালা দুই কানেব সনা গ সী'তায় রাখব যে সিন্দুব ॥  
 ছিঁ-ডি-ফাটি যায় ভালা ঝিলিমিলি শাড়ি গ মরি-হার'াই যাবে খেয়ুগাই।  
 বিকি-কিনি খায় ভালা দুই কানের সনা গ রহি যায় সী'তার সিন্দুব ॥
- ৬পবের দু'টি গানে বিবাহ-প্রসঙ্গ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে; বব, বরবাতী,

বাজ-বাজনা, হাতিঘোড়া, কল্যাণদান, সিন্দুর দান ইত্যাদি কথা যেমন আছে, তেমনি বিবাহরাত্রির ভোজের আয়োজন, যৌতুক আদি প্রসঙ্গও আছে। নারীর জীবনে দান যৌতুক ইত্যাদির ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য, কেননা এগুলো অত্যন্ত স্বল্পস্বায়ী; তার জীবনে উজ্জ্বল হয়ে থাকে শুধু সিঁথির সিন্দুব। সিন্দুরের রক্তবর্ণের মধ্যেই তার নারীত্বের সবটুকু গোঁবব নিহিত থাকে। চুম্যানো অল্পটানটি তাই শুধু বিবাহের আচার পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আচার-ঘটিত বিবাহসংগীতও খুব স্বাভাবিকভাবেই এর অঙ্গভঙ্গ হয়ে থাকে। বিবাহ-অল্পটানের মাদুলিক উপকরণেব কথাও এইসব গানে স্তনতে পাওয়া যায়। তেল হলুদ ধূপ-ধুনো সিন্দুব, নতুন কাপড়-চোপড়, ধান দুর্বা, ঝলমলে বেশবাস সব কিছুই চুম্যানো গানের উপজীব্য হয়ে থাকে।

২৫. কন মালংকাকেবি নাবায়ণ তেল গ কন মালংকা কে সিন্দুব।  
 কন মালংকাকেরি বাই যে ধুনা গ রাই ধুনায় করে মহমহ ॥  
 কুলুহ মালংকাকেবি নাবায়ণ তেল গ বাছা মালংকা কে সিন্দুব।  
 খাডিয়া মালংকাকেরি রাই যে ধুনা গ রাই ধুনায় করে মহমহ ॥  
 কেইসে রাখবে মালিন নারায়ণ তেল গ কেইসে রাখবে ত সিন্দুব।  
 কেইসে রাখবে মালিন রাই যে ধুনা গ করবে ভগবতীর পূজা ॥  
 শিঁশিতে রাখব নারায়ণ তেল গ সিন্দুর কাঁটায় রাখব সিন্দুব।  
 মাটি সরায় রাখব রাই যে ধুনা গ করবে ভগবতীর পূজা ॥

২৬. কনে কা ফুলে মালিন উটন পিঁধন গ কন কা ফুলে রে ভক্ষণ।  
 কন কা ফুলে মালিন খঁপারে চিকণ কন ফুলে রাখে রে সংসার ॥  
 কাপা কা ফুলে ভালো উটন পিঁধন গ ধান কা ফুলে রে ভক্ষণ।  
 তিল কা ফুলে ভালো খঁপারে চিকন সিঁদুর ফুলে রাখে রে সংসার ॥  
 কেইসে চিন্হবে মালিন উটন পিঁধন গ কেইসে চিন্হবে রে ভক্ষণ।  
 কেইসে চিন্হবে মালিন খঁপারে চিকন কেইসে চিন্হবে সিঁদুর ফুল ॥  
 পরুহিতে চিন্হব উটন পিঁধন গ খাইতে চিন্হব ধান ফুল।  
 মাখিতে চিন্হব খঁপা রে চিকন সীঁতাতে চিন্হব সিঁদুর ফুল ॥

পরবর্তী গানে নারীজীবনে অন্নবস্ত্রের সমস্তা, পুত্রহীনতার বেদনা এবং স্বামী-স্বর্গস্থতার কথা ফুটে উঠেছে। অন্নকথায় অন্নের বিহনে অন্ধের বিবর্ণতা, ডাঙুল বিহনে মুখের মলিনতা, সম্বান বিহনে শোকে আল্লাল্লায়িত্ত কেশ, এবং স্বামী বিহনে অন্ধকার জগৎ সংসারের চিত্রগুলি উজ্জ্বল রাখার আঁকা হয়েছে।



২৭. কিয়া বিনে গে মালিন বন্ন বিবন্ন গে কিয়া বিহু মুখ রে মলিন ।  
 কিয়া বিনে গে মালিন আউলালি কেশ গে কন লাগি ছুনিয়া আঁধার ॥  
 অন্ন বিনে গে ধনি বন্ন বিবন্ন গে পান বিহু মুখ রে মলিন ।  
 ছেল্যা বিনে গে ধনি আউলালি কেশ গে সঁয়া লাগি ছুনিয়া আঁধার ॥
- চুমানো অহুঠানে টাটকা তেলের প্রয়োজন পড়ে । গৃহস্থামিনী নতুন কাপড় পরে অঙ্গসজ্জা করে মুখে পান নিয়ে গরু চুমিয়ে থাকে । ধান-দুর্বা আতপ চাল ছিটিয়ে গো-দম্পত্যিকে চুমানো বা আশীর্বাদ কবাব নিয়ম ।
২৮. আশুর আশুর বুনিলম রাই বৃগী ধান  
 তার পেছুর বুনলম খেড়ী রে শুঁদলিয়া  
 মুখে লিলম পাকল পান খঁচলে লিলম আওয়া চা'ল  
 চলি গেলা আমার গুলিন গাইয়া চুমায় ।  
 এক চুমায় চুমালম দুই চুমায় চুমালম  
 তিন চুমায় পড়ি গেল শিরি বরদা ।  
 না কান্দ না খিজ শিরা রে ববদা  
 তর গুলিন দেয় ত দুবধান ॥

চুমানো অহুঠান ছাড়াও এই দিন আর একটি অহুঠান পালিত হয়ে থাকে । এটিও মূলতঃ মেয়েলি আচার ছাড়া কিছু নয় । এই অহুঠানটিকে বলা হয় 'চোক পুরা' । স্নান করবার সময় ধুয়ে-আনা আতপচাল ঢেঁকিতে শুঁড়ো করে নেওয়া হয় । পানিয়া লতা খেঁতলে বড়ো বাটিতে বা খাপরিতে জলে ভিজিয়ে রাখা হয় । পানিয়া লতার বস অত্যন্ত চটচটে হয়ে থাকে । পানিয়া রসের জলে চালের শুঁড়ো মিশিয়ে পিটুলি তৈরী করা হয় । বলাবাহুল্য, এই পিটুলিও চটচটে হয়ে থাকে । মেয়েরা গাঁয়ের রাস্তা থেকে ঘরের ভেতর আঙিনা সর্বত্র এই পিটুলির সাহায্যে আলপনা দিয়ে থাকে । ডান হাতের পাঁচটি আঙুল ডুবিয়ে অত্যন্ত দ্রুত ওপর থেকে মাটির ওপর পিটুলি ছড়িয়ে লতাপাতা ফুল আদির আলপনা দেওয়া হয় । এই আলপনার প্রতিটি সঙ্কীর্ণস্থলে সিন্দুর লেপন করার নিয়ম আছে । তারপর ওগুলোর ওপর গাঁয়ের রাস্তা থেকে গোয়াল পর্বস্ত ঘাস ছড়ানো হয় । গরুবাছুর ঘাস খেতে খেতে এই আলপনার ওপর হেঁটে গোয়ালে গিয়ে ঢোকে । এই অহুঠানটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র । এই সময় 'চোক পুরা' সম্পর্কিত আহীরা গানও পাওয়া হয়ে থাকে ।

২২. কন মাল্যানী ভালা গুঁড়ি যে কুটে রে কন মাল্যানে গুঁড়ি ঝাড়ে ।  
 কন মাল্যানী ভালা চোক যে পুরে রে দাঁয়ে-বাঁয়ে ফেঁকে তরু-ডাল ॥  
 বড়কী মাল্যানী ভালা গুঁড়ি যে কুটে রে মাঝলী মাল্যানে গুঁড়ি ঝাড়ে ।  
 ছটকী মাল্যানী ভালা চোক যে পুরে রে দাঁয়ে বাঁয়ে ফেঁকে তরু ডাল ॥  
 পরবর্তী গানে গৃহস্থামিনী বক্সাব এই অস্থানে শিল্প-সম্মত আল্পনা দেবার  
 আশ্চর্য ক্ষমতার জন্ম প্রশংসাবাদ আভাসিত হয়ে উঠেছে ।

৩০. ছুটুছুটু ছুটুছুটু মাল্যানের বেটি রে লেখাপড়াই সবগ পাতাল ।  
 আঁগিনাই ত লেখে ভালা চাঁদ সুরুজ রে কপাটে ত লেখে হুয়মান ॥  
 আচার-অস্থানগুলো শেষ হয়ে যাবার পর প্রতিটি গৃহস্থের বাড়িতে মহা-  
 সমারোহে ভোজেব আয়োজন করা হয় । পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনদের  
 ডেকে একসঙ্গে বসে ছাঁকা পিঠে, মাংস পিঠে, মাংস ভাত, মজা মাংস খাবার  
 ধুম পড়ে যায় । তুচ্ছ বিবোধেব অবসান ঘটিয়ে এই দিন আনন্দমুখর মাহুস  
 সবার দিকে বন্ধুত্বেব, মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দেয় । নববর্ষের আনন্দোচ্ছ্বাসের  
 সব লক্ষণ এদিন প্রকাশ পেয়ে থাকে ।

ঝাড়খণ্ডে ভ্রাতৃত্বিতীয়ার দিনটি বাঁধনা পরবের শেষ দিন বললেও চলে ।  
 এদিনটিকে বলা হয় 'বুটী বাঁধনা'; পবেব দিনেও বাঁধনা হয়ে থাকে, তাই  
 তৃতীয়ার দিনটি 'দেশ বাঁধনা' নামে পবিচিত । দ্বিতীয়ার দিনে পূর্বদিনের  
 মতো শিববলদ ও শির গাইকে 'বাঁধনা' করে নিমছানো চুমানো আচারগুলো  
 পালন করা হয় : এ খেন অনেকটা বাসি বিয়েব মতো । এই দিনেও 'চোক'  
 পুরণ করা হয়ে থাকে । পূর্বদিনের আচারঅস্থানের প্রতিটি নিয়মই এদিনও  
 পালন করা হয় । আল্পনা দেবার অতিরিক্ত কুলবধূরা এদিন খড়ি-গোলা  
 জলে ছাকড়া ডুবিয়ে দেওয়াল ও মেঝেব সঙ্কস্থলে শাড়ির পাডের মতো চওড়া  
 দাগ টেনে থাকে । এটিকে বলা হয় 'পাইড দেওয়াল' । দ্বিতীয়ার পর আর  
 কোন আচার-অস্থান পালনের বেওয়াজ নেই । তাই আস্থানিকভাবে এই  
 দিনই বাঁধনা পরবেব সমাপ্তি ঘটে থাকে ।

দ্বিতীয়ার দিন 'বুটী বাঁধনা'র দিন । বিকেল বেলা 'বাঁধনা'র অস্থান হয় ।  
 একে 'গরু খুঁটানো'-ও বলা হয়ে থাকে । দুপুর থেকেই এর আয়োজন শুরু  
 হয়ে যায় । সাধারণতঃ গ্রামের রাস্তায়, কোথাও কোথাও মার্চে, দুহু-  
 দুহু শক্ত দড়ি দিয়ে গরু-কাড়াকে বাঁধা হয় । গরু-কাড়ার শিঙে তেল-সিঁদুর  
 চকচক করে । কপালে ধানের 'মোড়' ঝিলমিল করে, গলায় দোলে গাঁদা  
 ঝা.—২

ফুলের মালা। সারা গায়ে রঙ-বেরঙের নানা ধরনের ছাপ। চতুর্দিকে টোল ধমসা মাদলের গুরুগম্ভীর বাজনা। গৃহপালিত পশুগুলো তাই এই দিন খুব স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে থাকে। তাদের উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলবার জন্তু তাদের গলাতেও পরিষে দেওয়া হয় ঘাঘর ঘাঁটি শুঙুরের মালা, যতোই উত্তেজিত হয়ে ছটকট করে ততোই গলার ঘাঘর-ঘাঁটি ঝনঝন করে বেজে ওঠে। এই অহুষ্ঠানটিকে বলা হয় বাধনা ( < বন্ধন )। এই অহুষ্ঠানটি থেকেও বাধনা পরবের নামটি এসে থাকতে পারে। এইটি উৎসবের অগ্রভঙ্গম প্রধান অহুষ্ঠান বলেই 'বুটী বাধনা' 'দেশ বাধনা' নামগুলো ব উদ্ভব হয়েছে।

গরু-কাড়াগুলোকে খুঁটিতে শক্ত করে বাধবাব পর গরু-খেলানো আরম্ভ হয়ে যায়। টোল মাদল-ধমসা বাজিয়ে আহীরা গান গেয়ে-গেয়ে উদ্ভাল মাতাল জনতা এগিয়ে আসতে থাকে। তাদের বিচিত্র বেশবাস, টেলোমলো এলোমলো ভঙ্গি, হাতের গরু-মোষের শুকনো চামড়া কি লাল শালু, বস্তা আদি দ্রুবে থেকে দেখেই পশুগুলো ভীষণ রকম উত্তেজিত হয়ে ছটকট করতে থাকে। খুঁটির চারপাশে চরকির মতো পাক খেতে থাকে। কখনো শিং দিয়ে মাটি খোঁড়ে, কখনো পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হংকার তোলে। এই সব উত্তেজিত শৃঙ্গী পশুগুলোকে খেলানো সহজ কথা নয়; তাই মানুষগুলো মদের হাঁড়িয়ার নেশায় চুর হয়ে এই বিপজ্জনক খেলায় নেনেমে থাকে। প্রায়ই গরু কাড়ার গুঁতো-লাধি খেয়ে মাতালেরা আহত হয়ে থাকে, কোথাও কোথাও প্রাণ নিয়েও টানাটানি দেখা দেয়। এই অহুষ্ঠানে মাতাল জনতাও যেন অনেকটা হিংস্র হয়ে ওঠে। গরু-মোষকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে হিংস্র করে তোলে। এই অহুষ্ঠানের প্রয়োজন কোথায়? এ-ব্যাপারে অনেকে অনেক কিছুই বলে থাকেন। কেউ বলেন, এটা নিছক খেলা মাত্র; কেউ-বা বলেন, হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষায় যাতে গৃহপালিত পশুগুলো সক্ষম হয়, তাই এই ভাবে বেঁধে খেলিয়ে তাদের লড়াই শেখানো হয়। আমাদের মনে হয়, এই ব্যাখ্যাগুলোর কোনটাই ঠিক নয়। গভীরে অল্প কোন অর্থ লুকিয়ে থাকারটাই স্বাভাবিক। আগেই বলা হয়েছে, কৃষিজীবী মানুষের ভাবনায় ঘাঁড়ের পবিভ্রতা অত্যন্ত বেশি, বলা যেতে পারে অপরিসীম। সমগ্র গোষ্ঠীর লোকদের সাধ-আহ্লাদ এই ঘাঁড়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে থাকে। একই ভাবে শিকার জীবীদের কাছে ভালুক এবং অরণ্যচারীদের কাছে বৃক্কও অত্যন্ত পবিভ্র

বস্তু । জেন হ্যারিসন বলেন, Bear and Bull and Tree are sacred, that is, set apart, because full of a special life and strength is desired. They are led and carried about from house to house that their sanctity may touch all, and avail for all ; the animal dies that he may be eaten ; the Tree is torn to pieces that all may have a fragment, and above all, Bear and Bull and Tree die only that they may live again.<sup>e</sup> পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কেন কুবিজীবী মানুষেরা গরুজাতির প্রতি এতো আস্থাশীল । গো-জাতিকে পবিত্র পশু হিসেবে সম্রাজ্ঞ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয় যাতে তাদের কাছ থেকে গোষ্ঠীর সবাই পবিত্রতা লাভ করা তো বটেই, তদুপরি বিশিষ্ট জীবন এবং শক্তি লাভও করতে পারে । এই পবিত্র পশুকে হত্যা করে তার মাংস গোষ্ঠীর প্রত্যেকে ভক্ষণ করে থাকে, কারণ তাতে গোষ্ঠীর সবাই এক বিশেষ ধরনের জীবন এবং ক্ষমতা অর্জন করে । পবিত্র পশুর মৃত্যু ঘটানো হয়, কারণ তাতে পশুটি পুনর্জীবন লাভ করে । প্রকৃতির মধ্যে মৃত্যু ঘটে, কারণ তারই মধ্য দিয়ে পুনর্জন্মের ভিত্তিও রচিত হয় । আমাদের বিশ্বাস, সুদূর অতীতে ঝাড়খণ্ডেও এই ঝাড়া পরবে ঝাঁড় হত্যা করে গোষ্ঠীর প্রত্যেকে তার মাংস ভক্ষণ করত । গরু-খুঁটানো অহুষ্ঠানটি অতীতে ঝাঁড়কে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে হত্যা করার স্মৃতিই বহন করে চলেছে । অনেকে ঝাঁড় হত্যা করে ভক্ষণের কথায় শিউরে ওঠেন । তাঁদের বক্তব্য, এই অহুষ্ঠানে গো-হত্যার কথা ভাবা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক ; কারণ, যে গো-জাতির পূজা এবং বন্দনা করা হয়, তাদের হত্যা করার কথা অকল্পনীয় । কিন্তু আদিম মানুষের ভাবনার গভীরে প্রবেশ করলেই বোঝা যাবে, এটি ভ্রমাত্মক তো নয়ই, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার । যা কিছু পবিত্র, তার স্পর্শ অস্ত্রের শবীরে পবিত্রতা সঞ্চার করতে পারে ; যার মধ্যে বিশিষ্ট জীবন এবং ক্ষমতা আছে, তার মাংস ভক্ষণের ফলে সেই বিশিষ্ট জীবন এবং ক্ষমতা লাভ করা যায়, লোক-ভাবনার এই বিশেষ দৃষ্টিকোণটি অনুধাবন করলে পবিত্র পশুহত্যা এবং তার মাংসভক্ষণ ব্যাপারটি খুবই সংগত এবং স্বাভাবিক বলে মনে হবে । মনে রাখতে হবে, আদিম মানুষের ভাবনায় আত্মসংরক্ষণের চেয়ে বড়ো প্রশ্ন

আর কিছু ছিল না। সন্তান এবং ফসল উৎপাদন ছাড়া অল্প কোন প্রসঙ্গ তাদের কোনদিনই আকৃষ্ট করে নি। ফসল উৎপাদনের জন্তু গো-জাতির ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের গত্যস্তুর ছিল না। মানুষের বংশবৃদ্ধির জন্তু যেমন সন্তানোৎপাদনের প্রয়োজন, তেমনি গো-জাতির বংশবৃদ্ধির জন্তু তাদের প্রজননের প্রয়োজন। গোজাতির প্রজনন এবং সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্তুই এই বাঁধনা পরব। বিবাহ আদি কতকগুলো আচার পালনের মধ্য দিয়ে আদিম মানুষ গো-জাতির মধ্যে অলৌকিক উপায়ে প্রজনন এবং সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা ত্বরান্বিত কবত। তাই বাঁধনার আচার-অনুষ্ঠানগুলো অনেকাংশে জাদু-ক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়; তেয়ি পবিত্র পশু বাঁডকে হত্যা করে ভক্ষণ করার মধ্যে ঐশ্বরিক উপায়ে বাঁডের পবিত্রতা, প্রজননক্ষমতা, দৈহিক শক্তি ইত্যাদি মনুষ্যশরীরে সঞ্চারিত হওয়ার কথায় আদিম মানুষ বিশ্বাস কবত।

অতঃপর আমবা গরু-খুঁটানোব গান নিয়ে আলোচনা কবব। বেশিব ভাগ গানই প্রমোক্তবমূলক, কিন্তু গাইয়েদেব মধ্যে কবি-গানের মতো কিংবা তর্জনা গানের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব থাকে না। একই ব্যক্তি গানেব প্রম্ন এবং উত্তব দু'টি অংশই গেয়ে থাকে, কখনো কখনো সম্মিলিত কণ্ঠে এ গান গাওয়া হয়ে থাকে। জাগবণেব এবং গরু খুঁটানোব আহীরা গানের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সূক্ষ্ম সীমাবেথা থাকে না। তাই একই গান জাগরণের সময় এবং গরু খুঁটানোর সময় গীত হতে শোনা যায়। সব সময় যে গানেব বিষয়বস্তু গরুকাড়া হয়ে থাকে, তা নয়; কখনো কখনো মনুষ্য, অত্যাচার প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগৎও গানের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। তবে মনুষ্যতর প্রাণীর প্রসঙ্গই এ গানে সর্বাদিক লক্ষ্যগোচর হয়। আদিম মানুষের পারিপার্শ্বিক জীবজগৎ এবং উদ্ভিদজগৎ সম্পর্কিত অত্যন্ত সহজ সরল অভিজ্ঞতাগুলোই আহীরা গানে বিদ্যুত হয়ে আছে।

গরু-খেলানো দলটি নেচে-গেয়ে যখন কোন খুঁটানো বলদের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন তারা ঢোল-ধমসা-মাদলের বাজনায সম্মিলিত গানে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে বলদ বা বাঁডটিকে উত্তেজিত করে তোলে। 'শ্রীবরদা'র সম্মুখে দাঁড়িয়ে তারা গো-জাতি-সম্পর্কিত গান গাইতে শুরু করে। গরু-খেলানো এবং কাড়া-খেলানো গান আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। তবে অনেক সময়ই একই গানের বলদ বা কাড়া শব্দটি বদলে উভয় ক্ষেত্রেই গাইতে শোনা যায়। প্রথমে গরু-খেলানো গান নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

৩১. কনে ত ছাঁচয়ে কনে ত ছুলয়ে কনে ত গাড়ে মাল খাম ।

সেই খামে বাধব কনে কা পুতা হো মাইরে ত ধুলা উড়ি যায় ॥

ঈশ্বরে ছাঁচয়ে মাহাদেবে ছুলয়ে মানমী-এ গাড়ে মাল খাম ।

সেই খামে বাধব কপিলা কা পুতা হো মাইরে ত ধুলা উড়ি যায় ॥

ঈশ্বর মাল খাম (<মল্লস্তু ?) ছাঁচলেন, মহাদেব ছুললেন এবং মাছুষ সেই খুঁটা মাটিতে পুঁতল । সেই মাল খুঁটায় বাধা কপিলাপুত্র ষাঁড় নেচে-খেলে চাবপাশ ধুলোয় ভবে তুলল । এখানে মাল খাম শব্দটি লক্ষণীয় ; মল্লকীড়ার খুঁটিতে ষাঁড়কে বেঁধে একদা খেলা অথবা লড়াই করা হত বলে মনে হয় ।

পববর্তী গানে বলা হয়েছে, শিখবভূমে বলদের জন্ম, ববভূমে তার গৃহবাস, বাগালেব হাতে তাব লালনপালন আর গোয়ালিনী (এখানে গৃহস্থামিনী) তার নাম রেখেছে ভোমবা ।

৩২. কন ঠিনে বে বরদা তোহরি জন্ম রে কন ঠিনে লিলি গিরহবাস ।

বার হাতে রে বরদা লালন পালন বে কেহু ত ধরে ভমরা নাম ॥

শিখর ভুঁই-এ বে বরদা তোহরিজন্ম রে বরহাভুঁই-এ লিলি গিরহবাস ।

বাগালের হাতে বরদা লালন পালন রে শুলিনে ত ধরে ভমরা নাম ॥

কালো গাই ছুলালী হয়, ধবলী গাই দেখতে সুন্দরী হয়, রাঙী গাই দেখতে যেমন রূপসী তেমনি সোনার পাত্র ভরে দুগ্ধদানেও পারদর্শিনী ।

৩৩. কন যে গাই ভালা উলালী ছুলালী-রে কন গাই ও দেখিতে সুন্দর ।

কন গাই যে ভালা বড় রূপসিনী গ সনার কটোবায় দুধ দেয় ॥

কাঠলী যে গাই ভালা উলালী ছুলালী বে ধলী গাই দেখিতে সুন্দর ।

বাঁগী যে গাই ভালা বড় রূপসিনী গ সনার কটোরায় দুধ দেয় ॥

কাড়া বা মোষ বলদের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর পশু । ক্ষমতার যেমন বিপজ্জনক, তেমনি তাব উত্তেজিত উন্নত চেহারাও অত্যন্ত ভীতিপ্রদ । হিন্দু পুরাণে এই মোষই সাক্ষাৎ মৃত্যুর দেবতা যমের বাহন, তাই মালখুঁটায় কাড়া বেঁধে তাকে খেলানো অত্যন্ত বিপজ্জনক । প্রায়শঃই মাতাল ধাঁগড়িয়ারা মোষের আঘাতে ধায়ল হয়ে থাকে । নিচে কয়েকটি মোষ-খেলানোর গান উদ্ধৃত করা হল ;

৩৪. কিয়া বরণ কাড়া তরি আট অজ রে কিয়া বরণ দুই শিক ৪০০

কিয়া বরণ কাড়া তরি দুই আঁধি রে কিয়া বরণ চারি পা বে ॥

তামাল বরণ কাড়া তরি আট অজ রে কায়া বরণ দুই শিক ।

কাজল বরণ কাড়া তরি দুই আঁধি রে উখল বরণ চারি পা যে ॥  
 কিসে সাজাব কাড়া তরি আট অঙ্গ রে কিসে সাজাব দুই শিক ।  
 কিসে সাজাব কাড়া তরি দুই আঁধি বে কিসে সাজাব চারি পা যে ॥  
 শুঁড়ি-এ সাজাব তরি আট অঙ্গ রে সিন্দুরে সাজাব দুই শিক ।  
 কাজলে সাজাব কাড়া তরি দুই আঁধি বে নেপুরে সাজাব চারি পা যে ॥

৩৫. কন মাসে রে কাড়া ধুলায় ধুমুর রে কন মাসে লিলি কাটা লেওয়া ।  
 কন মাসে বে কাড়া মইলকৈ বাহিরালি কন মাসে লিলি ষাড়ে দড়া ॥  
 চ'ৎ বৈশাখ মাসে ধুলায় ধুমুর রে আষাঢ় মাসে লিলি কাটা লেওয়া  
 আশিন মাসে রে কাড়া মইলকৈ বাহিবালি কাঙ্কিক মাসে লিলি ষাড়ে  
 দড়া ॥

গরু-খেলানো বা কাড়া খেলানো বিশিষ্ট গানের অতিবিক্ত আবেগে বিভিন্ন  
 বিষয়বস্তু আহীরা গানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে । বলা যেতে পারে, গরু-  
 কাড়া প্রসঙ্গবজিত আহীরা গানের সংখ্যাই বেশি । গরু কাড়া নির্বিশেষে  
 এই সব গান গেয়ে খেলানো হয়ে থাকে । গরু-কাড়ার কথা থাকলেও এই  
 সব গানে তাদের প্রাধান্য থাকে ন । অত্যান্ত মনুষ্যত্ব প্রাণীর সঙ্গে তাদের  
 প্রসঙ্গও গানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে ।

৩৬. কেহ ত পুষে ভাল লাল নীল পাখি বে কেহ ত পুষে খেহু গাই ।  
 কেহ ত পুষে ভাল রাডাবাম্প কাড়া জন্ডি ক্ষেতে দেয় ত ঠেসাঁই ॥  
 রাজায় ত পুষে ভাল লাল নীল পাখি বে রাণীএ ত পুষে খেহু গাই ।  
 চাষায় ত পুষে ভাল রাডাবাম্পা কাড়া জন্ডি ক্ষেতে দেয় ত ঠেসাঁই ॥  
 লক্ষণীয় রাজা-বাণী অল্প আয়াসে লালিত প্রাণী পোষণে কিন্তু চাষীকে পুষতে  
 হয় এমন প্রাণী যার উদবপূরণের ভাবনা তার কাছে এক রীতিমতো সমস্ত ।  
 তাই মোষ-কাড়াকে ছেড়ে দিতে হয় 'জন্ডি' ক্ষেতে বা জলা তৃণভূমিতে ।

৩৭. কেহ ত আনে ভাল লতা বল পাতা রে কেহ ত আনে কাটা-লেওয়া ।  
 কেহ ত আনে ভাল বাঁধনা পরব রে ঘরে ঘরে গরয়া ঠাকুর ॥  
 মৈষ্ ধনি আনে লতা বল পাতা রে কাড়ায় ত আনে কাটা-লেওয়া ।  
 গাই ধনি আনে ভাল বাঁধনা পরব বে ঘরে ঘরে গরয়া ঠাকুর ॥

৩৮. কনে ত খুজে ভাল চৈত বৈশাখ গ কনে ত খুজে আষাঢ় মাস ।  
 কনে ত খুজে ভাল গলা কাঙ্কিক মাস যে পহঁচল ঋতকেরি দিন ॥

শিগিরি বরদায় খুজে ভাল। গলা কান্তিক মাস যে পহঁ'চল ঋতকেরি দিন ॥

কেই সে চিনবে বাবু চৈত বৈশাক গ কেই সে চিনবে আষাড় মাস ।

কেই সে চিনবে বাবু গলা কান্তিক মাস যে পহঁ'চল ঋতকেরি দিন ॥

ধূলায় চিনব বাবু চৈত বৈশাক গ কাদায় চিনব আষাড় মাস ।

ধান ফুলে চিনব গলা কান্তিক মাস যে পহঁ'চল ঋতকেরি দিন ।

গানটিতে বিভিন্ন পশুর বিভিন্ন ঋতুতে স্বচ্ছন্দ বিহারের কথা বলা হয়েছে । ছাগল শুকনো খটখটে জমি পছন্দ করে, তাই তাদের প্রিয় সময় হল চৈত্র-বৈশাখ মাস ; মোষ-কাদা কাদা মাটি পছন্দ করে, তাই তাদের প্রিয় সময় হল আষাঢ় মাস বা বর্ষাকাল ; গরু-বলদ খরা বা বুষ্টি কোনটাই পছন্দ করে না, তাদের পছন্দ প্রচুব সবুজ ঘাসে-ঢাকা ভেজা মাটি—তাই তাদের প্রিয় কার্তিক মাস । এ মাস তারা চেনে কি ভাবে ? চারপাশে ধূলো উড়তে থাকলে তা চৈত্র-বৈশাখ, কাদা দেখলেই বোঝে আষাঢ় মাস আর বিলেক্ষেতে সর্বত্র ধানের ফুল দেখে বোঝে সময়টা কার্তিক মাস—যখন চার পাশে আনন্দের বাজনা বেজে ওঠে আর বাঁধনা পরব এগিয়ে আসে ।

৩০. কন মরিলে ভাল। ঘুরি ফেরি আসে বে কন মরিলে নাহি ঘুরে ।

বনেকেরি কাঠপাত গাঁয়েকেরি আশুন খসি খসি পড়ে ত আঁগার ॥

পরব মরিলে ভাল। ঘুরি ফেরি আসে রে মানমী মরিলে নাহি ঘুরে ।

বনেকেরি কাঠপাত গাঁয়েকেরি আশুন খসি খসি পড়ে ত আঁগার ॥

কে মারা গেলে আবার ফিরে আসে, কে মারা গেলে আর ফিরে আসে না ? বনের কাঠ-পাতা আর গাঁয়ের আশুন দিয়ে রচিত চিতা থেকে শুধু জলন্ত অক্ষর খসে-খসে পড়ে । পরব মারা গেলেও ( অর্থাৎ পরব শেষ হলেও ) আবার পরের বছর ফিরে আসে, কিন্তু মাহুঘ মারা গেলে আর ফেরে না : বনের কাঠ আর গাঁয়ের আশুন দিয়ে রচিত চিতা থেকে শুধু জলন্ত অক্ষর খসে-খসে পড়ে । গানটিতে মাহুঘের নখর জীবনের কিছুটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আছে । কিন্তু তবু ঝাড়খণ্ডী মাহুঘের জীবনে আনন্দ-উৎসব তাকে স্মৃত্যু চেতনার বিঘাড়ে স্নান হতে দেয় না । এখানকার মাহুঘ তাই আনন্দ-উৎসবকে আখাহন জানাবার জন্ত সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকে । বাঁধনা পরব ফুরিয়ে গেলেও সে জানে আবার সে পরব ঘুরে-ফিরে আসবে, আবার তারা আনন্দ-উৎসবে মত্ত হবার অবকাশ পাবে—

পরব মরিলে ভাল। ঘুরি ফেরি আসে রে ॥



॥ সাত ॥

## টুঙ্গু গীত

টুঙ্গুগীত ঝাড়খণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক উৎসব, বলা যেতে পারে জাতীয় উৎসব, মকর পরব উপলক্ষে গাওয়া হয়ে থাকে। মকর পরব টুঙ্গু-পরব নামেও পরিচিত। বলা বাহুল্য, এই উৎসবটিও শস্তোৎসব, অনেকের মতে ফসল তোলার উৎসব (Harvest Festival)। এই উৎসবটি ঝাড়খণ্ডের নববর্ষোৎসবও বটে, কৃষিবর্ষ এখানে পয়লা মাস থেকে আরম্ভ হয়ে থাকে। কিন্তু সবার উপরে এই উৎসবে যাব প্রাধান্য তা হল টুঙ্গু। টুঙ্গু পূজা উপলক্ষে টুঙ্গুগীত গাওয়া হয়ে থাকে। টুঙ্গুগীত ঝাড়খণ্ডের সবচেয়ে নিরংলকার, প্রাণ-তপ্ত গীত। অল্প কোন গীতে একটা অঞ্চলের জাতীয় জীবনকে এমন সামগ্রিকভাবে পাওয়া যায় না, যেমনটা পাওয়া যায় টুঙ্গুগীতে। টুঙ্গুগীতের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্বেল সুর-ঝংকারে সারা ঝাড়খণ্ড অজ্ঞান সংক্রান্তি থেকে মকর পরব পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে যে-ভাবে প্রাণচঞ্চল হয়ে থাকে, তেমনটি খুব কম উৎসবেই খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার শারদোৎসবের প্রাণচাঞ্চল্যও এর কাছে ম্লান মনে হয়। এই টুঙ্গুকে কেউ-কেউ ব্রত বলবার পক্ষপাতী, যদিও টুঙ্গু পূজায় উপবাস কিংবা প্রার্থনার মন্ত্র বা ছড়া নেই। তবে টুঙ্গু পূজা যে আচাবঅস্থান-মূলক শস্তোৎসব তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমবা প্রথমে টুঙ্গু পরবের এই সব বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

ঝাড়খণ্ডে সাধারণতঃ অজ্ঞান সংক্রান্তির মধ্যই ফসল তোলার কাজ শেষ হয়। এই অজ্ঞান সংক্রান্তিকে বলা হয় ‘চাঁউড়ী’ (<চাউনী?) বা ‘ছট মকর’। এ-দিনও ঝাড়খণ্ডে পিঠে করে খাবার নিয়ম আছে। এই দিন সন্ধ্যা থেকেই টুঙ্গুসংগীত অস্থলীলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়ে থাকে। সারা পৌষ মাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা টুঙ্গুগীতের চর্চা করে থাকে। পৌষ পরবে এই সঙ্গীতচর্চার সমাপ্তি ঘটে; তবে কোথাও কোথাও শ্রীপঞ্চমীতেও টুঙ্গুপূজা করে টুঙ্গুগীত গাওয়া হয়ে থাকে। মকর পরবের আগের দিনটিকে ঝাড়খণ্ডে ‘বাউড়ী’ (<বাউনী?) বা ‘সৈদেশ’ অর্থাৎ সন্দেশের দিন বলা হয়। এই দিন সন্ধ্যাবেলা মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পিঠে-পুলির প্রচুর আয়োজন করা হয়। এই রাত টুঙ্গু জাগরণের রাতও বটে, তাই সংগীতের

সুরে-সুরে সাবা ঝাড়খণ্ড যেন জেগে থাকে। এ-গানে বাস্তব জীবনের নানা কামনা - বাসনার কথা, কুংসা আর দেহমিলনের কথাও অনাবৃত ভাবে প্রকাশ পায়। ওদিকে সারা বাত ধবে ছেলেরাও টুঙ্গীতে, অধুংসবে সচকিত কবে বাঞ্চে সমগ্র জনপদকে। পবেব দিন মকর সংক্রান্তি। সেদিন ভোব বাত্রি থেকে স্নানের ধুম পড়ে যায়। স্নান না করে জল গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। স্নানান্তে নূতন বস্ত্রপরিধানের নিয়ম আছে। ঝাড়খণ্ডে অণ্ড কোন উৎসবে নূতন বস্ত্র পরিধান সর্বজনীন নয়, যাদের অর্থবল নেই, তারা অস্বতঃ গেলি কি গামছা কি এক টুকরো নতুন কাপড় শরীবে জড়িয়ে থাকে। স্নানান্তে অণ্ড কোন খাণ্ড্রব্য গ্রহণের আগে তিলের বীজ খাবার বীজ আছে। উল্লিখিত আচাৰগুলো শুধু যে কৃষি-সম্পর্কিত তা নয় ওগুলো নববর্ষের আচাৰও ঘটে। আচাৰ যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি বলেন, ‘যোলশত বৎসব পূবে পৌষ সংক্রান্তিৰ দিন উত্তবায়ণ আবস্ত হইত। পবদিন ১লা মাঘ নূতন বৎসরের প্রথম দিন। সেদিন আমরা দেব-খাতে প্রাতঃস্নান কবি। লোকে বলে মকব স্নান।’ তাঁব মতে ৩১২ খৃষ্টাব্দে পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তবায়ণ হইত। মকর পবয যে ঝাড়খণ্ডেব নববর্ষ উৎসব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নববর্ষোৎসবেব প্রতিটি লক্ষণই মকব পববেব বিভিন্ন আচাৰ - অলুষ্ঠানেব মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে।

পয়লা মাঘ নববর্ষের প্রথম দিন। ঝাড়খণ্ডে এই দিনটিকে ‘আখিয়ান খাত্রা’ বা ‘খাত্রা’ বলা হয়। ‘আখিয়ান’ শব্দটি ‘অক্ষ-অয়ণ’ শব্দজাত বলে মনে হয়। অক্ষ অর্থে সূর্য এবং অয়ণ অর্থে গতি অর্থাৎ সূর্যের গতি। খাত্রা অর্থে গমন, বলাবাহুল্য সূর্যেরই গমন। এখানে উত্তরায়ণের কথাই প্রকাশ পেয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য আখিয়ান শব্দের উৎপত্তি অর্ক-অয়ণ থেকেও এসে থাকতে পারে, অর্ক একই, সূর্যের গতি।

পয়লা মাঘ সূর্যের উত্তরায়ণ এবং নববর্ষের প্রথম দিনই শুধু নয়, ঝাড়খণ্ডে এই দিনটি কৃষিবর্ষের প্রথম দিনও বটে। এই দিনটিকে তাই ‘হালপুণ্যা’ (‘হালপূর্ণ’ শব্দসজ্জাত হতে পারে) বলা হয়। এদিন বছরের প্রথম হালচালনা অলুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হয়। বাধনা পরবের গরয়া পূজার দিন লাঙল-জোয়াল ধুয়ে মাচাব উপরে তুলে রাখা হয়; হালপুণ্যের দিনের আগে মাটিতে নামানো নিষিদ্ধ। তাই এই দিন লাঙল নামিয়ে বছরের প্রথম হালচালনা করা হয়।

ওপরে দেখানো হল মকর পরব শুধু নববর্ষোৎসবের স্মৃতিই বহন করছে না, কৃষিবর্ষোৎসবও এর মধ্যে নিহিত আছে। অল্প কথায় এই উৎসব শস্তোৎসবও বটে। কেউ কেউ বলেন, এটি ফসল তোলার উৎসব। ঝাড়খণ্ডে অত্রাণ সংক্রান্তির মধ্যে সাধারণতঃ ফসল তোলার কাজ শেষ হয়ে যায়। টুসুগীতের উদ্বোধন যখন করা হয়, তখন চারপাশে শূন্য মাঠ খাঁ খাঁ করতে থাকে। মকর-পরবের ফসল তোলার কথা তো ওঠেই না। এদিক দিয়ে বিচার করলে একে সরাসরি ফসল তোলা উৎসব বলা চলে না। তবে যেহেতু এই সময় সবাব ঘরেই নতুন ফসল উঠে থাকে, তাই ফসল কাটা উৎসব বললে খুব একটা ভুল বলা হয় না। টুসু পরব যে আদিম শস্তোৎসব তাতে স্থিমত থাকতে পারে না। তাই টুসুকে পৌয়লক্ষ্মী রূপে ধারা দেখতে চান, তাঁরা এই আদিম শস্তোৎসবকে অস্বীকার করে টুসুকে আধদেবীত্ব দান করে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে ফল বলে প্রতিপন্ন করতে চান। কিন্তু টুসু প্রতিষ্ঠাব উপকরণগুলো, যার মধ্যে মুখ্য হল নতুন ধানের তুষ, গোবর ইত্যাদি, স্পষ্টতঃ প্রমাণ করে যে সাব মাটি দিয়ে উর্বরতা সৃষ্টিব কামনাই টুসুকে উর্বরতাবাদেব প্রতীকে পবিত্র করেছেন। উক্তিব স্কুমার সেনও একে শস্তোৎসব হিসেবে গ্রহণ করে বলেছেন, টুসু উৎসব তিষ্ঠানক্ষত্রে অনুল্লিখিত শস্তোৎসবের প্রবহমান ধারা।

টুসুর রূপ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও মাটির সরার মধ্যে তুষ আব পিটুলিগোলা-ছেটানো গোবরের নাড়ু রাখা হয়, কোথাও বা ছোট কুণ্ডের মধ্যে গোবর রাখা হয়, কোথাও বা বাঁশের 'ডালির' (ছোট ডালা) ভেতর তুষ আর গোবর নাড়ু রাখা হয়, কোথাও দেখতে পাওয়া যায় রঙিন কাগজ আব সোলা কাঁক দিয়ে তৈরী চৌড়ল বা চতুর্দোলা। ধলভূম এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে বর্তমানে ভাদুর অনুরোধে টুসুর মূর্তিপূজা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, মূর্তিগুলো পুতুলের মতো, বিভিন্ন ধরনের মূর্তিব ওপর হিন্দুদেব দেবীমূর্তির প্রস্তাব সহজেই নজরে পড়ে। তবে মূর্তির চল হলেও সরার মধ্যে তুষ, গোবরের নাড়ু পিটুলির নাড়ু রেখে পূজা করা হয়। কয়েক দশক আগে ধলভূম-ঝাড়গ্রামেও চৌড়ল প্রচলিত ছিল।

টুসু শব্দটি যে তুষ শব্দ থেকেই এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধানের তুষ জাদুক্রিয়াব যেমন অঙ্গ তেমনি মৃত ধানেরও প্রতীক। টুসুকে জলে

বিসর্জন দেওয়ার অর্থ হল তাকে কবর দেওয়া। আদিম মানুষ মৃত্যু এবং পুনর্জন্মকে পবম্পব সম্পর্কযুক্ত দুটি ঘটনার অতিরিক্ত কিছু মনে করত না। জাওয়া এবং টুসু ঝাডখণ্ডেব দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শস্ত্রোৎসব। জাওয়া (<জাত) উৎসবে শস্ত্রোৎপাদনেব জাডু-আচার পালন করা হয়ে থাকে। জাওয়া তাই শস্ত্রেব জন্মোৎসব। আদিম মানুষ প্রকৃতিতে বিচিত্র লীলাপ্রকাশ দেখত। গাছপালা লতাগুল্য এক বিশেষ সময়ে জন্মগ্রহণ করে, আবার এক সময় শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু কিছু কাল বাদে আবার চারা গজিয়ে ওঠে। এই দেখেই তারা জন্ম মৃত্যু এবং পুনর্জন্মকে একসূত্রে গ্রহণ কব পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস কবতে আবম্ব কবে। এই জগুই প্রকৃতিতে মৃত্যু দেখে মাটেই আশাহীন হত না। তাই মৃত্যু সম্পর্কিত উৎসবেও তারা জীবনেব আনন্দ-গান করত, কারণ তাবা জানত, বৃক্ষলতাগুল্য জীবজন্তু মানুষের মৃত্যু খটে এই কারণেই যে তাবা পুনর্জীবন লাভ করবে। এই লোশবিশ্বাসেব অন্তর্গত জন্ম-মৃত্যু দু'টি ঘটনা জাওয়া এবং টুসুব মধ্য দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে। জাওয়া শস্ত্রেব জন্মোৎসব এবং টুসু মবণোৎসব। In hot countries the seeds sprang up rapidly, but as the plants had no roots they withered away quickly. At the end of the eight days they were carried out with the images of the dead Adonis and thrown with them into the sea or springs.১ জেন হ্যাঁবসনের এই বক্তব্যেব কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখলে জাওয়া পববকে মোটেই এ্যাডোনিস-তত্ত্ব থেকে পৃথক মনে হবে না। জাওয়া ডালিব মধ্যে বালির ওপব বিভিন্ন শস্ত্রবীজ বপন করে হলুদ-গোলা জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ জাওয়া মূল পরবের সাত দিন আগে দেওয়া হয়। তারপর কবম পববেব পরদিন জাওয়ার চারাগুলোকে করম-ডালসহ জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। চারাসহ এ্যাডোনিস-এর বিসর্জন এবং চারাসহ করমের বিসর্জন কোনক্রমেই ভিন্ন বস্ত্র হতে পারে না। অল্পঠানটির মধ্য দিয়ে উদ্ভিদজগতের রহস্যই ফুটে উঠেছে, স্বল্পকালীন অস্তিত্বের পর মৃত্যু খটে কিন্তু সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই পুনর্জীবনও যেন আভাসিত হয়ে ওঠে।

১ The Ancient Art and Ritual J. E. Harrison P 55

টুঙ্গ পরব শশুর মরণোৎসব। তুষ থেকে টুঙ্গ শব্দের উদ্ভব; তুষ মৃত ধানের প্রতীক। কিন্তু টুঙ্গ উৎসব কোনক্রমেই শোক-উৎসব নয়, বরং টুঙ্গ উৎসব ঝাড়খণ্ডের সবচেয়ে প্রাণবন্ত উৎসব। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি মতোই গাছ-গাছড়ার জন্ম মৃত্যু পুনর্জন্ম যে এক সূতোয় বাঁধা তা আদিম জনতার কাছে স্পষ্ট হয়েছিল। তাই পুনর্জন্মের সম্ভাবনাকে তীব্রতর এবং স্বরাষিত করবার জন্তু বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক আচার পালন করত। মৃত্যু অমুষ্ঠানের মধ্যেও তাই উর্বরতা-বৃদ্ধির ব্যগ্রতাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। মৃত ধানের প্রতীক তুষেব সঙ্গে গোবব, পিটুলি গোলা, হলুদ জল, গাঁদা ফুল আদি ঐন্দ্রজালিক উপকরণ মিশিয়ে উর্বরতা বৃদ্ধি এবং শশুর পুনর্জীবন লাভেব কামনা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কুমাবী মেয়েদেব মধ্যে উর্বরতাবাদেব প্রজন্মন ক্রিয়া, শশুরোৎসব আদি গুণগুলো সর্বাধিক থাকে বলে লোকবিশ্বাস আছে, আর তাই ঝাড়খণ্ডের দুটি শ্রেষ্ঠ শশুরোৎসব জাওয়া এবং টুঙ্গ মধ্যে কুমাবীকন্যাদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। জাওয়া মতোই টুঙ্গ পূজায় একমাত্র কুমাবী মেয়েদেবই অধিকার। যৌনতার শিথিলতা এই উৎসবেও দেখা যায়, গানের মধ্য দিয়েও এই দেহ মিলনেব উত্তপ্ত আকাজ্জা নিবাবরণ ভাষায় প্রকাশ পেয়ে থাকে। সাবা বাত্রি মৃত শশুর ডালিকে কেন্দ্র কবে কুমারী মেয়েরা যে আচার পালন কবে তা মৃত শশুর মধ্যে প্রাণসংকাবে এবং উর্বরতা বৃদ্ধি কামনাতেই করে থাকে। টুঙ্গ বিসর্জনেব সময় খই ছড়ানো নিয়ম আছে, যা আমাদের শবযাত্রাব আচারেব কথা স্মরণ কবিয়ে দেয়। কোথাও কোথাও টুঙ্গ চৌডল-এব চাব কোণে দড়ি বেঁধে দু'টি লাঠিতে বেঁধে চাবজন কাঁধে তুলে নেয় এবং মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবাব বীতির অল্পকরণ কবে। তাবপব পুকুর বা নদীতে নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়, বলা যেতে পাবে, টুঙ্গকে সমাধি দেওয়া হয়। এই সমস্ত আচার থেকে এটাই সঙ্গ্রহণিত যে, যে-টুঙ্গকে কেন্দ্র কবে এই উৎসব তা আসলে মৃত শশুরই। এই আচারগুলো অমুকৃত ইন্দ্রজাল (Imitative Magic) ছাড়া কিছু নয়। উদ্দেশ্য, শশুরদেবতার জীবনধারাকে গতিশীল প্রাণবন্ত করে তোলা এবং তাকে নিজস্ব প্রয়োজন এবং কার্যসিদ্ধি উপযোগী কবে তোলা। শশুর দেবতা প্রায় সব সময়েই মৃত্যু এবং পুনর্জন্মেব সঙ্গে জড়িত। এ-প্রসঙ্গে জেন্ হ্যাভিসন বলেন, when the death and burial are once accomplished the hope of resurrection and new birth begins and with the

hope the magical ceremonies that may help to fulfil that hope.<sup>২</sup>

যখন মৃত্যু এবং সমাধি-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় তখনই পুনর্জীবন এবং নব-জন্ম লাভের আশাব সূত্রপাত হয় এবং এই আশাকে পূর্ণ করে তোলাব জন্ম ইন্দ্রজালিক অল্পট্টানের সাতাষা নেওয়া হয়। টুঙ্গ উৎসব এই পুনর্জীবন এবং নবজন্মলাভের আশার পরিপূর্ণতাব জন্ম অল্পট্টিত ঐন্দ্রজালিক আচার-উৎসব বলেই মনে হয়।

এবাবে বিচাব কবে দেখা যেতে পাবে, টুঙ্গ আদৌ কোন ব্রত কিনা। ব্রত সাধাবণতঃ সমষ্টিগত কোন কামনাপূরণের উদ্দেশ্যে অল্পট্টিত হয়ে থাকে, এবং শস্ত্রব্রতে প্রধানতঃ কুমাবী মেয়েদেবই ভূমিকা থাকে। আমবা ওপবেব আলোচনায় দেখেছি, ব্রতেব এই ধর্মগুলো জাওয়া এবং টুঙ্গ উভয় শস্ত্রাৎসবেই পূবোপূবি বর্তমান। জাওয়াতে কুমাবী কন্তারা শস্ত্রেব জন্মোৎসব পালন কবে প্রচুব ফসলের কামনায়, টুঙ্গতে কুমাবী কন্তারা শস্ত্রেব মবণোৎসব পালন কবে শস্ত্রেব পুনর্জীবন এবং নব-জন্মের কামনায়। কিন্তু ব্রতেব অল্প একটি বিশিষ্ট ধর্ম হল, ব্রতেব প্রার্থনা মন্ত্র থাকবে অথবা কামনার বাণীরূপ ছড়া থাকবে। ছড়া বলাব রীতি নাকি ব্রতেব প্রাচীনতাব পবিচয়। ডঃ সূধীব কুমাব কবণেব মতে ভাদুর প্রভাবেব ফলেই নাকি ঝাডগণ্ডেব টুঙ্গ ব্রত থেকে ছড়া এবং তৎসঙ্গে কামনাবাসনা-প্রার্থনা ল্প্ত হয়ে গেছে। তাঁব মতে ‘বাঙলাদেশেব তোষলা ব্রত সীমান্ত বাঙলার টুঙ্গ’তে পরিগত হয়েছে’<sup>৩</sup>। ঝাডগণ্ডেব টুঙ্গ উৎসবে কোন ছড়া নেই, কোন কামনা-বাসনার মন্ত্র বা প্রার্থনা নেই; টুঙ্গ উৎসবে শুধু গান আছে। যে-গানে একটা সমগ্র অঞ্চলেব জাতীব জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়ার কথা আছে। জাওয়াতে-ও কোন ছড়া নেই, শুধু গান আছে যে গানে নাবী-জীবনের সুখ দুখ আনন্দ-বেদনার কথা আছে। দুটোই শস্ত্রাৎসব। দুটোতেই কোম ছড়া নেই কিন্তু বিভিন্ন আচার আছে; কথা নেই, কিন্তু কথার ব্যঞ্জনার চেয়েও তীব্রতাব ব্যঞ্জনা আছে আচারগুলোতে। ছড়া মাচুষেব পবিণত বৃদ্ধির সৃষ্টি, কিন্তু

<sup>২</sup> Ibid P 55

<sup>৩</sup> পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার লোকবান।

আচার ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসপুষ্ট আদিম মানুষের সৃষ্টি। যে কোন পূজাহুষ্ঠানে আচারের ভূমিকাই মুখ্য, ছড়ার বহুপূর্বে আচারের সৃষ্টি। ঝাড়খণ্ডের আদিম মানসিকতায় প্রার্থনার কোন স্থান ছিল না। জাণ্ডয়াগীত এবং টুসুগীত ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু এই গীতগুলো বহু পর্বে এই উৎসবেব সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই ভাদুর প্রভাবের কলে ঝাড়খণ্ডের টুসু উৎসব থেকে ছড়া এবং কামনা বাসনা লুপ্ত হয়ে গেছে, একথা বিশ্বাস করা যায় না। জাণ্ডয়া বা টুসুতে কোন দিনই ছড়ার মধ্য দিয়ে কামনা-বাসনা প্রকাশ করা হত না। আদিম মানুষ কোনদিনই প্রার্থনায় বিশ্বাস করে নি: তাই বিশ্বাস করত তুফতাক, জাদু-ক্রিয়া এবং ঐন্দ্রজালে। The savage is a man of action. Instead of asking a god to do what he wants done, he does it or tries to do it himself; instead of prayers he utters spells. In a word, he practises magic, and above all he is strenuously and frequently engaged in dancing magical dances<sup>৪</sup>। অসভ্য আদিবাসীরা সক্রিয় হয়ে থাকে, তাই তাই যে কাজ সম্পন্ন করতে চায় তাই জন্তু দেবতার কাছে প্রার্থনা না জানিয়ে নিজে করে কিংবা কববাব চেপ্টা করে, প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ না করে তুফতাক করে। অন্য কথায়, তাই জাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে এবং কঠিন পরিশ্রমেবসাথে প্রায়শ: ঐন্দ্রজালিক নৃত্যেব আয়োজন করে। জাণ্ডয়াতে যেমন ঐন্দ্রজালিক আচার আছে তেমনি ঐন্দ্রজালিক নৃত্যও আছে। টুসুতেও শশুর পুনরুজ্জীবন এবং পুনর্জন্মেব জন্তু জাদু আচার পালিত হয়, এতে সবাসবি নৃত্য না থাকলেও পুকুর ঘাটে, নদী ঘাটে কিংবা দীগড়ি (গালুড়ি), জয়দা (চাণ্ডুল), সতীঘাট (তাড়াং-মুবি) আদি মেলায় টুসু বিসর্জনের সময় টুসুগীত সহ বিক্ষিপ্ত নৃত্য যে একেবাবেই নজবে পড়ে না তা নয়; নারীতন্ত্র দৃশ্যমান করে অঙ্গীলতাব পরিবেশ বচনা করাও ঐন্দ্রজালিক আচার বিশেষ। এর ভেতর দিয়ে প্রজনন ক্রিয়া, নবজন্ম আদি ইচ্ছাগুলো প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ছড়ার চেয়ে এই আচারগুলো তীব্রতায় অনেক বেশি সক্রিয় তা বৃত্তে আমাদের অসুবিধে না। এই ব্রতাহুষ্ঠানে ছড়া অপরিহার্য,

এমন সিদ্ধান্ত সংগত নয় বলেই মনে হয়। জাওয়া এবং টুসুকে ব্রত হিসেবে তাই স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। টুসু যে বাংলাব তোষলা ব্রতের ঝাড়গুণী রূপ নয়, তা'ও তুলিয়ে বিচার করলে বোঝা যায়। যে-কোন ব্রতের আচাবই মৌলিক পবিচয়, ছড়া কিংবা প্রার্থনামন্ত্র পরবর্তী কালের সংযোজন। ঝাড়গুণী যদি বাংলার তোষলা ব্রতকেই গ্রহণ করে থাকত তাহলে ছড়াটিও গ্রহণ করত। টুসুব মতো এই ব্রতের আদিমতম রূপটি পাওয়া যায় যা বাংলার তোষলা ব্রতের মধ্যে নেই। তাই বাংলার তোষলা ব্রত ঝাড়গুণী টুসুতে পবিণত হয়েছে এমন কথা যুক্তযুক্ত নয় বলে মনে হয়। বরং এখনকার টুসু ঝাড়গুণীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উঁচুবেগে লোকেদের মধ্যে প্রচারলাভ করে উন্নত পযায়েব তোষলা ব্রতে পবিণত হয়ে থাকটা স্বাভাবিক। তাছাড়া টুসু ব্রত যদি বাংলাদেশ থেকে ঝাড়গুণী আনদানি করা হয়ে থাকত তাহলে তা'র প্রভাব কি এতো শ্যাপক হতে পারত? টুসু উৎসব ঝাড়গুণীর জাতীয় উৎসব, কোন উৎসব যে একটা অঞ্চলের সমগ্র মানুষের জীবনকে হানদেব স্পন্দনে উদ্বেল প্রাণবন্ত কবে তুলতে পারে, ঝাড়গুণী টুসু পবন না দেখলে বোঝা যায় না। বাঙালির দুগোৎসবও বাঙালি জাতির সর্বস্তরে প্রাণেব এমন স্পন্দন জাগাতে পারে না। তাই টুসু ঝাড়গুণীর নিজস্ব সম্পদ, এ উৎসবের সম্পর্ক এখনকার মাটি বন গাছপালা মানুষজন সবাব সজ্জ। টুসু ঝাড়গুণীদের প্রাণেব উৎসব, মিলনের উৎসব, নবজন্মের উৎসব। তাই টুসু ঝাড়গুণীর এক বিশিষ্ট ব্রত এবং এই ব্রত এখনকার আদিম মানুষের আদিম ভাবনার জাবক-রসে জারিত হয়ে জন্মলাভ কবেছে।

টুসু উৎসব ঝাড়গুণীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হওয়ার কারণ হিসেবে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যে কথা বলেছেন, তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ 'জাতীয় উৎসব বলিতে যাহা বুঝায় এবং পুরুলিয়াব টুসু উৎসবের মধ্যে আমরা আজও যাহা দেখিতে পাই, তাহার কোন রূপ পূর্ব বাংলা কিংবা পশ্চিম বাংলার কোথাও দেখা যায় না। ইহার কারণ, সামাজিক সংহতি ব্যতীত জাতীয় উৎসব সম্ভব হয় না। পুরুলিয়ায় এখন পর্যন্ত সমাজ জীবনের যে সংহতি বর্তমান আছে, বাংলাদেশের আর কোথাও তাহা নাই, সেই জন্য জাতীয় উৎসবের রূপ এই অঞ্চলেই এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়, অত্র কোথাও নহে। সেই জন্য শাস্ত্রোৎসব বলিতে যাহা বুঝায়,



পুরুলিয়া ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার আর কোথাও নাই।<sup>৫</sup> আমরা ডঃ ভট্টাচার্যের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সর্বাংশে একমত। আমরা শুধু ‘পুরুলিয়া’ শব্দটির পরিবর্তে ‘ঝাড়খণ্ড’ শব্দটি ব্যবহার কববার পক্ষপাতী। টুঙ্গু উৎসব ঝাড়খণ্ডের একান্ত নিজস্ব উৎসব, প্রাণের উৎসব।

টুঙ্গু মেয়েলি ব্রত ; কুমারী মেয়েরা এই ব্রত উদ্দাপনের অধিকারিণী। সধবা বিধবা রমণীরা টুঙ্গু পূজায় অংশগ্রহণ কবতে পারে না। কোন কোন আলোচক জাওয়া এবং টুঙ্গু ব্রতে কুমারী মেয়েদের সঙ্গে সধবা বিধবা বয়স্কানারীদেরও অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ধবনের তথ্য পবিবেষণ বিভ্রান্তিকর। জাওয়া ব্রতে ‘জাওয়া দেওয়া বা উঠানো’ অর্থাৎ একমাত্র কুমারী মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে থাকে ; নৃত্য-গীতে সধবা বয়স্ক বমণীরা অংশগ্রহণ কবতে পাবে, কেন না এতে কোনবকম বাধা-নিষেধ নেই। তেমনি টুঙ্গু পূজাতেও কেবলমাত্র কুমারী মেয়েবাই অংশ গ্রহণ কবতে পারে ; কিন্তু গীতে যে-কেউ অংশগ্রহণ কবতে পারে—পুরুষ-নারীব কোন বাছবিচাব থাকে না। দু’টি ব্রতই দু’টি প্রধান শাস্ত্রাংসবকে উপলক্ষ কবে উদ্দাপিত হবে থাকে ; ব্রতপালনের যে লক্ষ্য তা কুমারী মেয়েবা ছাড়া অন্য কোন নারীব সাহায্যে সিদ্ধ হতে পারে না।

টুঙ্গু মেয়েদের নিজস্ব ব্রত হলেও টুঙ্গু গীতে পুরুষবাও সমানভাবে অংশগ্রহণ কবে থাকে। তাই এই উৎসব পুরুষ ও নারীব সাম্মিলিত অংশগ্রহণেব ফলে ঝাড়খণ্ডের জনজীবনেব সর্বস্তবে ছড়িয়ে পড়ে জাতীয় উৎসবেব পর্যায়ে উন্নীত হতে পেবেছে। তবে শুধু টুঙ্গু পরব হিসাবেই এ উৎসব এতো ব্যাপক এবং জনপ্রিয় হয়েছে ভাবা ঠিক নয় ; এব সঙ্গে শাস্ত্রাংসব এবং নববর্ষোৎসবেব আনন্দও মিলে-মিশে আছে, কথটা স্বীকার করে নিলে উৎসবেব একটি সূষ্ঠ সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

টুঙ্গু শুধু শাস্ত্রাংসবেব দেবী নন। তিনি ঝাড়খণ্ডের মাহুষের নিতান্ত আপন জন, অন্তরের দেবতা, জীবনেব দেবতা বললেও অত্যাঙ্কি করা হয় না। টুঙ্গু শাস্ত্রীয় দেবী নন, তিনি বহুজনপূজিতা লক্ষ্মীদেবীও নন। টুঙ্গু নিতান্তই লৌকিক দেবী, ঝাড়খণ্ডের সীমিত অঞ্চলে প্রাণচেতনার মূর্তিমতী দেবী। টুঙ্গু ঝাড়খণ্ডী নারীর কাছে কি নয় ? ডঃ সুধীরকুমার করণ বলেন, ‘টুঙ্গুকে কামনাপূর্ণের দেবী রূপে আর দেখা হয় না ; পরিবর্তে টুঙ্গু এখন মাতা-

কল্পা-ভগ্নী-সহচরী-বান্ধবী-রূপা, সমাজেরই একজন অন্তরঙ্গ নারীমাত্র।<sup>৬</sup> উচ্চতর সংস্কৃতিতে দেবতার সঙ্গে ভক্তের ছন্দর ব্যবধান, কিন্তু টুঙ্গুর সঙ্গে ভক্তের ব্যবধানের কোন সীমারেখা নেই। টুঙ্গু উৎসবে দেবতা এবং ভক্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়; দেবতা এবং ভক্ত পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার; পরস্পর পরস্পরের কাছে মন-প্রাণ উজাড় কবে আনন্দ-বেদনার কথা অকপটে প্রকাশ কবে পরম পবিতৃপ্তি লাভ কবে। তাই টুঙ্গু গানেব মধ্য দিয়ে ঝাড়খণ্ডেব সামগ্রিক জীবনের কথা যেমন অব্যবিত অকপট ভাষায় প্রকাশ পায় তেমনটি আব কোন গানে প্রকাশ পায় না। টুঙ্গু গান যেন কেউ রচনা কবে নি, এগান যেন আপনা আপনি জন্মেছে। ছড়ার মতোই এর রূপসজ্জা, চেকনা আর মেজাজ-মজি। ছড়ার মতোই টুঙ্গু গীত ভারহীন, অনায়াস গতিতে প্রবহমান। টুঙ্গু গীত ঝাড়খণ্ডের মানুষের জীবনেব সঙ্গীত। ব্যক্তিগত জীবনের কথা, পারিবারিক জীবনের কথা, সামাজিক জীবনের কথা, ঝাড়খণ্ডেব জাতীয় জীবনের কথা—কি নেই টুঙ্গু গানে। অত্র কোন গানে একটা পুরো অঞ্চল এমন বিচিত্ররূপে ধরা পড়েছে, আমাদের জানা নেই। এমন সহজ ভাষায়-সুবে এমন হৃদয়স্পর্শী গান আর কোথাও আছে কি না, তা'ও বলা কঠিন।

টুঙ্গু গীতে টুঙ্গু তত্ত্বসম্পর্কিত গীত একেবারেই নেই এমন কথা বলে চলে না। আগেই বলেছি, আদিম মানুষ তত্ত্বকথায় বা প্রার্থনায় বিশ্বাস করত না। তাই টুঙ্গু গীতে টুঙ্গু-তত্ত্ব অন্বেষণ সংগতও নয়। তবে টুঙ্গুগীতে টুঙ্গু বিচিত্ররূপে বিচিত্রসাজে বিচিত্রকামনার মূর্তি ধবে বার বার জনচিত্তের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। আসলে টুঙ্গু তো উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার প্রকাশ, টুঙ্গুগীতে ঝাড়খণ্ডী মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, ঈর্ষা-মুগা, প্রেম-ভালোবাসা, নিন্দা কুৎসা—জীবনসম্পর্কিত প্রতিটি অনুভব প্রতিটি অভিজ্ঞতা গভীর মমতায় প্রকাশ করা হয়েছে। টুঙ্গুগীত ঝাড়খণ্ডের গার্হস্থ্য জীবনের কথায় রস-সমৃদ্ধ। লোকসংগীতের এমন সহজ সুন্দর প্রকাশ অত্র কোন গানে দেখা যায় না। জীবনের কথার এমন সাবলীল অকপট প্রকাশ আছে বলেই এ গান এত অন্তরঙ্গ, এত সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ। টুঙ্গুগীতে মানুষ

এতই সজীব এবং প্রাণবন্তভাবে উপস্থিত হয়েছে যে তাদের সান্নিধ্য সম্পর্কে আমরা স্বভাবতই সচেতন হয়ে উঠি। তাদের কামনা-বাসনার তাপ আমরা অনুভব করি; তাদের আনন্দ আমাদের প্রাণে আনন্দসঞ্চার হবে, তাদের দীর্ঘশ্বাস আমাদের গায়ে লাগে। টুঙ্গুগীতের মতো সজীব এবং গতিশীল খুব কম লোকগীতিই আছে। টুঙ্গুগীতের সংখ্যাব কোন পর্বসীমা নেই। প্রতি বছর মুখে মুখে হাজার হাজার তাৎক্ষণিক গানের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতি বছর নিত্য নতুন বিষয়বস্তু এর অন্তর্গত হচ্ছে।

করমনাচের গানের মতোই টুঙ্গুগীত স্বল্পায়তনের হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এগীত দু'পঙক্তির চার চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে এব কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। মূল গানের সঙ্গে ধুয়ো বা 'রং' থাকে, যা সব সময়ই দু'টি চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মূল গানের সঙ্গে রং-এব সম্পর্ক কখনো থাকে, কখনো থাকে না। রং-গানগুলো চকিতে-চমকে মুখে মুখে উচ্চারিত হয়; চোখের সামনে যা পড়ে তাই রং-এর বিষয়বস্তু হয়। এগান সর্বাধিক সজীব এবং প্রাণ-তপ্ত।

টুঙ্গু গীতে যে আচার-সংগীত একেবারেই নেই, তা বলা চলে না। নিম্নোক্ত গানটি প্রতি দিন সাঙ্ঘ্যবেলা টুঙ্গু পূজাব সময় গাওয়া হয়ে থাকে। গানটির বিষয়বস্তু সন্ধ্যা দেওয়া অর্থাৎ দীপ জালিয়ে টুঙ্গুব আরতি ও পূজা করা। সাধারণতঃ এই গান গেয়ে পূজো করা হয় এবং তারপর অন্যান্য গান গাওয়া হয়।

১. সন্ধ্যা-দেওয়া বউ গ তবা সন্ধ্যা কেন্ নাই দেও গ।  
কুমহার শালায় পদীপ দেয় নাই কিসে সন্ধ্যা দিব গ ॥
- সন্ধ্যা-দেওয়া বউ গ তরা সন্ধ্যা কেন্ নাই দেও গ।  
খট্টা শালায় কাপড় দেয় নাই কিসে সন্ধ্যা দিব গ ॥
- সন্ধ্যা দেওয়া বউ গ তরা সন্ধ্যা কেন্ নাই দেও গ।  
কুলছ শালায় তেল দেয় নাই কিসে সন্ধ্যা দিব গ ॥
- তেল দিলম স'লতা দিলম সগগে দিলম বাতি গ।  
যত দেবতায় সন্ধ্যা লেয় মা ঘরের কুলবতী গ ॥

সন্ধ্যাদীপ জালানো যে একটি পবিত্র অস্থান গানটি থেকে তা স্পষ্ট। কুমোরের দেওয়া নতুন প্রদীপে খোট্টার দেওয়া নতুন কাপড় থেকে সলতে তৈরী করে কলুর দেওয়া তেল দিয়ে পূজোর দীপ জালাবার নিয়ম। শুধু

দেবতাদের জন্মই যে সন্স্কারতির আযোজন কবা হয় না, কুলবধুও এব শবিক হয়ে থাকে, তাও লক্ষণীয়। গানটিতে 'শালা' শব্দটি অমুযোগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. তিবিশ দিন যে ছিলে টুঙ্গ তিবিশটি ফুল ধবো গ।

আব রা'খতে না'বব টুঙ্গ মকব হল্য বাদী গ ॥

সাৰা পোষ মাস জুড়ে টুঙ্গ গীত গেয়ে টুঙ্গ পূজা কবাব প্রসঙ্গ এখানে স্পষ্ট। একমাস হবে আনন্দ-অন্তষ্ঠানের পর মকবসংক্রান্তিতে টুঙ্গকে বিসর্জন দেওয়া হয়। মকবসংক্রান্তি এই আনন্দ অন্তষ্ঠানে বাদ সাধে, টুঙ্গকে বিসর্জন না দিয়ে উপায় থাকে না।

৩. ষোল ঘড়ি ষোল পূজা খা গ টুঙ্গ খই ভাঙ্গা।

তুমাব মা ত অভাগিনী কুখায় পাবেক দই ডিডা ॥

সে ত যাবার বেল', খায়ে লে গ দই চিডা ফুল বাতাসা ॥ বং ॥

জাগবণেব বাঙে ষোল বাব পূজা কবাব নিয়ম। ষোল ঘড়ি ষোল পূজা প্রসঙ্গে কবমেব দিনে ষোল বাব জা'ন্যা নৃত্যানুষ্ঠানেব মিলটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৪. শালুক ফুলটিব লাগো টুঙ্গ গুল আডায় অ'ডায় গ।

পদ্মফুলটির লাগি টুঙ্গ দবিয়ায় ঝাঁপ দিলে গ ॥

দবিয়ায় ঝাঁপ দিলে টুঙ্গ কব ঠুকু'কু গ।

দু'হাতে দু সনার ছাতা উঠেই খেলা কব গ ॥

টুঙ্গব দরিয়ায় ঝাঁপ-দেওয়া ঘটনাটি যে আত্মনিমজ্জনেব ব্যাপার তাতে কোন সন্দেহ নেই। দু'টি হাতে দু'টি সোনার ছাতা চিত্রটিও বিশেষ অর্থবহ। আঁধরা আগেই দেখিয়েছি, টুঙ্গব এই আত্মনিমজ্জনেব মধ্যে পুনর্জীবনের সূনিশ্চিত আশাও আছে। শস্ত্রের মৃত্যুব মধ্যেই পুনর্জীবনেব বীজ নিহিত থাকে। গানটিতে শালুক ফুল পদ্মফুলেব (লাভেই টুঙ্গর আত্মনিমজ্জনেব কথা বাক্ত হয়েছে কিন্তু টুঙ্গ পূজাব উপচাব হিসাবে গুলাত (কাঠ গোলাপ) আব ধৃত্তরো ফুলের কথাই পাওয়া যায়।

৫. শিব পূজা শীতলা পূজা কি ফুলে কিষ্টের পূজা।

গুলা'ত ফুলে টুঙ্গব পূজা ধৃত্তরা ফুলে হয় মজা ॥

জলের ভেতরেই টুঙ্গর আসল স্থান। জল সব কিছুকে ঢেকে ফেলে, সব কিছুয় সমাধি রচনা কবে। মৃত শস্ত্রের প্রতীক টুঙ্গকেও জলে বিসর্জন দিয়ে সমাধি

দেওয়া হয়। লক্ষ্য, শশুর পুনর্জীবন। টুসুর যেন জলেব জন্তু একটা তীত্র আকাঙ্ক্ষা আছে। জলের ভেতর তার সব কিছু আছে; জলেব ভেতর তার বাপের বাড়ি শশুরবাড়ি এমন কি তাব ভাবেব লোকও আছে।

৬. জল জল যে কর টুসু জলে তুমার কে আছে।

মনেতে ভাবিয়ে দেখ জলে শশুব ঘব আছে ॥

৭. ঝিক্‌ঝিকি পাথবের তলায় বল টুসু তর কে আছে।

মাও আছে বাপও আছে আর ভাবেব লক আছে ॥

তাই টুসুকে বিসর্জন না দিয়ে উপায় থাকে না। বিচ্ছেদেব বেদনা অবশুই সমস্ত চেতনাকে অসাড করে তোলে, তবু একটা ভবসা থাকে : টুসুব বিসর্জনই শেষ কথা নয়, টুসু পুনর্জীবন লাভ কবে প্রত্যাবর্তন কববে।

৮. নাচা বিলে চাঁদ উঠেছে পিখিমী আল কবো।

এমনি আল ক'রবে টুসু একড্যা কদম তলে ॥

টুসু যাও মা জলে. আ'সছে বছব আ'নব গ টহববে ॥

ওপবেব গানগুলো থেকে দেখা গেল টুসু গীতে শুধু জীবনেব সুখ-দুঃপের কথাই নেই, টুসু-৩৩৬ আছে। ওপবেব গানগুলোতে যে টুসুব স্বরূপ বোঝাবাব চেষ্টা কবা হল, সে-টুসু শশুরকপিনী। পববর্তী গানগুলোতে যে-টুসু রূপ পবিগ্রহ কবেছে, সে টুসু মর্তবাসিনী বমণী। কখনো কন্ঠা, কখনো জননী, কখনো সখীসহচবী, কখনো সাধাবণতমা বমণী—টুসু যেন বহুরূপিনী বিচিত্ররূপিনী নারী, ক্ষণে-ক্ষণে তাব রূপ বদলায়। এই নারীস্বরূপিনী টুসু-সম্পর্কিত গানগুলো জীবনবস-সম্পৃক্ত প্রকীর্ণ কবিতার মতোই উজ্জল। নিঃশ্বাসেব মতোই সহজ অনায়াস এবং ভারহীন এই সব গান।

প্রথমে টুসুব রূপবর্ণনা। ঝাড়খণ্ডের লোকবিশ্বাসে টুসু অপরূপ সুন্দরী। বাংলাদেশে যেমন কোন রমণীব রূপ-প্রসঙ্গে চুর্গাপ্রতিমাব উপমা দেওয়া হয়, তেমনি ঝাড়খণ্ডে বমণীব সৌন্দর্যেব চবম উৎকর্ষ বোঝাবাব জন্তু টুসুব রূপেব সঙ্গে তুলনা কবা হয়।

টুসু গোবান্ধিনী, হেলে-ছলে চলে আবাব যখন-তখন রাধে রাধে বলে ছ'হাত ভূলে নৃত্য কবে—

২. দলমা পাহাডেব উপব হাঁসা পাথব লডে গ।

আমার টুসুব গউব ববণ হেল্যে ছল্যে চলে গ ॥

টুসু শুধী-ও বটে। পথ চলতে গেলে তার তহু-লতা বিনা বাতাসেও

দুলে ওঠে । তার গায়ে কেয়া ফুলের গন্ধ মাখানো । সে যেখানেই যায় সে-  
থানেই তাব গন্ধে চাব পাশ ভাবি হয়ে ওঠে ।

১০ এক সড়পে দুই সড়পে তিন সড়পে লক চলে ।

আমদের টুঙ্গ এমনি চলে বিন বাসাতে গা লড়ে ।

গেল অই শহরে, কিয়াফুলের বাস র'হল নগরে ॥

টুঙ্গ নবনী তলুতে কোমলতা ও লাবণি সুপরিষ্কৃট। টুঙ্গ অপরূপা সুন্দরী ।

১১ উতলা বনের পুতলা খাডি কুডচি বনে ঘব কবি ।

জুসনা বাইতে টুঙ্গ আ'নব যেমন দুধেব সরধানি ॥

১২ ডাল ভা'ঙলম ফল তু'ললম পান বনালম খনজবী ।

আমদের টুঙ্গ বস্ত্রে আছে যেমন কণ্ঠা সুন্দরী ॥

কিন্তু টুঙ্গর অপরূপ রূপ এতে ও বুঝি ফুটে ওঠে নি । টুঙ্গ ফুলকুমারী।  
পুষ্পরূপিনী, তাব সর্বশরীরে বিকশিত পদ্মফুলেব ঘেন মেলা বসেছে,  
তাব হাতে পদ্ম, পায়ে পদ্ম আর সেই পদ্মকে ঘিবে ভ্রমরের শুভ্রন ।

এ রূপকল্পনা বুঝি বা কোন অলংকাবশাস্ত্রেব ধবা-ছোয়ার বাইরে, এ রূপ  
কল্পনা শুধু ঝাড়খণ্ডী লোকভাবনাতেই বুঝি বা সম্ভব ।

১৩ আঁচিবে পাচিবে পদ্ম পদ্ম বই আব ফুটে নাই ।

টুঙ্গ হাতে জড়া পদ্ম ভমব বই আব বসে নাই ॥

আদাড়ে পাদাড়ে পদ্ম পদ্ম বই আর ফুটে নাই ।

আম্দের টুঙ্গ পায়ে পদ্ম ভমব বই আব বসে নাই ॥

এবারে কণ্ঠারূপিনী টুঙ্গ কথ্য । ঝাড়খণ্ডী নারীর কাছে টুঙ্গ এতোই  
কাছেব দেবতা যে তাকে তাবা অত্যন্ত স্নেহভরে কণ্ঠারূপেও গ্রহণ করেছে ।  
জননীই জানে সন্তানের বেদনার কথা, তাই পরের সন্তানকে কোলে  
নিলেও মায়ের মন কেমন কবে ওঠে । বহু টুঙ্গ আবদারে জননী কি  
কম বিব্রত ; টুঙ্গ চাব আকাশের চাঁদ, গাছের ফল হলে বরং কথা ছিল ।

১৪ ছালা ছালা কর তরা ছাল্যার বেদন কি জান ।

পরের ছালা কলে লিলে মাখের মন কেমন করে ॥

বল টুঙ্গধন চাঁদ কুণায় পাব, গাছের ফল লছে যে তুল্যে দিব ॥

টুঙ্গ কখনো ধূলায় অঙ্গ মলিন করে মায়ের দুশ্চিন্তা বাড়ায় ।

১৫ বাড়ি নাময় শিম'ল গাছে পায়রা কুহরে গ ।

পাখি নয় পাখুড়া নয় মা টুঙ্গ খেলা করে গ ॥

খেল্য না খেল্য না টুঙ্গু কাপড় হবে মলিন গ ।

তুমাব মা ত অভাগিনী সাবন কুথায় পাবে গ ॥

কখনো-টুঙ্গু বনে-বাদাড়ে গিয়ে সোনায় বাঁধানো লাল ছাতা হাবিয়ে আসে—

১৬ ছট বনের লতাপাতা বড় বনেব শাল বাতা ।

কন্ বনে হাবালে টুঙ্গু সনায় বাঁধা লাল ছাতা' ॥

টুঙ্গু কখনো লক্ষ্মী মেয়েটির মতো তপোবনে পড়তে যায়, মায়ের ডাক তাব কানে পৌঁছায় না ।

১৭ আমাব টুঙ্গু পুঁথি পড়ে তপুবনেব কাননে ।

কি করো মা গুঁনতে পাব জুঁদের বানে ঢেউ মাবে ॥

টুঙ্গুর এমন লক্ষ্মীমস্ত রূপ কম সময়ই দেগা যায় । সে তাব মানবী মাকে চিন্তায়-ভাবনায় অস্থির করে রাখে ।

টুঙ্গু ক্রমশঃ সখী-সহচরী রূপে আত্মপ্রকাশ ববে । ঝাড়খণ্ডী বমণী নিজেব জীবনের সাধ-আহ্লাদ টুঙ্গুর জীবনেব মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ কবেত দেখলে তৃপ্তি লাভ কবে । তাই তাবা নিজেদের জীবনেব অপূর্ণ সাধ আহ্লাদ টুঙ্গুব জীয়েন আবেপিষ্ট কবে গানে পূর্ণতার চিত্র অঙ্কন কবেছে । ছেলে বেলায় গেলা-ধুলোব অরোধ আনন্দের দিনগুলোতে সখী কেবল সানী । কিন্তু যতোই বয়োরু'দ্ধ ঘটতে থাকে, ততোই মনেব কোণে বিচিত্র সব অন্তর্ভবের আবির্ভাব ঘটতে থাকে, মনেব গোপন ভাবনাগুলো কাবো কাছে খুলে বলাব জগ্ন সখী-সহচরী 'ফুল'-এব প্রযোজন । এই 'ফুল' পাতানো বা সই পাতানো অল্পষ্টানটি এক কালে ঝাড়খণ্ডী নারীব জীবনে অপবিহায ছিল, বর্তমানে এব গুরুত্ব যথেষ্ট মৃদুতর হয়ে এসেছে । টুঙ্গু কখনো-কখনো বাজকন্ঠা রূপেও বর্ণিত হয়ে থাকে, তবু সই পাতাবাব জগ্ন তাকে বেবিয়ে আসতে হয় সাধাবণতমা কিশোরী হরণীব কাছে । আবার টুঙ্গু কখনো নিতাস্তই সাধাবণ গৃহস্থ-কন্ঠা, তবু সে বাণীব সন্ধে ফুল পাতায় আব মনের গোপন ভাবনা গোলাপ ফুলেব ভেতবে পূর্বে চিঠি পাঠায় ।

১৮ আলতা পাতে চালতা পাতে বিনদ পাতে মেয়েছে ।

টুঙ্গু নকি রাজাব বিটি সেই পাতাতে আশুছে ॥

১৯ আমার টুঙ্গু ফুল করেছে ঝাড়গাঁ গডেব বাণীকে ।

মনে মনে চিঠি ছাড়ে গোলাপ ফুলেব ভিতবে ॥

‘মনে-মনে চিঠি ছাড়ে গলাপ ফুলের ভিতরে’ চিত্রকল্পটি নিঃসন্দেহে অনবচ্ছ কবিভ্রমর এবং স্বভাবতঃই মনোহারী। লোককবিব সৌন্দর্য-ভাবনা যে কতো সুন্দর হতে পারে এটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু মনের ভাব নয়, শরীরের গন্ধও যেন এ-চিঠিতে ভাসমান।

টুঙ্গ এবাব প্রেমিকা রূপে দেখা দেয়। ঝাড়খণ্ডী তরুণী টুঙ্গ ৬পর তার প্রেম ভাবনা আবোপিত ববে আত্মতুষ্টি চবিতার্থ করে। বাজাব ছেলের সঙ্গে প্রেম কবাব কথা কোন যুবতী না ভেবে পাবে? কাডখণ্ডে যে রাজাব ছেলেদের সঙ্গে যুবতী গ্রাম্যবালাদের প্রণয় এবং দেহমিলন প্রায়শই ঘটত, তার নজিব শুধু টুঙ্গ গীতে নয় কবম নাচেব গানেও খেটে পাওয়া যায়।

২০ কুল গাছে ফুলীব বাসা ডালিম গাছে কেবকেটা।

আমদের টুঙ্গ ফাঁস আডোছে লাগোছে বাজাব বেটা।।

গলাষ লাগা নিশা, খায়ে লে বে লম্পট্যা বাজাব বেটা।।

টুঙ্গ মাঝে-মাঝেই অভিসাবে বেরিয়ে পড়ে: মায়ের মন কত কি সম্ভব-অসম্ভব দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়; তাই টুঙ্গর ৬পর সব সময় নজব বাখা হয়:

২১ কলাতলে বাট বাখোছি পাছে টুঙ্গ পাব হচ্ছে।

নন্দেব বেটা চিত্রণ কালা সে ৩ বাঁশ বাজাছে।।

সংসার-ধর্ম নাবী-জীবনে একটি অনিবার্য স্তব বিশেষ। তাই টুঙ্গকেও সংসাবাশ্রমে প্রবেশ কবতে হয়, তাকেও বিবাহ কবতে হয় এবং গৃহস্থ পরিবারের বধু হিসাবে আত্মপ্রকাশ কবতে হয়। তাই পববর্তী গানগুলোতে টুঙ্গ বধুকপিনী।

বাজ-বাজনাব আয়োজনে টুঙ্গর বিয়ে দেওয়া হয়—

২২ লৌতন পথ’রের আডায় চাঁদে লাগে কদমা।

আমদের টুঙ্গর বিভা দিলে ঝরি-ঝম্পার বাজনা।।

টুঙ্গর বিয়ে নিশ্চয়ই আনন্দের! কিন্তু বিয়ের অল্পষ্টান আনন্দের হলে-ও কোন্ জননীর বুকে বাখা বাজে না কন্ঠাব বিয়েতে? নাড়ি-ছেঁড়া ধন কন্ঠার জন্ম স্বভাবতঃই জননীব চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তাই কন্ঠার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কাছে কন্ঠাকে আদর যত করার অল্পরোধ জানান, কারণ কন্ঠা জননীর কাছে চিরকালই শিশু,—শিশুর কি শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে কোন বোধ থাকে?



২৩ আলা রে গুনগুন্যা মাছি দখিণ দিগের হাওয়াতে ।

উড়াল্য সনার পাল্থি নিয়ে' গেল টুসুকে ॥

টুসু লে 'গলে ভাল ক'রলে রা'খবে গ যতন করে ।

আম্দের টুসু শিশু ছালা স্বস্তর ঘরেব কি জানে ॥

বিয়ের রাত্রিশেষে বিদায়ের বেলা। বর-পক্ষের পালকি হয়তো-বা ভাঙ , তাই টুসুর জন্ম জননী কাঁচ-বসানো পালকির ব্যবস্থা করেন। টুসু কাঁচের ফাঁক দিয়ে চারপাশ দেখে-শুনে স্বস্তরবাড়ি যেতে পারবে; পেছনে তাকিয়ে দেখবে পরিচিত মাটি ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে, সাম্নে তাকিয়ে দেখবে চাব পাশে অচেনা দেশ জেগে উঠছে। মায়ের এই একটি আয়োজনের মধ্য দিয়েই তাঁর জন্মের সক্রমণ কছাঙ্গের গভীর ভাবে ফুটে উঠেছে ।

২৪ বাড়ি নাময় কু'ল গাছটি কু'ল ভদ্ভদ্ কবে গ ।

শেষ রা'তে ককিল ডাকে টুসুর মন ভুলাতে গ ॥

ভুল না ভুল না টুসু ভাঙা পাল্থি বঠে গ ।

আয়না-বসা পাল্থি দিব দেখো-শুন্তে যাবে গ ॥

বধূজীবনের পববর্তী স্তরই হল মাতৃ-অর্জন। মাতৃ নারীজীবনের চবম বিকাশ এবং তাতেই তার সার্থকতা। তাই টুসু যতোদিন না সন্তানের জননী হয় ততোদিন তার মায়ের উৎকর্ষা যায় না। গহনার দোকানে শিশুদের দুধবালা দেখে দীর্ঘশ্বাসে বুক ভারি হয়ে ওঠে, কারণ টুসুব কোন সন্তান নেই।

২৫ মেদিনপুরে দেখ্যে আলাম ডালায় ডালায় দুধবালা ।

আমার টুসুর নাইখ ছেল্যা কাকে দিব দুধবালা ॥

টুসু যাতে সন্তানবতী হয় তার জন্ম মানত-মানসিক করতে হয়; সন্তানের জন্ম হলে প্রচুর খরচপত্র করবার অঙ্গীকার করা হয়—

২৬ ইঘর কাদা সেঘর কাদা লুহার পাটা বসাব ।

আমার টুসুর বেটা হলে হাজার টাকা উডাব ।

শেষ তক টুসু মাতৃ অর্জন করে। সন্তানের জন্ম এবার আগবালা কেনে হাজার টাকা খরচ করে—

২৭ আমার টুসুর একটি ছেল্যা নাম রাখ্যোছি বিমলা ।

বিমলাকে কিন্তে দিব হাজার টাকার আগবালা ॥

নিয়োক্ত গানগুলোতে টুসুকে বিচিত্র ভূমিকায় স্থাপন করে ঝাড়খণ্ডী নারী তার মজবুত সাধকে পূর্ণতার রূপায়িত করে তুলেছে। দেবতার এমন অন্তরঙ্গ

চিত্র অঙ্ক কোন গানে সচবাচর দেখা যায় না। দেবতাকে সম্মুখে রেখে নিজেব খুশিমতো তাকে বিচিত্র সাজে সাজিয়ে নয়ন ভরে দেখার এমন মনোহর বিশ্বকব ভাবমূর্তি অঙ্কিত সত্যিই দুর্লভ। শাক্ত পদাবলীতে দেবী কল্যা- এবং জননী-রূপে বাঙালীর প্রেমভালোবাসা স্নেহ-অমুরাগ আকষণ কবেছেন কিন্তু টুঙ্গ গীতে টুঙ্গ কল্যা-সহচরী-বধু জননী রূপেব অতি-বিক্রম বহু বিচিত্ররূপে ঝাড়খণ্ডীদেব স্নেহ-ভালোবাসা আদর-অমুরাগ নিঃশেষে আদায় কবে নিয়েছে। টুঙ্গ তাই বহুকপিনী, বিচিত্ররূপিনী। যে-সব কাজে সমাজে নারীর ভূমিকা অস্বীকার করা হয়েছে, টুঙ্গকে দিয়ে সে-সব কাজও অবলীলায় কবিয়ে নেওয়া হয়েছে। নারীর শারীরিক গঠনভঙ্গি এবং শক্তিশীলতাও জগত তাহেব পবিত্রমসাম্য কাজ কবতে দেওয়া হয় না। তবু টুঙ্গ গীতে টুঙ্গ বনে-ডুংবিতে কাঠ কাটে, লাঙল দিয়ে জমি চষে; মাঠে-প্রান্তরে গোচারণে যায়। টুঙ্গ যাই করুক না কেন, সর্বত্রই একটি স্নিগ্ধ ছবি তাকে ঘিরে থাকে।

২৮. আমদেব টুঙ্গ কাট কাটে'য়েছে বাদববনী'ব ডুংবি এ।  
এক গাড়ি কাট দু গাড়ি কাট তিন গাড়ি কাট চালাব ॥
২০. আমদেব টুঙ্গ হাল বাছে ভাইনে বায়ে লাল গক।  
বাছো বাছো কামিন ক'বব দাত কাল কাঁকাল সুরু ॥
৩০. আমদেব টুঙ্গ গাই চবাছে বড বাঁদেব আগালে।  
পানবাটা চুল খুলো দিয়ে বস্ত্রে আছে জল ধাবে ॥

অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বিতাব গানে টুঙ্গব যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। পাডায়-পাডায় এক বা একাধিক টুঙ্গ জাগরণের আসব বসে। বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাব ভাব থাকে। তাই একদল অঙ্কদলেব টুঙ্গর নিন্দা করে গান কবে, কুৎসা, অশ্লীল ইঙ্গিতও এই গানের বিষয় হয়ে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত ঘৃণা সমস্তই নিরাবরণ ভাবায় গানের মাধ্যমে তবল সীসের মতো জ্বালা ছড়ায়। টুঙ্গ উপলক্ষ, লক্ষ্য; নিজেদের বিদ্বেষ-ভাবনাকে গানের রূপ দিয়ে প্রকাশ করা। অঙ্কের নিন্দা করা, নিজের গুণগান করা নারীসমাজেব বিদ্রোহ ধর্ম। তাই নিজের টুঙ্গকে কাঠপুতুলের মতো সুন্দর মনে হয়, কিন্তু অঙ্কের টুঙ্গ শূকর পদতুল্য!

৩১. ই মন্দির উ মন্দির মাঝ মন্দির নিচা।

আমার টুঙ্গু ডাঁচাই আছে কাঠপুতুলের পারা ॥

ই মন্দির উ মন্দির মাঝ মন্দির কবা।

তদের টুঙ্গু ডাঁচাই আছে বুঁসুর ঠেঙের পাবা ॥

বলাবাহুল্য, এই লড়াই-এব মূল শুবটিই হচ্ছে নিজের কোলীশ, আত্মগবিমা প্রকাশ করা। এ খেন অনেকটা শ্রেণীসংগ্রাম, একদল নিজের ধলসম্পদের প্রাচুর্যেব বড়াই কবে অচ্ছদলকে হাঘবে হ্যাংলা পত্টিপন্ন করবার চেষ্টা কবছে।

৩২. আমার টুঙ্গু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝলমল কবে।

তদের টুঙ্গু ছচ্বা টুঙ্গু আঁচল পাতি মাগে ॥

এ ত গেল টুঙ্গুকে উপলক্ষ কবে আত্ম-প্রশংসা এবং পবনিন্দার ব্যাপার। কিন্তু ও পাড়া থেকে যাবা এ পাড়ায টুঙ্গু দেখতে এল তাদেব প্রতিও তীত্র বিবোধগাব কবা কবা হয সবাসবিভাবে। ওখান থেকে সরে না গেলে কালো খবিসেব কামড খেতে হবে, এমন আভাসও দেওয়া হয। গানটি রূপকাস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়।

৩৩. টুঙ্গু দে'খতে আলি তবা ধবলি ল চালেব বাতা।

চালে আছে কাল্যা খবিস খাবেক ল তদের মাথা ॥

বাইরে-থেকে-আসা দলটি আতিথ্যজ্ঞানহীনতা সম্পর্কে ইঙ্গিত কবে গান ধবে, এমন কি অর্থহীন আত্ম-গবিমায তাদেব সাধারণ শিষ্টাচার এবং সৌজ্ঞান্যবোধও যে ঢাকা পড়েছে, তাও খোলাখুলি প্রকাশ কবে।

৩৪. তদের ঘরকে ব'সতে গেলি ব'স বলি কেউ বললি না।

তিত্তা দক্কা পানের খিলি তা-উ তরাকে জু'টল না ॥

তদের ঘরকে ব'সতে গেলি ব'স বল্যে আর বললি না।

উচু পিটাঁ ময়দা মেলা গববে রা কাটলি না ॥

ঝাড়খণ্ডে গৃহে অতিথি-অভ্যাগত এলে পান-তামাক দিয়ে আত্মার্থনা জানানোটাই শিষ্টাচার। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে হৃদয় খুন্নে অকপটে বার্তালাপ করে থাকে, এর ব্যত্যয় ঘটলে তাকে সৌজ্ঞান্যজ্ঞানহীনতা এবং অহংকারেব ফল বলেই ধরে নেওয়া হয়।

কুৎসাকারিণীকে গ্রহাণের ভয় দেখিয়ে সাবধানে পথ চলতে বলা হয়—

৩৫. হাটে বাটে পখ'র ঘাটে বলিস ল আমার কথা।

যেদিন তকে একলা পাব ক'রব ল কাপড় কাচা ॥

কুলুহির মাঝে চলবি সতরে, পালে লাগি মা'বব ল তব গত্তবে ॥

শুধু এই নয়, এক পক্ষ অত্র পক্ষকে গান গাইতে জানে না বলে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে শুরু কবে। কখনো গান জানে না, শুধু টং জানে বলে বিদ্রূপ করে, কখনো গান শেগাবাব গুরুগিবি করবাব কথা বলে; কখনো গলার সুব গাডোল ভেডাব মতো বলে ব্যঙ্গ কবে।

৩৬ মেলা গাছে হেলা ফেলা কত ভলা ধবোছে।

শাই মাগীবা গীত জানে না কত কলা কবোছে ॥

৩৭ গান গাইতে আলি তবা গানেব নাইথ আ'গ-গড়া।

তান ল তব দুয়া'ত কলম লিখ্যে দিব সাত জড়া ॥

৩৮ গাডব ভেডা ভেবায় যেমন কঁচি কঁচি ঘাঁস বিনে।

তেমনি তবা ভেৰাঁই মবিস মিলে নাই তদেব গানে ॥

বলাবক্তব্য, এইসব প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক গানে কাব্যোৎকর্ষতা তেমনটা লক্ষ্য-গোচর হয় না। এসব গান সাধারণত তাত্ক্ষণিক সৃষ্টি, মুহূর্তমধ্যে লক্ষ্য-বস্তুকে বিদ্ধ কবাই এদের উদ্দেশ্য। যেহেতু এ গান আক্রমণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় তাই এর তীব্রতা যতো বেশি হ'ল, প্রতিপক্ষের জালাও ততো বেশি হ'ল; শাই এ গানে বিবোধগাম্যের তীব্রতা এবং আক্রমণের সূচিমুখের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয়। এ-গান যে বীতিমতো প্রাণবন্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। পবিচিত সংসারের ঈর্ষাকাতব কুংসা-পবায়ণ মাল্লবগুলো এই সব গানের মধ্য দিয়ে নিবাববণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গানগুলো সাহিত্যবস্তুমুগ্ন হোক বা না হোক, টুঙ্গ গীতের বিশিষ্ট গুণ চিত্রধর্মিতা প্রায় সর্বত্রই বক্ষিত হয়েছে। শুধু ছন্দোধর্মে নয়, এই চিত্রধর্মে দিক দিয়েও টুঙ্গ গীত ছড়াব সমগোত্রীয়। ছড়াব আব এক ধর্ম অসংলগ্নতাও টুঙ্গ গীতে সবিশেষ লক্ষ্য কবা যায়। টুঙ্গ গীতের নামটা মুছে দিলে গীতগুলো গান না ছড়া তার সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। টুঙ্গ গীত আসলে ছড়াই, তবে এ ছড়া শিশুদের জন্ম নয়, বয়স্কদের জন্ম, এ ছড়ার বিষয়বস্তু অলৌকিক অবাস্তব জগৎ নয় ববং আমাদের পরিচিত প্রেম-ভালোবাসা ঈর্ষ্যা-ঘৃণা-বন্দভরা প্রত্যক্ষ সংসার।

টুঙ্গ গীতে ঝাড়খণ্ডের সামগ্রিক জীবন প্রতিকলিত হয়ে থাকে, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। গাহ'স্ব্য জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ঈর্ষ্যা-

সহায়ভূতি, ঘুণা-ভালোবাসা সব রকমের অমুভূতিই নিচিহ্ন বর্ণে-রসে সজীব চিত্ররূপ ধারণ করে এবং আমাদের কল্পনাকে মুগ্ধ করে তোলে। অনবচ্ছিন্ন চিত্র-রস যেমন টুঙ্গু গীতের একটি বিশিষ্ট বৈভব, তেমনি জীবন-বস এর প্রাণৈশ্বর্য। গাহ'স্ব্য জীবনসম্পর্কিত গীতগুলো তাই চিত্রেব ব্যঞ্জনা, অমুভবের তীব্রতায়, অকৃত্রিম অবযবতায়, সহজ ভাষণ রীতির ঋজুতায় অমুপম কবিতা বিশেষ। গাহ'স্ব্য জীবন বাদ দিয়ে নাবীব জীবন কল্পনা করা যায় না; তাই পবিবাবেব বিভিন্ন জনেব সঙ্গে তাব বিভিন্ন বকমেব সম্পর্ক। তাব জীবনে পিত্রালয় এবং শ্বশুরবালয় দুটোই গুরুত্বপূর্ণ স্থান। প্রাক বিবাহ যুগে পিত্রালয়ে তাব মধুব দিনগুলো অতিবাহিত হয় কিন্তু বিবাহেব পব মাতৃপিতৃবিয়োগ ঘটলে প্রাতৃজায়া-শাসিত পিত্রালয়ে তাব জীবনে আব সুখ থাকে না। ওদিকে শ্বশুরবালয় তো কাবাগাব বিশেষ, শাশুড়ী-ননদীব লাঞ্ছনা গঞ্জনা, কখনো কখনো শাবীবিক পীড়ন, তো আছেই, তাব ঃপব সপত্নী বহুগা। শ্বশুরবালয়ে বধুব বিভিন্ন জনেব সঙ্গে সংঘর্ষের কথা, তাব বেদনার কথা, তাব চোখেব জল টুঙ্গু গীতে মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

পিত্রালয় থেকে বিদায়েব মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। বাবা বিদায় দিতে বাজি, মায়েব কিন্তু ছাড়তে গিয়ে প্রাণ কাঁদে। বোনেব দু'চোখে জল দেখে ভাইও তাকে ছেড়ে দিতে চায় না। জামাই ঠিকি বু'কি মাবতে ছাড়ে না।

৩৯. বাপে বলে ছা'ডব ছা'ডব মায়ে বলে ছা'ডব না।

ভাই-এ বলে ঝিউডি ছেল্যা কাঁদায়ে পাঠাব না।।

পিঠা ঘব ঘুবাছে, জামাই ছানা ভুলুকে হলুক দিছে।।

জামাইকে তাই ডেকে পবিষ্কাব জানিয়ে এডয়া হয়, ঠিকি বু'কিতে কোন লাভ হবে না, কিছুতেই মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

৪০. আল' ধানেব কাল পিঠা খুড়ি কাঠে সিজেনা।

কেনে জামাই হলুক বুলুক বিটি ছাড়ো দিব না।

কিন্তু কন্যাকে একদিন শ্বশুরবাডি যেতেই হয়। তার মনে যেটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াব সৃষ্টি কবে তা হলো পিত্রালয়েব পবিচিত লোকজনেব পরিবর্তে শ্বশুরবালয়েব অপরিচিত লোকজনেব বিচিত্র সব মনোভাব। আজন্ম বাপের বাড়িতে মানুষ, তাই সবাব সঙ্গে তাব আত্মিক পবিচয়, শ্বশুর বাড়ির অচেনা লোকদেব বুঝতে এবং বোঝাতেই তাব যত্নগার সীমা পরিসীমা থাকে না।

৪১ বাপের ঘরে ছিলম ভাল কাঁখে গাগরা চা'ল ডাঙ্গা ।

শুগুর ঘরের বড় জালা লক বুঝাতেই যায় বেলা ॥

শুগুরবাড়িতে শুশুব, শান্তুডী, ননদ, ডান্দুব, দেওব আর স্বামী মোটামুটি এই চ'জন লোকেব মুখোমুখি তাকে হতে হয় । সাধারণতঃ পিতৃ- এবং শুশুব- প্রসঙ্গ লোকসাহিত্যে একেবাবেই পাওয়া যায় না । তাই টুঙ্গ গীতে শুগুর- সম্পর্কিত গান নেই । কিন্তু শান্তুডী আছেন । লোকসাহিত্যে শান্তুডীর ভূমিকা সর্বজন বিদিত । টুঙ্গ গীতেও শান্তুডী তাঁব নির্দিষ্ট ভূমিকা যথাযথভাবে পালন কবে গেছেন । বধূব জীবনকে অত্যাচাবে-নিপীডনে জর্জবিত কবে তোলাই যেন তাঁব উদ্দেশ্য । মনোরঞ্জনব জন্ত ব'ব কিছু কবতে বসলেই শান্তুডীব বিষাক্ত ছোবল অব্যর্থ আঘাতে আছড়ে পড়ে ।

৪২ স'বষা ফুলটি থপনা থপনা হল'দ বলো বাঁটোছি ।

অ শান্তুডী গা'ল দিহ না পাশা খেলতে বগ্বেছি ॥

বধূব প'বশুই একটু অপবাধ ছিল : হলুদ মনে কবে সে খোঁকা-খোঁকা সববে ফুল বেঁটেছিল । পৌষ পববে সবাই নীল শাড়ি পবল, কিন্তু বধূব শান্তুডি এমনি পাপিঠা যে বধূব সে সাধও মেটান নি ।

৪৩ এষ্ট বছ'ব পোস পববে সবাই পবে লীল শাড়ি ।

সামাব শাউডী দুগ্গাব পাপী নাই দিল গ লীল শাড়ি ॥

কিন্তু শান্তুডীব অত্যাচাব যখন চবমে ওঠে তখন শুশুব বাড়িব কোন আকর্ষণই তাকে সাহুনা দিতে পাবে না । শান্তুডী তাকে পেট ভবে খেতে দেন না, এমন কি তাকে ধবে কিল চড ঘুঁষি মাবতেও বাদ দেন না ।

৪৪. মায়ে বলে ঈ গ বিটি এত কেনে শুখালি ।

শুশুব ঘরের ফপবা মুটি সেহ খায়ে শুখালি ॥

আব যাব না শুশুরের বাড়ি, আমকে কিলাঁই দিল শান্তুডী ।

ননদিনীও অত্যাচাবে-পীডনে শান্তুডীর চেয়ে কম যায় না । তাই ননদীর প্রতি বধূব মনোভাব ক্ষমাহীন ভাষায় প্রকাশ পায় । শান্তুডী যতোদিন বেঁচে, ততোদিন বধূকে নির্বিকাব সহ্য কবতে হয় কিন্তু শান্তুডী মারা গেলে বধূর কত্রীত্বে পান্টা আঘাত ভোগ করতে হয় ননদীকে ।

৪৫. পাহাডেতে জল পড়ে ননদিনী গান করে ।

ধাম্ ল ননদ ভা'ঙব গরব যবে তুমার মা মরে ॥

ননদের পীডন বধূকে এতোই আঘাত করে যে ননদ-সম্পর্কে কোনরকম

সহানুভূতির লেশমাত্র আর থাকে না। প্রতিশোধ-স্পৃহা তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর করে তোলে। তাই ননদীর মৃত্যুসংবাদ এলে সে মোটেই দুঃখ পায় না, বরং স্বস্তি পায়; এতোকালের পীড়নের অবসান ঘটে।

৪৬. ভাত বাঁধোছি ডা'ল বাঁধোছি গেলাসে দুখ ঢালোছি।

খাবার বেলা খবর আলা তর ননদ মরয়ে গেল ॥

ননদ ম'রল ভাল হল্য পেটের ভাত জিরুন গেল।

ছট বেলা সাঁতাই ছিল তাই হঁতে যমে লে'গল ॥

নিয়োক্ত গানটি ননদ-ভাজের মধুব সম্পর্কের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বধুব খশুরালয়ে থেকেপিত্রালয়ে যাবাব বিদায়লগ্নে বিচ্ছেদ-কাতব ননদের অশ্রুসজল মূর্তিটি আমাদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। ননদ-ভাজেব 'এমন বেদনা-মধুব মিলনের চিত্র লোকসাহিত্যে একান্তই পিবল।

৪৭. ইন্দু বিন্দু সিন্দুব প'রলম বাপেব ঘর যাবাব লাগ্যে।

জুণের ননদ কাঁদতে লা'গল বাস ফুলেব ডাল ধব্যে ॥

কাঁদ না কাঁদ না ননদ কিব্যে আ'সব মাঘ মাসে।

তু হাতে তু মিঠাই খালা আগ্তে দিব তুমাকে।

লৌতন দেশেব লৌতন শাড়ি আগ্তে দিব তুমাকে ॥

ভাস্তবেব সঙ্গে বধুব পবিহাবেব সম্পর্ক। টিম্ব গীত বাস্তবজীবনেব মিশ্রিত চিত্র বলেই ভাস্তব-প্রসঙ্গও খনিবাবভাবেই এসেছে। বলাবাহুল্য, প্রায় প্রতিটি গানেই দেখা যায় ভাস্তব বডো বেশি ভ্রাতৃজায়ার প্রতি কৌতুহল দেখিয়েছে; কোথাও বধুব সঙ্গে একটু অন্তবঙ্গ হবার প্রয়াসের আভাস, কোথাও বা দেহমিলনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

৪৮. মাছ কা'টলম চাকা চাকা মাছেব কাঁটা সিজ়ে না।

ভাস্তব হয়ে জিগির করে ই জীবন আর বা'খব না ॥

৪৯. বাডি নাময় রাহেড বু'নলম রাহেড হল্য চমৎকার।

কলের পুরুষ চাকরি গেল ভাস্তব হল্য গলার হার ॥

দেবব-ভাজ সম্পর্কটি কিন্তু ঝাড়খণ্ডে অত্যন্ত বঙ্গ-মধুর। দেবরই যেন খশুরালয়-মরুদেশে একমাত্র সবুজ সজীব পাশুপাদপ। সুখ-দুঃখের কথা বলে দেবরের কাছ থেকেই সান্ত্বনা পেয়ে থাকে বধু। ঝাড়খণ্ডী সমাজব্যবস্থায় দেবর-ভাজের মধ্যে দেহ-মিলন নিষিদ্ধ নয়।

৫০. সিন্দু বিন্দু সিন্দুব প'রলম বাপের ঘর যাবাব লাগ্যে।

শুণের দেঅর কাঁদতে লা'গল বাস ফুলের ডাল ধবো ॥

কাঁদ না কাঁদ না দেঅর আ'সব মাসের সাঁকরা'তে ।

ছ হাতে ছই সনার ছাতা আশ্বে দিব তুমাকে,

লোঁতন দেশেব লোঁতন ধুতি আশ্বে দিব তুমাকে ॥

টুঙ্গ গীতে স্বামী প্রসঙ্গ নেই বললেই চলে । কোথাও কোথাও আভাস দেওয়া হয়েছে মাত্র ; কখনো বলা হয়েছে চাকরীতে গেছে, কখনো বিদেশে গেছে, কখনো-বা স্বামীব পবকাঁয়া প্রেমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । একটি মাত্র গানে যুবতী নাবী বৃদ্ধস্ত তকণী ভার্যা হয়ে-ও পরম পবিতৃপ্তির কথা সর্গোরবে ঘোষণা কবেছে এবং বৃদ্ধ স্বামী যে দেহস্থখ দানেও সমর্থ, তারও ইঙ্গিত আছে । স্বামী-সম্পর্কে এতোখানি নীববতাব কারণ সুস্পষ্টভাবে বলা মুশ্কিল, তবে মনে হয় স্বামীদেব নিদালন অত্যাচাবেব জন্মই নারী-সমাজ টুঙ্গ গীতে স্বামীদেব সম্পর্কে নীবব । বং অবৈধ প্রেম এবং দেহমিলনেব কথায় তারা টুঙ্গ গীতর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভবে তুলেছে ।

৫১. আয়না লিলি পায়না লিলি মাখা বাঁধলি কপসী ।

ই রূপটি তব দে'থবে কে ল পুরুষ হল্য বিদেশী ॥

৫২. আধ পয়সার ভাজা মালা আমবা বল্যে পবোছি ।

নিজের পুরুষ পরকে দিয়ে' পাষণে বুক বাঁধোছি ॥

৫৩. লকে বলে বুঢ়া বুঢ়া থাকুক ন আমার বুঢ়া ।

বুঢ়া যদি বাঁচো থাকে দিবেক ল পায়ের তড়া ॥

বুঢ়া আমার শুণের নাই হলে, আমি ধব কবো খাই কি কবো ॥

সপত্নী-যন্ত্রণা বধুব জীবনে তীব্রতম যন্ত্রণা । টুঙ্গ গীতে সতীন-সম্পর্কিত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জালাময়ী ভাষায় প্রকাশ লাভ কবেছে ; কোথাও তা এতোই নয় এবং এতোই নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে তা রুচিবানদের রুচিতে প্রবল আঘাত করে । কিন্তু এই নগ্নতা এবং নিষ্ঠুরতাই প্রমাণ করে সতীন-জালা কি মাবাত্মক জালা । ঝাডখণ্ডী নাবী তাব মনোভাবকে কখনো অপ্রকাশ রাখে নি ; তার প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত সহজ ভাষায় সরাসরি প্রকাশ করেই সে যেন তৃপ্তি পায় । লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট গুণ হল স্পষ্টতা । টুঙ্গ গীতের মতো স্পষ্টতা এবং ঋজুতা খুব কম গানেই পাওয়া যায় ।

সতীন-সম্পর্কিত গানগুলো তিক্ততম অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রকাশ মাত্র ।

৫৪. আয় ল সতীন মারবি ন কি তর কি আমি মা'র ধাব ।



কালীর ধানে খুঁটা গাডো তকেই বলিদান দিব ॥

৫৫. একটি চুঁলের ফিরকি বুঁটি বাঁধব ল যতন কবি ।

তুঁই ল সতীন মরো গেলে কাঁদব ল ছাঁচায় ধবি ॥

৫৬. এক গাডি কাঠ ছুঁগাডি কাঠ কাঠে আশুন লাগাব ।

যখন আশুন পরগল হবক সতীনকে ঠেলে দিব ॥

সপত্নী-যন্ত্রণা তীব্রতম তিক্ততম হয় যখন বোন-সতীনের ঘটনা ঘটে ।

‘সবার ওপর তেঁতো কণ্ঠা বোন-সতীনের ঘব ।’

৫৭. তাদের পাডায় দেখে আলায়াম দু বহিনে জঁটা জ টি ।

এমন বাপে হচুক-চবা এক জামাহকে ছবিটি ॥

গাই/স্বা-জীবনসম্পর্কিত গানে বধূব জীবন নিঃসন্দেহে বেদনাব বড়ে চিত্রিত হয়েছে । সে বাপেব বাড়ি থেকে ফুল পেড়ে শাড়ি পেলে জাতিকুল খুঁইয়ে শাড়ি পেয়েছে বলে খোঁটা দেখা হয় ।

৫৮. বাপের ঘবে কাপড দিল ধারে ধাবে ধানকী ফুল ।

শুণুর ঘরের লকে বলে গেল বড়ব জাতিকুল ॥

তাই বাপেব বাড়ি যাবার জন্ত মন উল্খুস কবে । পৌষ পবব এলে বাপেব বাড়ি যাবার সুযোগ আসে কিন্তু অনেক সময়ই ম'-বাপ তাকে শ্বশুরবাড়িতে কেলে রাখে । অভিমানে তাব বুক ভাবি হয়ে ওঠে । মায়েব প্রতি সে সক্রম অভিযোগ কবে । তার ইচ্ছে কবে পাখির মতো উড়ে গিয়ে বাপের বাড়িব কোঠাঘবের ভেতবে গিয়ে বসে পড়ে ।

৫৯. তুঁই যে গ মা বেহা দিলি বড় লদীর সে পারে ।

এত বড় পোষ পরবে রাখলি মা পবের ঘবে ॥

মনটা কেমন করে, উড়ো য়ায়ে ব'সব গ মাক্যা ঘরে ॥

কোন গানে মৃত্যু মায়েব স্মৃতিতে তার ছুঁচোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে । পৌষ পরবে বাপেব বাড়িতে যাবার জন্ত সে ভেতরে-ভেতবে তৈরী হল, অখচ কেউ তাকে নিতে এল না । মা নেই, তাই প্রাণ জুড়াবার মতো কেউ নেই, এক অসহায় কান্নায় সে যেন ভেঙে পড়ে ।

৬০. মাথা ঘঁষে রইলম বশো প্রাণ জুড়াব কার কাছে ।

আবাল কালে মা মরোছে আর আমাদের কে আছে ॥

শ্রেয় টুঙ্গু গীতেব-ও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় । টুঙ্গু গীতের শ্রেয়বোধে স্কুসুমার অল্পভুক্তির দর্শন খুব কমই মেলে । দেহ-মিলনের তীব্র বাসনা

প্রেম-বিষয়ক গানগুলোতে সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ ঝাডখড়ের প্রেম-ভাবনা মোটেই মানস-লোকেব ব্যাপাব নয়, বরং বৃত্তক্ষু শরীরের তৃপ্তি-সাধনেব মধ্য দিচ্ছেই প্রেম এখানে পূর্ণতা এবং পবিত্রতা লাভ কবে। দেহকে বিস্মিত কবে বিদেহী প্রেমের কথা ঝাডখড়ী সমাজজীবনে কল্পনাও কবা যায় না। দেহকে আশ্রয় করেই এখানে যুবকযুবতীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে; দেহকে অশ্রয় কবেই তাদের চিত্তলোকে গভীর প্রেমবোধ জন্মলাভ করে। শরীর প্রেমের তপ্ত বাসনামণ্ডিত প্রকাশ টুঙ্গ গীতের রং-এ সর্বাধিক লক্ষ্যগোচর হয়। টুঙ্গ গীতেব মূল পদে বং দেহ-কামনার একটু আবরণ থাকে, টুঙ্গ গীতের বং-এ সেটুকু বাহ্যাবোধের যন বর্জিত হয়ে থাকে।

দেহ-প্রেমের কথা টুঙ্গ গীতে প্রাধান্য পেলেও গভীর ব্যঞ্জনাশ্রয়ী প্রেম বিষয়ক পদ যে একেবাবেই নেই, তা বলা চলে না। মধুর প্রেম-ভাবনা নিচের গানগুলোতে আভাসিত।

৬২ কুখা হতে আলে তুমি কুখায় তুমাব ঘববাড়ি।

গাছতলাতে দাঁড়াও টুকু ডাল ভাঙে বাগাও কাঁব ॥

প্রেম-সম্পর্কিত গানে পুকুর ঘাট, নদী ঘাট, ৩৩ কপায় জলেব একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এত বরনের গানগুলোতে প্রেমের সহজ ভাবনা যেমন আছে, তেমনি আছে দেহমিলনের ইঙ্গিত।

৬৩ সখের বাটি সখের ধটি প'ডল গ ঝানাং কবে।

জলকে যাবাব লছনা কবে ব'সলম গ বাবলা তলে ॥

৬৪ বাবুব বাঁধকে নাহতে গেলে বাবুব দেয মা হে'ল মাবো।

খাঁকের গাগ'বা খাঁকেই র'হল হিকিম দিল চ'খ ঠাবো ॥

আয় রে হিকিম ব'সবে খা'টে পান দিব বাটা ভবো।

ঝিঙাফুল্যা গয়না লিব দে রে হিকিম দব কবে ॥

রাজা দিল আঁচিব পাঁচিব রাজা দিল তেতালা।

হিকিম দিল ফুলেব বাগান হাওয়া খাওয়ার গাছতলা ॥

ওপরের গানটিতে বাজাব ( বাবুব ) পুকুরে স্নান করতে গিষে যুবতী নাবী যে অভিজ্ঞতাব সন্মুখীন হয়েছিল, তাবহ অকপট বর্ণনা। যুবতীকে স্নান করতে দেখে রাজা জলে ঢেউ-এর দোলা দিতে লাগল, বিশ্বয়-চকিত যুবতীর কাঁথের কলসী কাঁথেই থেকে গেল—সময় বুঝে রাজজাতা ( হিকিম )-ও চোখের ইশারা করতে লাগল। তাই হিকিমকে খাতিব ষড় করে বাটা ভরে পান

ফুলে দিল সে আর পরিবর্তে হিকিম দিল ঝিঙাফুলিয়া গহনা। রাজা পাঁচির-  
অলা তেতলা বাড়ি বানিয়ে দিল আর হিকিম কবে দিল ফুলের বাগান,  
হাওয়া খাওয়ার গাছতলা। গানটিতে গয়না-গাঁটি ঘরবাড়ির বিনিময়ে দেহ-  
দানের ইঙ্গিত আছে।

কিছু গানে বীতিমতো কাব্যিক ব্যঙ্গনার সঙ্গে এই উপহাস জব্য প্রসঙ্গটি  
চিত্রায়িত হয়েছে। ইঙ্গিতধর্মিতা এসব গানের বিশিষ্ট ধর্ম।

৬৫. বাণ আল্য বরষা আল্য ভাঁশ্রে আল্য তুলুকি।

তুলুকির ভিতর লেখা আছে নবীন প্রেমের উলুগী ॥

৬৬. ডাকে আল্য কাল ছাতা ধাবে ধাবে নাম লেখা।

আজ ফিরে যাও কাল ছাতা কা'লকে হবেক মুখ দেখা ॥

টুঙ্গু গীতে যৌন-প্রেমের রূপকান্তিত উল্লেখ মেলে যত্র তত্র, তবে রূপকের  
আবরণটা যথেষ্ট পাতলা, প্রায় স্বচ্ছ বললেও অতুক্তি কবা হয় না।

৬৭. অ ল অ ল শিশু ছাঁডি যা'স না কঁচি শালবনে।

খুঁদি বল্লায় বিঁধ্যে দিলে গবাব ল তুঁই জ্বলনে ॥

৬৮. আঁধাব ঘরে কাল ভমর বিঁধ্যে কবল জবাজব।

আর বিঁধ না কাল ভমর তুমাব বই আর লই কাব ॥

টুঙ্গু গীতে প্রেমের বিচ্ছেদ প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ যন্ত্রণার গভীরতায়  
মর্মভেদী নয়। যেহেতু এখানে যে-প্রেমের কথা বলা হয়েছে, তা মিতান্ত্রই  
দেহ-গত প্রেম, তাই বিচ্ছেদ এলেও তা হৃদয় মথিত করে না। ঝাড়খণ্ডে  
যৌনতাই প্রেমের চাবিকাঠি। গ্রহণে যেমন আগ্রহ, বর্জনেও তেমন সহজ  
নির্লিপ্ততা এখানকার প্রেম-ধর্মের মৌল লক্ষণ। নিম্নোক্ত গানগুলোতে  
প্রেমের আবির্ভাব, বিবহ, প্রতীক্ষা, বিচ্ছেদ, অহুযোগ, নির্বিকার বর্জন  
ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে।

৬৯. পুরুলিয়ার পুতনী পক' উডে গেলে ধ'রব না।

যার সঁগে যাব ভালবাসা প্রাণ গেলে ভাব ছা'ড়ব না ॥

৭০. অ ল অ ল কাল ছাঁড়ী তর কথার কি সত্ আছে।

আ'সব বলে' আশা দিলি গামছা বিছাঁই রা'ত গেছে ॥

৭১. খডপ্পুরের সুরু চাদর উডে' গেলে কেউ ধর্য না।

যার সঁগে যার ভাব থাকে রে সে ছাড়া কেউ ধর্য না ॥

৭২. অ রে অ রে কাল ছাঁড়া পানে কেনে চুন দিলি।

এত দিনের ভালবাসা আ'জ কেনে জবাব দিলি ॥

৭৩. একটি ডগে দুটি পায়রা জড় ভাঙে বিজড় হল্য ।

এবার বঁধু নিঠুর হল্য দেশ ছাড়ো বিদেশ গেল ॥

৭৪. ভালবাসা বলোছিল আ'সব মাসের তিন দিনে ।

দিনে দিনে মাস ফুরাল্য আল্য না বছর দিনে ॥

৭৫. চাকুলিয়ার সুরু চাদর উড়ো গেলে ধ'রব না ।

যার স'ঙ্গে বিচ্ছেদের কথা প্রাণ গেলেও রা কা'টব না ॥

আগেই বলা হয়েছে যে, বহু বিচিত্র বিষয় টুসু গীতের উপজীব্য; সমগ্র ঝাড়খণ্ডকে রূপেরসে গন্ধেবর্ণে কামনায়-বাসনায় পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হলে টুসু গীত অপরিহার্য। আরো কিছু বিচিত্র বিষয়-সম্পর্কিত গানের আলোচনা করা যেতে পারে। শাড়ি-গহনা-অলংকার ঝাড়খণ্ডী নারীর কাছে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তাই বিভিন্ন গানে এসব সম্পর্কে তাদের সাধ-আহ্লাদেব কথা, না-পাওয়ার বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস ঘনীভূত হয়ে আছে।

৭৬. আলতা পাঢ়া চালতা পাঢ়া সকল পাঢ়া পরোছি ।

মনহরা শাড়ির লাগে ডাকে চিঠি ছাড়োছি ॥

৭৭. চল ল সঙ্গতি সবাই বেলাই চণ্ডীব হাট যাব ;

গায়ের গহনা বিকেঁ দিয়ে' প্রেম-ডুরিয়া শাড়ি লিব ॥

টুসু গীতে অজস্র ইচ্ছার মিছিল। যা কিছু চোখে রঙ ধরায়, তাই গান হয়ে ওঠে; যা কিছু মনে ভাব জাগায় তাই সুর হয়ে ভেসে ওঠে। ছ'পর্ডস্তির গানে একটি মুহূর্ত, একটি দৃশ্য, একটি ভাব অনন্তকালের জন্ম ধরা পড়ে। তাই কতো কি তুচ্ছ দৃশ্য, তুচ্ছভাব টুসু গীতে মিছিলের মতো বিচিত্র সাজে রূপায়িত হয়েছে।

কখনো ফুল তুলে বিনি-সুতোয় মালা গাঁথবার বাসনা—

৭৮. বাছো বাছো ফুল তুলব বাছো তুলব ভাবরি ।

বিনা সুতায় হার গাঁথোছি লকে বলে মাদলি ॥

কখনো রাজার বাগানের মল্লিকা ফুলের বাতাসকে গন্ধময় করে তোলার চিত্র—

৭৯. রাজা যেমন বাগান তেমন মালী ফুল বই ফুটে না ।

আমরা সবাই কিনতে গেলে তিন আনা বই বলে না ॥

কি ফুল ফুটোছে বাগানে, ফুলের গন্ধ ছুটে পবনে ॥

এমনি তরো কতো ইচ্ছা, কতো সাধ যে টুঙ্গু গীতে চিত্র হয়ে উঠেছে তার ইয়ত্না নেই।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, টুঙ্গু গীতে বাধাক্ষয় সম্পর্কিত গান নেই বললেই চলে। আমাদের সংগৃহীত গানের মধ্যে ছ'চারটির বেশি গান নেই। ভনীতায়ুক্ত লোককবির মুদ্রিত টুঙ্গু সংগীত পুস্তিকায় অবশ্য বাধা-ক্লেষ সর্গোরবে উপস্থিত আছে। কিন্তু সে-সব গানকে আমরা আমাদের নিবন্ধে আলোচনার যোগ্য বলে মনে করি না। ঝাড়খণ্ডী নাবীসমাজ রচিত টুঙ্গু গীতে বাধা-ক্লেষের কথা প্রসঙ্গ থাকবাব কথা নয়। বৈষ্ণব প্রভাব পুরুষদের ওপর ভাসা-ভাসা ভাবে পড়লেও অন্দবমহলেব নাবীসমাজের ওপর যে প্রভাব ফেলতে পারে নি, তা সপ্রমাণ হয় যখন আমরা লক্ষ্য কবি ঝাড়খণ্ডী নাবীর একান্ত নিজস্ব গান জাওয়া গীত, বিয়েব গান এবং টুঙ্গু গীতে বাধাক্ষয়-প্রসঙ্গ বর্জিত গীত। অত্র কাবণ এও হতে পারে যে, টুঙ্গু গীতে লৌকিক প্রেম-কথারই প্রাধান্য, বাধাক্ষয় প্রসঙ্গ এখানে একান্ত গৌণ হয়ে পড়েছে; অথবা লৌকিক প্রেমিকযুগলেব অন্তবানে বাধাক্ষয় আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

৮০. লহ লহ কলমী লতা দবাব মাঝে ডাল ফেঁকে।

এত এত সগী থা'কতে রুক্ষ দব্যায় কাপ দিছে ॥

৮১. জল কাল যবুনার আব মাথাব বেণী কাল।

দে'খতে ভাল অঙ্গ কালাব শ্রীরাধিকাব নাম ভাল ॥

এবাবে 'টুঙ্গু গীতের বং' সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, টুঙ্গু গীতের মূল পদের সঙ্গে বং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এই সব বং যে পদের অর্থেব সঙ্গে সম্পর্কিত হবেই এমন কোন কথা নেই। বং সদর্থেই বর্ণময়, জীবন্ত নব-নাবীব তপ্ত রক্তের বিচ্ছুরণে এগানগুলো উত্তপ্ত বক্রিম চিত্রমালাব সৃষ্টি করে থাকে। জীবনের এমন প্রাণময় প্রকাশ অত্র কোন গানে পাওয়া যায় না। এতো সহজ নিরাবরণ প্রকাশ, এমন সরাসরি ঋজুভাষণ অত্র হ্রস্ব। গানগুলো যেন ঝাড়খণ্ডী মানুষের শব্দচিত্র বিশেষ; শব্দচিত্র হলে-ও তার মধ্যে আমরা ঝাড়খণ্ডী মানুষের হৃদস্পন্দনের মুছ শব্দটি পর্যন্ত শুনেতে পাই। এসব গান আরো অব্যবহিত অনবশুষ্টিত হয়ে ওঠে পুকুর ঘাটে, নদী-ঘাটে এবং মেলায়। এগান যেমন অব্যবহিত হৃদয়ের প্রতিলিপি, তেমনি এগান মুক্ত প্রান্তরের

ভাবলিপি। টাঁড বুয়ব যেমন ঝাডখণ্ডের মাঠে-প্রান্তবের আদিম আব-  
হাওয়ায় স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে, এ-গান ও তেমনি লোকা-  
লয়েব বাইরে সজীব এবং বর্ণময় হয়ে ওঠে।

বং গীতের বিষয়বস্তুও বিচিত্র উপাদানে গঠিত হয়ে থাকে। প্রেম-  
ভালোবাসা, ঈর্ষ্যা ঘৃণা মিথালি-কলহ, শাড়ি গহনা সব কিছুই এর অন্তর্গত।  
মুহূর্তেব আবেগে তাৎক্ষণিক সৃষ্টি বলে এগুলোব মধ্যে মগুনেব কোন  
অবকাশ থাকে না অথচ একটি অভিনব চিত্রের আধাবে আবেগটি আবদ্ধ  
হয়ে থাকে। প্রধানতঃ প্রেমই বং এর উপজীব্য হয়ে থাকে। তবে এ-  
প্রেম কোনক্রমেই নিষ্ফল হয় না। দেহকে হাশ্রয় কবেই এ-প্রেম পূর্ণতা  
ও পরিণতি লাভ কবে। অল্পভবেব কল্পলোকে বিচরণ কবে প্রেমান্বিত হওয়াব  
চেয়ে দেহকে হাশ্রয় কবে বসাপ্ত হওয়া ঝাডখণ্ডী জনমানসে শ্রেষ্ঠতব  
অভিজ্ঞত হিসাবে গ্রহণ কবা হয়েছে। ডঃ ধীবেন্দ্র নাথ সাহা তাঁর ‘ঝাড-  
খণ্ডী লোকভাষার গান’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘এখানে প্রেমের দেওয়া-নেওয়াকে  
গোপন কবা হয় নি, দেহ অনাবশ্যক অবলম্বনে অদৃশ্য নয়। হৃদয় থেকেও  
দেহ যে প্রিয়, মানসী থেকেও দেহী যে গোতনেব অনেক পদেই তার প্রকট  
প্রকাশ কর্তৃক স্বীকৃতিতেই। দেহকে দেহেব সবচেয়ে বাস্তবতায় ধবার অধীরতা  
এগানেব প্রতি ছত্রে। এখানে আকাঙ্ক্ষা ভাবদিগন্তেব পাখি নয়।’

নিছক দেহই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে পূর্ববাগের কোন প্রস্নই ওঠে না।  
যতক্ষণ না দেহ অধিগত হচ্ছে ততক্ষণ অহুবাগেব আবির্ভাবও সম্ভব  
নয়। তাই প্রেমপ্রার্থী যুবক কখনো তীব্র শ্লেষে-বিদ্রুপে বিদ্ধ কবে যুবতীকে  
তাব দিকে আকৃষ্ট কববার চেষ্টা করে।

৮২ সিনাই লে ল গুবায জল আছে। তকে দে'থলে ল অকাই পাছে।।  
দৈহিক প্রেমের ক্ষেত্রে চোখ বা চোখের চাতনির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা  
আছে। নায়িকার তির্যক দৃষ্টি দেখে নায়ক সরাসরি পশ্চাদ্ভ্রমের জন্ত  
কখনো ডাক দেয়—

৮৩ তু'ই ভালছিস কি আডে আডে। মন যাছে ত আয় পেছা ধরো।।

প্রেমিকাও চোখের ইঙ্গিতে তার মনোভাব বোঝাবার চেষ্টা করে—

৮৪ তু'ই বুঝলি না রে চ'থঠাবা। ক'রব কত হাতের ইশারা।।

কখনো বা প্রিয়জনকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে, প্রার্থিত-জনের  
নাম সে জানে না, তাই নাম ধরে ডাকতেও পারে না নায়িকা।

৮৫ তুই ডাঁটালি অনেক ধুরে । নাম জানি নাই ডা'কব কি কবো ॥

ঝাড়খণ্ডে প্রেমের অম্লষঙ্গ হিসাবে পানের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে । মুখ-চেনা, স্বল্প-চেনা কিংবা মেলায় চোখেব ইঙ্গিতে মন জানাজানি হয়েছে এমন নরনারী যদি একে অঞ্ছের পান গ্রহণ কবে, তবে উভয়পক্ষই যে দেহমিলনে রাজি, একথা উভয়ের কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । ঝাড়খণ্ডে পানের ভেতব মোহিনী দিয়ে বশীভূত কববাব তুকতাকে লোকে বিশ্বাস কবে । তাই অনিচ্ছুক যুবক যুবতী সহসা পান গ্রহণ করতে রাজি হয় না ।

৮৬ কি দিলি বে পান পাতে । মন কবে নাই ঘব যুব্যে যাতে ॥

৮৭ আমদের যগমহিনী গাছ আছে । ডাকি নাই ল'তা উ চলি আসে ॥

একবার প্রেম ঘনীভূত হলে নারী কুলত্যাগ এবং গৃহত্যাগ কবে প্রেমিকের হাত ধবে গোপনে পালিয়ে যায়—

৮৮ একটা নাথে দু'টা নাগছাৰি । তুই থাকিব ন বা'হবা'ই খাৰি ॥

তবে ঝাড়খণ্ডে প্রেমিক-যুগল যে লোকনিন্দা কিংবা কলঙ্কেব গুণ কবে না, তা নয় । তাবাত সামাজিক জীব, তাই নিষিদ্ধ বা অসামাজিক প্রেম-লীলা অভ্যস্ত গোপনে চালাতে হয় । বাস্তব পথে-ঘাটে সোচ্চাব হয়ে ওঠাব অবকাশ পায় না । শুধু চোখেব চাহনি আর মুচকি হাসিব বলকে নিঃশব্দে প্রেমিক-প্রেমিকা পাবস্পবিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ বাণে ।

৮৯ আমরা বা কাটি নাই লকপাদী । মুহে হাঁদি চইপে ভাব বাখি ॥

কিন্তু শেষ তক যে-প্রেমকে একদা মনে হয়েছিল, 'যেমন গেঁতা মাছেব হাব গাখা/তব মন আমাব পাঁজবায় গাখা,' সে প্রমেমেও ভাঙন ধবে, বিচ্ছেদ আসে । তখন পরস্পর পবস্পবকে দোষাবোপ কবে—

৯০ তবা উডাঁই দিলি জনহা'ব পই । ভালবাসা বা'থতে পাবলি কই ॥

দুঃখে-বেদনায় তখন প্রেমিকা সিদ্ধান্ত নেয় : একবার প্রেম কবেছিলাম, ভুলেও আব কবব না, কিন্তু প্রেমের তিক্ত-মধুব অভিজ্ঞতা সাবা জীবনে ভুলব না ।

৯১ ভাব করোছি আব ক'বব না । ই জনমে ভুলব না ॥

কিন্তু সত্যিই কি এ বৈরাগ্যের কোন মূল্য আছে ? যে-বিবহজ্জালার কোন অভিজ্ঞতা তার জানা ছিল না, তাও এবাব হল । এ-অভিজ্ঞতা তো বেদনা-মধুর স্মৃতিবসে সম্পৃক্ত ।

৯২ আমি নাই জানি বির জালা । জানাঁই দিল ডাঁগুয়া খালভরা ॥

প্রেমেব ব্যর্থতা এবং বিবহজালা নিঃসন্দেহে সাময়িক যজ্ঞগাব সৃষ্টি করে। অতীত-প্রেমের জন্তু দীর্ঘশ্বাস যেমন থাকে, তেমনি থাকে স্মৃতিব মাধুরী। ভাঙা মনকে জোড়া দেবাব ইচ্ছা দীর্ঘশ্বাসেব মধ্য দিয়েই আভাসিত হয়ে থাকে।

২০ মন ভাঙোছে মিলন হয়ে কিসে। আমাব জড়া ককিল যায় ভাঁশ্বে ॥

॥ আট ॥

### ছো নাচের গান

ঝাডথণ্ডেব অত্মতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যসম্পদ 'ছো নাচ'। নৃত্যগুণান আবশ্বেব পূর্বে গান গেযে নৃত্যেব বিষয়বস্তু, তাল হ ত্যাদি বাঁধা হয়। এই গানগুলোকে ছো নাচের গান বলা হয়ে থাকে। ছো শব্দটির অংপত্তি সম্পর্কে কম মতামত পেশ করা হয় নি। কেউ বলেন সঙ্ শব্দ থেকে এব উদ্ভব, কেউ বলেন ছায়া শব্দ থেকে, আবাব কেউ বলেন শৌভিক শব্দ থেকে। বলা বাহুল্য, এই নৃত্য ঝাডথণ্ডেব অত্মতম নৃত্যেব মতোই আদিম নৃত্য, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্তুই আদিম সমাজে নৃত্যেব প্রবর্তন হয়েছিল। নৃত্যেব মধ্যে যে ক্রমজালিক-ভাবনা নিহিত আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পববর্তী কালে আদিম সমাজের লোকনৃত্য কখনো-কখনো নিছক তানন্দলাভেব জন্তু অলুষ্ঠিত হলেও মুলে এগুলো আচার-নৃত্যই ছিল। ছো নাচ তার ব্যতিক্রম ছিল না, তাই কোন্ সুদূর অতীতে এই নাচের প্রথম অলুষ্ঠান হয়েছিল, তা অসুমান করা কঠিন। অধুনা এই লোকনৃত্যে যথেষ্ট রূপদী কলাকৌশল যুক্ত হলেও তার ফলে লোকনৃত্যেব চবিত্র-গুণ বিনষ্ট হয় নি। ঝাডথণ্ডী উপভাষায় এই নাচ চিবকালই 'ছ নাচ' নামে পবিচিত, বাঙলা উচ্চারণ-রীতিতে বলা যেতে পারে 'ছো,' কিন্তু কদাচ 'ছো' নয়। 'ছ' শব্দের অর্থ অন্ধভঙ্গি সহকারে চং করা অর্থাৎ অন্ধভঙ্গির মুদ্রার সাহায্যে বিশেষ একট ঘটনা বা উদ্দেশ্যকে ফুটিয়ে তোলা। ছো নাচে অন্ধভঙ্গির মুদ্রার সাহায্যে জীবনের কোন ঘটনা কিংবা কোন পৌবাণিক উপাখ্যানকে নৃত্যে রূপায়িত করা হয়।



ছো নাচ সাধারণতঃ চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রায় সাবা চৈত্র মাস ধরে সন্ধ্যাবেলা নৃত্যবাবীরা নৃত্যচর্চা করে থাকে। কিন্তু অষ্ট সব দিনের নৃত্য নিত্যশুই অনুষ্ঠান করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির আগের রাতে অর্থাৎ ভগ্নতা পবনের প্রাক্কালে, যেখানে চড়ক বা ভগ্নতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে সাজসজ্জা, মুখোস ইত্যাদি ব্যবহারেব মধ্য দিয়ে জনতার সম্মুখে এই নৃত্য প্রদর্শন করা হয়। তার আগে পশু সব দলই নিজের নিজের গ্রামের আখড়ায় সাধাবণ বেশ বাসে নৃত্যচর্চা করে থাকে। ভগ্নতার আগের রাতে বিভিন্ন গ্রামেব দলগুলো যেখানে চড়কপূজা ও মেলা হয়, সেখানে সমবেত হয় এবং প্রতিটি দলই নিজেকেব শ্রেষ্ঠ প্রমাণেব চেষ্টা করে। একই আসবে বহু দলের নৃত্য পবিবেষণেব মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দিতাব ভাব এসে থাকে। যেহেতু ঝাড়খণ্ডে তেরোই জ্যৈষ্ঠ বোহিন পবনেব কিছু আগে পশু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাই বোহিনের আগে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত চড়কেব আগের রাতে ছো নাচ হয়ে থাকে। তাই সাধাবণভাবে আনুষ্ঠানিক ছো নাচেব সময়-সীমানা চৈত্রসংক্রান্তি থেকে তেরোই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। একটু লক্ষ্য কবলেই বোঝা যাবে, ছো নাচ বিশিষ্ট আচার অনুষ্ঠানেব মতোই চড়কেব আগেব রাতে অপারিহার্যরূপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাজেই যারা মনে করেন, ছো নাচ নিছক মনোরঞ্জেব জন্তু অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাঁদের ধারণা যে ভুল হাতে কোন সন্দেহ নেই।

খরাপীড়িত ঝাড়খণ্ডে চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে জল-ঢালাব ব্যাপাবটি ঐন্দ্রজালিক-ভাবনাপুষ্টি, যাব লক্ষ্য, বৃষ্টি আনয়ন। ওপব থেকে বৃষ্টি ঝরে-পড়ার সঙ্গে দেবতাব মাথায় জল-ঢালাব অনুষ্ঠানটির মিল এবং সাযুজ্য সহজেই মজরে পড়ে। ওপর থেকে বৃষ্টি ঝবে পড়তে দেখেই আদিম মানুষ জল-ঢালা আচারটি পালন কবতে শুরু করে এবং ভাবতে শুরু করে এই আচার পালনের কলে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে বৃষ্টি অবশুই হবে। ফ্রেঞ্জার বলেন, Magic assumes that in nature one event follows another necessarily and invariably without intervention of any spiritual or personal agency. Thus its fundamental conception is identical with that of modern science, underlying the whole system is a faith, implicit but real and firm, in the order and

uniformity of nature' জাদুক্রিয়ায় বিশ্বাস করা হয় যে প্রকৃতিতে একটি ঘটনা আবার একটি ঘটনাকে সংগতভাবে এবং অনিবার্যভাবে অনুসরণ করে থাকে, দৈব বা ব্যক্তিশক্তি কখনো এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাধা সৃষ্টি করে না। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমস্ত ভাবনাটির গম্ভীরে এমন একটি বিশ্বাস কাজ করেছে যা প্রকৃতিতে শৃঙ্খলা এবং একত্রিত্ব দেখাব পক্ষপাতী, যদিও এ বিশ্বাস অন্যান্য গভীরে নিহিত থাকলেও তার ভিত্তি বাস্তব এবং দৃঢ়মূল। এটি জাদুক্রিয়ায় ত্যাগসমর্পণ বা আবেদন-নিবেদন-প্রার্থন নেত্র, এবং তুণ থাকেব সাহায্যে প্রকৃতিকে বাধ্য করে অশীল সিদ্ধির প্রয়াস আছে। এটা অল্পমানের সাহায্যে প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে বাস্তবতা ফলাফল করা যায় বলে, যদিও মাত্র বিশ্বাস করে। তাই তাই দেবতার পদতলে নমস্কার হয়ে থাকে। জানায় না, এবং বাস্তবতা বস্তু দানে দেবতাকে বাধ্য করে থাকে। ডেন হারিসন বলেছেন, When a savage wants sun or wind or rain, he does not go to the church and prostrate himself before a false god; he summons his own tribe and dances a sun dance or a wind-dance or a rain dance' অর্থাৎ অসভ্য আদিবাসী রাজ, বাস বা বৃষ্টির প্রয়োজনে মন্দিরে গিয়ে কৃত্রিম দেবতার পদতলে নুটিয়ে পড়ে না, এবং সে তার গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে সমবেতভাবে প্রয়োজনমতো বাদ্য নৃত্য কিংবা ঝটিকা-নৃত্য অথবা বধা-নৃত্যের আয়োজন করে। এখানেই ছো নাচের উৎপত্তি ইতিহাস এবং ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ছো নাচের পবিত্র ঘনঘটাচ্ছন্ন কালবৈশাখী পবিত্রের নিখুঁত অনু-করণমাত্র, একটু তলিয়ে দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়। টোলমস এবং সানার-এর সম্মিলিত গুরুগভীর বাজনার মেঘগর্জনের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। প্রচণ্ড শাবীক শক্তির প্রকাশ, অন্ধভঙ্গিতে রক্ত এবং বীভৎস ব্যঞ্জনা, বিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন বেগায় নৃত্যের গতি—সমস্তই কালবৈশাখীর রূপটিকে সুপরিষ্কৃত করে থাকে। অত্যাধিক ঐন্দ্রজালিক নৃত্য—জাওয়া, কবম—বাসনৃত্যের

১. The Golden Bough
২. The Ancient Art and Ritual

মতোই বৃত্তাকার রেপায় অঙ্কিত হয়ে থাকে ; ছো নাচ বৃত্তাকারভাবে অঙ্কিত হয় না এমন কথা বলি না, কিন্তু এই ধরনের অঙ্কিত ছো নাচে খুব কমই দেখা যায়। কয়েকজন মিলে যখন অল্প কোন লোককে বেঁটন করার প্রয়োজন পড়ে,—যেমন সখা-সখী পরিবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণ, রাধা কিংবা উভয়ে—তখনই বৃত্ত বা বেঁটনী রচনার প্রয়োজন পড়ে—এ যেন অনেকটা মেঘের সূর্য বা চন্দ্রকে ঢেকে ফেলার অঙ্কন মাত্র। কালবৈশাখী মেঘ এলোমেলোভাবে আকাশে ছোটাছুটি করে, ফলে বজ্রবিদ্যুতের সৃষ্টি হয়, প্রচণ্ড দাপাদাপি করে সমস্ত পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তোলে, তারপর যখন স্থির হয় তখন বৃষ্টির ফোঁটায় বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত পৃথিবীকে স্নিগ্ধ কবে তোলে। আদিম যুগেব আদিম মানুষ তাদের এই লোকনৃত্যের মধ্যে নিখুঁতভাবে কালবৈশাখীকে অনুসরণ কবে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে বৃষ্টি আনবার চেষ্টা করত। জেন হ্যাবিসন ঠিকই বলেছেন, অসভ্য আদিম মানবগোষ্ঠী কোনদিনই দেবতার রূপা প্রার্থনা কবে নি, বরং অলৌকিক আচার-অঙ্কিতানের মাধ্যমে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে দেবতাকে অভীষ্ট বস্তু দিতে বাধ্য করত। দেবতা যেভাবে কালবৈশাখী সৃষ্টি করে বৃষ্টি আনয়ন করেন, আদিম মানুষ সেই পদ্ধতিকেই ছো নাচের মধ্য দিয়ে রূপায়িত কবে ঐন্দ্রজালিক আচারের সাহায্যে বৃষ্টি-নামানের সম্ভাবনায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কবত। The central principle of this magic was that by imitating any process which was thought to have desirable results, such results could be brought about.<sup>৩</sup> অর্থাৎ যে-কোন পদ্ধতির নিখুঁত ঐন্দ্রজালিক অঙ্কনক্রমের সাহায্যে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা সম্ভব। কালবৈশাখীর রূপ এবং গতি-ভঙ্গিমার ঐন্দ্রজালিক অঙ্কনক্রম ছো নাচ ; উদ্দেশ্য, বৃষ্টি লাভ।

আমাদের এ বক্তব্য আরো সুস্পষ্ট হবে যখন আমরা ছো নাচের অঙ্কিতানের কালসীমানার শেষপ্রান্তে দৃষ্টিনিবন্ধ করব। বোহিনের প্রাক্কাল পর্যন্ত ছো নাচের অঙ্কিতান হয়ে থাকে। একদা রোহিন নাগাদ বর্ষাকাল শুরু হয়ে যেত বলে মনে হয়। কেননা লোকবিশ্বাস আছে, বোহিনে বৃষ্টি হবেই। প্রবাদে পাওয়া যায়, বোহিন টলে কপাল টলে না অর্থাৎ রোহিনে যে বীজ বপন করা হয়, তা থেকে অনিবার্যতঃ ফসল লাভ করা সম্ভব হয়। এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ করে আমরা একটি বক্তব্যই পরিষ্কৃত করতে চাইছি : বৃষ্টি নামবার আগে

৩. The Outlines of Mythology : Lewis Spence, P 23

পঞ্চম খবাপীড়িত দিনগুলোতে ঐক্সজালিক উপায়ে বৃষ্টি নামাবার আচার হিসাবে ছো নাচ অল্পকিছু হয়ে থাকে। বর্তমানে ছো নাচের মূল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষও বিশ্বৃত হয়েছে। আচার সহজে লুপ্ত হয় না, ছো নাচের আচারঅনুষ্ঠান এখনো অব্যাহত আছে। তবে বর্তমানে ছো নাচ ঐক্সজালিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়, পরিবর্তে মনোবঞ্জন উপায় হিসাবে যত্রতত্র এই নৃত্য অঙ্কিত হচ্ছে।

ছো নাচের চলনভূমি নিয়ে যতো না তর্কবিতর্ক তাব চেয়ে অনেক বেশি তর্কবিতর্ক হয়েছে এব উৎপত্তিস্থল নিয়ে। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার পণ্ডিতবর্গ নিজের নিজের অঞ্চলকেই ছো নাচের উৎপত্তিস্থল হিসাবে প্রমাণ কববার অযথা প্রয়াস পেয়েছেন। আমাদের পক্ষে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার পণ্ডিতবর্গের কোন দৃষ্টিকোণই সমর্থনযোগ্য মনে হয় নি। ছো নাচ বিহারের ধানবাদ জেলা, বাঁচি জেলার পাঁচ পবগনা এবং সি'ভূম জেলার ধলভূম এবং সেবাই কলা মহকুমায় যেমন প্রচলিত আছে, তেমনি উড়িষ্যার ময়ূভঞ্জ, কৈঁওঝোব আদি অঞ্চলেও প্রচলিত আছে, ছো নাচের সর্বাধিক প্রচলন পশ্চিমবঙ্গের পুকলিয়া জেলায় এ-কণা অস্বীকার কববার উপায় নেই। তিনটি প্রদেশেই যদি এ - চেব প্রচলন থাকে, তাহলে সংগত দাবিটা কাব ? আমাদের উত্তর হচ্ছে, কাবোই না, অথবা তিনটি প্রদেশেই। এই আলোচনা-নিবন্ধের ভূমিকায় ছোটনাগপুর এবং সন্নিক্ত পশ্চিমবাংলাব পরিচয় প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে যে প্রাচীন ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ছিল ছোটনাগপুর (পুকলিয়া সহ) মালভূমি এবং উড়িষ্যাব ময়ূভঞ্জ, কৈঁওঝোব আদি বাজাগুলো। ছো নাচের চলন-ভূমিও এই অঞ্চলটিই। আমরা যা বলতে চাই, তা হল এই যে ছো নাচ বাংলারও নয়, বিহারেরও নয়, কিংবা উড়িষ্যাবও নয়, ছো নাচ ঝাড়খণ্ডের নৃত্যসম্পদ। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক মানচিত্রে ঝাড়খণ্ড লুপ্ত হয়ে গেছে এবং এব বিভিন্ন অংশ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যাব অন্তর্গত হয়ে নামাস্করিত অস্তিত্ব বজায় রেখেছে; এদিক দিয়ে দেখতে গেলে ছো নাচ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সম্মিলিত নৃত্যসম্পদ। ছো নাচের ধারক এবং বাচক বলতে প্রধানত: কুমি (মাহাত) ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোকেদেরই বোঝায়। উল্লিখিত অঞ্চলের সর্বত্রই এই দু'টি সম্প্রদায় অস্বাভাবিক সম্প্রদায়ের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তাতে কোন সন্দেহ নেই। দু'টি সম্প্রদায়ই সম্ভবত: একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল কোন কালে। আমরা এই দু'টি সম্প্রদায়ের বহু শতাব্দীর লীলাভূমি ঝাড়খণ্ডের

বিশেষ সংস্কারবহু জাতীয় লোকনৃত্য হিসাবে ছো নাচকে গ্রহণ কববার পক্ষপাতী।

আগেই বলা হয়েছে, ছো নাচ আদিকালে ঐন্দ্রজালিক আচাৰ হিসাবে অহুষ্ঠিত হত। তখন এ নৃত্য ঐন্দ্রজালিক অন্তুকৃতিমাত্র ছিল। বর্তমানে ছো নাচ মুগোসনৃত্যে পৰিণত হলেও সূত্রপাতের সময় যে কোন প্রকার মুখোসেব ব্যবহার ছিল না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন খুব সম্ভবতঃ নৃত্যকাবীবা নিজেদের শবীর বস্ত্র-বেৰেডে চিত্রিত কাৰ নৃত্যেব বিবৰ্যনস্থ অনুসাবে বীভৎস বা ভয়ংকব কবে তুলত। পববর্তীকালে ঐবিত্ত্রলোকে আবে বেশি বাস্তব রূপময় করে তোলাব জন্তুই মুগোসেব প্রয়োজন পড়ে থাকবে। শাদিবাসী জীবনের বিভিন্ন বিষয়বস্তু—যেমন কৃষি, পশুশিকাব, মৎস্যশিকাব—ছো নাচে দেপা যায়। বর্তমানে ভালুক আদিব জন্তু মুগোস ব্যবহার বৎ শালও স্তমতে এব ব্যবহার না থাকাবও কথা। বর্তমানে মুগোস বাদ দিযে ছা নাচেব অন্তর্গত হয় না বললেই চলে। বিষয়বস্তুতেও পবিবর্তন এসেছে, রাধা-কৃষ্ণেব কাহিনী, বামাষণ মহাভাবতের কাহিনী বর্তমানে ছো নাচেব বিষয়বস্তুব প্রধান অংশ অধিকাব কবে নিযেছে। বাধাকৃষ্ণেব কাহিনী রূপায়িত কববার জন্তু ছো নাচেব মুখোসেব ব্যবহার তেমনটা লক্ষ্যগোচর হয় না। কাৰণ বাধাকৃষ্ণেব কাহিনী ঝাড়খণ্ডী লোক চেতনায় লৌকিক প্রেম কাহিনী থেকে খুব এবটা পৃথক বস্তু হিসাবে বিবেচিত হয় না। বামাষণ মহাভাবতের কাহিনী রূপাষণে মুখোসেব ব্যবহার সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। মুখোসেব ব্যবহার প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন : ‘মণিপূববাসীব সুন্দব গৌবৰণ দেহাকৃতিব জন্তু তাহাদেব নৃত্যকালীন বাধাকৃষ্ণেব মুখোস ব্যবহারেব বীতি প্রচলিত হয় নাই একথা সত্য, কিন্তু কৃষ্ণকায় এবং অপেক্ষাকৃত কুৎসিত দেহাকৃতিব জন্তু পৌৰাণিক অভিজাত চবিত্ত্রেব নৃত্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ কবিবার কালে পুরুলিয়াব সাধারণ জনসমাজে স্বভাবতঃই মুখোসেব ব্যবহার প্রচালত হইয়াছে। সেইজন্য ছো নাচেব মৰ্যেও যাহাতে অনভিজাত কিংব আঞ্চলিক কোন বিষয় প্রকাশ কবা হইয়া থাকে, তাহাতে মুখোস ব্যবহৃত হয় না।’<sup>৪</sup>

ডঃ ভট্টাচার্যেব এই মন্তব্য বিভ্রান্তিকর এবং ঝাড়খণ্ডী জনতার পক্ষে অপমানজনকও বটে। ঝাড়খণ্ডেও যে বাধাকৃষ্ণেব কাহিনী রূপায়িত কববার সময়

মুখোসের ব্যবহার সাধারণতঃ কবা হয় না, একথা আগেই বলা হয়েছে। পৌরাণিক অভিজাত চরিত্র কেন, নিজেদের সম্প্রদায়বহিত্ত সমস্ত চবিত্র-রূপায়ণের জন্যই মুখোসেব ব্যবহার কবা হয়, তা জঙ্ক-জানোয়ার হোক কিংবা রাম-রাবণ ২ গ্রীব চরিত্রই হোক অথবা গণেশ দুর্গা-শিব চবিত্রই হোক। মুখোসেব ব্যবহার চবিত্রকে অধিকতর বাস্তবায়ন এবং রূপসম্মত করে তোলাবাব জন্মই যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই। পুর্কলিয়াব মানুষ কৃষ্ণকায় এবং কুংসিং দেহাক্রান্তি হওয়াব জন্ম মুখোস ব্যবহার করেন। এমন মস্তব্য অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়। স্বদেশী যাত্রায় সাধারণ পোষাকে ও ভিনয় করা হয় কিন্তু পৌরাণিক যাত্রায় সাজসজ্জা উপকরণেব সাহায্যে চবিত্রের বপস্থি কবে অভিনয় কবা হয়। এব কাবণ প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, সেই একই ব্যাখ্যা ছো নাচের পৌরাণিক অভিজাত চবিত্রে মুখোস ব্যবহারেব কারণ হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। এ-ছাড়া আগে বঙ-বেবঙে শবীব চিত্রিত কবে নৃত্যার্ভি-যেব কথা বলা হয়েছে, এশ্বেত্রে তা'ও স্ববণীয়। বিভিন্ন জীব জঙ্ক দেবদেবতাচ চরিত্রে নৃত্যার্ভিনয়েব জন্ম আদিতে বিবিধ রঙে মুখ চিত্রিত কবে চবিত্র রূপায়ণ কবা হত, বাব বাব মুখ চিত্রিত স্নকববাব বিধাও অনেক, এই স্নকববিদ দর কবাব জন্ম পাকা পার্কি ভাবে মুখোস ব্যবহারেব প্রবণতা দেখা দিয়ে থাকতে পারে।

ছো নাচ যে ঐন্দুজালিক নৃত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। জীবনের দৈনান্দন পয়োজর্নীয় উপকরণ সংগ্রহের জন্ম আদিম মানুষকে সংগ্রাম করতে চেষ্টে। খাণ্ডবস্ত সংগ্রহের সংগ্রামেব এক একটি ঘটনাকে নৃত্য নাচটোব মাধ্যমে তারা রূপায়িত কবত। তাই ছো নাচ মূলতঃ বৃষ্টি আনবাব জাহ্নু-নৃত্য হলেও এর মধ্যে শিকাবনৃত্য, মেছুয়ানৃত্য, শবরনৃত্য, ইত্যাদি জীবন-সম্পর্কিত সুপরিচিত ঘটনাবলী-সংবলিত নৃত্যও স্থান লাভ কবে। মাত্র দু' এক শতক আগে ছো নাচে বামায়ণ মহাভাবতেব ঘটনাবলী অনুপ্রবেশ কবেছে। ইতিহাস বলে, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ঝাড়খণ্ড বৃটিশ অধিকায়ে যাবাব আগে এখানে আর্ধসভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে নি, যার ফলে আঞ্চলিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী জনমানস প্রভাবিত হতে পারে। উচুবর্বেব লোকেদের অনুপ্রবেশের ফলে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঝাড়খণ্ডের লোকেদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে তীব্র নাড়া দেয়। তারা হীনমন্ত্রতায় ভুগতে শুরু কবে, উচুবর্বেব লোকেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অনুকরণ করতে প্রয়াসী

হয় ; তারই ফলে বামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ছাড়া নাচেব বিষয়বস্তু হিসাবে সর্গেরবে গৃহীত হয় । শিব-দুর্গা-কালী-গণেশ রাম-রাবণ-কৃষ্ণ আদি পৌরাণিক চরিত্রগুলো নৃত্য-নাট্যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কবল, কিন্তু পরোধর্ম ভয়াবহর মতো এই সব পৌরাণিক চরিত্র তাদের জীবন-চেতনাকে সৃষ্টিশীল করাব পবিবর্তে গতানুগতিক কাহিনীর চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ কবে বাখল । এর ফলে স্বাভাবিক বিকাশ শুধু নৃত্যেব ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতির অগ্রাণ্ড ক্ষেত্রেও ব্যাহত হল । পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া নাচে নিত্য নতুন বিষয়বস্তু জুগিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু কোনক্রমেই স্থানীয় অধিবাসীদের হৃদয় স্পর্শ কবতে পারল না । সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটল না, যদিও অনেকেই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কথা বলে থাকেন । দুর্গাপূজা, কালীপূজা কোনদিনই ঝাড়খণ্ডের জনতাব পূজা হতে পারে নি । শিব-দুর্গা কালী-গণেশ কোন দেবতাই ঝাড়খণ্ডী মানুষের দেবতা নয়, বামলীলা উৎসব কিংবা কৃষ্ণের দোলোৎসব ঝাড়খণ্ডের মানুষের উৎসবে পবিগত হতে পাবে নি । এমন কি গানে বাধা-কৃষ্ণ প্রণয়-প্রসঙ্গ এলেও তা শুধু নামেই এসেছে । লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকাবাই বাধাকৃষ্ণ নাম গ্রহণ কবে আভিজাত্য অর্জনের রূপা চেষ্টা কবেছে ।

ছো নাচে প্রধানতঃ কুম্বি-মাহাত এবং ভূমিজ সম্প্রদায় অংশগ্রহণ কবে থাকেন । কুম্বিবা এই সেদিন অবধি আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন এবং ভূমিজ সম্প্রদায় এখনো আদিবাসী শ্রেণীভুক্তই আছেন । ছো নাচ এই গোষ্ঠীব আদিবাসীদের নৃত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই । পশ্চিমবঙ্গেব পণ্ডিতবর্গ আদিবাসী বলতে শুধুমাত্র সাঁওতাল ছাড়া অগ্র কোন সম্প্রদায় বোঝেন না অথবা বুঝতে চান না । সাঁওতালদের মধ্যে ছো নাচ কেন কবম নাচও প্রচলিত নেই । কিন্তু আজকাল সাঁওতালরাও হিন্দুসমাজেব অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টায় ব্রাহ্মণ্যবাদের শিকারে পবিগত হয়েছেন, আব তাই তাঁবাও ছো নাচ, কাঁঠি নাচ আদি নৃত্য, যাদের বিষয়বস্তু হিন্দু পুবাণ-কথা, অহুশীলন করতে শুরু কবেছেন ।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ছো নাচেব গানের উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে পবম্পববিবোধী মন্তব্য কবেছেন । তিনি বলেছেন, ‘ছো-নৃত্যের সঙ্গে যে বুম্বুর-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহা আদিবাসী সমাজেব প্রভাবজাত ।..... ছো নাচে প্রচলিত বাংলা বুম্বুবেব প্রভাব তাহাদের উপব গিয়া কিছু কিছু পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের দিক হইতে কোন প্রভাব আসিয়া ছো নাচের

ঝুম্বরের উপর পড়িয়াছে, তাহা মনে করা যায় না।<sup>৪</sup> আদিবাসী সমাজ বলতে তিনি ঐ এতাল সমাজকেই সাধাবণতঃ বুঝিয়ে থাকেন। খুব সম্ভবতঃ ছো নাচেব গান সাধাবণতঃ দু' পঙক্তিব হুযে থাকে বলে স্বল্লায়তনের নিরীপে তিনি এ গানকে আদিবাসী সমাজেব প্রভাবজাত বলে উল্লেখ করেছেন। স্বল্লায়তন যদি আদিবাসী সংগীতেব প্রভাবেব নিবীথ হয় তাহলে ঝাডথঙী উপভাষায় বচিত প্রায় সমস্ত গানবেহ আদিবাসী প্রভাবজাত বলে উল্লেখ কবতে হয়।

ছো নাচেব গান হিসাবে যে-সব গান গাঙয়া হয় তা যে ছো নাচেব মৌলিক গান এমন কথা ভাববাব কাবণ নেই। কাবণ ঝাডথঙে এক নাচেব গান অন্ত নাচেব গান হিসাবেও গীত হয়ে থাকে।

ছো নাচের গান সাধারণতঃ দু' পঙক্তিব মথো সীমাবদ্ধ থাকে। প্রকাশ-ভঙ্গি অত্যন্ত সহজ সবল এবং অকৃত্রিম। বিষয়বস্তুব মথো পুবাণ-প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমন আছে বাস্তবসংসাবেব সুখ দুঃখ আনন্দবেদনাব কথা। পুবাণ-প্রসঙ্গেব গানের পবিমাণ সংখ্যায যেমন কম, তেমন কাব্য-রস এবং জীবন-বসেব বিচাবে অল্পলৈপাঙ বটে। পুবাণ প্রসঙ্গেব গানগুলো সম্পূর্ণতঃ বস্তব-ধর্মী, কবিত্বেব ছিঁটে ফোটাঙ এগুলোব মথো নেই। লৌকিক জীবন-সম্পর্কিত গানগুলো, অন্ত পক্ষে, কবিত্বেব জাদুস্পর্শে সজীব এবং প্রাণবন্ত। ঝাডথঙেব আদিম প্রাণেব স্পন্দন এই সব গানেব মথো খুব সহজেই মেলে ছো নাচের গানেবও একটি বিশিষ্ট বিষয় হল প্রেম। এ প্রেম লোকজীবন-পুট, তাই অবাবিত উদ্দাম। বিস্ত এ-প্রেম শুধু আনন্দ-উচ্ছ্বাসিত নয়, অশ্রু-সজলও বটে।

১. কুল্হি কুল্হি আ'সবে বঁধু ব'সবে বারুণে।

তামুক খাবার লছনা করো হে'ববে নয়নে ॥

ঝাডথঙের প্রেমিকা যে লঙ্কাবনতা যুবতী নয়, গানটি থেকে তা প্রমাণিত হয়।

২. গুণগুণায়ে আ'সলে ভমর ব'সলে কন্ ফুলে।

লইতন ডালিম ফুল ফুটোছে ব'সবে এই বারে ॥

গানটি রূপকধর্মী। গানটিতে স্পষ্টতঃ শরীর-প্রেমের ইঙ্গিত রয়েছে। ভমর, ডালিম, ফুল ইত্যাদি প্রতীকগুলো দৈহিক প্রেমের অসুসঙ্গ-বিশেষ্য।



৩. ভাব ত জান না বঁধু প্রেম ত জান না ।

কন ফুলেতে কত মধু তাউ ত জান না ॥

দুঃসাহসিকা প্রেমিকা সমাজের রক্তচক্ষুকে বেপরোয়া ঔদ্ধত্যে অবহেলা করে—

৪. চিংড়ি মাছেব ভিতর ফরা তাহ ঢালোছি ঘি ।

আমরা যদি পিণ্ডিত করি তদেব গেল কি ॥

৫. ঘরের জল বাইবে ফেলাই জল আ'নব বই ত কি ।

চুঁয়া শালে নাগব আছে হাঁ'সব এই ত কি ॥

ছেলেবেলাব স্মৃতি অত্যন্ত মধু। তাই ছেলেবেলাব 'ভালবাসা'কে দেখলে এক মুহূর্তে স্মৃতি অস্পষ্ট অতীতের এক একটা ঘটনা ছবি হয়ে চোখে সামনে ভাসতে থাকে আব সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর জন্ত দীর্ঘশ্বাস ধরে ।

৬. শিশুকালে খেলোছিলম এক গলা জলে ।

সে সব কথা মনে পড়ে তুমায় দেগিলে ॥

প্রেম কখনো গোপন থাকে না । হতেই সে দুঃসাহসিকা হোক, বন্ধ তাইও স্পর্শ করে ।

৭. দুর্ধলতাব বন গ সখি দুর্ধলতাব বন ।

নাকছাবিতে লা'গল কালি গুচাবি কখন ॥

এখানে কলঙ্কের কথা অপূর্ব কাব্যব্যাঞ্জনায় প্রকাশ করা হয়েছে, চিত্রকল্পটি আমাদের চমকিত করে। 'নাকছাবিতে লা'গল কালি'—নিঃসন্দেহে গভীর ব্যঞ্জনাবহ একটি চিত্র। একদিকে নাকছাবি গহনাটিতে প্রেমিকের দানের স্মৃতি জড়িয়ে আছে; অন্যদিকে নাকছাবি নাগিকার গরিমাময় উজ্জল রৌপ্যবনবও প্রতীক। তাই নাকছাবিতে কালি লাগাব অর্থ, একদিকে যেমন গোপন প্রেম জানাজানি হয়ে-বাওয়ার ইঙ্গিত আছে, অন্যদিকে নাগিকার রৌপ্যবনবর্মে কলঙ্কের দাগ লাগার সংকেতও আছে ।

এসবের পবেও নাগিকার যন্ত্রণাব শেষ নেই। নিঃসর্তে এবং নিঃস্বার্থভাবে যে-পুরুষের কাছে সে আত্মদান করেছিল. সে-ও শেষ শুক তার সঙ্গে প্রতাবণা করে। প্রেমিকের প্রতারণা তাই প্রেমিকার হৃদয়কে চূর্ণ করে ফেলে ।

৮. ধন গেলে জীবন গেলে তাউ ত ভাবি নাই ।

গুণের বঁধু চল্যে গেলে বল্যে গেলে নাই ॥

ভালবাসা যদি ভাল মনে বিদায় নিয়ে যেত, দুঃখ থাকত না ; কিন্তু যাবার আগে প্রেমিক যে একটি কথাও বলে গেল না ।

৯ ভাব করো শ্রাম চল্যে গেলে বল্যে গেলে না ।

প্রেমের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ নিম্নাই গেলে না ॥

তবু তো মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে । প্রেম গেলেও প্রেমের জন্ত দীর্ঘশ্বাসে ভরা প্রতীক্ষা থাকে ।

১০ আঁধারি-এ খান সিঝায়ে জুসনায় ঘাঁটি ধান ।

মাথা বাঁধে দে গ মাসি যদি ফিরে শাম ॥

১১ লদী কাঁদে লাল। কাঁদে কাঁদে গ মালতিয়া ।

লটায়ে লটায়ে কাঁদে বনেব ধাদকিয়া ॥

মত্নিকথা বলতে কি ঝাডখণ্ডেব প্রেমের কাহিনী এমন অগ্র সজল কাহিনীৰ মধ্যেই যেন পবিগতি লাভ কবে ।

বধু-জীবনেব বেদনার কাহিনীও ছো নাচের গানেব একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার কবে আছে । স্বস্তুরালয়ে নিধাতনে-নিপীডনে, লালনা-গঞ্জনায় বধূৰ জীবন বেদনাবিধুব হয়ে ওঠে । তাই কখনো-কখনো প্রাক্‌বিবাহ যুগেব প্রেমের কথা মনে পড়ে । দাম্পত্যজীবন-বহির্ভূত প্রেম কথােনো তাকে উন্নন করে ।

১২ বাঁধের আডায় বা 'জল বাঁশি শু'মতে পার্যেছি ।

আব বাজ না প্রেমের বাঁশি স্বস্তুর ঘব ঘাঁছি ॥

স্বস্তুরবাড়ির লোক দেগলে তাব চোখে জল আসে ।

১৩ আষাড শরাবণ মাসে মুকুণ পাতে জল ।

স্বস্তুর ঘরের লক দে'গলে চইথে পড়ে লব ॥

১৪ আয়না দিলি পাইনা তেল ত দিলি নাই ।

স্বস্তুর ঘরের মাথা বাঁধা মনকে ঘবে নাই ॥

তার মনে হয়, মেয়েছেলের জীবন অসার্থক, কাবণ সে পবের ঘব আলৈ' কবে ।

১৫ বনে ফুটে বনতিলাই ফুল বনকে করে আল ।

বিটি ছানার মিছাই জনম পরের ঘব আল ॥

১৬ মাঠে-মাঠে গইঠা কুটা তা-উ বব' ভাল ।

স্বস্তুর ঘরের হাঁড়ি মাজ্যে গা হল্য কাল ॥

একবার সিঙ্কাস্ত নিলে তা কার্ধকরী করতে ঝাডখণ্ডী নারী দ্বিবা করত না ।

স্বস্তুরবাড়ি ভাল লাগত না বলে তারা গোপনে বাপেব বাড়ি পালিয়ে যেত ।

১৭ স্বস্তুর ঘর লে পাল'ই আলি বনে লুকালি ।

গামছা-পাড্যা টসর শাড়ি ঘামে ভিজালি ॥

যে-সব গান নিয়ে আলোচনা করা হল তার প্রতিটিই নারীর উজ্জ্বল ভো বটেই, নারীর বিচিত্রজীবনের রস-ধারায় এগুলো পুরোপুরি সাহিত্যের উপাদানেও পরিণত হয়েছে। জীবন-বর্মিতা এইগুলোকে সাহিত্য-পদবাচ্য করে তুলেছে। এই গানগুলো নিঃসন্দেহে ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের মূল্যবান উপকরণ। খাঁটি লোকগীতির সব গুণ এই গানগুলোতে পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে, এগুলো ছো নাচের গান হলেও একেবারে মৌলিক এমন কথা বলা যায় না। ঝাড়খণ্ডে এক শ্রেণীর গান অল্প শ্রেণীতে যথেষ্ট যাতায়াত কবে থাকে। ছো নাচ পুরুষের নাচ, তাই এ-নাচে নারীজীবন-সম্পর্কিত, সম্ভবতঃ নারী-রচিত, গানের প্রচলন যথেষ্ট বেমানান এবং অসংগত।

## দ্বিতীয় অধ্যায় আচার সংগীত

কিছু কিছু লোকসংগীত আছে, যা সম্পূর্ণতঃ আচার-ভিত্তিক। বিভিন্ন অস্থানের আচার উপলক্ষে এই সব গান গাওয়া হয়ে থাকে। এব মধ্যে কিছু গান, যেমন বিয়ের গান, পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে গীত হয়ে থাকে, এই গানের একটা ব্যবহারিক দিক থাকায় একে ব্যবহারিক সংগীতও বলা যেতে পারে। এ-গান শুধুমাত্র বিয়ের দিন কয়েক ছাড়া বছরের অল্প কোন সময় গাওয়া হয় না। ব্যবহারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ-গানের তেমন কোন প্রভাব লোকমানসে লক্ষ্যগোচর হয় না। বিয়ের গান সম্পূর্ণতঃ আচার-ভিত্তিক গান। কেউ কেউ বলেন, ঝাড়খণ্ডে বিয়ের গানই বিয়ের একমাত্র আচার; এ-সিদ্ধান্ত সর্বৈব স্রাস্ত। বিয়ের বিভিন্ন আচারের অন্তর্ভুক্ত হিসাবেই বিভিন্ন ধরনের গান গাওয়া হয়ে থাকে। প্রতিটি আচারের জন্য বিশেষ গান থাকে; যে-কোন আচারে যে-কোন গান গাওয়া চলে না। বিয়ের গান যেহেতু আচারভিত্তিক, তাই এ-গানে রক্ষণশীলতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। আচার যেমন কখনো পরিবর্তিত হয় না, তেমনি এ গানও। বিয়ের গান নিতান্ত নুতন রচিত হয় না, আচারের মতো প্রাচীন কালের গান ভাবে-ভাষায়

সংরক্ষিত হয়ে এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই এই গানকে আমরা আচার সংগীত নামে চিহ্নিত করবার পক্ষপাতী।

আচার-মূলক আরো কিছু গান আছে; যেমন, রুমুজ গান, মন্ত্র গান ইত্যাদি। রুমুজ গান খুঁপারের ( কারো গায়ে দেবতার ভর নামা ) সময় দেবতাকে আবাহনের গান। এ-গানও সব সময় গাওয়া হয় না; বছরের যে-কোন সময় খুঁপারের অহুষ্ঠান করা হলে শুধুমাত্র সেই অহুষ্ঠানে দেবতার আবির্ভাব কামনা করে আচারের মতো এ গানগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এ-গানও অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত হয়ে বহুকাল ধরে একই ভাবে গীত হয়ে আসছে। এগানের খুঁপার অহুষ্ঠানে যে একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনও আছে, তা'ও অস্বীকার করা যায় না। সর্পমন্ত্র, রোগশোক ভূত-প্রেতের ঝাডনমন্ত্র, মোহিনীমন্ত্র, বশীকরণমন্ত্র আদি মন্ত্রগানের অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রের মধ্যে আচারের ধর্ম সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। তাই এই সমস্ত গানকে আমরা ব্যবহারিক সংগীত না বলে আচার-সংগীত হিসাবে উল্লেখ করেছি।

॥ এক ॥

## বেহা গীত

‘বেহা গীত’ বা বিবাহের গান বিবাহের অহুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গীত হয়ে থাকে। বৎসরের যে-কোন সময় বিবাহ অহুষ্ঠিত হতে পারে। অল্পকথায়, এ-গান যেমন ঋতুচক্রের উৎসবসংগীতের মতো নির্দিষ্ট সময়-সীমায় আবদ্ধ থাকে না, তেমনি বিবাহ-অহুষ্ঠান ব্যতীত কখনো এ-গান গাওয়া হয় না। ব্যবহারিক প্রয়োজনেই এ-গান গীত হয়ে থাকে। বিবাহের প্রতিটি আচার-অহুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে গান রচিত হয়েছে। বিবাহ-সংগীত তাই প্রতিটি আচার-অহুষ্ঠানের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। নিশ্চয় আচারকে যেন বাণীরূপ দিয়ে সজীব প্রাণবন্ত করে তোলে। বিবাহের গানের, ‘নির্দিষ্ট একটি ব্যবহারিক প্রয়োজন’ থাকায় এই গানকে ব্যবহারিক সংগীত ( functional song ) ও বলা হয়ে থাকে।

বাড়িগণ্ডের ভাষা এবং সংস্কৃতি মূলতঃ কুম্বি-মাহাতদের ভাষা এবং

সংস্কৃতির ওপর নির্ভবশীল। স্বাভাবিক কারণেই এই নিবন্ধে আলোচিতব্য আচার এবং সংগীত কুর্মি-মাহাত সম্প্রদায় থেকেই গৃহীত হয়েছে। ধানবাদ, পুরুলিয়া, পাঁচ পবগণা, সেরাইকেলা, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বীকুড়ার সর্বত্রই এই সম্প্রদায়েব মধ্যে একই ধরনের আচার এবং সংগীত বিবাহ-অমুষ্ঠানে লক্ষ্যগোচর হয়। অবশ্য ঝাড়খণ্ডের কুর্মি ভূমিজ-বাগাল-ভূঞা কামার-কুমোর আদি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের আচাবে এবং গানে পার্থক্যের পরিমাণ খুবই কম।

বিবাহের গান আচারমূলক। তাই পূজা-মন্ত্রের মতো এই গানেও রক্ষণশীলতা লক্ষ্য করা যায়। বিবাহসংগীত নিত্য নতন রূপে বচিত হয় না। আচাব-অমুষ্ঠানকে অহুসবণ কবে প্রাচীনকালে যে গান বচিত হয়েছিল, এপনো সেই একই গান গীত হয়ে চলেছে। স্বভাবতঃই গানগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন। বর্তমানে এই ভাষা সর্বাঙ্গিণী ব্যবহৃত হয় না। বহু শব্দই অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। গানের ভাষাই প্রমাণ কবে গানগুলো যথেষ্ট প্রাচীন।

বেহা গীত একান্তভাবে নারীসমাজেব গীত। গানসৃষ্টিতে এবং কণ্ঠদানে তারাই যৌথভাবে অংশগ্রহণ কবে থাকে। অবশ্য বঙ্গ বসিকতার সময় পুরুষদেব কণ্ঠেও এগান শোনা যায়, তবে শুধুমাত্র বঙ্গ-বসিকতার গান। আচাব-সম্পর্কিত সমস্ত গানই নারীকণ্ঠে গীত হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডে নারী-সমাজ বিয়ের গানে যৌথভাবে অংশগ্রহণ কবে। একক-কণ্ঠে এ-গান যে শোনা যায় না, তা নয়, তবে এ গান সম্পর্কিতঃ যৌথভাবে গেম। বিবাহ সংগীতে কোন বাস্তব বাস্তব হই না, কিংবা কোন নৃত্যও এই গানেব সঙ্গে জড়িত নয়। আসলে বিয়ের গান বিভিন্ন আচার-অমুষ্ঠানকে কেন্দ্র কবেই বচিত। যখন যে আচাব-অমুষ্ঠান, তখন সেই সম্পর্কিত গান গাওয়াই বীতি। তবে সব সময় যে এ-নিয়ম মেনে চলা হয়, তাও নয়। তাছাড়া বহু আচার-অমুষ্ঠান বর্তমানে অপ্রচলিত হলেও গানগুলো অবলুপ্ত হই নি, সমান আদরে সে-সব গানও গীত হয়ে থাকে।

বিয়ের কপাবার্তাব সূত্রপাতেব সাথে-সাথেই বিয়ের গান করবার বেওয়ারাজ ঝাড়খণ্ডে লক্ষ্য কবা যায়। বাড়িঘর রঙ কববার সময়, চাল-ভাল-মুড়ি-চিঁড়ে তৈরী করবার সময় নারীকণ্ঠে বিয়ের গান গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। বিয়ের সব অমুষ্ঠান শেষ হলে এবং অভিনী-অভ্যাগতেরা বিদায় নিয়ে যাবার পব বিয়ের গান গাওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। বিয়েটা আনন্দের, কিন্তু মজাব

কথা এই যে, বিয়ের গান এক আশ্চর্য ককণ সুরে ডিমে লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। একমাত্র বঙ্গরসিকতার গানগুলোতে এই সুরটাকে খানিকটা সহজ এবং হালকা করে নেওয়া হয়, লয়ও খানিকটা দ্রুত হয়ে পড়ে। বিয়ের পালাগানগুলো এমনি করণসুরে গাওয়া হয়ে থাকে যে, গায়িকার সুরের অনুরণন, খাসাঘাত এবং আন্তরিক উচ্চারণ-সজ্জাত পবিবেশে শ্রোতার চোখ সহজেই সজল হয়ে ওঠে।

অতঃপর 'কন্ঠা' নিরীক্ষণে বেরুবাব শুভ মুহূর্ত থেকে বিবাহোত্তর সময় পর্যন্ত বিভিন্ন আচাবঅনুষ্ঠান-সম্পর্কিত গানগুলো ধাবাবাহিকভাবে আলোচনা করা যাবে।

১ ছুটুমুট রঙ্গনী মা ঝববলি রে ডাল,

শুন যে শুন গ বাবা পবিবাব বালার কেউ নাই ॥

সঙ্গে সঙ্গে জনকজননী সচেতন হয়ে ওঠেন। সত্যিই তো, পুত্রের বিবাহই দেওয়া হল না, পুত্রবধু থাকবাব কথাই তো ওঠে না। অতএব যেখানে-যেখানে পাত্রীর সন্ধান আছে, আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে নিয়ে সে-সব স্থানে ছোট্টাছুটি করতে হয়।

যে-ভাবেই হোক, পাত্রী যেন জেনে যায় তার জীবনের গতিপথ পরিবর্তনের সংকেতটি।

২ 'নদিয়া কা ধারে ধারে কুইলী কা শবদ গ/আস কুইলী বস নীম ডালে গ।

পালঙ্কে বসন্তে আছেন মোর যে বাবা গ/শুন বাবা কুইলীব শবদ গ' ॥

'কি-অ শুনিব মা কুইলীর শবদ গ

আঁখি মোর ঢরকিছে, ছাতি মোর বিছবিছে গ' ॥

পাত্রপক্ষের লোক অবশেষে কন্ঠাগৃহে এসে উপস্থিত হয়। নানাভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কনে দেখা হয়, পছন্দও হয়। এবার কথাবার্তা পাকাপাকি করা। দরদস্তুর রীতিমতো বিকিকিনি ব্যাপার।

৩ 'বাবার বাড়ি-এ কুঁড়ুরীর লত্ গ/ফুলে ফলে ঝবরলি ডাল গ।

মাচিলায় বসন্তে আছেন মোর যে বাবা গ/বল বাবা ফুলেকেরি দর গ।

সুন্দর সুন্দর ফুল দেখো খ'দার লাগিল গ/বল বাবা ফুলেকেরি দর গ।'

'যদি ফুলের দর করি দশ কুটুম খুজি-গ

কুটুম থাক্যে দিব গ মূল্যাই, কন দিনে না করবে বেমান ॥'

আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর উপস্থিতিতে শুধুমাত্র বাবার কথাতেই বিয়ে পাকাপাকি হয় না, মায়েব মতামতের ও বিশেষ মূল্য আছে।

৪ 'মালিনীর ঝাড়ি-এ রুপল বাইগন, দশ টাকা দিব মাগ্যান লিব বাইগন।'  
'নাই লিব দশ টাকা নাই দিব বাইগন, নাই লিব বিশ টাকা নাই দিব বাইগন  
গাছের বাইগন তু'ললে গাছ হবেক শুধা, কলেব বাইগন বিকলে কল  
হবেক শুধা ॥

কোল গুণ্ড হবে বলে তো মেয়েকে চিবকাল ঘরে রাখা যায় না, তাই আত্মীয়-স্বজন সমাজের লোকের দববাবে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫ তিলগিলি বুনিলম খাদাকীধুতুকী, উঠ তিল ভুই মাটি ছাড়িয়ে।  
সুঘরের ঝি হথা সুখ বাসিত গ, লিলজ কন্ডা দববারে বসাল্য গ।  
সুজাও এর বিটি তুমি সুজাওের বিটি, লিলজ কন্ডা দববারে বসালি।  
বাবা-এ মোবসমুদয় দেশ ডাকিয়ে গ, মা-এ মোর সমুদয় দেশের পাশে গ।  
অন্নবস্ত্র না হয় যেমন জালা গ,  
অন্নব জালা পবতু বহুত জালা গ, বস্ত্রব বিনে বড় মানে হীন ॥

ওপরের গানটিতে দু'টি ব্যাপাব স্পষ্ট। 'দববাবে' বসে মেয়েব বিয়ের বাগদানের ব্যাপাবে কন্ডাপক্ষ যেন বেশ হীনমন্ত্রতা বোধ কবে। অল্পদিকে অন্নবস্ত্রের অনটনের ব্যাপারটায় সহজেই অর্থনৈতিক দুর্বস্থা অনুমান করা যায়। কন্ডাপণের অতিবিক্ত পাত্রপক্ষকে এই ভাত-কাপডেব শর্তটাও মেনে নিতে হয়।

বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাবাব পব আনুষ্ঠানিকভাবে দু'পক্ষের লোকই দু'বাড়িতে যাতায়াত কবে। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'দুয়াব মাদা'। তারপরই শুরু হয় বিয়েব উদ্বোধনপর্ব।

প্রথমেই আসে নিমন্ত্রণপ্রসঙ্গ। বিবাহ একক পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়, আত্মীয়স্বজনসহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। গ্রামেব প্রতি ঘরে ঘরে একটি 'ইা'ড়কা' (ছোট হাঁড়ি) সহ ঘুরে ঘুরে নিমন্ত্রণ করবার রীতি আছে। বর্তমানে হাতে লেখা বা ছাপানো নিমন্ত্রণপত্রের চল হলেও হলুদমাখানো গোটা গুয়া বা সুপারী দিয়ে নিমন্ত্রণ কববার বীতিই মৌলিক রীতি। বরপক্ষ কনেপক্ষ পরস্পর পরস্পরকে নিমন্ত্রণ কবে। সম্মান এবং মর্যাদা অনুসারে নির্মন্ত্রিতদের একটি বা দুটি সুপারী দিতে হয়। নির্মন্ত্রিতদের মধ্যে 'বহনোই' বা ভগ্নিপতিব সম্মান অত্যন্ত বেশি। ভগ্নিপতিব জন্তু দুটি সুপারী দিয়ে নিমন্ত্রণ করতে হয়।

জোড় উজাল দিয়ে, বালা, বহনোই আন, বহনোই-এর বড মান গ।

বিরহি কুখি ষড়ার দানা, ধর চাবুক ছুটাও ষড়া গ ॥

এরপর তিনদিন বা একদিন আগে বরপক্ষ থেকে কন্ঠাগৃহে 'লগণ' পৌঁছে দেওয়া হয়। 'লগণ' কনেবাড়িতে পৌঁছালেই বিয়ে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। ববগৃহের 'লগণ'এর তেলহলুদ শাড়ি-গহনা-প্রসাধন দ্রব্যাদির সাহায্যেই কনের 'গায়ে হলুদ' অলুষ্ঠান পালন করা হয়। 'লগণ' এর দিন থেকে উভয় বাড়িতে বরকনের গায়ে হলুদ মাখানো হয়। গায়ে হলুদের সঙ্গে সঙ্গে ববেব হাতে জাঁতি এবং কনেব হাতে কাজললতা তুলে দেওয়া হয়। গায়ে হলুদের সময় গাওয়া হয়—

৭ 'কঠাধরেরেব দুয়ারে কঠাধরেরেব দুয়াবে, বালার মা, কিসের বাতি জলে ?'

'আম্দেরেব বালা হল'দ মাথে ঘি-এর বাতি জলে।'

তারপর আসে বিয়ের দিন, অধিবাসের দিন। ঝাড়খেণ্ডে বিয়ের দিন ববকনের উপবাস করবার বীতি নেই, শুধু নিজের বাড়ির অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ। বিবাহিতা সোনোবা, মাসি-পিসি-মামীবা এবং অন্যান্য আত্মীয়বা তেলহলুদ মাথিয়ে খাবার পরিবেষণ করে। প্রত্যেকেব পালা থেকে অস্তুত: কিছুটা খাবার খেতে হয়। বব-কনে এই অলুষ্ঠানে নগদ দক্ষিণা এবং নূতন বস্ত্র পেয়ে থাকে। এই অলুষ্ঠানের নাম 'আভ্‌ডা ভাত পাওয়া' (অবুঢ়ান্ন)। এই সময়ে গাওয়া হয়—

৮ ডুঁশুবি কা ধাবে ধারে কুডাবি কা শবদ, কে কাটিছে পাঁজনেব গাছ।

পাঁজন তরুতলে এট ব'লার জনম, মাগ বালা আভ্‌ডাব হল'দ ॥

অবশেষে 'বরিষাত্' বা বরযাত্রার সময় এগিয়ে আসে। ক্ষৌবকাব এসে ক্ষৌবকর্ষ সম্পাদন করে। নাপিত নগ কেটে ববেব পায়ে আলতা পরিষে দেয়। পুরনারীরা গানে-গানে তিবন্ধাবে এবং বলরনিকতায় নাপিতকে বিদ্ধ কবে—

৯. এক পইলা চাউলে লাপিত ভুলিয়ে' রহিল।

চাঁদের বকম বহু লাপিত চোরে নিয়ে' গেল ॥

এরপর স্নানের অলুষ্ঠান। বলাবাহুল্য, গায়ে হলুদ হবার পব থেকে স্নান করা নিষিদ্ধ। নিশ্চিত করে বলা কঠিন, তবে গানের মধ্যে যে-ধরনের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাতে নতুন পুকুর কেটে তার জলে স্নান করানোর রীতিই হয়তো একদা প্রচলিত ছিল।



১০. মুদি-এ মাটি তাড়ে মুইদানেকেলে, লিবি ত লিবি মুদি আনা হাত্তের খুতি ।

লিবি ত লিবি মুইদান টসর কা শাড়ি ॥

বর্তমানে অবশ্য নতুন পুকুরের কোন হৃদিশ মেলে না। ‘বহনোই’ কোদাল দিয়ে একটা চারকোণা প্রতীক-পুকুর কাটে। একটি জোয়াল অই গণ্ডির ওপর পেতে তার ওপর বরকে দাঁড় করানো হয়। তারপর মাথার ওপর শালপাতার একটি ‘খালি’ (পাতা) ধরা হয় এবং বহনোই একটি ঘটি থেকে জল ঢালে। গায়ে ছিঁটেফোঁটা জল পড়ে মাত্র, সবটাই চারপাশে গড়িয়ে পড়ে। ওখানেই বিয়েব সাজসজ্জা নতুন জামাকাপড় পরানো হয়। নতুন চিক্কনি দিয়ে বহনোই ববের চুল আঁচড়ে দিয়ে মাথায় ‘মোড়’ (< মুকুট) পরিয়ে দেয়। অহুষ্ঠানটি যেন যুদ্ধে বেরবার আগে অহুষ্ঠিত অভিষেক মঙ্গলাচরণ। হাতে জাঁতি অস্ত্রের প্রতীক, ক্ষৌবকর্ম অশুচিতা নাশের প্রতীক, স্নানেব অহুষ্ঠান পবিত্র বাবিসিঞ্চনে অভিষেকের প্রতীক এবং মোড় উক্ষীষেব প্রতীক। স্নানেব পব বরকে হাটানোর নিয়ম নেই, তখন থেকে সে ববের কোলে বা কাঁধে চড়ে স্থানান্তরে যায়। ক্ষৌবকর্মেব সময় বব একবার আঙিনায় বেরিয়ে এলে কেব ঘরে ঢোকান নিয়ম নেই। এটা যে যুদ্ধযাত্রার স্মৃতি-অবশেষ, তার ইঙ্গিত বিভিন্ন গানেব মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এ যুদ্ধযাত্রা অতীতের নারীহরণেব সঙ্গেই তুলনীয়। স্মৃতিবতঃই ববের মা এবং নিকটাস্বীয়াদেব আচরণে এই আনন্দের দিনেও এক আশ্চর্য চিত্তবেদনাব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

এবপর গ্রামের একটি প্রাচীন আমগাছেব তলায় ‘আমবেহা’ অহুষ্ঠিত হয়। এটিও একটি মেয়েলি আচাৰ। বব আমগাছটিকে দু’হাত মেলে বৃকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে। তার আঙ্গুলসহ গাছটিকে বহনোই নতুন স্মৃত্তো দিয়ে সাতবার বেড় দেয়। এই ‘সাত বেড়’ স্মৃত্তো দিয়ে আমগাছের পাতা পেড়ে বরের ডান হাতে বহনোই ‘কাঁকন’ (< কঙ্কন) বেঁধে দেয়। এই সময় গান গাওয়া হয়—

১১. আম গাছে আম বকুল ঝবরলি, তাব তলে সাধের বালা গ ॥

আমবেহা একমাত্র ‘ফলস্তু’ আমগাছের সঙ্গেই অহুষ্ঠিত হয়। অহুষ্ঠানটি বৃক্ষপূজা-সম্পর্কিত হতে পারে। স্মৃতিবতঃই বরোবার আগে এই স্মৃত্তোচীন আত্মবৃক্ষকে বিবাহ করে তাকে আলিঙ্গন করে দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। সাত পাক বাঁধনে বেঁধে গাছটিকে তার আয়ু তার নিরাপত্তাব রক্ষাকর্তা

হিসাবে স্বীকার করা হয় এবং আশিস চিহ্ন হিসাবে আত্মপল্লবের 'কাঁকন'টি বাঁধা হয়। দ্বিতীয়তঃ, আত্মপল্লব কল্যাণ এবং মঙ্গলময়তার প্রতীক, তাই প্রাকৃবিবাহ অল্পষ্টান। তৃতীয়তঃ, আত্মবৃক্ষে প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে। প্রজননক্ষমতা, সম্ভানপ্রাপ্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যেও এই আচার পালন করা হতে পারে।

আমগাছের তলাতেই একটি অদ্ভুত স্ত্রী-আচাব দেখা যায়। এই অল্পষ্টানটিকে বলা হয় 'আম্‌ল খাওয়া'। 'আম্‌ল' শব্দটি 'আমলকী' কিংবা 'আম্‌লোর' কোন্‌ শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কিত বলা দুর্কহ। কচি আম পাতা পেড়ে তাব বোঁটা অংশগুলো ববকে চিবোতে দেওয়া হয়। তার মুখেব সেই অল্পরস হাত পেতে প্রথমে মা, তারপর মাসী-পিসি জ্যোষ্ঠি-কাকীবা মুখে দেন এবং বরের মুখে সরাসরি চুষন করেন অথবা কখনো কখনো বরের ঠোঁটে হাত ছুঁইয়ে সেই হাত নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ান। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আচার, এর জন্তু যাঁরা 'আম্‌ল' খান, তাঁদের উপবাস করে থাকতে হয়। বিনিময়ে তাঁরা অবশ্য শাড়ি-কাপড় পেয়ে থাকেন। অল্পষ্টানটি যথেষ্ট আবেগ-ধর্মী। মা-মাসিদের চোখে জল পযন্ত দেখা যায়, অন্তর্নিহিত চিন্তবেদনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়। এই সময়ের গান—

১২. বরের মা রাজার কি আম্‌ল খাইছে, কন্নার মা হাড়ির কি নিচিন্তে ঘুমাছে  
কে আম্‌ল খায় বলি কে আম্‌ল খায়, যে বরের সদর মাসি সেই আম্‌ল খায় ॥  
'আম্‌ল' খাওয়ার পর মা ছেলেকে কোলে নিয়ে তিনবার জিজ্ঞেস করেন,  
'কুথায় যাছিস বাপ?' উত্তরে ছেলেকে বলতে হয়, 'কামিন আ'নতে  
যাছি।' তারপর মা ছেলের গায়ে 'পাল্লা' উত্তরীয় তুলে দেন তার এক কোণে  
সর্ব অশুভনাশন মন্ত্রপুত সরবে বাঁধা থাকে। এইসব লৌকিক আচার-অল্পষ্টানে  
কল্যাণ আয় এবং অশুভনাশ কামনা করা হয়ে থাকে। চিন্তবৈকল্য দেখা  
দিলেও এই সময়ের গানগুলো আনন্দবেদনার সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

১৩. 'লোকলঙ্কার লিয়ে' বালা কুথাকে সাজিলে, দিয়ে' রাখতুধেকেরি ধার।'  
'এখন নাই দিব মা তুধেকেরি ধার, গঙ্গা যায়ে' দিব এক ধাব।'  
'কুথাকে সাজিলে বালা লোকলঙ্কার লিয়ে' ?  
'রানী আগ্‌সার করোচ্ছে মা গ দেখিবার তরে।'  
'যাই লিবি তাই দিব বালা, কি লিবি রে বল ?'  
'মাথায় বাঁধা সুরু চাধর মুখে পানের খিলি ॥'

পুত্র 'রানী' আনতে যাচ্ছে জেনে মা তাকে রণসজ্জায় সজ্জিত করে উৎসাহিত করে বলেন—

১৪. বাম-ঝাড়ের বাঁশ গ বালা সীতা-ঝাড়ের শর

বালা চল্যে যা ন রানী দরশন ।

এক কাঁড় বিঁধিবি বালা আদাডে বাদাডে

দশ কাঁড় বিঁধিবি বালা বানীব বাসঘরে ॥

(এখানে রাম-সীতার প্রসঙ্গ লক্ষণীয়।) মা পুত্রকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে বীরত্বপ্রকাশের বীতি-নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছেন এবং বিয়ে করে রানীকে নিয়ে আসবার জন্ত উৎসাহ দিচ্ছেন—

১৫ 'উচ উচ পিঁচা, বালা, গহীর গহীব খুঁটা, তার তলে ভমরাব বাঁসা।

যাও, বালা, যাও গ বিভা ক'রতে যাও

বিভা ক'রবে ফুলকুমাবী কন্যা গ, বিভা ক'রবে ফুলসুন্দবী বন্যা ॥'

মা গামছায় টাকা বেঁধে ছেলেব হাতে তুলে দিয়ে সংশয়ে নিরুৎসাহ পুত্রকে ভরসা দিচ্ছেন—

১৬ 'কে জানে মা গ কে জানে বাবা গ, পরের বিকে দিবেক ন নাই দিবেক ?'

'গামছার টাকা বালা বিঁচিয়ে' দিবে, পবেব বিকে কেনে নাই দিবেক ॥'

তাতেও পুত্রকে নিরুৎসাহ দেখে মা নানান উপহার সামগ্রী দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন—

১৭ অই কালা মেঘে অই কালা মেঘে, বালা বে, শেঁয়াল বরন বসে ।

ধব ধব ছাতা দিব বালা গ বানীব মহল যাতে,

উডকি ধানের মুডকি দিব বালা গ বানীব মহল যাতে,

কদমফুল্যা মিঠাই দিব বালা গ শালাকে তুলাতে ॥

পুত্র সম্মত হলে রানীকে নিয়ে আসবার জন্ত এবাব যাত্রাব আয়োজন চলে—

১৮ লক্ষ লক্ষ হাতি সাজে লক্ষ লক্ষ ঘড়া সাজে ,

রাজা মিধি সেন সাজে মথুবা গ, যাও ন গ বানীব মহলে ॥

ক্রমশঃ অপস্ফয়মান বব-বরযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে মায়ের বুক দীর্ঘশ্বাসে ভরে ওঠে—

১৯ ই পথে দেখোছ যাতে ই পথে দেখোছ যাতে গাটি ত হল'দ বরন,

ই পথে দেখোছ যাতে হাতে বে কঁকন আছে,

ই পথে দেখোছ যাতে কপালে তিলকের ফঁটা ॥

বয়ের ক্ষেত্রে যে সব আচার-অচুঠান পালিত হয়, কন্যার ক্ষেত্রেও তাব কোন ব্যতিক্রম নেই। সমধর্মী আচারমূলক গানগুলোও প্রায়শঃ এক। শুধুমাত্র ‘বালা’র স্থানে ‘ধনি’ কিংবা ‘কল্যা’ শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্যগোচর হয়। আভাড়া খাওয়া, নাপিতেব নথ কাটা, স্নান এবং নুতন বস্ত্রসজ্জা সমস্তই একই ধরনে অহুষ্ঠিত হয়। কনের হাতে কাজললতা যথারীতি থাকে, কিন্তু মাথায় ‘মোড়’ বা উষ্ণীয় তুলে দেওয়া হয় না। ওটা ‘বানী’ হবাব পব ববপক্ষ .থকেই দেওয়া হয়।

একটি ক্ষেত্রে মৌল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কনের আচার অচুঠানে ‘আম বেহা’ নেই, পরিবর্তে ‘মহল বেহা’ প্রচলিত। বয়োজ্যেষ্ঠা আত্মীয়াবা কনেকে কোলে তুলে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট প্রাচীন মহয়া গাছেব তলায় নিয়ে যায়। আম গাছেব সঙ্গে ববকে যেসব আচাব পালন করতে হয়, কনেকেও মহয়া গাছেব সঙ্গে সেই সব আচার পালন কবতে হয়। এখানেও তার বহনোই তাব বাম হাতে মহয়া পাতাব কাঁকন বেঁধে দেয। এখানে বহনোইকে তামাসা কবে গাওয়া হয়—

২০ বহনোইকে বালোছিলি মচলতল বাটাআন্দে,

আমাদেব সাধেব ধনি জব্বায় ডাঁঢালা।

হাতের কাঁকন বাঁধি দিছ যত্ন কবো, বহনোই মিনতি কবি ॥

কনের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়—

২১ মহলতলে মচল থঁচে ঝববলি,

ছিলে ধনি মায়েব ভারি, ছিলে ধনি বাপেব ভারি গ ॥

‘মহল বেহা’ সম্পর্কে আম বেহার মতোই কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানেও একটি ফলপ্রসূ প্রাচীন মহয়াবৃক্ষকে নির্বাচিত কবা হয়। (অভাবে আম বা মহয়ার চাবা গাছেও কাজ চালানো হয়।) দীর্ঘ জীবন এবং আয়ু, প্রজননক্ষমতা এবং সম্ভানপ্রাপ্তি আদি কামনায় যে এই বৃক্ষবন্দনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। আম এবং মহল দু’টি গাছই বহুপ্রসূ। দু’টি গাছ পৃথকভাবে নির্বাচিত করার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে আম গাছটি পুরুষ এবং পুরুষ ষোঁনাঙ্কের প্রতীক, এবং মহয়া গাছটি নারী এবং নারী ষোঁনাঙ্কের প্রতীক দু’টি বৃক্ষের ফুলকলের ধারাটি লক্ষ্য করলেই এই কথাটি স্বাভাবিকভাবে মনে আসে। তা ছাড়া আত্ম এবং মহয়া বৃক্ষের বন্ধলরসও এ-ব্যাপারে বিচার্যবস্ত। ঝাডথণ্ডে শিশুসজ্জানের মৃত্যু হলে তাকে মহয়া বৃক্ষের তলায়

পূঁতে ফেলা হয়। কারণ, মহয়ার বন্ধলরস এবং পত্রবৃক্ষের রস দেখতে মাড়ু-  
ছন্দের মতো; মাতৃভ্রমুর অভাবে শিশু মহয়ার দুধ খেতে পারে, এটাই লোক-  
বিশ্বাস। ঝাড়খণ্ডের লোককথাতেও এই বিশ্বাসটির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

মহয়ার্তলায় কনের 'আম্ল' খাওয়ার রীতি আছে। কনে মহয়াপাতার  
বোঁটা চিবিয়ে তার রসটা মা-মাসি-পিসিদের হাতের তেলোয় দেয়। বর্তমানে  
এরীতির বদলে মিষ্টায়ের ব্যবহারের ঝোক দেখা যাচ্ছে। পুত্রকন্টার কল্যাণ  
কামনায় অশুভনাশেব জগু যে এই অহুষ্ঠান তাতে সন্দেহ নেই। এর পশ্চাতে  
কোন লৌকিক জাদুক্রিয়া থাকার অসম্ভব নয়। অবশ্য প্রাচীনপ্রাচীনাদেব কাছ  
থেকেও এর রহস্য কিংবা মর্মকথা উদ্ধাব করা সম্ভব হয় নি, হতে পারে এ-  
অহুষ্ঠানে মাতৃঋণ বা 'দুধেকেবি ধার' শোধ করা হয়।

অবশেষে লোকলঙ্কার নিয়ে বর কনের গায়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছেলে  
কনে ঘেন বাজনার শব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে—

২২ 'ডুঁগুরি কা ধারে খাবে কিসের বাজান বাজে ?'

'অই দিগের লে আ'সছে ধনি 'ত্রি শিরেব লক।'

'আমাকে লুকা ন বাবামহল ভিতবে, তুমিয়ে থাকিবাবা সদব দুয়াবে।'  
'কি কবো লুকাব মা মহল ভিতরে, দেশমজলিসেব পাশে জবাব কবোছি ॥

কন্ঠাদানে অঙ্গীকাববন্ধ পিতাব কাছে ভবসা না পেয়ে কনে এবার দাঁটার  
শরণাপন্ন হয়—

২৩ কাঁটিয়া কাটিকুটি পালহাব বেডন রে, রাধি দে ন খিডকি দুয়াব।

খিডকি দুয়াবে ভাইবে চোর সামাছে, এক বহিন যাছে তব চুরি,  
ভাইবে ফুলসুন্দরী বহিন যাছে চুবি ॥

সবারই নিরুপায় অবস্থা। ইত্যবসবে বর তার 'লকলঙ্কার' নিয়ে গ্রামের প্রবেশ  
মুখে পৌঁছে যায়। গ্রামের লোকেদের সাথে অতীতে বরপক্ষের লোকেদের  
গানে-গানে বাদপ্রতিবাদ চলত শোনা যায়। দুর্ভাগ্যবশত: সে সব গান  
সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে এই যে বাদপ্রতিবাদ তা যুদ্ধেরই প্রতীক।  
বর্তমানেও গ্রামেব লোকেরা বরের প্রতিরোধ করে থাকে; ক্রুরকিছু  
পাওনা-গণ্ডা আদায় করে পথ দেখিয়ে কন্ঠাগৃহে নিয়ে আসে অর্থাৎ যুদ্ধেব  
পর মৈত্রীর মতোই ব্যাপারটা দাঁড়ায়।

বর এসে কন্ঠাগৃহের দরজায় দাঁড়ায়। কন্ঠাকর্তা 'গুয়াচন্দন' করে 'বর-  
বরণ' করেন। এখানেও যুদ্ধের প্রতীক খুঁজে পাওয়া যায়। ছ'টি সর্ব্ব আত্ম-

পল্লব তিনবার অঙ্গলবদল করা হয় এবং শেষে দু'টিই বরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সবুজ আশ্রপল্লব দু'টি সুস্পষ্টভাবে অঙ্গের প্রতীক। বরের হাতে নিজের আশ্রপল্লবটি তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে কস্তাকর্তার আত্মসমর্পনের ছবিটিই ফুটে ওঠে। এখানেও আবাহন আদির মাধ্যমে মৈত্রীর রূপটি ফুটে ওঠে।

ভতোক্ষণে বরপক্ষের প্রতি পুরনারীদের আক্রমণ শুরু হয়ে যায়।

২৪ বরের ভাই-এব এলেং বেলেং তেলেং ধুতি, বিরালে মারিল লাধি ॥

পিঁড়রা শলের কুলুহি আডায় সন্লা ফুল ফুটোছে,

আমরা বলি বরের ভাই ফুলছড়ি সাজাছে ॥

২৫ পায়বার লাগ্যে ফাঁস আডেঁয়ছি গ, লাগ্যে গেল বরের সদর বাপ।

ববেব বাপ বলেঁয় চিনিতে না পারি গ, মারেঁয় দিলি থাডিয়া কাবড ॥

ববকে 'ছামড়া (<ছায়ামগুণ) তলে' আনা হলে বর দেখবার জন্ত পুরনারীদের মধ্যে ঠেলাঠেচিলি পড়ে যায়। বরকে গালাগালি ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে গাওয়া হয়—

২৬ কিসেব এত দেরি বর কিসের এত দেবি,

আম জাম ডাল দিলি ছাঁহিরা হবক বলি।

ধাবে পাশে গাছ নাই মহকে আসে বাস,

কুথায় পালি বে বর কিয়া ফুলের বাস ॥

বিবাহ আনন্দের অস্থান, স্বভাবতঃই ব্যঙ্গবিদ্রুপ, অপমানকর বাক্যবাণ নিতান্তই বেমানান মনে হতে পারে। তবে বরপক্ষের অভিযানকে নারীহরণ-বচিত যুদ্ধ যাত্রার স্মৃতি-অবশেষ ধবে নিলে মোটেই অসংগত মনে হবে না। বিজয়ী বরপক্ষের বাক্যবাণ প্রয়োগের প্রয়োজন থাকে না, অস্থপক্ষে পরাজিত অসহায় বাকসর্বস্ব কস্তাপক্ষের শাণিত বিদ্রুপই শেষ অস্ত্র।

'রানী দরশন'-এর আগে বরকে বোনের শেষ প্রহরী শালকের সম্মুখীন হতে হয়। বর টোপর-মাথায় এবং শালক পাগড়ি-মাথায় নিজের নিজের ভঙ্গিপতির কাঁখে চড়ে সবুজ আশ্রপল্লব তিনবার অঙ্গলবদল করে এবং শেষে শালক নিজের পল্লবটি বরের হাতে তুলে দেয়। টোপর এবং পাগড়ি নিঃসন্দেহে শিরদ্বাগের প্রতীক এবং আশ্রপল্লব বরের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ বৃদ্ধান্তে শালকের পরাক্রম স্বীকার। একে অস্থকে মিষ্টান্ন এবং পানের বিলি খাইয়ে দিয়ে মৈত্রী স্থাপন করে; এছাড়াও বর শালককে একটি ধুতি দিয়ে থাকে—ভাই এই অস্থঠানের নাম 'শালা ধুতি লুটা'।

এবার কনেকে বিবাহমণ্ডপে নিয়ে আসা হয়। শেষবারের মতো সে যেন বাবা, দাদার কাছে মিনতি কবে—

২৭ ই পিতা সে পিতা চালে ছুয়ালা গ, ধনিব বাবা পাটপণ্ডিত।

বাবাব কলে বসে করিছে বিনতি গ, দেখ বাবা না দিহ যে দান। ইত্যাদি এই বেদনাময় বিষয় মুহূর্তে পুরনারীদের কণ্ঠে করুণস্বরে গান বেজে ওঠে। সবার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। যেখানকার যা সব আছে, ধনসম্পত্তি কিছুই এদিক ওদিক হয় নি। শুধু সাধের কন্যা চুবি যাচ্ছে, পর হয়ে যাচ্ছে এ যে এক মর্মান্তিক অহুভূতি, এতুখের যে কোন সাহুনা নেই—

২৮ আঁচিরে পাঁচিরে ধর তায় সামালা চর,

ধনধরিব সক'ল আছে, আমার ধনি চুবি যাছে, আমদেব ধনি চুরি যাছে।

আঁচিরে পাঁচিবে ধর তায় সামালা চর

ঘটিবাটি সক'ল আছে, আমাব ধনি চুরি যাছে, আমদেব ধনি চুবি যাছে।

এত বড় বাথ'লে ধনি নাই আঁটিল, শাগবাইগনেব মতন ধনিকে বিকিল ॥

বরকনে মুখোমুখি হয়ে দু'জনের মাঝখানে ঝোলানো পর্দার তলা দিয়ে দু'টি সবুস্ত আশ্রপল্লব তিনবাব বিনিময় করবার পর পাতা দু'টি বরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আমাদের মনে হয়, এটিও অতীতের যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র। সেদিন স্ত্রীপুরুষনির্বিষেবে অস্ত্রপবিচালনা করে আশ্রবক্ষার শিক্ষা নিত। কন্যা আশ্রবক্ষায় অসমর্থ হয়ে বরের কাছে আশ্রুসমর্পণ করবার পর মাঝখানের পর্দাটা ধীরে ধীরে উঠে যায়, বরকনেব শুভদৃষ্টি হয়। তারপব উপস্থিত আশ্রীয় স্বজনের মাঝে বরকনে মালাবদল কবে। পুৱনারীদের কণ্ঠে তখন আবার গান শোনা যায়—

২৯ কচা বাড়ির ভিতরে গুলা'চ ফুলেব পাছ,

ডাল ভাঙি ফুল'তুলে বিদেশী ভমরা।

সেফুলের হাব পাখে্য দিল ধনিব গলে,

ফুলের মালা পলে দিয়ে গিবহজালা দিলে।

নাই লিব ফুলের মালা নাই লিব জালা,

গিবহজালা বডজালা নয়নে বহে ধারা ॥

তারপরই বর কনের সারা সিঁথি রাঙা করে দিয়ে সিঁদুর লেপে দেয়। যে-কনে বাবার কাছে তাকে লুকিয়ে রাখবার আবেদন করেছিল, যে তাকে দান না করবার জন্ম 'বিনতি' করেছিল, তার মধ্যে পরিবর্তন আসে।

৩০ বাবার বাড়ি-এ লতার জনম গ, গুরুলতায় হরোঁছে মিলন ।

পূর্ববে করোঁছি সত্য স'ঙ্গে রইবার তরে গ, পরাণ গেলে হব ছাড়াছাড়ি ।

ঈগার পাঁউশে রহিব জড়ায়োঁ গ, কুশা যাবে আমারে ছাড়িয়েোঁ ॥

ববাগমনের পর যে বিদ্বেষেব ভাব দেখা যায়, বিয়ের পর আর তা থাকে না ।  
সবাই তখন বরকনে দেখবার জন্ত ভিড করে ।

৩১ তেঁতলী পাতে ধান ঘাঁটিলম হেলকি হেলকি পড়ে ডাল,

লহকি লহকি পড়ে ডাল ।

ছামডাতলে বাজকুঁয়ব জামাই গ, ছামডাতলে বাজকুঁয়বী কন্যা গ,

হেবো হেরো প্রাণ গ জুড়ায়, হেরো হেবো মন গ জুড়ায় ॥

বাত্রি ভোর হতে না হতেই বিজয়ী যুদ্ধযাত্রীবা বন্দিনী বাজকন্যাকে নিয়ে ঘবে  
ফেবার উদ্বোগ কবে ।

৩২ 'থুকুড়া ডাকি গেল নিশি পুহাল্য গ, উঠ কন্যা পথ বড়ী ধুর ।'

'কমনে টট্টিব পবভু কেমনে বসিব গ, ঝাঁচলেতে সহদব ভাই ।'

'থুকুড়া ডাকি গেল নিশি পুহাল্য গ, উঠ কন্যা পথ বড়ী ধুর ।'

'ব'শ্র ন ব'শ্র পরভু তিলেক পলম গ, বাবাকে মোব বধ দিয়ে' রাখি ।'

'থুকুড়া ডাকি গেল নিশি পুহাল্য গ, উঠ কন্যা পথ বড়ী ধুর ।'

'ব'শ্র ন ব'শ্র পবভু তিলেক পলম গ, মাকে মোর বধ দিয়ে' রাখি ॥

এই গানটি থেকে সহজেই কনের যন্ত্রণা-বিক্ষুব্ধ মনের খবর পাওয়া যায় ।  
আজন্ম-পবিচিত এই সংসার ছেড়ে তাকে চিরকালের মতো চলে যেতে হবে ।  
সহোদর ভাই বাবা মা সবাই একসাথে তার মনের দোর আটকে যেন  
দাঁড়িয়ে আছে । তাদের প্রবোধ দিয়ে সাবুনা দিয়ে তবে তো সে অজানা  
অচেনা দেশে যাত্রা করবে । তাই মেয়ে মা-বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তার  
কণ্ঠস্থরে বেশ খানিকটা অভিমানের আভাস পাওয়া যায়—

৩৩ চা'র কুনে চা'র খড ভাবি, ছিলি এদিন বাবার ভারি গ ।

এবার বাবা ভূমাবে নিশ্চিন্তে ঘরে, আমি যাছি শশুরালি গ ॥ ইত্যাদি  
মা সোচ্চার কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে কিছু সাংসারিক উপদেশ  
দেন—

৩৪ রাঙাচাঙা টুপাডালা রইল ধনির শিকায় ভূলা গ,

ঔধার ঘরে রাঁধিবি মাঝ্যাঘরে ঝাঁটিবি গ ।



দুধ সূঁষ হলে ধনি কহিয়ে' পাঠাবি গ,

বাবা যাবেন দেখিতে খুড়া যাবেন আনিতে জেঠা যাবেন বুঝাইতে গ ॥

মা মেয়েকে কাছেই শশুরবাড়ি বলে সাঙ্ঘনা দেন আর নানান উপহারে  
ভোলাবার চেষ্টা করেন—

৩৫ ই পারে হাঁস ঘুরে সে পারে পায়রা ঘুরে মধ্যে ত বরের বাপের ঘর ।

ছ মাসের তেল দিব ছ মাসের হল'দ দিব আর দিব পদ্মফুল্যা শাড়ি ॥

এবারে কনে তার ভাইদের কাছে বিদায় নেয়—

৩৬ 'এক মায়ের এক বাপের ভাই অ বহিন, সবরি সবরি দুধ খায় ।

তুমি যে যাবে ভাই রাজার দরবার রে, আমি ভাই যাছি পবের ঘব ।

পরের ঘবে ভাই গাঞ্জনায় গাঁজিবে রে, আঁচলে ঢরকি পড়ে লব ।'

'আমি নাছি লেখি বহিন বিধাতায় লিখেছে বে, বিধাতায় লিখে'ছে

পরের ঘব

পরের ঘরে বহিন সংসার চালাবে রে, রাখি দিবে বাপভাই-এর নাম ॥'

এই বিদায় মুহূর্তটিতেই তাই অপ্রত্যাশিত হাবানোর বেদনা জনবজননীকে  
আকস্মিকভাবে বিহ্বল করে তোলে । মেয়েব থাক-থাওয়া ভালোমন্দের কথা  
ভেবে তাঁরা স্বস্তি পান না । চোখের জল তো সমুদ্রের মতোই উত্তাল ।  
'বেহাই'কে তাই তাঁরা মেয়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপাবে কাতর মিনতি  
জানান—

৩৭ মোর ঘরে মোর ধনি সকাল হলে খাতে খুজে

সাঁজ হলে শুতে খুজে, বেহাই বিনতি করি ।

মোর ঘরে সকাল হলে ছডাঝাঁটি, সাঁজ হলে স'নঝা বাতি,

বেহাই বিনতি করি, মোর ঘরে সকাল হলে টুপায় মুচি ॥

মেয়ে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে ঘুরে, আরো ঘুরে । মা এক বিশাল শূন্যতা-  
বোধ নিয়ে শুধুই নিম্পলক তাকিয়ে আছেন । তিনি যেন কিছুই দেখতে  
পাচ্ছেন না । সারা মন জুড়ে কবে কোন্ দিন মেয়ের ওপর খারাপ ব্যবহার  
করেছিলেন, তার কথা মনে পড়ছে । মেয়ের সেই অভিমান-সুন্ধ কথা তাঁকে  
তীব্র অসহ্য কষ্ট দিচ্ছে : 'এবার মা ঘুমাতে নিশ্চিন্তে ঘরে, আমি যাছি  
শশুরালি গ ।' কিন্তু সেই 'শশুরালি'তে মেয়ে কি ভাবে দিন কাটাবে, তা  
ভাবতে গিয়ে বুক কেটে যাচ্ছে ।

৩৮ জ'ড পাতটি লড়েচড়ে মায়ের মন কেমন করে,

এবে মা গ কাতর হলে, কাতর হয়ে দিলে পরেব ঘরে ।

জ'ড পাতি লড়ে চড়ে যাবের মনে পড়ে,

কেমনে রহিবে শ্বশুর ঘরে মা গ কেমনে বহিবে শ্বশুর ঘবে ॥

মা যেন শোকে কাতর হয়ে পায়ণ হয়ে যান ; তাঁব চোখে আব জল নেই, অথচ এ শোক ভোলবাব জন্তু কারার প্রয়োজন । 'তাই পুনাবীবা তাঁকে কাঁদাবাব চেষ্টা করে—

৩৯ মেঘ আঁধাব রাতি হাতে কাজল বাতি

কন্নাব মা-এর কঠিন পায়ণ হিয়া, নয়নে নাই বহে ধাবা গ ॥

ওদিকে বব তার 'রানী'কে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন কবলে তাব ম' ববকনেকে সাদরে বরণ কবাব জন্তু এগিয়ে আসেন—

৪০ 'শশুবাল গেলে বালা কি কি পাওন পালে বে ?'

'হাতিশালে হাতি পালাম ঘড়াশালে ঘড়া, আব পালাম মেজুবের খুঁটি ॥

বধুর সঙ্গে কয়েকজন 'লগদিন' থাকে । সম্ভবতঃ অতীতে বধুর সঙ্গে তার প্রিয় সখি অথবা দাদীচাকবানী পাঠাবাব একটি বীতি ছিল । পববর্তীকালে অর্থনৈতিক দুববস্থার জন্তু মেঘেন সঙ্গে বি-চাকবানী দেবাব ক্ষমতা অনেকবই থাকে না । বর্তমানে বীতিটি লুপ্ত হয়ে গেলেও প্রতীকগতভাবে বধুব সঙ্গে ঠাকুমা, দিদিমাদেব 'লগদিন' হিসাবে পাঠানো হয়ে থাকে । ঠাকুমা-দিদিমাবা তাই ববকে বসিকতা কবে প্রশ্ন কবে, এতগুলো বমণীব কোনটি তার 'কামিনী' অর্থাৎ বধু ।

৪১ 'তিনটি যে লক বে ধন কনটি কামিনী ?'

'ঐ দিগে ডাঁটাই আছে সেই ত কামিনী ।'

'ই ত সম্পত্তি লিতে আলা ধনদরিব গাতে আলা বিষয় উডাতে আলা ।

তিনটি যে লক ধন কন বে কামিনী ?'

'যার সীতে সিঁদুর আছে সেই ত কামিনী বঠে,

যার পায়ে আলতা আছে সেই ত কামিনী বঠে ॥'

ববেব মাযের মন কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল । বধুর বাবামার বেদনার কথা তিনি নিজেও অহুভব করতে পারছেন । তাই ছেলে শশুব-শাশুড়ীকে কিভাবে সাঙ্ঘনা দিয়ে এসেছে, তা একে একে জিজ্ঞেস করে জেনে নেন—

৪২ 'তরি যে শুনি বালা সাত শশুর বে, সাত শশুবকে কি দিয়ে বধালি ?'

'সাত শশুরকে সাত শালা কলে দিলি, আল্লাদিনীকে নিয়ে আলি ।'

‘তরি যে শুনি বালা সাত শান্তুড়ী রে, সাত শান্তুড়ীকে কিবা বদল দিলি ?’  
 ‘সাত শান্তুড়ীকে সাত ঘরে বাতি দিলি, আল্লাদিনীকে নিয়ে’ আলি।’  
 ‘বালা রে আল্লাদিনীর দিদি আছে, দিদিকে কি দিয়ে বধালি ?’  
 ‘কাড়া মেলায় কাড়া-পাষায় বাঁধিলি, আল্লাদিনীকে নিয়ে’ আলি।  
 কাড়া-পাষা ছিটাই করি পেছু পেছু দৌড়ো আলা  
 আশু মা মাঝাঘরে ডাঁঢ়ালা,  
 মা গ মাঝাঘরে খাতে দিবি আঁধার ঘরে শুতে দিবি  
 ই ত বঠে দুদিনের কুটুম ॥’

‘দিদি’ অর্থে ‘ঠাকুরদিদি, মামাদিদি’ বা ঠাকুমা-দিদিমার প্রসঙ্গই এখানে রয়েছে। স্বভাবতঃই বর তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটু চটুল রসিকতাপূর্ণ জবাব দিয়েছে।

বরের মা বরবধুকে বরণ করে ‘ছামডাতলে’ তোলেন। বর-বধু দেখে পুরনারীরা গেয়ে ওঠে—

৪৩ আঁকছ্যারের পিঁপ’ল গাছ করে লহলহ গ / লহসি লহসি মেলে ডাল।  
 ছামড়ার তলে রাজপুত্র-কণা গ,  
 হের্যে হের্যে মন গ জুড়ায়, হের্যে হের্যে প্রাণ গ জুড়ায় ॥

ধীরে ধীরে সঙ্কার অঙ্কার নামে। এবার শোবার প্রশ্ন: ‘বালা’ যেন ‘ফুলের বিছনা’র জন্ম অস্থির হয়ে ওঠে। সেই নিরিবিলি নির্জনতা, যেখানে থাকবে শুধু সে আর তার রানী।

৪৪ দুয়ারের ছামডা রুগুরে কুগু, মাঝাঘরে বোল ফুলের বিছনা গ,  
 সেহ দেখ্যে সাধেব বালা খুজে বিছনা গ।  
 দিব যে দিব বালা ফুলের বিছনা গ, কেনে বালার আকুল জীবন ॥  
 এবং তারপরই শুরু হয় দাম্পত্যজীবন।

॥ দুই ॥

### রুমুজ গান

দেবতা ডাকানো মন্ত্রকে ঝাড়খণ্ডে, বিশেষভাবে ধলভূমে’ রুমুজ গান বলা হয়। পটমদা আদি এলাকায় এই গানকে ‘ভাউ’ বলা হয়। রুমুজ গান

‘সুঁপাব’ নামক একটি অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়ে থাকে। মন্ত্র শেখাবার জন্তু ওঝারা তেরোই জৈষ্ঠ থেকে ‘চেলা বসায়’ বা শিশু নিয়োগ করে। এই আখড়ায় শুধু যে তুঁকতাক ঝাড়ফুক মন্ত্রতন্ত্রই শিক্ষা দেওয়া হয়, তা নয়। ‘সুঁপাব’ এই আখড়ার অন্ততম আকর্ষণ। সুঁপার হচ্ছে কোন দেবতাব কোন মিডিয়ামের শরীবে ভব কবাব বাপার। বোগ শোক দুর্ভিক্ষ বৃষ্টি চুরি বাহাজানি সর্বক্ষেত্রেই এব প্রয়োগ লক্ষ্য কবা যায়। মিডিয়ামের মারফৎ জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যায়। সব সময় যে তা সত্যি হয়, তা’ও না। জবাবগুলো বেশিভ ভাগ ক্ষেত্রেই অশ্রুস্ত ভাসা-ভাসা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঝাড়গুণী আদম মানুষ সুঁপারের ‘দৈববাণী’তে অত্যন্ত আস্থাশীল। আমাদের মনে হয়, এব পেছনে আদিম মানুষের সেই চিন্তাটি কাজ কবছে যে, দেবতা মান্তবেব শরীরে ভব কবেন এবং তাকে দিয়ে তাঁর উদ্দিষ্ট কাজ কবিযে নন। ঝাড়গুণী জনতা বিশ্বাস কবে, দেবতানে আকুলভাবে আহ্বান জানালে তাঁরা না এসে পারেন না এবং যখন আসেন তখন কোন ভক্তেব শরীবে আশ্রয় গ্রহণ কবেই নিজেব স্বরূপ প্রকাশ কবেন। তাই এবা নিজেদিগকে দেবতার বাহন বা ঘাড়া হিসাবে ধরনা কবে থাকে। দেবতা আগুন গেতে পারেন, গ্নিস্ফুলিঙ্গ মিশ্রিত ছাই গায়ে মাখতে পারেন, শিমূল বণ্টকেব ওপর বসতে পাবেন, শাঁখা পবেন, তাই এবাও সুঁপারের সময় নিজেবা দেবতা সেজে এইসব অনুষ্ঠান পালন কবে এবং শাঁখার বদলে সাবুই ঘাস দিয়ে পাকানো ‘কডু’র (শক্ত দড়ি) আঘাতেব ক্ষত হাত এবং পা এগিয়ে দেয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠান রিচুয়ালস ছাড়া কিছু নয় : দেবতাদের কর্মকাণ্ডের বিশ্বস্ত অনুকরণমাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা মনসা প্রথম আবির্ভূতা হন, তাবপর আঞ্চলিক এবং আদিম লৌকিক দেবতাবা।

অবশ্য প্রত্যেকদিন সুঁপাবেব অনুষ্ঠান হয় না। বোহিমেব দিন আখড়াব প্রথম পূজার দিন থেকে শুরু কবে সাধারণতঃ সাপ্তাহিক পূজাব দিন মঙ্গলবারে সুঁপার হয়। এছাড়া বিশেষ কারণে, যেমন কোন পরিবারে কোন অকল্যাণ দেখা দিলে, চুরি হলে, দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে, সুঁপাবেব আয়োজন কবা হয়। দেবতার মুখ থেকে ভালোমন্দ খবরাখবব জানবাব জন্তু তাঁদের আখড়ায় আসবার জন্তু আহ্বান জানানো হয়। দেবতা ওঝা কিংবা কোন চেলাকে আশ্রয় কবে আবির্ভূত হতে পাবেন। একে ‘বঁলা হয় ‘ভরন’। অগ্নি কারো শরীরে ‘ভবন’ আনতে হলে দেবতাব ভব-নামা লোকটির সামনে

তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়, তার স্পর্শ লাগলেই 'ভরন' সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তবে দেবতাকে নামাবো বললেই হয় না, অনেক তুকতাক সাধ্য-সাধনা করতে হয়। উবু হয়ে বসে এক পা তুলে রাখা, শিলের ওপর বসা, একগাছি লাঠি ধরে খুবই আলতোভাবে বসে-থাকা—'ভরনের' এগুলো কয়েকটি পদ্ধতি মাত্র। রুমুজ গান সম্বলিত কণ্ঠের গান; দেবতার ভরের প্রতীক্ষায় আখড়ার সামনে বসে-থাকা চলারী রুমুজ গান গেয়ে দেবতাকে নেমে আসবার জ্ঞান আহ্বান জানায়। দেবতাকে নামানোর এই পদ্ধতিটি সারা ঝাড়খণ্ড জুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়। দেবতাব ভর হলে লোকটির মাপা প্রথমে ঢুলতে শুরু করে, তারপর সারাদেহ খরখর করে কাঁপতে আবম্ব করে এবং লোকটি 'সোহা' (<সোহং ?) বলে চীৎকার কবে মাটি কাঁপিয়ে হাত পা আছড়ে দাপাদাপি করতে থাকে।

দেবতা সহজে আখড়ায় আসেন না। অনেক সময় দীর্ঘকাল ধরে সমবেত রুমুজ গান করে দেবতাকে আহ্বান জানাতে হয়। রুমুজ গানের একটি বিশিষ্ট সুর আছে, বিলম্বিত লয়ে টানা সুরে এই গান গাওয়া হয়। মন্ত্বেব মতো রুমুজ গান কবিত্ব-বর্জিত নয়। এব মধ্যে লোককবির কল্পনার ব্যাপ্তি, সৌন্দর্যবোধ এবং চিত্রকল্পসৃষ্টির প্রয়াস কখনো কখনো দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণতঃ দেবতাদেব জাগাবাব গান দিয়েই অমুঠানের সূত্রপাত করা হয়। লোকবিশ্বাস এই যে, দেবতার নিদ্রিত থাকেন, গান গেয়ে তাঁদের ঘুম ভাঙাতে হয়। তাই রুমুজ গানে একের পর এক দেবতার নাম কবে গান গেয়ে দেবতাদের জাগাতে হয়।

১ 'আগড়া জাগাও' পিঁটা জাগাও' জাগাও' সবগের দেবতা।

আগে জাগাও' বাসুকী বস্মাতা পেছু জাগাও' চেলা ॥

দেবতাদের ঘুম ভাঙানোর গানে একের পর এক বিভিন্ন দেবতাব নাম আসতে থাকে : ধরম, গরাম, মনসা, সন্ন্যাসী, ভৈরব, হনুমান, বাঘুং, সাত বহনী আদি লৌকিক দেবতাদের একে একে ডাক পড়তে থাকে।

নিজেকে দেবতার ঘোড়া কল্পনা করে দেবতাকে তাঁর ঘোড়ার পিঠেচাপবার জ্ঞান কাতর অহুন্নয় করা হয়।

নামিয়ে আইস গায়ের গরাম দেবতা গ,

ডুমার ঘড়া র'হল বাধা আঁগিনাতে গ ॥

শুধু ঘোড়া বৈধে রেখে আবাহন জানালেই দেবতা আসেন না। তাঁর জ্ঞান

প্রদীপ জ্বলে আরতিও জানাতে হয় ।

৩ সাঁজ দিলম স'ন্ব্যা দিলম সগ্গে দিলম বাতি ।

গটাশিলা আ'সবেন বলি গুরু জালিছেন বাতি ॥

তা সত্ত্বেও দেবতাব আসন যদি নাটলে, তাহলে একলব্যের মতো অঙ্গুলিচ্ছেদন  
কবে দেবতাব মনস্তপ্তি করবার চেষ্টা করা কবা হয় ।

৪ কঁড়ি আঁগুল কাটিয়ে আ'জ ত সলিতা জালিব গ,

অ গ গটাশিলা আ'সবেন বলি গ ॥

দেবতাব জন্ম ভোগাদ্বেবোবও আয়োজন কবতে হয় । তাই আ'হুপ চাল আব  
কাঁচা দুধ সাজিয়ে গুরুশিষ্য মিলে কুমুজ গান গেয়ে দেবতাকে আবাহন জানায় ।

৫ 'আণ্ডা' চাল আব কাঁচা দুধ কাব নামে দিব ।

যদি আসেন মা মনসা তাঁব নামে দিব ॥

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন : একই গান গেয়েই বিভিন্ন দেবতাকে  
আবাহন জানানো হয়, শুধু এক দেবতাব নাম বদলে অন্য দেবতাব নাম  
বসিয়ে দিলেই হল ।

৬ টিলহাতে গবজে টিল্‌হার সাপ আগডায় গবাজ গবজ সাঁই,

হাড কাটি কাটি চাঁওবা ক'বলম বকত ক'বলম পানী ॥

ঝাড়খাণ্ডর দেবতা মানেই শো বন-পাহাড়ের দেবতা । তাই ভক্তের ডাকে  
দেবতাবা উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসবে এসে উপস্থিত হন ।

৭ মেঘ বরষে বিজলী চমকে দেবতাকে ভুলায় রে,

সাত শিম'ল পক্বতের উপর দেবতা চলি আয় বে ॥

মেঘাচ্ছন্ন নিকষ অন্ধকারে বিদ্র্যাতের আলোকে পথ দেখে-দেখে দেবতা নেমে  
আসেন, এটি আদিম মানুষের নিত্যস্থ কল্পনা হলেও এব মধ্যে বিন্দু এবং  
কিছুটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও মিলে আছে বলে আমাদের বিশ্বাস ।

৮ ঝিমির ঝিমির পানী বরষে ভিজি গেল'ায় বাতি,

কন্ দেবতা নাচ লাগায় নিশাভর বাতি ॥

দেবতাদের নৃত্যস্থান নিত্যস্থ ভাব-কল্পনা নয় । মানুষ তার নিজের আধাবেই  
দেবতার কল্পনা কবেছে । তাই দেবতারিও যে নাচেন, স্বাভাবিকভাবেই এই  
বিশ্বাসটি তাদের মধ্যে এসেছে । ষাঁবা রূ'পার অস্থান দেখেছেন, তাঁবা দেখে  
ধাকবেন 'সাত বহনী' দেবতারি একসঙ্গে বৃত্তাকারে নৃত্য করুন, বর্ণে থাকে  
'আম্বলা মেপি চুয়াচন্দন ঘামে ভিজি গেল' আদি গান এবং অন্য একজন

দেবাজ্ঞয়ী ব্যক্তিমাঙ্গল বাজাবার অভিনয় করে মুখে বাজনার তাল ধরে থাকে। এই সাত বোন দেবতা বন-পাহাড়ের দেবী। সাত বহনী ঝাড়খণ্ডের সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেবতা হিসাবে আবর্তি পেয়ে থাকেন। সাতটি বোন যেন ফুলের মতো। এই সাত বহনীকে সাতটি ফুলের ওপব নেচে নেচে আসবার জন্তু আমন্ত্রণ জানানো হয়—

৯ নদীর ধাবে সুরজুঁজা ফুল ফুটে লালে লাল।

হিলতে আয়বে ঢুলতে আয় বে সাত বহন সাত ফুলে আয় ॥

এত কবেও যদি দেবতাব আবির্ভাব না ঘটে, তখন মনসাব দোহাই পাড়া হয়, মনসার দোহাই দিলে দেবতা না এসে পাবেন না।

১০ কাঁচ ফুল'কতে কাঁসা বাজে, কন কন দেবতা খেলি খেলি আসে।

আয়বে দেবতা, মনসাব দোহাই ॥

একবার একজন দেবতা এসে গেলেই হল, তাবপব একে একে সবাব গায়ে 'ভবন' আবস্ত হয়, সব দেবতাই নিজের নিজের 'ঘোড়ায়' চড়ে আগডায় আসেন। তাবপব কুশলপ্রস্ন জিজ্ঞাসাবাদঃ গায়েব শুভাশুভ, বৃষ্টি-বাদল সম্পর্কে পূর্বাভাস, চুবি-রাহাজানিব হৃদস দেবতাদেব সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তাবপব যাব যা প্রিয় নৈবেদ্য তাঁকে তা দিলেই তিনি খুশিমনে বিদায় নিয়ে চলে যান। মা মনসা ধুপধুনো পেলেনই খুশি (যদিও অন্তত মনসাপূজায় ধুপধুনো চলে না, ঝাড়খণ্ডে এটি অপবিহার্য উপকরণ), নবসিংবীর কডবার আঘাত পেলেন খুশি, সরাসরী দেবতাব প্রযোজন বসবাব জন্তু সর্কটক শিমুল দণ্ড, বিভূতিব জন্তু আগুনের ফুলকি মেশানো ছাই, আর এক কলকে গাঁজা; বাঘুং দেবতাব জন্তু ছাই কাঁচা বক্ত, একটি জ্যান্ত মূবগী যাব ঘাড় ভেঙে বাঘুংবীর তাজা গবম বক্ত খান। দেবতা বিদায় নিলেই ঝুঁপাবের অন্তষ্ঠান শেষ হয়।

॥ তিন ॥

মন্ত্র গান

মন্ত্রকেও আমবা গান হিসাবে উল্লেখ কববাব পক্ষপাতী। একটি বিশিষ্ট সুরে কখনো বাগ্মন্ত্র ছাড়াই, কখনো বা ঢাকী কিংবা ডম্বরুর তালে তালে,

মন্ত্ৰোচ্চারণ কৰা হয়ে থাকে। তবে ঝাড়ফুক কববার সময় ঢাকীব বাবহার হয় না। এগুলোকে গান হিসাবে স্বীকাৰ কৰ হোক বা না হোক এগুলো যে লোকসাহিত্যেৰ উপকরণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এগুলোর যে তেমন কিছু সাহিত্য মূল্য নেই, তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না। কাব্যরস কিংবা জীবন-বসেৰ দৰ্শনলাভ মন্ত্ৰতন্ত্ৰে একেবাবে বিবল বলা যেতে পারে। মন্ত্ৰ ঝাড়ফুক হিসাবেৰ সাধাৰণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অস্পৃশ্য, কু-নজব, মাৰণ-উচাটন ইত্যাদি ক্ষেত্ৰে এৰ প্ৰয়োগ থাকলেও সপৰ্দশনেৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰেই এৰ মুখ্য প্ৰয়োগ লক্ষ্য কৰা যায়।

তেৰোই জ্যেষ্ঠ বোহিনেৰ দিনে মনসাৰ পূজা কৰে কাঁপবৈজ্ঞ বা ওঝাবা 'চেলা বসায়' বা শিষ্য নিয়োগ কৰে। প্ৰতি সন্ধায় মন্ত্ৰ শেখানো হয়, প্ৰতি মঙ্গলবাৰ পূজা কৰা হয়। ওঝাদেৰ ঝাড়গণ্ডে 'গুণী' বলা হয়। এই গুণীদেৰ ক্ষমতা অসীমিত বলে জন মানসে সন্ত্ৰম এৰ আতঙ্ক দুটোই তারা সৃষ্টি কৰে থাকে। গুণী উপযুক্ত শিষ্যকে মন্ত্ৰদান কৰে থাকে। শিষ্য তাৰ গুৰুৰ অন্তৰ্ভূত না পলে ভবিষ্যতে গুৰুগিৰি কৰতে পারে না। গুৰু শিষ্যদেৰ প্ৰতি সন্ধায় আশুভায় তুলসীমঞ্চেৰ সামনে ডুব্ব হয়ে বসে তুকতাক, ঝাড়ফুক, মন্ত্ৰতন্ত্ৰ আদি সন্ত্ৰে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এইসব মন্ত্ৰেৰ মধ্যে সৰ্পমন্ত্ৰেৰ পৰিমাণই সৰ্বাধিক। সপমন্ত্ৰ ছাড ৩ বিনী যোগিনী মন্ত্ৰ, গা-বীধা, জব ঝাড়া, কুনজব ঝাড়া, ধুলো পড়া, হুন পড়া, বাটি চালা, তেল দেণা, চালন কাটা আদি অসংখ্য ধৰনেৰ মন্ত্ৰ শিক্ষা দেওয়া হয়। এ-ছাড়াও নানান তুকতাক, ভোজবাজি, ওষুধপত্ৰও শেখানো হয়। ঝাড়ফুক কৰবাৰ ধৰন-ধারণ, বোগীৰ রোগনিৰ্ণয় আদি টোটকাও শেখানো হয়।

মন্ত্ৰগুলো কখনো মনে হয় অৰ্ধহীন প্ৰলাপ, কখনো মনে হয় নিছক পছোব পদ মাত্ৰ। ছড়াৰ সঙ্গে মন্ত্ৰেৰ, অন্ততঃ বহিবন্ধে, যথেষ্ট মিল দেখা যায়। প্ৰায় ক্ষেত্ৰেই মন্ত্ৰগুলো ছড়াৰ ছন্দে বচিত হয়েছে। ছড়াৰ মতেই মন্ত্ৰগুলো সংগতিহীন, চিত্ৰেৰ পৰ চিত্ৰ মন্ত্ৰকেও চিত্ৰময় কৰে তুলেছে। ছড়া শিশুদেৰ জন্মই মূলতঃ রচিত কিন্তু মন্ত্ৰ এক শ্ৰেণীৰ বয়োপ্ৰাপ্ত লোকেৰ জন্ম রচিত। ছড়া নিছক মনোৰঞ্জন বা নিশ্চাকৰ্ধণেৰ জন্ম ব্যবহৃত হয়ে থাকে; মন্ত্ৰেৰ ব্যবহার কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভিন্ন কাৰণে—বোগ-শোক, সৰ্পদংশন আদি দুঃখকষ্ট নিৰাময়েৰ জন্মই মন্ত্ৰেৰ ব্যবহার হয়ে থাকে। মন্ত্ৰেৰ নায়ক-নায়িকা সাধাৰণতঃ কখনো লৌকিক কখনো বা পৌৰাণিক দেবতা, এ ছাড়া ডাকিনী-যোগিনী



ভূত-প্রেতঃ সর্গোরবে স্থান পেয়ে থাকে, কিন্তু ছড়ার নায়ক সব সময়েই শিশু বললে অত্যাঙ্কি কবা হয় না—লৌকিক প্রাণীই তার উপজীব্য হয়ে থাকে। ছড়াব সাথে মন্ত্রের মৌল পার্থক্য এই যে, মন্ত্র আচার-ধর্মী রচনা, মৌখিক ধারায় প্রচাৰ এবং শ্রুতি স্মৃতিতে এর শিক্ষা এবং সংবক্ষণ, একটি শব্দও এর পাবিবর্তন কবা চলে না; মন্ত্র প্রতিনিয়ত বচিত হয় না—আজি-কালের বচনাই আবহমানকাল ধরে চলে আসছে; মন্ত্রের গোপনীয়তা একটি প্রধান ধর্ম; মন্ত্রের প্রতি কেমন একটা সশ্রদ্ধ ভয় লক্ষ্য করা যায়, মন্ত্রকে লিপিবদ্ধ কবার কথা অভাবনীয় ব্যাপাব, তাতে গোপনীয়তা নষ্ট হবাব আশঙ্কা পাকে—মন্ত্রের গোপনীয়তা নষ্ট হলে তাব কাযকারিতাও নষ্ট হয়, যেমনটা হয় মন্ত্রের শব্দ পাবিবর্তিত হলে, তবে একান্তই যদি লিপিবদ্ধ কবতে হয়, তবে তা াল কালিতে লিপিতে হবে এবং সংগোপনে রক্ষা করতে হবে। ছড়া কিন্তু আর্দৌ আচার-ধর্মী বচনা নয়; অপাবিবর্তনীয়তা কিংবা গোপনীয়তা ছড়ার ধর্ম নয়, ববং শ্রুতিস্মৃতি পাবিবর্তনশীলতাব মধ্য দিযেই ছড়াব প্রাণময়তা প্রকাশ পায় এবং সশব্দ উচ্চাবণে তার সজীবতা হ মূত হয়ে ওঠে, মন্ত্রের মতো ছড়ার কোন তুক্রতাক কাযকারিতা থাকে না, ছড়ার রচনা কোন কালে সীমাবদ্ধ থাকে না, ছড়া সব সময়ই বচিত হয়, তাই ছড়াব ভাবায় বক্ষণশীলতা মোটেই দেখা যায় না, যা মন্ত্রেব একটা অপাবিহায় ধর্ম।

মন্ত্রগুলোর মধ্যে পৌবাণিক দেবতাব প্রসঙ্গকথা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। বামলক্ষণ-শিব-কৃষ্ণ মনসা-কামরূপ-কামাখ্যা সবাব প্রসঙ্গই আছে। কিন্তু কোন প্রসঙ্গে কোন দেবতাব স্মরণ নেওয়া দবকাব তা এই মন্ত্রশ্রষ্টাদেব যে ভালোভাবেই জানা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলার সীমান্ত অঞ্চল-গুলোতে এবং ঝাড়খণ্ডে একই ধরনের মন্ত্রগান প্রচলিত। সীমান্ত অঞ্চল-গুলোতেই এখনো আদিম জীবনের স্পন্দন পাওয়া যায়। অলৌকিকতাব প্রতি আকর্ষণ, কুসংস্কাবের মধ্যে জীবনের উপলব্ধি এখনো অনগ্রসর আদিম সমাজেব মধ্যেই লক্ষ্যগোচর হয়। মন্ত্রের মধ্যে ঐশ্বরজালিক ক্ষমতাব অস্তিত্বেব বিশ্বাসে তাই ঝাড়খণ্ডী জনমানস এখনো পরিপ্লুত হয়ে আছে।

প্রথমে গা বাঁধার একটি মন্ত্র। এই মন্ত্র আউড়ে 'গা বাঁধলে' ভূত-ডাইনী-অপদেবতার নজর লাগে না, সাপে কামড়ায় না।

১ আয়া বন্দি মায়া বন্দি, সগ্গে পাতালে ব্রহ্মা বন্দি। ফলস্তি নজব বন্দি, ফলস্তি মুখ বন্দি। এক খাড চৌবাশি বাণ, মা ভবানী মড্ডা পান। কে

গা বাঁধে ? গুরু বাঁধে । গুরুর আজ্ঞায় আমি বাঁধি । কার আজ্ঞায় ?  
সীতা শিরামের আজ্ঞায় শিগ্গি লাগ ॥

মন্ত্রটির ধারাবাহিক অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন । নিছক শব্দের পব শব্দ, পঙক্তির পব পঙক্তি যেন বহুতা ধারায় সাজানো হয়েছে । ছন্দ আছে, ছন্দ মিল আছে—কিন্তু অর্থের কোন সংগতি নেই । লক্ষণীয়, ২৪টিতে সীতা শ্রীবামের দোহাই দেওয়া হয়েছে । নিচের কু-নজব ঝাড়বাব ‘কু-কাটা’ মন্ত্রটি মুসলমানী মন্ত্র, মুসলমানের আল্লা বা গোদাব দোহাই দিয়ে মন্ত্র পড়লে হিন্দুব কু-নজব নাকি তক্ষুনি নষ্ট হয়ে যায় ।

২ মুসলমান কাটে সূতা উপবে ডাঠে থি । তাব তলে বসে পেঁচুয়া ককস  
কি ॥ আন রে ঝাটাব গাছি পুঠে কবি পাব । ছাড বেটা চোবা পাঁচু হুকুম  
আল্লাব । খোদাব দোহাই তোকে ছাড এইবাব ॥

মন্ত্রাচাবেব প্রধানতম বিষয় সর্পমন্ত্র । সর্পদংশন নিবারণ এবং বার জন্ম সাপেব মুখবন্ধনের মন্ত্র আছে, দংশনে উদ্ধৃত সাপ এম মন্ত্রোচ্চারণেব ফলে নিশ্চল হয়, দাঁতে দাঁত লেগে তা মুখবন্ধ হয় বলে লোকবিশ্বাস আছে ।

৩ টিল্হাব মাটি দেবীব বাট, লাগ সাপাকে ঠটে ঠটে দাত । আব গায় না  
ফুটে দাঁত, হাত বাড়াইছে শিবশঙ্কব নাথ । হাত বাবং লুহা জাবং, সাপ-  
সাপিনীকে অধীন কবং । কি গাবি বে সাপা ? হাতে আছে দেবী ধর্মেব  
পা । জিব্ভা তোব হোক অসাড়, দোহাই রাজা গোবিন চাঁদ । মুখে  
আশি বঁদ আব বঁদ বিবেব লনী । হা হা কব্যে খা’ম না মুখে, রাজা বন্ধেব  
দুহাই তকে । থাক সাপা নিশ্চলে, মুখ বান্দ্যেছি লুহাব শিকলে । কাব  
আজ্ঞায় ? মা মনসাব আজ্ঞায় ॥

মন্ত্রটিতে অহুস্বারেব প্রয়োগে সংস্কৃত-গন্ধ এনে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি প্রয়াস লক্ষণীয় । মন্ত্রের সাহায্যে সাপেব ঠোঁটে ঠোঁটে দাঁত লাগানো, দংশনেও দাঁত না-ফোটা, সাপেব জিহ্বা অসাড় কবে দেওয়া এবং তাকে নিশ্চল কবে দেওয়া এর আসল উদ্দেশ্য । সর্পমন্ত্রে মনসাব দোহাই দেওয়া বা আজ্ঞা পাড়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার । এখানে রাজা গোবিন চাঁদ এবং রাজা বন্ধেব দোহাই দেওয়া হয়েছে—এই দুই রাজা কাবা ? মন্ত্রের মধ্যে লৌকিক বা পৌরাণিক যে-সব দেবতার দোহাই দেওয়া হয়ে থাকে—তার মধ্যে এই দু’টি নাম বিরল-দর্শন বললেও চলে । সর্পদংশনের পর নানা ধরনের সর্পমন্ত্র অংগুড়ে বিষমুক্ত করার চেষ্টা করা হয় । ‘উড়ান মন্ত্র’ আউড়ে ফুঁ দিলে বিষ নাকি উড়ে যায় ।

৪ বায়বরনী ইঞ্জের বরিশয়ে জল, একখানি ঘরে বিষ আছে থরথর। আন্তে বসিলে যার কাছে, সকল শূনের বিষ উড়িল বাতাসে। আন্ত বলে আমি কিছুই না জানি, কন ঘরে বিষ তুমার কন্ ঘরে পানী। আন্ত বসিল যার কাছে। সকল শূনের বিষ উড়িল বাতাসে। চন্দিমা পূর্ণিমা ঘোল কলায় সম্পূর্ণ, হর হর বিষ তুই কুইলী বর্ণ। বসিতে ছগ্নর বিষ জুহু বায়, শিমুলের তুলা যেন পবনে উডায়। উড়িল বিষ পড়িল বায়, চাঙপ্রিঃ বিষ নাই অমকার গায়। সবাই বল হরি হরি সে মুগল, বিষ কবি কুগল। বসন্ত বিষ করি ধারা, অবে বিষ তুই হবি শঙ্কে ভণ্ড কুশলা হরি হবি সবাই বল মুখে, হরি শঙ্কে বিষ নাই এ তিন ভুবনে ॥

সর্পদংশনের বিষ ঝাড়বাব মন্ত্রের সংখ্যা অসীমিত। যে কোন পৌৰাণিক চবিত্তে যে-কোন সময় এইসব মন্ত্রে আবির্ভূত হতে পারে। নিচের মন্ত্রগুলোতে সখীসহ রাধার প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আছে গরুড়, গোবিন্দ আদির উল্লেখও।

৫ সাত শিম'লেব আগে বাস্কা, তাহ বশ্বেছে গডুব পাখ্কা। যখন গডুব লক্ষ্মে বস্পে, ঞ্ঠাঙ্কেব বিষ থবহবি কস্পে। আষ বিব তুই উচ হতে, নাম, বিষ তুই নিচ হতে। কাব আজ্জায় ? গডুব গবিন্দেব আজ্জায় ॥

৬ বিনদিনী বাই, পূর্ণমাসী বঙ্গে নয়ে সূষপূজা যাঠ। সূষেব মন্দিবে তুমবা বস পূর্ণমাসী, সখী সঙ্গে নানা সঙ্গে পুপ তুলে আসি। হাঁসিতে খেলিতে পেল যবুনাব জলে, জলে ছিল কাল সাপ দংশিল চবণে। চলিয়ে পড়িল বাধে নাইপ চেতনে। তপনি যে ললিতা কন বুদ্ধি করিল। হাঁসিতে হাঁসিতে বিষ বাউ-এ উডাইল। কাব আজ্জায় ? মা মনসাব আজ্জায় ॥

এতক্ষণ পযন্ত যে-সব মন্ত্র উদ্ধৃত করা হল, সেগুলোতে জীবন সম্পর্কিত কোন প্রসঙ্গ নেই। শুধু তাই নয়, এ-গুলোর মধ্যে কবিত্ববসও ত্রিমীরীক্ষ্য বললে অত্যাুক্তি করা হয় না। স্বভাবতঃই এগুলো সাহিত্যগুণবিবর্জিত। মন্ত্র আচাৰবর্মী হওয়ায় কিছুটা বক্ষণশীলতা বজায় থাকে। তাই ভাষা-তত্ত্বের দিক দিয়ে মন্ত্রেব গুরুত্ব আছে। মন্ত্রেব মধ্যে বামসার, কৃষ্ণসার, শিব চিয়ান আদি মন্ত্রগুলো অত্যন্ত বিখ্যাত। খ্যাতিমান এনং শিক্ত গুণাধেব অধিকারেই সাধারণতঃ এই সব মন্ত্র আত্মপোপন করে থাকে, বলতে গেলে এগুলোই তাদের অলৌকিক ক্ষমতার চাৰিকাঠি। এই সব মন্ত্র অনেকটা পালার মতো হয়ে থাকে এবং এগুলো সাখী গান হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এখানে 'শিব চিয়ান' মন্ত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

ভূমস্তকে বিষ মাহাদেব মথন করিল, অকুটা কলাব পাত আনিয়া বিষ রাখিল। অতি যতন কব্যে বিষ চা'র ভাগ কবিল, এক ভাগ বিষ মাহাদেব নাগগণকে দিল। একভাগ বিষ মাহাদেব খড়ি পিপড়িকে দিল, একভাগ বিষ মাহাদেব গরু মাল্লুকে দিল। একভাগ বিষ মাহাদেব বাঁচায়ের রাখিল। হাঁসিয়ে খেলিয়ে মাহাদেব স্নান কবিতে গেল খিরাই নদী'র কূলে। জয়বিজয় দুটি ঢাক বাজিতে লাগিল, বিষকে অমৃত বলে মাহাদেব ভক্ষণ কবিল। কি কব কি কব মামী নিশ্চিতে বসিয়ে, মামা শিবশঙ্কর নাথ ঢলে পড়েছে গবল বিষ খেয়ে। বঙ্গ না কর ভাগিনা না কব তামাসি। তো'র মুণ্ড খাই গো মামী গণেশে'র মুণ্ড হাত, সত্য ঢলেছেন মামা শিবশঙ্কর নাথ। ডান হাতে অমৃতের ডালা বাঁ হাতে সিঁড়বে'র কাঁটি, হাঁসিয়ে খেলিয়ে দুর্গা পোহাইল বাতি। বাজি পোহাইল দুর্গা'র পড়ে গেল মনে, উঠ উঠ নাবদ ভাগিনা ঘুমে অচেতনে। তোমবা শ্রীন ভাগিনা সজ্জাকে যাও, সিজ্জায় আছে কে, পছমা কুমাবী। অহোভং চিয়াও চা, যেই চিয়ানে চিয়ায়েছে বালা লখিন্দব। সেই চিয়ানে চিয়াও অমকাব কাল ঘুম। কাল বেকাল চক্ষুর চাঁদ, নামে দিশ বিষ দেখুক জগৎ সংসার। বড ঘবেব বউ জলকে যায় কাঁখে কুস্ত কবি, অমাকব দেব কালকুটের বিষ হল্য গঙ্গাব নানী ॥

বলাবাহুল্য, সর্পদংশনের বিষ ঝাড়া'র শেষ মন্ত্র এই চিয়ান মন্ত্র। মৃত লখিন্দর একদা এই চিয়ান মন্ত্রেই নাকি পুনর্জীবন লাভ কবেছিল। তাই এই চিয়ান মন্ত্র ব্যর্থ হলে বোগীব জীবনের আশা ছেড়ে দিতে হয়।

॥ চার ॥

সাথী গান

সাথী গান আসলে মন্ত্রই। প্রধানতঃ কাঁপান জলে'র ঘাটে বয়ে নিয়ে যাবার সময় এবং ফেরার সময় এই সাথী গান গাওয়া হয়ে থাকে। সাথী গান কাঁপানের সঙ্গে জড়িত বলে সংক্ষেপে কাঁপান সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। কাঁপান শব্দটি সংস্কৃত 'ষাপ্যান' থেকে উদ্ভূত। অর্থ, মনুষ্যবাহিত

যান। শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসাপূজার সময় এবং আশ্বিন সংক্রান্তি বা ডাক সংক্রান্তির সময় ঝাড়খণ্ডে কাঁপান অহুষ্ঠিত হয়। গুণী কাঁপানের ওপর বসে এবং শিগ্গা বা চেলাবা তাকে কাঁপানসহ পুকুর ঘাটে বয়ে নিয়ে যায় এবং স্নানপর্ব শেষ হলে আবার গুণীর গৃহে তাকে বয়ে নিয়ে ফিবে আসে। ঝাড়খণ্ডের বহুস্থানেই এখনো কাঁপানের আদি রূপটি টিকে আছে। কোথাও কোথাও গরু গাড়ি ওপর ছই-এর কাঠামোব মতো কবে কাঁপানের ব্যবস্থা করা হয়। শিগ্গেবা গাড়িটি টেনে থাকে। সাধারণতঃ বেদে এবং যুনিয়া সম্প্রদায়ের গুণী বাহ কাঁপানে চড়ে থাকে। তবে ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। কাঁপান বাশ দিয়ে তৈরী করা হয়, অনেকটা গরুর গাড়ি 'খাঁচা' বা ছই-এর মতো এর গড়ন। গুণী এই কাঁপানের ওপর দু'পাশে দু'টি পা ঝুলিয়ে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়াব মতো চড়ে থাকে। চেলাবার কোণে কাঁধ দিয়ে পালকির মতো কবে গুণীকে তাব বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে জলাশয়ে যায়। গুণীর মাথায় সাপ, কাঁবে সাপ, উপবীতের মতো কবে জড়ানো বুকব ওপব সাপ। বলা বাহুল্য, সবি খাবিস সাপ। তেবোই জ্যৈষ্ঠ রোহিনের দিন জমি খেবে তুলে-আনা ধুলো মাটি মস্তপুত কবে বাকি চেলাবা ওঝার গায়ে ছুঁড়ে মাবে, ওঝার গা ধুলোয় ছেয়ে যায়। তাই বলে বিষধর সাপগুলো ছোবল মাবে না, এমন কথা নেই। ওঝারা এ-ব্যাপারে অত্যন্ত হুঁসিষাব। কাঁপানের দিন সকাল বেলা সাপগুলোব বিষদাঁত ভেঙে ফেলা হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে, বিবেব জালায় ওঝাকে চলে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু কাঁপান বন্ধ বাথা হয় না। ওঝা বলে, 'চলুক কাঁপান, বাজুক ঢাক।' ঢাক আবো গুরু গন্তীব আওয়াজ তুলে বাজতে থাকে, 'পাট চেলা' (প্রধান শিগ্গা) ওঝাব জায়গায় গিয়ে উঠে বসে। দুর্ঘটনাব কাবণ হিসাবে ওঝা বিশ্বাস কবে যে অগ্র কোন গুণী বা ওঝা 'চালন' কবেছে অর্থাৎ মস্ত আউড়ে সাপগুলোকে উত্তেজিত কবেছে। চতুর্দিক শিগ্গাদের কঠোচ্চাবিত সর্পমস্ত্রের সম্মিলিত ধ্বনিত্তে শব্দিত হয়ে ওঠে। লুকিয়ে-থাকা গুণীকে বাইবে বেবিষে এসে মস্ত-শক্তির পরীক্ষার জন্য হৃদয়বুদ্ধে আহ্বান জানানো হয়। অনেক সময় অঙ্গীল এবং খেউড় মস্ত আউড়ে প্রতিপক্ষ গুণীকে অপমানিত কবে সবাসবি মস্ত-বুদ্ধে ডাক দেওয়া হয়। জলাশয়ে যাতায়াতের পথে এই মস্তই গান করে থাকে শিগ্গেবরা, মনসা-মঙ্গল গানের জাতের মতো এর সত্ত্বেও বোগ করা হয় ধ্রুপদ বা ধুয়ো।

এই গুলোকেই সাথী গান বলা হয়। অনেক সময় ছু'পক্ষের গুণীয় মধ্যে ঘোর মন্ত্র-যুদ্ধ লেগে যায়। প্রতিপক্ষের প্রশ্নের জবাব গুণীকে দিতেই হয়, না দিতে পারলে পূজার ঘট নেবার কোন অধিকার তার থাকে না। এই প্রশ্নোত্তরের মন্ত্রগুলোও সাথী গান। শুধু তাই-বা কেন, মনসামঙ্গল গানের ফাঁকে-ফাঁকে 'ঢাকী' বাজিয়ে তালে তালে সুরে-সুরে যে-মন্ত্র আওড়ানো হয় তাকেও সাথী গান বলা হয়। মনসাপূজার সময় দর্শকদের এই সাথী গান গেয়েই সাপের খেলা দেখানো হয়ে থাকে। এমন কি জীবিকার উদ্দেশ্যে বেদেরা গৃহস্থের ঘবে-ঘরে সাপের খেলা দেখাবার সময় মনসা-সংক্রান্ত গান কিংবা সর্প-মন্ত্র গেয়ে থাকে। ওগুলোকে সাপ-খেলানোর গান বলা যেতে পারে। 'আসলে কিন্তু ওগুলোও সাথীগান ছাড়া কিছু নয়। মন্ত্র সাধারণতঃ সরবে উচ্চারিত হয় না; মন্ত্র যখন সরবে উচ্চারিত হয়, তখন তাকেই সাথী গান বলা হয়। মন্ত্রের মতো ওগুলোতেও কাব্যরস তেমন দানা বাঁধবার অবকাশ পায় না।

মিচের সাথী গানটি 'ধানসার' শ্রেণীর একটি সর্পমন্ত্র। এর বিষয়বস্তু হল, নীলকণ্ঠ মহাদেবকে বিয়ের করালগ্রাস থেকে মনসা কর্তৃক উদ্ধারের কাহিনী। প্রসঙ্গক্রমে মনসার ক্ষুদ্র উক্তি থেকে তাঁর এবং দুর্গার মধ্যে ঘোর বিরোধের আভাসও মেলে।

১ বিষ্ণু পেয়ে মহাদেব হলেন অচেতন ! বেড়ি যত দেবগণ করেন রোদন ॥  
 ব্রহ্মা কান্দে বিষ্ণু কান্দে কান্দে যোগতিপি । নন্দীভৃঙ্গী কান্দে আর লক্ষ্মী  
 সরস্বতী ॥ ক্রন্দন শুনিয়া ব্রহ্মার বুদ্ধি উপজিল । নারদ মুনিকে তখন স্মরণ  
 করিল ॥ ধ্যানেন্তে বসিয়াছিল নারদ মহাঋষি । ব্রহ্মার নিকটে মুনি উত্তরিল  
 আসি ॥ ব্রহ্মা বলেন শুনহ নারদ উপোধন । সিজুয়া পর্বতে শীঘ্র করহ গমন ॥  
 সিজুয়া পর্বতে আছেন জয় বিষহরি । তিনি আইলে সদাশিব জিয়াইতে  
 পারি ॥ এতেক শুনিয়া মুনি ব্রহ্মার বচন । সিজুয়া পর্বতে শীঘ্র করিলেন  
 গমন ॥ সিজুয়া পর্বতে আছেন জয় বিষহরি । তথায় গেলেন মুনি অতি দ্বর  
 করি ॥ কি কর কি কর দিদি নিশিচ্ছে বসিয়ে । বিস খেয়ে মহাদেব পড়েছেন  
 চলিয়ে ॥ অমৃত মথনে কাল গরল উঠিল । সৃষ্টিবক্ষা করিবারে দেব গরল  
 ভক্ষিল । ঝাঁট করি চল দিদি উঠি দ্বর করি । এত শুনি রুধিলেন জয় বিষহরি ॥  
 না যাব তথায় আমি শুন মুনিবরে । হেমন্ত ঋষির কন্যা আছে তথাকারে ॥  
 হেমন্ত ঋষির কন্যা বড়ই অহঙ্কারী । সদাই বলিয়া থাকে বাপ-ভাতারী ॥

বাপের নাহিক দোষ কিদোষিব তায় । অবশ্য ঘাইব আমি দেবের সভায় ॥  
এত বলি চলিলেন আন্তিকের মাতা । বিষ খেয়ে মাহাদেব চলিয়াছেন  
যথা ॥ শুভ্র বরণ খান দেবী হাতে করি নিলা ।...খানের ঘায় বাপ চিয়াও  
বলে দস্তবাণী । কালকূট সাপের বিষ খানের ঘায় পানী ॥ মাংস গলিত  
করে হাড়ে করে বাসা । খেদাড়িয়ে দাও বিষ বলেন মনসা ॥

পরবর্তী সাথী গানটির বিষয়বস্তু সমুদ্রমস্থন ।

২ দুর্ভাসার শাপে লক্ষ্মী হইল চঞ্চলা । সাগর প্রবেশে লক্ষ্মী ইন্দ্র হৈল ভলা ॥  
হত লক্ষ্মী স্বর্গপুরে ভাবয়ে যাদব । মন্ত্রণা করয়ে স্বর্গে লইয়া কেশব ॥ সাগর  
প্রবেশে লক্ষ্মী আছয়ে বিশ্বয় । সাগর মস্থিবে লক্ষ্মী জানিহ নিশ্চয় ॥ এত  
বলি অনন্তকে ডাকি চক্রপাণি । মস্থ হ সাগর আজি কৈল দৈববাণী ॥  
তেত্রিশ কোটি দেবতা যার বচন পূবন্দর । সাগরমস্থনে তারা হইল তৎপর ॥  
মন্দার পর্বত আনে দেবগণ ঋষি । পর্বত চালনে বিষ ভূমে পড়ে খসি ॥  
পঞ্চাশ যোজন গিবি নড়িতে না পাবে । শ্রমভাবে অনন্ত লাগ গবল  
উদ্গারে ॥ বিষভাবে ধুম উঠিল আকাশে । জলজন্তু মবে কত মস্থনেব ত্রাসে ॥  
কুয়াশে ঢাকিল মহী হৈল অন্ধকার । ঐরাবত হস্তী উঠে পর্বত আকার ॥  
বাবণ দেগিয়া হ্রদ আনন্দিত হইল । পাবিজাতসহ হ্রদ হস্তী যে পাইল ।  
আদি মস্থন শুন বিস তোমাব জনম । মড়াব অঙ্গ ছাড়ো কাল কবে  
গমন ॥

চঞ্চলা লক্ষ্মী দুর্ভাসার শাপে সাগরে প্রবেশ করলে ইন্দ্র আদি দেবগণ লক্ষ্মী-  
হীন হয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন । বিষ্ণুর সঙ্গে পবামর্শ করে অনন্তনাগকে  
মস্থনবজ্জ্ব কবে মন্দার পর্বতেব সাহায্যে সমুদ্রমস্থন করা হয় । ফলে অনন্ত  
নাগেব মুগনিঃসৃত বিষের মেঘে আকাশ অন্ধকার হয় । এই সমুদ্রমস্থনে  
বিষ এবং অমৃত দুই-ই উঠেছিল । এই সমুদ্রমস্থন থেকে ইন্দ্র ঐরাবত হস্তী  
এবং পাবিজাত পুষ্প লাভ কবে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, অল্প দিকে  
পৃথিবীর একটি বিঘাট ক্ষতিও হয়েছিল । যে-পৃথিবী বিষহীন ছিল, সেই  
পৃথিবী এই সমুদ্রমস্থনের ফলে বিষগ্রস্ত হয়েছিল । পৌরাণিক কাহিনীটি এই  
ভাবে মন্ত্র বা সাথী গান হিসাবে পদবদ্ধ হলেও কোথাও কাহিনীর রস ব্যাহত  
হয়নি-

পরবর্তী সাথী গানটি 'রামসার' নামক বিখ্যাত সর্পমন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ।  
রামচন্দ্রের জীবনকাহিনী ধারাবাহিকভাবে এখানে বিবৃত করা হয়েছে ।

৩ জন্মিলেন শ্রীরামচন্দ্র দশরথের ঘরে । উদ্ধ্বাহ করে নিত্য করে পুরন্দরে ॥  
 গন্ধর্বে গায় গীত নাচয়ে অপ্‌ছরী । যত ছিল বডাব বিষ হয়ে গেল পানী ॥  
 যে-কালেতে রামচন্দ্রের মিথিলায় গমন । পাষণ হয়েছিল অহল্যা বনের  
 ভিতর ॥ পাষণ হয়েছিল অহল্যা ছিল দৈবদোষে । মুক্তি পদ পেল রামের  
 চরণ পৌরশে ॥ ইহা শুনি যদি বিষ না নামিবে তুমি । মিথিলার গণ্ডি ভাঙা  
 সুনাইব আমি ॥ ভাঙ্গিল হরের গণ্ডী শ্রীবাম ধামুকী । পণরক্ষা করে বিজয়  
 করিল জানকী ॥ বিবাহ করিল রাম জনকনন্দিনী । শ্রীবামেব আজ্ঞায় বিষ  
 নামিল এখনি ॥ রাজা হবেন বামচন্দ্র মনে ছিল আশ । আচম্বিতে শুনি  
 রাম কি যাবেন বনবাস ॥ কাঁদেন কৌশল্যাবাণী রামের জননী । শ্রীরামের  
 আজ্ঞায় বিষ নামিল এখনি ॥ মিথিলার প্রজাগণ কবে হায় হায় । রাজ্যপাট  
 ছেড়ে রাম কি বনবাসে যায় ॥ বনবাসে যায় বাম অযুধ্যা ছাড়িয়ে । যত  
 ছিল বডার বিষ যায় পালাইয়ে ॥ চিত্রকূট পর্বতে বাম বাঁধলেন কুঁড়ে-  
 খানি । কাল হয়ে এল বাম কি সনাব হবিণী ॥ মুগ মাবতে বামচন্দ্র করিল  
 গমন । বৃক্ষ আড়ে শুকায়া, মুগনইয়ে জীবন ॥ মায়া মোহ বাণ প্রভু পুরিল  
 লক্ষ্মণ । বাণ খেয়ে মুগ ডাকে কুথা .ব লক্ষ্মণ । সেহ বাকা সীতা দেবী  
 শুনিবাবে পেল । লক্ষ্মণে ডাকিয়ে কিছু কহিতে লাগিল ॥ শুন শুন শুন ওহে  
 দেবর লক্ষ্মণ । বিপত্তো পড়িয়ে গেমায় ডাকেন নাবাষণ ॥ তোমাদেব  
 মায়া প্রভু বৃষ্টিতে না পারি । ভরত নিন রাজ্যগণ্ড তুমি নিবে নারী ॥  
 সেই বাকা শুনে লক্ষ্মণ কর্ণে নিল হাত । কটুকথা কহে গেদে সাক্ষী থাক  
 বঘুনাথ । বাম কুণ্ডলী দিবে লক্ষ্মণ কহে পুনবার । কদাচিত সীতাদেবী না  
 হইবে পাব ॥ যদি পাব হবে সীতা আপনার শুণে । অবশেষে দোধ  
 কিছু না দিবে লক্ষ্মণে ॥ বাম অত্যাধণে লক্ষ্মণে করিল গমন । যত ছিল  
 বডার বিষ নামিল এখন ॥ রাম বাণে যখন ঘোর মহারণ । শক্তিশেলে  
 পড়েছিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ কুথা আছে হতুমান পবননন্দন । গন্ধমাতনে  
 আছে বিশল্যকরণ ॥ গন্ধমাতন আনল্য বীব হতুমান । শূশঙ্কর অঝারে শুঁষধ  
 কল্প প্রাণ ॥ রাম বলে ঘরে চল ঠাকুর লক্ষ্মণ । শ্রীবামের আজ্ঞায় বিষ  
 নামিল এখন । রাম বাণে যখন ঘোর মহারণ । লক্ষ্মণ করিল তখন অমৃত  
 বরিষণ ॥ হতুমান জালিয়ে দিল পবনেব আশুনি । দিবাকর আরমি দিল  
 জগৎমোহিনী ॥ অনলের মধ্যে গিয়ে প্রবেশিল সীতা । এসে বিভীষণ  
 তখন জোড় করিলেন হাত । ই কি আশ্চর্য প্রভু দেখি রঘুনাথ ॥ শুন



রে পাপিষ্ট নাগ সীতার পরীক্ষার কাহিনী। যত ছিল বড়ার বিব হল্য গন্ধার পানী ॥

রামায়ণের মোটামুটি কাহিনীটুকু আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে স্বল্পপরিসরের মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। আবে দু'চার কলি পদ লুপ্ত হয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়, কাহিনীটি তাই কিছুটা অসম্পূর্ণ মনে হয়। তবে রামায়ণের প্রধান ঘটনাগুলো স্বল্পায়তনের মধ্যেও স্থান পেয়েছে। শ্রীবামচন্দ্রের জন্ম-কথা, পাশাণী অহল্যা উদ্ধার, মিথিলায় হরধনুভঙ্গ এবং সীতাকে বিবাহ, রাজ্যভিষেকের প্রাকালে রামচন্দ্রের বনবাস, স্বর্ণমৃগকথা ও সীতাহরণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, রামরাবণের যুদ্ধ, সীতাউদ্ধার ও সীতাব অগ্নিপরীক্ষা সমস্ত উপাখ্যানই এই 'রামসাব' মন্ত্রটির অন্তর্গত হয়ে আছে। রামায়ণেব কাহিনীর রস এর ফলে মোটেই বিকৃত হয় নি, বরং দু'চার কপায় যে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে এই কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে, তা আমাদের বিশ্বয়ের উত্থেক করে।

পরিশেষে 'কৃষ্ণসার' মহামন্ত্রেব সাথী গান।

৪ সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ জমুনাব তীরে। নানান কোঁতুকে কাহু বনে বনে ফিরে ॥  
 ব্রজবালক সঙ্গে যত সিদাম সুদাম। কহ কৃষ্ণ মহাবল ভেয়া বলরাম ॥  
 উর্জ্জল ককিলার জল শ্রীমধুমঙ্গল। কৃষ্ণের স্মরণে বিখ যায় রসাতল ॥  
 বনে-বনে সখা সনে করেন গোচারণ। এক কথা আচম্বিতে হইল স্মরণ ॥  
 কানাই ডাকিয়া বলে গুন অরে ভাই। তুষ্টাতে আকুল চল জল খাইতে  
 যাই ॥ পলস্বারির বচনে পলায় সব পাল। যায়রে কালকূটের বিষ সপ্ত  
 পাতাল ॥ কাহু গেলেন খেহু নয়ে কালিদহের কূলে। কমল দেখিয়া  
 সব পড়ে গেল ভুলে ॥ তবে হাঁসন চান কৃষ্ণ বলরামের পানে। কৃষ্ণের  
 মনের কথা বলরাম জানে ॥ কানাই ডাকিয়া বলে দাদা রে বলাই। তুমি  
 আঞ্জা দেঅ পুষ্প তুলিবারে যাই ॥ কৃষ্ণের বচনে পলস্বারি দিল সায়া।  
 কমল তুলিতে কৃষ্ণ সাজিলেন স্বরায় ॥ কালিদহের কূলে রে কদম্ব শিশুগণ।  
 তার ডালে উঠিলেন শ্রীনন্দের নন্দন ॥ বাঁপ দিয়ে পড়েন কৃষ্ণ কালিদহের  
 জলে। কৃষ্ণকে বেড়িল যত নাগিনী সকলে ॥ দমকয়ে নাগিনী সব  
 কৃষ্ণের শরীরে। কৃষ্ণের স্মরণে বিষ অন্তরীক্ষে উড়ে ॥ কালিদহে ডুবিলেন  
 নন্দের নন্দন। তা দেবে আকুল হল সব শিশুগণ ॥ আর কে করিবে  
 রক্ষা দাবা অগ্নি হতে। আর কেবা খুদা পেলে এনে দিবে খেতে ॥

এবোল বলিয়া শিশু খুলিতে নটায়। কুষ্টির স্বরণে বিষ বাউ-এ উড়ে যায় ॥ বলরাম ডেকে বলে শুন অরে ভাই। ত্বরা করি কহ গিয়া জননীর ঠাঁই ॥ এবোল বলিয়া শিশু উদ্ধমুখে ধায়। নয়নের জলে পথ দেখিতে না পায় ॥ হেথা যশোমতি দেবী ব্যাকুল অন্তরে। কেঁদে কেঁদে এসে শিশু দেখে কত দুরে ॥ নিকটে আসিল তখন রোহিনীনন্দন। মররে কালকূটের বিষ ফুঁয়ে করি জল ॥ কেঁদে কেঁদে বলে শিশু শুন অগ মা। কালিদহে ডুবিলেন প্রাণের কানাই ॥ হেথা যশোমতি দেবী উদ্ধমুখে ধায়। কুথা ছেড়ে গেলে বাছা অভাগিনী মায় ॥ ললিতা বিশাখা রাখা করে হায় হায়। কুষ্টির স্বরণে বিষ বায় উড়ে যায় ॥ মনে বিচারিল তখন রোহিনীনন্দন। কণ্ঠপতনয় গড়ুরে করিল স্বরণ ॥ গড়ুর গড়ুর বলে ডাকিতে লাগিল। কুশম্বীপে গড়ুর বীরের আসন টলিল ॥ আসন টলিল বীর ভাবে মনে মনে। সংকটে পড়িয়া মারে কে করে স্বরণে ॥ এ বোল বলিয়া বীর বসিল দিয়ানে। দিয়ানে জানিল বীর সব বিবরণে ॥ কালিদহে ডুবেছেন নন্দের নন্দন। তেজস্বরে আমারে ডাকেন সংকেষ্টান ॥ কুষ্ঠকে দংশিল কালী এত অহংকার। আজ যে করিব চূর্ণ কালীর অহংকার ॥ এবোল বলিয়া বীর ধায় মহারোড়ে। মেঘ খান খান হয় নিঃশ্বাসের ঝড়ে ॥ দাণ্ডাল গড়ুর বীর কালিদহে আসি। অচেতনে পড়ে সব যত ব্রজবাসী ॥ ললিতা বিশাখা তারা যত ব্রজবাসী। উর্জস্বরে কান্দে তারা কালিদহে আসি ॥ যশোমতি বলে কুথা গেল লীলমণি। উঠ বাছা পাওয়াতে এসেছি ক্ষীর ননী ॥ ললিতা বিশাখা রাখা করে হায় হায়। কুষ্টির স্বরণে বিষ বায় উড়ে যায় ॥ মনে-মনে ভাবে বীর কি করি উপায়। কালিদহের জল পরশিতে না জুয়ায় ॥ এ বোল বলিয়া বীর পাকসাট মারে। কালিদহের জল সব উড়াইল ঝড়ে ॥ ভয়ে ত্রাসে লিল কালী কুষ্টির স্বরণ। গড়ুর বলিয়া কুষ্টি দিলেন আলিঙ্গন ॥ প্রাণ দান দেও বাছা এ কালনাগিনী। আজ হতে তুমার নামে বিষ হবে পানী ॥ চেতন পাইল যদি নন্দের নন্দন। চেতন পাইয়া উঠে সব শিশুগণ ॥ বাহ পসারিয়া রানী পুত্র নইল কোলে। লক্ষ লক্ষ চুষ দিল বদন কমলে ॥ কুষ্ঠকে দেখিয়া সবার আনন্দিত মন। কুষ্টির স্বরণে বিষ বায় রসাতল ॥

কালীয়দমন এই সাধী গানের বিষয়বস্তু হলেও প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে এর

অসামঞ্জস্য সহজেই নজবে পড়ে। প্রচলিত কাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কালী নাগের দমনকার্ণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ নাগের দংশনে বিষের জ্বালায় অর্চৈতন্য হয়ে জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিলেন; নিরুপায় বলরাম গরুড়ের স্মরণ করলে গরুড় এসে শ্রীকৃষ্ণকে জলের তলা থেকে উদ্ধার করে বিষমুক্ত কবে।

সাথী গানে বিধৃত কাহিনীটি এই : শ্রীদাম, সুদাম, বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গিয়েছিলেন। তখন তাঁরা সবাই নিতান্ত শিশু ছিলেন। যমুনার তীরে খেলাধুলো করে ক্লাস্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। তখন দাদা বলরামের কথামতো সবাই জল খাবার জগ্ন কালিদহেব কূলে উপস্থিত হল। কালিদহে পদ্মফুল ফুটে থাকতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণার কথা ভুলে গেলেন। বলরামের অনুমতি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ফুল তুলতে গেলেন। তীব্রতরী কদম্ববৃক্ষের ডালে উঠে শ্রীকৃষ্ণ জলে লাফিয়ে পড়লেন। অমনি চাবপাশ থেকে নাগিনীরা তাঁকে ঘিরে ধবে দংশন করতে লাগল। বিষের জ্বালায় শ্রীকৃষ্ণ অর্চৈতন্য হয়ে কালিদহে ডুবে গেলেন। শিশুদের মধ্যে শোকের সাগর ভেঙে পড়ল। বলরাম যশোদাকে খবর দেবার জগ্ন গোকূলে দৌড়ে গেল। খবর শুনে যশোদার প্রাণ উড়ে গেল। ললিতা বিশাখা বাধা হাহতাশ করতে লাগলেন। এমনি সময় বলরামের হঠাৎ গরুড়ের কথা মনে পড়ল। গরুড়ের আসন ছুঁলে উঠল, কৃষ্ণকে দংশন করার জগ্ন উত্তত কালিনাগকে সায়েস্তা করবার শপথ নিল সে। প্রাণের কানাই শ্রীকৃষ্ণের শোকে শিশুগণসহ সমস্ত ব্রজবাসী তখন অচেতন হয়ে পড়েছেন। গরুড় কালিদহের জল না ছুঁয়ে পাখার ঝাপটে সব জল উড়িয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধার করল; চাবপাশ যেই সে কালীনাগকে মাতে উত্তত হল অমনি শ্রীকৃষ্ণ ওকে বাধা দিলেন। গরুড়কে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণ কালীনাগকে ক্ষমা করতে অনুবোধ করলেন, বললেন, 'আজ হতে তোমার নামে বিষ হবে পানী।' শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেতনা ফিরে পেল। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে লক্ষ লক্ষ চুপনে তাকে ভবে তুলল। এই কথাবস্তুর মধ্যে নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব আছে। ঘটনার পবিত্রনায়, কাহিনী-বয়নে যথেষ্ট দক্ষতা লক্ষ্যগোচর হয়। মন্ত্র হলেও আশ্চর্য মানবিকতার স্পর্শে এই সাথী গান সাহিত্যবসসম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে। করুণ বেদনা-রসে এই সুদীর্ঘ সাথী গানটি এমনি সিন্ত হয়ে আছে যে তা আমাদের বেদনা-

পুত করে। প্রাণের কানাই যে ব্রজবাসী কতোখানি, তা শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁদের সবার হতচেতন হয়ে পড়ার মধ্যে সুস্পষ্ট। শিশুদের শোকার্ত মুহূর্তের চিন্তা—‘আর কে করিবে রক্ষা দাবা অগ্নি হতে / আর কেবা খুঁদা পেলে এনে দিবে খেতে’—কি-গভীর বেদনার অন্তর্গত উপলক্ষি, তা আবার ঘনীভূত হয় ‘নয়নেব জলে পথ দেখিতে না পায়’ পদটিতে এসে। পুত্র শোকাভুবা জননী যশোদার আর্তনাদ ‘কুখা ছেড়ে গেলে বাছা অভাগিনী মায়’ যে কোন বাস্তব মায়ের আর্তনাদের চেয়ে কম হৃদয়বিদারক নয়। জীবনবসসমুদ্র এই কাহিনী যে কোন লোকের হৃদয়স্পর্শ কবতে সক্ষম। এইখানেই এই সাথী গানটির চরম সার্থকতা ॥

## তৃতীয় অধ্যায়

### ধর্মাচার-সম্পর্কিত গান

এই অধ্যায়ে মাহবা গীত এবং চুয়া গান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মাহরা গীত ধর্ম পূজাব পূর্ববাত্রে জাগরণ গান হিসাবে সাবাত্ত্রি গীত হয়ে থাকে। এই গানের মধ্যে ধর্মীয় কোন গুণ বহুশ সশুপ্ত থাকে না, অল্পক্ষে চুয়া গানে দেহতত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিকতার জটিল তত্ত্বকথা বিশেষভাবে স্থান পেয়ে থাকে। অনেকে তত্ত্বাত্মীয় গানকে লোকসংগীত হিসাবে গণনা করতে চান না, কাবণ তত্ত্বসংগীত কখনো সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি কবতে পারে না; ফলে তত্ত্বসংগীত মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তা সত্ত্বেও আমরা চুয়া গানকে লোকসংগীতের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিবদ্ধ মনে করি। চুয়া গানের লৌকিক সুর সর্বজনমানসে অবশুই আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষও তাঁদের নিজস্ব বোধশক্তির সাহায্যে যতোখানি সম্ভব, কথাবস্তুর রস উপলক্ষি করবার চেষ্টা কবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে চুয়া গানকে লোকসাহিত্যের উপকরণ হিসাবে গণনা না করে পারা যায় না।

## ॥ এক ॥

### মাহারা গীত

পশ্চিম বঙ্গের বাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত ধর্ম ঠাকুর ও পূজা নিয়ে তর্কবিতর্কের অস্ত্র নেই। ধর্ম ঠাকুরকে অবলম্বন করে যেমন ধর্মমঙ্গলের কাব্যকাহিনী গড়ে উঠেছে, তেমনি ধর্ম ঠাকুর ও তাঁর পূজাকে কেন্দ্র করে আলোচনা-গবেষণার বিপুল দলিলপত্রও রচিত হয়েছে। আমবা কোন রকম তর্কের মধ্যে না গিয়ে ঝাড়খণ্ডের ধর্ম ঠাকুর সম্পর্কে স্বল্প কথায় আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। বলাবাহুল্য, রাঢ়ের ধর্ম ঠাকুর এবং ঝাড়খণ্ডের ধর্মঠাকুরের মধ্যে নামের মিল থাকলেও অমিলটাই সর্বাধিক। আচার-অহুষ্ঠান, পূজা-বিধি সব দিক দিয়েই অমিলটা স্পষ্টকট। ঝাড়খণ্ডের ধর্ম পূজায় গান করবার বীতি আছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী থেকে এর কাহিনী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ধর্ম পূজা ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের পূজাহুষ্ঠান হলেও কুমিদের মধ্যে এর একটি বিশিষ্ট রূপ লক্ষ্য করা যায়। কবম ধর্ম দুটি দেবতাই কুমিদেব বিশিষ্ট দেবতা। ধর্ম পূবোপুরি সূর্য দেবতা, তাই ধর্মের পূজা সূর্য পূজা ছাড়া কিছু নয়। কবমের পূজাতেও সূর্য পূজার আভাস আছে। কবম পূজাব দিন সন্ধ্যাবেলা বিদ্যায়ী সূর্যের জন্ম পুকুর ঘাটে উপচাব সাজানো হয় এবং পরের দিন সকালবেলা একইভাবে প্রভাতী সূর্যের জন্ম উপচাব সাজানো হয়ে থাকে। সূর্য ঋষিনির্ভর উপজাতিদের বিভিন্ন পূজাহুষ্ঠানে বিভিন্ন বেশে উপস্থিত থাকেন।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'ধর্ম' শব্দটি 'কুর্ম' বাচক আর্থেতর অস্ট্রীক শব্দের সংস্কৃত রূপ। রাঢ়ে ধর্মঠাকুর কুর্ম বা কচ্ছপের প্রতীকে পূজিত হন। কুমি সম্প্রদায় কুর্ম-টোট্টেমজাত উপজাতি। কোথাও কুর্ম বা কুডুম নামেও এই সম্প্রদায়টি পরিচিত। কুর্ম বা কচ্ছপ যে এদের কুলকেতু তাতে সন্দেহ নেই; এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কচ্ছপ হত্য' করা বা তার মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ—এমন জনশ্রুতি আছে। কারো কারো মতে কুর্ম টোট্টেমের উপজাতিদের দেবতা হলেন ধর্ম ঠাকুর। আমরাও এই কথায় বিশ্বাস করি। কারণ কুমিদের কাছে ধর্ম দেবতা সবার ওপরে। 'ধর্ম সাক্ষী' কিংবা 'ধর্ম ডাক' শব্দের ধর্ম নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ দেবতা ঈশ্বর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্ম ঈশ্বর বা ভগবান; তিনিই এই পৃথিবী এবং জীব-

জগতের স্রষ্টা। আদিম মানুষের চেতনায় সূর্য ঈশ্বরের প্রতীমূর্তি রূপ ছিলেন। আদিম মানুষের কাছে তাই সূর্য এবং ‘বসুমাতা’ পৃথিবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন দেবতাই ছিলেন না। তারা বিশ্বাস করত সূর্য আর পৃথিবীর মিলনের ফলেই সমগ্র সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়েছে। আমরা এর পূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে কোমবন্ধ আদিম মানুষ শুধুমাত্র শস্ত্রকামনা এবং সন্তানকামনায় তাদের সমস্ত পূজা-উপাসনা, আনন্দ-উৎসবের অহুষ্ঠান কবত। শিশুসন্তানের নিরাপত্তার জ্ঞান তাই আদিম মানুষ বিশেষভাবে ধরম এবং ‘বসুমাতা’র শবণাপন্ন হত। শিশুপুত্রের কল্যাণ-কামনায় এখনো ঝাড়খণ্ডের সর্বত্র ধরম দেবতার শবণ নিয়ে তাঁর পূজা-অর্চনা কবা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুর কুর্ম বা কচ্ছপের প্রতীকে পূজিত হলেও ঝাড়খণ্ডে ধরমঠাকুরের কোন মূর্তি নেই, বলা যেতে পারে ঝাড়খণ্ডে ধরমঠাকুর শূন্যমূর্তি। সূর্য স্বয়ং জ্যোতিষ্মান শূন্যবিন্দুমাত্র। আদিবাসী মননে তার শূন্যমূর্তিই যে স্বাভাবিকভাবে কল্পিত হবে, তাতে আশঙ্ক্য নেই। কবমঠাকুরও যে ছদ্মবেশী সূর্য তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। ঝাড়খণ্ডের অন্ততম শ্রেষ্ঠ দেবতা গরাম। গরাম আসলে গ্রামদেবতা, সমগ্র জনপদেব দেবতা। কবমের যেমন কোন মূর্তি নেই, তেমনি গরামেবও মূর্তি নেই। এই দেবতারাত্মক শূন্যমূর্তি। আসলে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী চেতনায় মূর্তির কোন স্থান নেই। একমাত্র টুসুব মূর্তি চল আছে ধলভূমে ঝাড়গ্রামে; এ-মূর্তিও যে বঙ্গজন-পূজিত ভাদ্রব অহুসরণে নির্মিত হয়ে থাকে, তা আমরা অল্পকাল আলোচনা করে দেখিয়েছি। ধরম, করম, গরাম—তিনটি দেবতাই শূন্যমূর্তি। শুধু তাই নয়, তিন দেবতাই যে সূর্যেরই বিভিন্ন নামাস্তব তাতেও সন্দেহ নেই। তিনটি পূজাহুষ্ঠানই কোমবন্ধ মানুষের সামূহিক পূজাহুষ্ঠান। ব্যক্তিগত মানত-মানসিক উপলক্ষেও যে পূজাহুষ্ঠান হয় তাতে আত্মীয়কুটুম্ব এবং কোম বা গোত্রের পরত্যেকটি সদস্যের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। আচার্য স্কুমার সেন বলেছেন, ‘শ্রীশ্রী নলিনাক্ষ্য দত্ত সম্পাদিত গিলগিট পুঁথিতে ধর্মরাজ নামের সূত্র ও গ্রাম দেবত্বের ইঙ্গিত রয়েছে ঋকবেদের একছত্রে। ধর্ম হয়েছে গ্রামবাসীর রাজা। ধর্মাত্মবদ্ বৃজনস্বরাজ।’<sup>১</sup> দেখা যাচ্ছে ঋকবেদের যুগ থেকেই ধরম দেবতা গরাম দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছে।<sup>২</sup> শিশুর কল্যাণ

কামনায় প্রধানতঃ ধরম ঠাকুরের শরণ নেওয়া হয়ে থাকে ; কিন্তু গরাম দেবতার ওপর গ্ৰন্থ থাকে আবালবৃদ্ধবনিতার শুভাশুভ এবং সমগ্র জনপদের সবারকম কল্যাণ-অকল্যাণের দায়িত্ব। অবশ্য ধরম ঠাকুরও কোম বা গোত্রের শুভাশুভের দায়দায়িত্ব বহন করে থাকেন। ধরম ঠাকুর গোত্রের প্রতিটি মানুষের জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্ত্রা। স্বয়ং যেমন পার্শ্ববজ্রগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রত্যক্ষ কারণ, তেমনি ধরম ঠাকুরও জনপদের প্রতিটি মানুষের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রত্যক্ষ কারণ। তাই ঋকবেদে মৃত্যুর অধিপতি যমকে যে ধর্মরাজ বলা হয়েছে তা কোনক্রমেই অসংগত বা অস্বাভাবিক নয়। ঝাড়পণ্ডে ধরম যে স্বয়ং সূর্য তথা আগেই বলা হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রমতে সূর্য-পুত্র যম ধর্মবাজ, যম-পুত্র যুদ্ধিষ্ঠির ধর্মরাজ। ঝাড়পণ্ডে ধরম পূজার কোন বার্ষিক অনুষ্ঠান হয় না। করম এবং গরামের বার্ষিক পূজানুষ্ঠান থাকলেও, ধরমের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। ধরমঠাকুর সূর্যের পূজা করম এবং গরাম পূজার মধ্য দিয়েই অন্তর্গত হয়ে থাকে বলে আমাদের বিশ্বাস। ঝাড়পণ্ডে ধরমঠাকুর প্রধানতঃ শিশুদের জন্ম নির্দিষ্ট দেবতা বললে ভুল হয় না। সন্তানকামনায় ধরমঠাকুরের মানত করা হয়। শিশু জন্মগ্রহণ করবার পর শিশুর শুভাশুভের জন্ম ঝাড়পণ্ডী মানুষেরা ধরমঠাকুরের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। মানতের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ধরমপূজা করতে হয়। তবে ঝাড়পণ্ডের একটি বিশিষ্ট নিয়ম ( যা কুমিসম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ) হল এই যে, পরিবারের প্রথম পুত্রসন্তানের জন্মকে উপলক্ষ করে ধর্মের মানত শোধ করতে হয়। জন্মকাল থেকেই শিশুর মাথার চুল রেখে দেওয়া হয় ; ধরমপূজার আগে প্রথমবার তার মস্তকমুণ্ডন করা হয়। তবে অনেক সময়ই এই নিয়মেব কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে হয়। ধরমপূজার একটি বিশিষ্ট নিয়ম হল এই যে, যে বৎসর গোত্রের কোন রমণী অন্তঃস্বভা থাকে না, একমাত্র সেই বৎসরই ধরমপূজার অনুষ্ঠান সম্ভব। গোত্রের লোকসংখ্যা বেশি হলে প্রত্যেক বৎসরই কোন না কোন রমণী গর্ভবতী থাকেই, তাই ধরমপূজার অনুষ্ঠানও বিলম্বিত হয়ে থাকে। তাই অনেক সময় ছেলের মাথায় জন্মজাত চুলের একটি 'চুট্‌কি' বা শিখা রেখে বাকি চুল ছেঁটে ফেলা হয়। ধরমপূজা প্রতি 'পিট্‌' (generation)তে একবার হয় এবং বারো বছর ব্যবধানে এক একটি পূজানুষ্ঠান হয়। আমরা আগেই বলেছি, পূজার কোন নির্দিষ্ট দিন থাকে না ; বৎসরের যে শনিবারে (মতাস্তরে শুক্রবারে) পূর্ণিমা তিথি পড়ে, সেই দিন এই পূজার অনুষ্ঠান করা যায়। ধরমপূজা গোষ্ঠীপূজা, তাই পূজার আগে পরিবারের

প্রতিটি লোকের তো বটেই গোত্রের প্রতিটি আত্মীয়স্বজনের উপস্থিত থেকে উপবাস করতে হয়। পূজার আগের রাত্রিটি জাগরণের রাত্রি। সারা রাত ধরে 'মাহরা' (<মাহারায়< মহারাজ) গীত গাওয়ার বীতি প্রচলিত আছে। পরিবারের সমস্ত সদস্যদের ভোরে স্ন্যেহের আগেই স্নান করবার অনিবার্হ নিয়ম আছে। স্ন্যেহের লগ্নে পূজা শুরু করা হয়। এই পূজায় কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকে না। কোন মন্ত্রও এই পূজায় উচ্চারিত হয় না। গৃহকর্তা স্বয়ং এই পূজার পুরোহিত। ঝাড়খণ্ডে আর দশটি পূজাব মতো তুলসীতলাতেই এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তুলসীপাতা, আতপচাল, মিষ্টান্ন, ফল দুধ ইত্যাদি সহযোগে পূজা দেবার পর পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। এই পাঁঠাটি মানত কবার সময় থেকে পালিত হয়ে থাকে। পূজার সময় পাঁঠাটিকে ধরমঠাকুকের বলি হিসাবে উৎসর্গ করবার পর পাঁঠাটি যদি পূজার 'ফুলে' না 'চরে' অর্থাৎ পূজার পত্রপল্লব ভক্ষণ না করে, তাহলে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা করা হয়; তাই তখন সেই পাঁঠাটিকেই দেবতাজ্ঞানে পত্রপল্লবের অর্থাগ্রহণের জন্তু অনুবোধ করা হয়। ধরমপূজার ভোজও গোষ্ঠীভোজ। গোত্রের প্রত্যেক সদস্যকে একত্র পঙক্তিভোজনে অংশ গ্রহণ করতে হয়। ভোজ আরম্ভ হবার আগে গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি গাঁয়েব পথে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বলে, ভোজ আরম্ভ হচ্ছে, গোষ্ঠীর-গোত্রের যে যেখানে আছো চলে এসো, যে আসবে না তাকে আজ থেকে গোত্র থেকে বাদ দেওয়া হবে। এই ডাকেই 'ধরম ডাক' বলা হয়। গোত্রচ্যুত হবার আশঙ্কা থাকায় সকলেই এই ভোজ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে। ধরম যে কুর্মিদের সম্প্রদায়গত জীবনে কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছেন, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ধরম কুর্মিদের কুলদেবতা, গোত্রদেবতা। কুর্মবাচক ধরম তাই কুর্মিদের টোটম বা কুলকেতুও বটে।

এই ধরমপূজা উপলক্ষে মাহরা গীত গাওয়া হয়ে থাকে। পূজার আগের রাত্রে সারারাত্রি জাগরণ উপলক্ষে এই গীত গাইবার রীতি। ধর্মপূজাকে কেন্দ্র করে যেমন ধর্মমঙ্গলের কাব্যকাহিনী প্রচলিত আছে, তেমনি ঝাড়খণ্ডের ধরমপূজাকে কেন্দ্র করে কাব্যকাহিনী না থাকলেও উপাখ্যানমূলক গীতিকাহিনী প্রচলিত আছে। উপাখ্যানটি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লিখিত করা হল :

গঙ্গামাহী রাজার একমাত্র কন্যা চান্দাধনী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীরকেশবামীর রূপে পাবার জন্তু বার বছর ধরে ধরমের তপস্বী করে। রাজা মেয়ের বিবাহের



জন্তু চারদিকে গান্ধু নাপিত মারকং খবর পাঠায়। রাজার পাটহস্তীর ওপব শ্রেষ্ঠবীর নির্বাচনের ভার পড়ে।

চার ভাই গোয়াল্লা ছিল। ছোট ভাই ছিল পিঠাতি গোয়াল্লা। তার কোন ছেলেপিলে ছিল না, সবাই তাকে আঁটকুড়া বলে গালাগালি করত। মনের দুঃখে স্বামি-স্ত্রী দু'জনে মিলে অল্প দেশে চলে গেল, সেখানে গোচাবণের জীবিকা গ্রহণ করে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু ওখানেও তাবা শাস্তি পেল না; আঁটকুড়া অপবাদে লাঞ্ছনা-গঞ্জনাও অস্ত ছিল না। তখন পিঠাতি গোয়াল্লা লোকেব চোখে ধুলো দেবার জন্তু স্ত্রীব পেটেব ওপব কাপড়ের পুঁটলি বেঁধে তাকে গর্ভবতী সাজালে। সংযোগবশতঃ এই সময় তাবা গোষ্ঠমার্ঠে দু'টি সন্তোজাত শিশুকে অসহায় অবস্থায় কুড়িয়ে পায়। তখন পিঠাতি গোয়াল্লা চারপাশে প্রচার করে দিল যে সখী গোয়ালিনী যমজ সন্তান প্রসব কবেছে। দু'টি ছেলেব নাম রাখা হল সাঁউরু আর ধাঁউরু। তাবা দুজনই অত্যন্ত বলবান, বীর এবং সর্বগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। যথাসময়ে তাবাও রাজকন্যা চান্দাধনির স্বয়ংবরসভার খবর পায় এবং দুই ভাই সেই সভায় গিয়ে উপস্থিত হয়।

পাটহস্তী সাঁউরুব গলায় মালা পরিয়ে তাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হিসাবে নির্বাচন কবে। চান্দাধনীও তাকে পতিরূপে স্বীকাব কবে তাব গলায় ববমান্য দান কবে। রাজাব এক ভাইঝির সঙ্গে ধাঁউরুব বিয়ে হয়।

রাজাব মৃত্যুর পর সাঁউরু সেই দেশের বাজা হয় এবং ধবমপূজার প্রচার করে।<sup>২</sup>

মাহরা গীতেব কিছু বৈশিষ্ট্য সহজেই নজবে পড়ে। উপাখ্যানের আদি অস্ত সর্বত্র বাম নামের গুণগান কবা হয়েছে। গীতেব প্রতিটি কলিব শুরুতে রাম নাম জপ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ কাব্যবচনার বীতিতে যেমন সরস্বতী আদি দেবতার শরণ নেবাব রেওয়াজ আছে, তেমন মাহরাগীতেব গাইয়েও ভবানী সরস্বতীব শরণ নিয়ে থাকে, সে বিশ্বাস কবে এব ফলে পূর্বাপব গীতিকাহিনী তার ঠিক মতো মনে পডবে, কণ্ঠস্বর কাংশ্রধনির মতো হবে, জিহ্বা কলমের মতো নিভুল ক্ষতগতি হবে। আর একটা বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত উপাখ্যানটি গীতবন্ধ হলেও সমিল ছন্দোবদ্ধ গীত নয়। আদিম সমাজের গীতধারায় মিল বন্ধ করে গীতরচনার তেমন বোঁক আদিকালে ছিল না। যেহেতু মাহরা গীত

আচারগীতের মতোই বক্ষণশীল, তাই নতুন করে ছন্দোমিল দিয়ে গীতরচনার তাগিদ কেউকোনদিন অনুভব করে নি। তবে আধুনিকতার ছাপ যে এই গীতে নেই তা বলা যায় না। মাহরা গীত নিতান্তই মুখের গণ্ডভাষায় বচিত। স্রুবেব স্পর্শে এগুলো গীতে পরিণত হয়। মাহরা গীত সবারি গণ্ডে রচিত বক্তব্যধমা গীত তাই এই গীতে কবিত্বেব প্রকাশ নেই বললেই চলে। সমগ্র উপাখ্যানটি বিপুলাকার বলে মাহরা। গীতের অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হল।

বাম রাম রাম বাম বাম রাম রাম। বামকেবা নাম ভাই বে সন্ঝা কা বিহানে, পাপ যায় দুরে বে ধবম বহি যায়, দেহিয়া এত নিরমালা বে—  
রাম ॥ কারণ পে শবণ মাই গ দেবী গ ভবানী, আশুব কথা আশু মাই গ দিবে শ্ববণ কবি, পেছুব কথা পেছু মাই গ দিবে শ্ববণ কবি। বাহা যে ফেঁকবে মাই গ কাঁসাকে সমান, জিব্ভা চালাবে মাই গ কলম সমান, সরসতী ভরা মুখে দিহ বে রাম নাম ॥ গঙ্গামাহী রাজাব খিটি বাগান করিল, বাব বার বছর ভালা তপ যে করিল। তপে খনি জানিতে পারিল, তপে উহার সিদ্ধি ভালা হইল হইল, তখনযে চান্দাধনি ঘরে চলি আইল ॥ বাজাব বিটি চান্দাধনি আসবে আসিল, বাসবঘরে আসি ভালা কপাট খিঁড়া দিল ॥ তখন যে রানী ভালা জগ্গাসু কবিল, 'কি জন্তে তুঁই ভালা কপাট-খিঁড়া দিলি, মনেব কথা না বলিলে .কমনে জানিব ॥' তখন যে চান্দাধনি বলিতে লাগিল, 'আমাব সঁগে সত্য যদি কববে কববে, তাহলে আমি যে মনেব কথা বলিব বলিব, না হলে হ জীবন আব না বাখিব ॥' তখন যে বানী ভালা বলিতে লাগিল, 'সত্যায় বন্দী আমি ভালা হইখু হইখু।' এতক শুনি চান্দাধনি বলিতে লাগিল, 'আমাবি বিহা ভালা দিবে রে জগায়ে', ইচ্ছামতন আমি বিহা হইব হইব। যাকে ফুলেব মালা দিব যে পর্ছাই, সেইটি যে তব জামাই হইবে হইবে ॥' তখন যে বানী ভালাবলিতে লাগিল, 'শুন শুন শুন কামিন শুন বে বচন, বাজাকে যে এগন ভালা আস বে ডাকিয়া, আমার কথা চান্দার কথা আসিবি বলিয়া ॥' তখন যে কামিন ভালা পেল ঘে চলিয়া, কামিন ভালা চঁহবি মেলায় ডাঁটায়ে' বলিল, 'শুন শুন শুন বাজা শুন হে বচন, তুমাকে এখনি যে মহলে ডাকিছে, মহলে তুমি আ'সবে ভালা আ'সবে যে চলিবে' ॥' তখন যে রাজা ভালা বলিতে লাগিল, শুন শুন শুন মন্তিবি খিটাঁব চালাবে। আমি যাছি মহল ডিওরে ॥' তখন যে রাজা ভালা আলা যে চলিয়ে,

মহলে আসি ভালা জিগ্‌গাস করিল, 'বার বার বছর গেল কবু না ডাকল, আ'জ ভালা কেনে যে ডাকল ॥' তখন যে রানী ভালা বলিতে লাগিল, 'মনের কথা তকে আমি দিব যে বলিয়ে, সত্যায় যদি বন্দী হবে তাহলে মনের কথা বলিব, না হলে ই জীবন আর না রাখিব ॥' তখন যে রাজা-ভালা সত্যায় বন্দী হইল, 'মনের কথা তুমি ভালা দিবে যে বলিয়ে' এতেক শুনি রানী ভালা বলিতে লাগিল, 'চান্দাধনি বার বছর বাগানে রহিল, চান্দাধনির বিহা দিবে যে জগায়ে', ইচ্ছামন্তন সেত বিহা হইবে হইবে। যাকে ফুলের মালা দিবে যে পরহায়ে', সেইটি তর জামাই হইবে হইবে ॥' তখনযে 'রাজাভালা বলিতে লাগিল, 'শুন শুন শুন গাঙ্গু শুনবে বচন, চান্দাধনির বিহা ভালা দিব যে জগায়ে', দেশে দেশে নিমন্তন যে দিবে, চান্দাধনির বিহা ভালা দিব যে জগায়ে' ॥' তখন যে গাঙ্গু ভালা বলিতে লাগিল, 'ছয়মাস সময়সদি আমাকে যে দিহ, তাহলে দেশে দেশে নিমন্তন দিব যে জগায়ে', না হলে আমি নাই যে পারিব ॥' তখন যে রাজা ভালা ছয়মাস সময় দিল যে বলিয়ে'। ঐ দেখি গাঙ্গু লাপিত বলিতে লাগিল, 'দিন দায় দিবে রে বলিয়ে', ছয়মাসের বাদে ভালা আসব করবে ॥' দেশে দেশে নিমন্তন দিল যে জগায়ে', রাজাকে যে আসি ভালা দিল যে বলিয়ে'। চিয়ার বেঞ্চি ভালা দিল যে সাজায়ে', চঁহরি মেলায় রাজা দিল যে বসায় ॥... 'শুন শুন শুন হাতী শুনরে বচন, বীরকে যে তুমি ভালা মালা যে পরহাবে ॥' শূণমণি হাতী ভালা শুম দিয়ে রহিল ডাটায়', একঘণ্টা বাদে ভালা মাখা নাডা দিয়ে দিল যে বলিয়ে', 'ফুলের মালা আমি দিব যে পরহায়ে' তখন ভালা চান্দাধনি গেল যে বাগানে ॥...

॥ দুই ॥

ডুয়া গান

ক্রীচৈতন্য মথুরা যাবার পথে ঝাড়খণ্ডের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার এই অরণ্যভূমিতে তখন থেকেই শুরু হয়েছে, ধরা যেতে পারে।

ঝাড়খণ্ডের 'ভীল প্রায়-পবন পাষণ্ড' আদিবাগীদেব চৈতন্যদেব কৃষ্ণনামে উন্নত করেছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। সর্বশ্রেণীর জনতার মধ্যে ব্যাপকভাবে এই ধর্মের প্রচারণা না হলেও কিছু সংখ্যক মানুষ যে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ কবেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৈষ্ণবধর্মের জাতপাঁহীন সমাজের শ্রেণীসমতার প্রতি ঝাড়খণ্ডী জনতার আকৃষ্ট হয়ে থাকার স্বাভাবিক। কুমি ভূমিজ-কামাবকুমোর-বাগাল আদি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ কবনার ফলে ধর্মীয় সাধনমাগে ঝাড়খণ্ডীদেব আয়ত্তে আসে। কিছু লোক সাধনমার্গের দীক্ষা নিয়ে 'সাবু' হয়ে যাব, সাধনমার্গের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বে-গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তাকে ঝাড়খণ্ডে ঢুয়া গান বলা হয়। এই গানের বিষয়-বস্তু তাই বাহার্ষ্য, নিঃসঙ্গ-চৈতন্য এবং আধ্যাত্মিকতা ও দেহ-তত্ত্ব। বাণীব-বাউল গানের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের ঢুয়া গান আত্মিক-সম্পর্কযুক্ত। বাণীব-বাউল, ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত আন্যান্যাত্মিকতাও দেহতত্ত্বসম্পর্কিত গানগুলো 'উজ্জ্বল নীলমণি'র অল্পশাসনের বহির্ভূত নয়।

'ঢুয়া' শব্দটি 'ধুয়া' ( ধ্রুপদ ) শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হয়। ঠিক ৬ষ্ঠ গান শুধু মাএ বুয়ো সবধ নয়। ঢুয়া গান পূর্ণ দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। এ গানের বেশ কয়েকটি 'কলি' থাকে, গানের প্রথম কলির শেষে সাধারণতঃ ধুয়া বা ধ্রুপদটির স্থান থাকে, তাবপব প্রতিটি কলির শেষে ধ্রুপদটির পুনরাবৃত্তি করা হয়। ঢুয়া গানের কবি সাধারণতঃ সাধনমার্গের সাবু-বাউল বা গৃহী-সাধকেবাস্ত হয়ে থাকেন। প্রতিটি গানের শেষে ভগ্নিতায় বচনিতাব নামোল্লেখ থাকে। গানগুলো পবীক্ষা কবে দেখলেই বোঝা যায় যে বচনিতাবা ধর্মশাস্ত্র-পূর্বাবকাহিনী আদিবসঙ্গে সুপার্বচিত, শুধু তাই নয়, প্রচুর ধর্মগ্রন্থপাঠের ফলে তাদের মধ্যে লোকমানসের উপযোগী একটামার্জিত শিক্ষিত-মনও আত্মপ্রকাশ করে। তাই ঢুয়া গানগুলো ভাবা এবং বচন শৈলীর দিক দিয়ে বাংলাব বৈষ্ণব বচনাবলীর উত্তবাবিকাব বহন কবে চলেছে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কি শব্দচয়নে, কি ছন্দাকর্মে, কি অলংকারে সবদিক দিয়েই উচ্চসাহিত্যের আশ্বাদ এই ঢুয়া গানে মেলে। তাই ঢুয়া গানে এবং বাউল গানের মধ্যে নামের পাণ্ড্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য লক্ষ্যগোচর হয় না। এই প্রসঙ্গে স্বরণ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশের যশোহর জেলাব পাগলা কানাই-এব বাউল গানগুলো 'ধুয়া' বা 'শব্দগান' নামেই পবিচিত।

চুয়া গানের বিষয়বস্তু, আগেই বলা হয়েছে, রাধাকৃষ্ণ, নিতাইচৈতন্য এবং আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্ব। একমাত্র দেহতত্ত্ব-সম্পর্কিত নামগুলোই জটিল রূপকের মোড়কে রচিত হয়েছে। উজ্জলনীলমণি-নির্দেশিত তত্ত্বকথা যেমন এ-গানের অবলম্বন, তেমনি লোচনদাসের বৃহৎ নিগম গ্রন্থের সাধনতত্ত্বও এ-গানের প্রাণবস্তু। দেহতত্ত্ব সম্পর্কিত গানগুলো নিঃসন্দেহে তত্ত্বসংগীত সাধনমার্গের লোক ছাড়া এ গানের অর্থ কিংবা রসগ্রহণ অন্নের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানেই তত্ত্বগীতিলোকগীতি কি না এ প্রশ্ন ওঠে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, ‘তত্ত্বগীতির সর্বদাই একটি নিগূঢ়ার্থ থাকে—এই নিগূঢ়ার্থ সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকলে বিশ্লেষণ করিতে পারে না, ইহা গুরু কর্তৃক বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। সেই জন্ম তত্ত্বগীতিলোকগীতির মর্খাদা দাবী করিতে পারে না।’<sup>১</sup> একমাত্র দেহতত্ত্বের গানেই এই জটিল নিগূঢ়ার্থ থাকে। রূপকের দুরূহ ব্যবহার এগানকে সাধারণ মানুষের উপলব্ধির সীমানা থেকে দূরে নির্বাসিত করে বাখে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে এর সুর, গায়নরীতি, আনুশঙ্গিক বাস্তব ইত্যাদি লোকসংগীতের বিশিষ্ট পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। যে-কোন সাহিত্য-কর্মের কণাবস্তুর একাধিক অর্থ থাকে; তা ছাড়া অন্তরঙ্গ এবং বহিঃরঙ্গ দুটি স্তরও থাকে। রসগ্রহণের পক্ষে যাব সময় যে অন্তরঙ্গ এবং বহিঃরঙ্গের পরিপূর্ণ উপলব্ধির প্রয়োজন, তা’ও সম্ভবতঃ ঠিক নয়। দেহতত্ত্বের গানের তত্ত্বকথা ‘উজ্জলনীল-মণি’ কিংবা ‘বৃহৎ নিগম গ্রন্থ’ অনুসারে সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারলেও নিজের সীমিত বোধ এবং বোধির সাহায্যে সে একটা অর্থ অবশ্যই পাড়া করে। তার এই উপলব্ধিটি চুয়াগানকে লোকগীতির মর্খাদা দিয়ে থাকে।

বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বহু চুয়া গান রচিত হয়েছে। চৈতন্যদেব স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার; দ্বাপরে যিনি কৃষ্ণ, কলিকালে তিনিই শ্রীচৈতন্য। দ্বাপরে যিনি পীতবসন, বনমালী, বংশীধারী, কলিকালে তিনিই গৈরিক কোঁপীনধারী, হরিনাম-মালাকব।

১ কে কাঞ্চাল সাজাল্য ওরে তুই জগতের চিন্তামণি, / ক’রল নেড়! সৃষ্টিছাড়া পরাল্য ডোর কোঁপিনী। কইরে বনফুলমালা গলে হরিনামের মালা, / বাঁশি নয় রে নামের ঝোলা দিতেছ হরিকনি। বেশ দেখো বেশ বুঝোছি হে এবেশ তোমার কিসের লাগো, / খেপা বলে যাবার তরে দে রে চরণ দুখানি ॥

২ কাব ভাবে হয়ে বিভোর নদীয়ায় হয়েছো গোউর, / ব্রজপুবে গোপের ঘরে  
কিসেব অভাব ছিল তোর। বনমালা নাই হে গলে তুলসীর মালা গলে  
দোলে. ছু'নয়নে বহে লোব। / নাই হে শিরে শিগী পাখা নেডামুগু যায় যে  
দেখা/টাকালে কি যায় হে ঢাকা নয়ন বাঁকা স্বভাব তোব। রাধা নামেব  
সাধা বাঁশি বাধা নামে বাজত দিবানিশি / সে বাঁশি তোব কিসের দোষী  
অথব ছাড়া হল তোব। কাব ভাবে হয়ে মগন কালরূপ কবেছ গোপন/যে  
ধবাল সোনার বন বেনী কয় তাব কঠিন জোব ॥

এই গোউবহবি ভবজালা-নিবারণের একমাত্র কাণ্ডাবী। তাঁর দেওয়া হবিনাম  
ভবযন্ত্রণাব একমাত্র মহোষধ। হরিনাম উচ্চারণ কবলে পাপতাপজালা সব  
দরে চলে যায়। কিন্তু সংসাবাসক্ত মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে থাকে, হাবনাম  
শ্রদ্ধাবণ কবে ০.৫ কার্পণ্য কবে। তাই যখন জীবনের দিনগুলো ফুরিয়ে আসে,  
তখন অসহায় বেদনায় আর্তনাদ তোলে।

৩ ক জানে প্রভুব লীলা সংসাবে অপাব খেলা হে/অপাবে পার হবি কিসে  
হল না চিন্তন হে, / জেনে কি জান না মন, যে দিন ধবিবে শমন হে। /  
কাব না মিলে অন্নভোগ কাব কত ঘটে বাগ হে/কাব স্বর্ণথালে অন্ন  
পঞ্চাশ বাজ্ঞন হে। কাবে না মাল ছিড়া চটা কাব বা মশাবী খাটা হে/  
কাব লেপবিছানা বাবুযানা কাব সিংহাসন হে। বিষ্টু কয় দেখ দেখি  
ধবাব যেদিন হিসাব বাকি হে/তারে দিতে নাববে ফাঁকি করবে বন্ধন  
হে ॥

মানবজন্ম বহু পুণ্যফলেই সম্ভব। অগচ মানুষ অবহেলায় এই দুর্লভ জন্মকে  
বিফল কবে, ধনর্যোবন নিয়ে অকাবণে অহঙ্কাব কবে। জীবনের সাধনা  
কবলেই যে আসল সুখ এবং প্রেমের দর্শনলাভ সম্ভব তা মানুষ ভুলে থাকে।

৪ বলত পুণ্যেরই ফলে পেয়েছ জন্ম মহীতলে রে/দেগরে মন বিফলে এ জনম  
যেন যায় না বে। মনরসনা, এই বেলা কবে লও সাধনা। জীবনর্যোবন  
ধন এই না রবে রে চিরদিন / তার ভবসা কব কেন এ জনম আর হবে  
না রে। ভাব কবিবে সুজ্ঞান জাগ্রে জয় কবে লও তিন গুণে রে / প্রেমের  
উদয় হবে দিনে দিনে সময় গেলে হবে না বে। বিষ্টু অনাথে ভণে পড়ে  
গুরুব শ্রীচরণে বে, / তাই ত ভাবে মনে মনে আমারে কি, ঘটবে না বে ॥

দুর্লভ জন্মের ফলে যে মানবদেহ, পববর্তী গানে সেই মানবদেহকে জমিররূপকে  
প্রকাশ করা হয়েছে। ভক্তিরূপ কোদালের সাহায্যে পাপরূপী ঘাস বিনাশ করে

গুরুদত্ত মহামন্ত্রের বীজ বোপণ করতে পারলে তবেই মানবজন্ম ফুলে-ফলে ভরে উঠতে পারে।

৫ মনবসনা, মানবজমিন আবাদ কবলি না, / হলে সন আথেবী মালগুজাবী  
 . দিতে হবে জান না। আশি লক্ষ বাব ঘুবে কত কষ্ট ভোগ হবে / চৌদ্দ  
 পোয়া জমিন পেলি দেখ মনে হবে, / এমন সাধেব জমিন বাথলি পতিত  
 চাষ দিলে ফলত সোনা। ও মন শুন তোবে বলি ধব ভক্তি-কোদালী  
 / পাপকপী ঘাস কর বিনাশ দাও তুলে ফেলি, / গুরুদত্ত মহামন্ত্র বে বীজ  
 বোপণ ভাষ কবলি না। তোব সঙ্গে ছ'জনা কিছুই ববতে দেবে না,  
 তা মাঝি খায় তোমায় ১জায় ৩'ও বি জান না, / ছ' ড় তা দেব সঙ্গ বে  
 গোউবর্হাবর চরণ কব সাধনা ॥

হাবনামেব মাধ্যমে শ্রীহবিব ভজনা এবং চরণসাধনা কবলে তবেই সংসার  
 সাগরে উত্তরণ সম্ভব। অনন্ত বাউল লুচিব কপকে হবিনামেব গুণকীর্তন  
 কবেছেন গানটিতে।

৬ হবিনাম গবম লুচি ৬ তুই গবম গবম গণে লে না ব / যাবে শাব  
 সংসারক্ষুধা এমন জিনিং খেতে সুখা এমন সুখা খাব পাবি না বে।  
 বসনা পাতা পেতে বস না যেতে এক গ্রাসেতে বাল থানা / ছত্রিশ জাতি  
 একত্রে বস থানে বে এখনো চাণ বে . ব হবিনাম এমন  
 লুচি খাঁই ছুঁয়ে মুঁচ গু হুঁচ হোন / নামে যাব হয় কতি কাল না  
 কাছি শুচি ও শুশুচি বাপে ন ব . ন . গুণাগ ছানাব ডালে মিশায়ে  
 গেলে অ'ব ও ভুলতে পারাবি না . ৬ বর্ষ ও ন'ব'ব সহ সঙ্গ ববি দি  
 তাব পূন হবে মনবাসনা বে। আনন্দময় চর্চিব বসে মিলবে শেষে  
 বসগোলা আব মিহাদানা / পাচন্দ্রবেব মণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা ঠাণ্ডা হবে তে'ব  
 মন বসনা বে। ক নতে ধন্য বণ্ড জীব তবিবাব জন্ম শ্রীচতুরবে  
 গণ্ডাপান (?) / বিলাছেন পাশ্চাব দাস সম্প ব দবে গোউব নিতাই ভাচ  
 ছ'জনা ব। হাবনাম খাছের বাজা ঘুতে ভাজা আর ত পেটে সহবে  
 না / অনপ তুমি মুড়ি পেয়ে বা'দে গলে লুচিব আশ্বাদ জন্মলি না বে ॥

বিন্দু শুভু হবিনাম উচ্চারণ কবলেই কি গর্বাঙ্কলাও সম্ভব, কিংবা মুক্তি  
 কবায়ত্ত হবে? লোক ১৫খানো তিলকমালা গোঁবাজ লাভেই উপায় নয়,  
 গুণবাণী গুরুব কাছে গমেব সাধনাব পথ জেনে নিতে পারলে গোঁবাজেব  
 প্র ৩ প্রেম-অমুরাগ জন্মাবে—তখন সংসারবেব বঁধন একে-একে কেটে যাবে।

৭ এমনিই গোউব পাব কিসে গোউর পাবার মন আলাদা তোর মনে না মিশে। লোকদেখান ত্রিলকমালা কোন্ কাজেতে আসে | যেমন ডুল দিয়ে জল গেলে পবে কি করিলে একাদশীর উপবাসে। বাহিরে কৌটার পত্তন ছুঁচার, কীর্তন বাসে | কেন দেখিলে না তক্ষু মেলে মায়া-মদ গেয়ে রয়েছ বেহুঁসে। অনুবাগ নহলে না পাই গোউব বলেছিলেম গোউব দাসে | আগে বাগেব হবে শিক্ষা কব অনুবাগী গুরুর পাশে। গোউর প্রেম অনুবাগ যার জন্মেছে সে কি থাকে ছাব গৃহবাসে | চিতে চিন্তামার্গ গো ডর পদ সাধুসঙ্গ মিশে। পেপা বলে ভজনসাপন কিছুই না আসে। জগাইমাপাই তবে গেছে আমি সেই ভবসায় আছি বসে ॥

তাঁই বৈষ্ণবসাপকদেব কাছে 'রাগেব ঘরে শিক্ষা', কাম এবং প্রেমের স্বরূপ শিক্ষাই আসল সাধনা। যতোক্ষণ না সমর্থ্য বস্তুর উদ্ভব হচ্ছে অর্থাৎ সন্তোগেচ্ছাহীন হয়ে কৃষ্ণরূপেব জন্ম ব্রহ্মগোপীদের প্রেমের মতো সন্তোগ-কামনায় কৃষ্ণের আশ্রয় সঙ্গে একাত্মীভূত হচ্ছে, ততোক্ষণ এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়।

৮ শ্রীবাধিকাব শ্রাম পিবিতি সেই ত পিবিতির বীতি | পিবিতি কবিত্তে জানে ভাল হয়। বেদেব উপবে পিবিতি সর্বশাস্ত্রে কয় | পিরিতি সামান্য নয় পিরিতি বড় বধে হয়। বুলশাল তেয়াগিয়ে পিবিতে মন মজাইয়ে তবে পিরিত করা ভাল হয় | গোপনে কবলে পিরিত সেও ত সদর হয়। পিরিতের নাই আগাগোড়া বেদ-বিধি দুই ছাড়া কিন্তু নিয়ত ভাগুমদো রয় | ঐ পিরিতে যে মজেছে তার সফল জন্ম হয়। কৃষ্ণ পতি কৃষ্ণ পতি বেণী মনে করেন স্থিতি সাধন বলে যদি সিদ্ধ হয় | আমি ছাড়ব না তোমার পিরিতি কৃষ্ণ দয়াময় ॥

মানবদেহ রহস্যের আকরবিশেষ। এহ দেহের মধ্যেই আছে কাম আর প্রেম, আছে পরমরতন অমূল্যধন; 'আছেন' অধরা অরূপরতন পবশর্মণ স্বয়ং জগৎপতি। কিন্তু সেই মনের মানুষ, সহজ মানুষকে পেতে গেলে গুরুর কৃপা ছাড়া তা সম্ভব নয়; গুরুসেবা এবং সাধুসঙ্গ ছাড়া সেই রূপাতীতকে উপলব্ধি করা যায় না।

৯ আসা-যাওয়া যেই পথে ভজনসাপন তাথে মিলে না তা সাধুসঙ্গ বিনে | বুঝা মনে, অরসিকে রসের মরম কিবা জানে। সাত গম্বুজে থাকে জল ফুটে শতদল কমল নিকটেতে ভেক তা না জানে। নিকুঞ্জ কাননে ঘর



সেখানে থাকে ভ্রমর স্নগন্ধেতে আসে মধুপানে। বিষ্টু অনাথে ভণে  
পড়ে গুরু শ্রীচরণে দয়া বৃষ্টি হল না অধীনে ॥

১০ গুরুসেবা বিনা কেবা পেয়েছে দরশন | ঘরে রইল ধন, চিনতে নাবিলি  
রে মন। খুঁজে বুল হাতে মাঠে তার কি বে মন বিষয় খাটে মনের বাসনা  
না মিটে | মনের মূলে সে ধন মিলে করিলে অশেষণ। সে-ঘরের দশ দরজা  
মালিক রাজা পাবে মজা জানে তার হয় না খুঁজা | ঐ ঘরের ঈশান  
কোণে যেজন জানে লাভ করে অমূল্য রতন। এমনি মন অবোধ হলে  
সাত কুপথে চলে বারণ করি তায় না গুনিলে | বিষ্টু বলে গোলেমালে  
এ জন্ম গেল অকারণ ॥

১১ রতনমণি বিবাজ করে এই ঘরে, কে চিনতে পারে | (তারে) চিনতে  
পারলে যাবি তরে ভয় হবে না এ সংসাবে। সেই যে পরমরতন তারে  
কর রে যতন, যতনে বতন মিলে হে শাস্ত্রেরই বচন | ওবে কি করিবে  
শমন দমন আপনি পালায় ঘুরে। সে ত ঘরেব মত ঘব, দেখ তাব  
বাহির ভিতর, স্থানে স্থানে বসেছে হে বত্রিশ অক্ষর | ওহে যোলকলা  
করছে খেলা সতত নিরন্তরে।...বিষ্টু অনাথেতে কয় সহজে পাবার নয়,  
সাধনে সাধ্য করলে অবশ্য তা হয় | আকারে ওকাবে আছে দেখ বেদের  
সেই পারে ॥

রতনমণি বিবাজ করে যে ঘরে, সেই মানবদেহগঠনের আশ্চর্য  
কারিগরি সাধকদের বিস্মিত করছে। যে কারিগর এমন ঘর তৈরী করেছিল,  
তাকে বলিহারি দিতে হয়। চৌদ্দ পোয়া দেহের ভেতর কতো বিচিত্র ধরনের  
ঘর, কতো বর্ণের ঘর। কোথাও বা মণিময় কোঠা; কোথাও-বা রতনদীপ  
মাণিক জলে, কোথাও বা চন্দ্রসূর্যের অনির্বাণ আলো। এর ভেতরে কোথাও  
নদী কোথাও বা সুউজ্জ্বল; কোথাও হংস-হংসিনী খেলা করে বেড়াচ্ছে, কোথাও  
অগ্নান শতদল ফুটে আছে যুগ যুগ ধরে। আর এরই মধ্যে রয়েছে সেই  
পরমপুরুষ অরূপরতন।

১২ ধন্য কারিকর, ও যে গড়েছিল এমন ঘর | সে কারিকুর বলিহারি সে  
মিস্ত্রির কোথায় ঘর। ঘরের দরজা নয় খান, ও তার সকলই প্রমাণ |  
অসংখ্য জানালা আছে কে করে অহুমান | ঘরের মাথা চৌদ্দ পোয়া চৌদ্দ  
ভূবন তার ভিতর। ঘরের প্রাচীর সপ্তপুত্র, সাধু-সন্ন্যাসী যেতে পারে  
অন্তর পক্ষে দূর | সেথা লাগে ধাঁদা চাকাচাঁদা প্রবেশ করা কষ্টকর।

ঘবের মূল তিন খুঁটি বেশ পরিপাটি/দডাদডি বাধারুঁধা সাড়ে তিন কোটি/  
 আছে পাচববনের পাঁচধবনেব পাচকুটুবি মনোহর। ঘবের ছয়তারা  
 কোঠা বেশ আঁটসাঁটা/সবার উপর আব একতারা মনিময় কোঠা/সেথা  
 দিবানিশি মাণিক জলে কতী বসে তার উপর। ধনু মিস্ত্রিব কৌশল ও তাব  
 ধনু বুদ্ধিবল | এষব কলেচলে এমনি চলে ৩৩মনি ধারা কল | ওরে কখন  
 ঘবের কি অবস্থা কতু স্থাবব কতু অস্থাবর। একথা মিথ্যা নয় ঘবের মাছুষ  
 যথা যায় | জলে অনলে এক মিশালে একত্রতে রয় | আছে সাধু-চোরে  
 বাক্সস-নবে বিষ-অমুত্র একত্র। ও নিত্যত ভেবেছিলেন তাই, ঘবের  
 ধনু কিসে পাই | ঘরে একে কতাব সঙ্গে আলাপ হেল নাই | আমি  
 দেশ-বদেশে খুঁজে বেড়াই না জানি ঘবের গব

১৩ এমন সুউজ্জ্বল আছে ওকলতা আছে / লতা ব শিকড় এই আচ্ছা ফুল ফুটে  
 আছে, পিণ্ডিত বুঝ পাছে কত শত যুগ গড়ে ফুল ফুটে আছে / এমন  
 ফুলের ভাগ্য শুণায়ে না পাঁড়ছে ॥ ( অধম কিশু )

১৪ চাঁদ ভুবন মাঝে এগটি নাদ্য আছে ১১ নদ নদ্যে সত্ত্ব শাকাব/বান  
 ন ছাঁড়লে নাতিশ পাবাপাব। একদিন মঙ্গল সাঁদিন সাঁ বাঁ স্থল  
 নাই তার অগাদ সাতাব লাভা নৌকান সঁ মাচ বন ছুটে ইচ্ছামতে  
 ছঁ সিয়াবে নামবে জলে দখ খবদাব ॥ ( তুগা গান দাস )

১৫ মহাশূন্য একগাছে হংস-হংসিনী আছে তারা ক ও হাব বাবছে / কোন  
 স্থখে আছে শাব বিকপে বাঁিয়ে | ২ পিণ্ডিত ওন দেহ পাচা বয়ে...সেত  
 হংস ক ০ ছলে মাঝা ডুণায়ে জলে পায়ব চ্খাণিয়ে ৩লে ব ডপবে বন  
 সবার উপবে। হেন গোবিন্দের উক্তি ক জানি হংসের স্থ ও সঁ সাবে  
 জন্মিয়ে / জলিছে বতনদীপ জলেতে থাকিয়ে ॥

সাধনতত্ত্ব এবং দেহতত্ত্বসম্পর্কিত গানগুলো জটিল এবং দুর্ভেদ্য রূপকের মাধ্যমে  
 রচিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এ গানের অর্থসুন্দর কবা সম্ভব  
 ব্যাপার। গুরু সাধাবনতঃ শিষ্যদের মধ্যে এ গানের অর্থ বিশ্লেষণ করে পাবেন।  
 যেহেতু এ-সমস্ত গান সাধন গুণনের গোপন রবণ ররণ, শ্রী সাধাবণের পক্ষে  
 দুর্বোধ্য এবং দুর্ভেদ্য কবেই এসব গান বচনা কর হয়েছে। চর্চাপদের ক্ষেত্রে  
 যেমন প্রহেলিকাময় ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তেমনি চুয়া গানেও এত  
 সব ক্ষেত্রে প্রহেলিকার ব্যবহার করা হয়েছে। সৈন্য সাধনতত্ত্ব বাদে  
 অধিকাব আছে একমাত্র তাঁরাই এসব গানের অর্থ এবং রস উপলব্ধি করতে

পারেন। অনেক গান তো পরিপূর্ণতঃ ধাঁধারই মতো। ধাঁধার সঙ্গে মূল পার্থক্য এই যে চুয়ার রূপক ধাঁধার রূপক থেকে অনেক বেশি জটিল এবং দুর্বোধ্য, ধাঁধার উত্তরটি জনশ্রুতিমূলক, কিন্তু চুয়া গানের গ্রাহলিকাব উত্তর বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব-মূলক।

১৬ ভাবি কথা হে, এ ভেদ অর্থ ভাব পণ্ডিতভ্রাতা। ভুলে জন্ম পিতামাতার না হয় পিতামহ কোলে নাতির উদয় / ভবে এ শুনেছ কোথা, / গাভী বিব-হিনী না হতে গণ্ডিনী বাছুরেতে খাচ্ছে পাতা হে। ভিতরে তরীর সমুদ্র ডুবে ভিজ়ে না বসন সলিলে কবে / ভিজ়া কাঠে অগ্নি কোথা, / ভ্রমর ছাণ্ডম্বালে পদ্মমধু ভুলে ভেকে কণীগিলে কোথা হে। ভয়ে কাঁপে সিংহ শশক মুখ হেবে, উভি পোকা হয়ে ভল্লকে সংহারে / ভুল নহে শাস্ত্রকথা, / ভগোলেতে কহে গাভী ঘব ছাহে বাঘে ধবে আছে ছাতা হে। ভর্ডাগৃহী মবে পরলোকে যান ভাষাসতী না হন বিধবা বিধান/ভণ্ডেতে না দোবে কথা,—ভণ্ড বিষ্ণু ভণে পাণ্ডু অজ্ঞানে ভক্তিপদে বাখি মাথা হে ॥

সবশেষে আমরা একটি বাধারক্ষবিষয়ক চুয়া গান পরিবেষণ করছি। সাধাবণতঃ এই শ্রেণীর গানগুলো গৃহী বৈষ্ণবেরা গেয়ে থাকেন। সুরমাদল বাজিয়ে এত শ্রেণীর চুয়া গান গেয়ে বৈষ্ণবেবা গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষা কবে বেড়ান। সাধনতত্ত্ব এবং দেহতত্ত্ব সম্পর্কিত গানের মতো এগুলো মোটেই জটিল বা দুর্বোধ্য নয়। অগ্গাণ্ড গানের মতো এইসব গান সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে, রসগ্রহণও করতে পারে। সুমূরের সঙ্গে এগানের বিষয়বস্তু কিংবা রচনাবীতির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধুমাত্র সুরে এবং অমুখক বাণ্যযন্ত্রে ব্যবহারে।

১৭ নূতন রাজা হে, শ্রামাপাখি চুবি গিয়েছে, | শ্রামা শ্রামা বলে পাখি শ্রামা-বরন ধরেছে। রাই আমাদের চন্দ্রমুখী পুষেছিলেন শ্রামাপাখি | শিকলি কেটে শ্রামাপাখি রাখায় ফাঁকি দিয়েছে। পাখির গায়ে পাখির চিহ্ন হস্ত-পদ রক্তবর্ণ | ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছে। পাখির উপর পাখির পাখা জোড়াভুরু নয়ন ঝাঁক। চলিতে চরণ ঝাঁক ঝাঁকায় ঝাঁকায় মিলেছে। পাখি খুঁজলাম দেশবিদেশে পাখির সন্ধান পেলাম শেষে | মথুরাতে আছে পাখি কুজায় ধরে রেখেছে। ভরত গোসাঁই-এর সাজা উচিং বিচার করবেন রাজা | মনোমত দিবেন সাজা যেমন কর্ম করেছে ॥

## চতুর্থ অধ্যায় বারোমেসে প্রেমসংগীত

ঝাডখণ্ডের বিশিষ্ট লোকগীতি রুমুবকে সাধারণ ৩: বাবমান্তা বা বারোমেসে গান বলা হয়ে থাকে, কাবণ রুমুব কোন বিশেষ ঋতু, মাস বা সময় সীমানায় মনো গীত হয় না। \*রুমুর সাবা বছর ধবে গাওয়া হয়, সময়-অসময় বিধি-নিষেধ রুমুবের ক্ষেত্রে নেই। রুমুবের বিষয়বস্তু মূলতঃ প্রেম, কখনো এই প্রেম দেহবলয়মুক্ত, কখনো বা দেহকেদ্রিক। তাই রুমুবকে প্রেমগীতি বলা যায় নির্দিষ্টায়; তবে রুমুবের বিষয় শুধুই প্রেম, এমন কথা বলা যায় না। প্রেমের অতিবিক্ত নানান চিন্তা-ভাবনাও রুমুবের বিষয় হয়ে থাকে। রুমুব মূলতঃ প্রেমনির্ভর বলে এবং প্রেম-গীতি সাবা বছর ধবে গাওয়া হয় বলে আমবা এই অধ্যায়টিকে বাবোমেসে প্রেমসংগীত নামে অভিহিত করেছি। তবে রুমুব নামে অভিহিত কবলেও ভুল হয় না।

জাওয়া এবং কাঠি নাচেব গানকে বাদ দিলে কবম নাচেব গান, ছোঁনাচেব গান এবং নাচনী নাচের গানকে রুমুব বলা হয়। আসলে নাচেব গানই রুমুর। সুদূর অতীতে রুমুবের রূপ করম নাচেব গানেব মতোই ছিল বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীৰ প্রভাব পড়লে স্বল্পশিক্ষিত লোক-কবির রচিত গানগুলো ভগিণায় ব্যক্তিনামাঙ্কিত হয়ে রুমুব পদাবলী রূপে ছায়াপ্রকাশ করে। কিন্তু নাচেব গানমাত্রই রুমুব হলেও বর্তমানে ব্যক্তি-কবি রচিত দীর্ঘাবয়বেব গানগুলোই রুমুব নামে পরিচিত। তবে সব সময়ই যে ব্যক্তিকবিব নামাঙ্কিত গানগুলোই রুমুর নামে পরিচিতি লাভ কবে তা নয়, উদয়া বা টা'ড রুমুব ব্যক্তি-কবি বাঁচত নয়, এগান সামূহিক সৃষ্টি।

বারোমেসে প্রেম সংগীতকে কষেকটি ভাগে ভাগ কবা যায়: (১) রুমুব, (২) ভাদরিয়া রুমুব, (৩) রুমুরেব বং, (৪) বং রুমুর এবং (৫) উদয়া বা টা'ড রুমুর। রুমুর, ভাদরিয়া এবং বং রুমুব ব্যক্তি-লোককবির রচিত গান এবং রুমুরেব বং ও উদয়া গান সম্প্রদায়েব সৃষ্ট অপৌরুষেয় গান। অনেকে নাচনী নাচের রুমুব নামে আর একটি শ্রেণীৰ কথা বলেন; আমবা তা বলি না, কারণ রুমুর, ভাদরিয়া রুমুর, রুমুবের বং এগুন কি কিছু-কিছু প্রহেলিকা-জাতীয় চুয়া গানও নাচনী নাচেব গান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই অধ্যায়ে যে সব গানেব আলোচনা করা হবে, সেগুলো প্রধানতঃ

প্রেমবিষয়ক। নর-নারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলে যে বেদনামধুর ভাবরাশি তাদের মানসলোকে আলোছায়ার সৃষ্টি করে, সেই সব ভাবরাশিই এই গানগুলোর উপজীব্য। এই বেদনা-মধুর ভাববাশির মধ্য দিয়েই নব-নাবীর প্রেমের অল্পভূতি প্রকাশ পায়। প্রেম বিশ্বজনীন; অরণ্যে গিবিগুহায় যেসব অসভ্য আদিবাসী বাস কবে তাদের হৃদয়ে যে প্রেমের দোলা দেখা দেয় তা সুসভ্য নাগরিক জন-চিত্তের প্রেমের দোলা থেকে পৃথক নয়। পার্থক্য শুধু প্রকাশ-ক্ষমতায় এবং ভঙ্গিতে; অসভ্য আদিবাসীরা ভাষাসম্পদ এবং শিক্ষা ও মননশীলতার অভাবে সভ্য শিক্ষিতজনেব মতো সুন্দর মার্জিত রূপে নিজেদের অন্তর-ভাবনা প্রকাশ কবতে পাবে না, স্বভাবতঃই তাদের প্রকাশভঙ্গিতে আদিমতা এবং গ্রাম্যতা থেকে যায়। বলাবাহুল্য, আদিবাসীদের প্রেম-বিষয়ক গানগুলো স্থূল-ভাবনায় ভরপুর থাকে, শিক্ষা এবং মননশীলতার অভাবে গীতরচনায় দক্ষতা এবং অল্পভূতির ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা অর্জন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু প্রেমের স্থূল দিকটিই প্রধানতঃ তাদের গানে রূপলাভ কবে, তাই এগুলোকে অনেকে প্রেমসংগীত হিসাবে গ্রহণযোগ্য মনে কবেন না। আমরা এহঁসব গানকেও প্রেমসংগীত বলে মনে কবি। দেশবিদেশে প্রেমের বীতিবেওয়াজ, ভঙ্গি এবং অল্পভূতির ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও প্রেমের মৌল উপলব্ধি সর্বত্রই এক; এবং এই উপলব্ধি যে-গানের উপজীব্য তা নিঃসন্দেহে প্রেমসংগীত। নবনাবীর পরস্পরের প্রতি জৈব-আকর্ষণ থেকেই প্রেমের উদ্ভব হয়; তাই প্রেমের অল্পভূতিব ক্ষেত্রে যে স্থূলতা, তা যদি গানেও দেখা যায়, যা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহলে সেই গান যে প্রেমগীতিই তাতে ঘিমত থাকতে পারে না।

জর্নৈক লোকসাহিত্যবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলেন, যথার্থ প্রেমগীতিতে অশ্লীলতা কিংবা গ্রাম্যতা নাকি থাকে সম্ভব নয়, কারণ এগুলো প্রেমের নিত্য বাহু, স্থূল প্রকাশ; প্রেমগীতির উদ্ভব হৃদয়ের গভীর অল্পভূতি থেকে ঘটে থাকে। এপ্রসঙ্গে একটি কথাই বলা যেতে পারে যে সমতল বাংলার জনতার হৃদয়াল্পভূতি এবং ঝাড়খণ্ডের আদিম জনতার অল্পভূত একই ভাষায়, একই বীতিতে প্রকাশ লাভ করবে, এটা ভাবা ঠিক নয়। সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজব্যবস্থা এবং রীতিরেওয়াজের ওপর নির্ভরশীল; সমতল বাংলা এবং ঝাড়খণ্ডের সমাজব্যবস্থা এবং রীতিরেওয়াজ এক নয়, তাই প্রেমগীতির রূপও এক হতে পারে না। ঝাড়খণ্ডের আদিম জনতার প্রেম-

গীতিতে স্বাভাবিকভাবেই স্থূলতা এবং গ্রাম্যতা আসবে, তাতে সন্দেহ কি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ঝাড়খণ্ডের প্রেমসংগীত রুমুরকে আঞ্চলিক গান হিসাবে উল্লেখ করেছেন, কাবণ এগান বাংলার সর্বত্র শোনা যায় না। তিনি বাংলার প্রেমসংগীত বলতে প্রধানতঃ ভাটিয়ালি গানকে বুঝে থাকেন, কিন্তু ভাটিয়ালি গান তো পূর্বাচল, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বঁকুড়ায় শোনা যায়না, শাহলে শ্রী বাংলার সাবজানীন প্রেমসংগীত কোন গুণে হয়ে ওঠে আমবা বুঝতে পারি না, অবশু বাংলার পশ্চিমাঞ্চলকে যদি বাংলার অংশ না মনে করা হয়, তবে বলার কিছু থাকে না। অতঃ তিন ঝাড়খণ্ডের আঞ্চলিক নৃত্য ছাড়া নাচকে বাংলার বাশষ্ট নৃত্য-সম্পদ হিসাবে দাবি করেন এবং গোঁবব বোধ করেন, যদিও এই নৃত্য তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে একান্তই আঞ্চলিক নৃত্য সংগত।

॥ এক ॥

ঝুমুর

ঝুমুর ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট প্রেমসংগীত। আগেই বলা হয়েছে, কবম নাচের গান, ছো নাচের গান, নাচনী নাচের গানও ঝুমুর নামে পবিচিত। তবে সাধারণতঃ দীর্ঘায়তনের প্রেমসংগীতগুলো, যা নাচনী নাচে যেমন গীত হয়, তেমনি একক ভাবেও গীত হয়, ঝুমুর নামে পবিচিত। অতি প্রাচীনকালে ঝুমুর ছো নাচের গান বা কবম নাচের গানের মতোই স্বল্পায়তনের হত। পবিত্রকালে তা উপ্তী জননী যখন বিস্তারিতভাবে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করে, তখনই ঝুমুর বর্তমানের পূর্ণাবয়ব লাভ করে। কবম নাচের গান বা ছো নাচের গানে প্রেমের প্রকাশ থাকলেও নির্ভেজাল প্রেমসংগীত নয়। কিন্তু ঝুমুর মূলতঃ প্রেমসংগীত। বৈফল্যপ্রভাবের ফলে রাধাকৃষ্ণের প্ৰেয়সীলাভ ঝুমুরের অঙ্গীভূত হয়, বলা যেতে পারে লৌকিক প্রেমের চেয়ে বাধাকৃষ্ণের প্রেমই শেষতক ঝুমুরের শ্রেষ্ঠ অংশ অধিকার করে ফেলে। তাছাড়া পৌবানিব ঘটনা এবং সামাজিক বিষয়ও এর উপজীব্য হয়ে পড়ে।

ঝুমুর সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুধীর্কুমার কবণ আদি অনেকেই তাঁদের বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। পণ্ডিতদের আলোচনায় দেখা গেছে, তাঁরাও এই গানকে প্রেমসংগীত হিসাবে স্বীকার করেন। ষোড়শ শতকের গ্রন্থ সঙ্গীতদামোদরে ঝুমুর শৃঙ্গাববসায়ক একটি রাগিণী হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে। কেউ বা বলেন, নৃত্যের সময় পায়ের নুপুর বা ঘুঙুরের ঝুম ঝুম শব্দ থেকে শব্দটির উৎপত্তি, অথবা কথায় তাঁরা বলতে চান যে ঝুমুর গানও নৃত্য-সম্পর্কিত। নাচনী নাচের গান হিসাবে ঝুমুরের ব্যাংহাবের কথা স্মরণে রাখলে গ্রন্থটি অসম্ভবমনে হয় না। বিভিন্ন গানেও ঝুমুর খেলাব কথা আছে, এবং এই ঝুমুর খেলা যে আসলে ঝুমুর নাচই তা'ও গান থেকেই প্রকাশ পায়। আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট কববার জগ্নু মিচে কয়েকটি কবম নাচের গান উদ্ধৃত করা হল।

আ'ককের বাতিয়া বড়ই বে জল কবলি

জান পলই হাতে ডাটম দবলি।

জু'লি বে জু'লি, মঘনে ঝুম'ব জু'লি ॥

আখড়া বন্দনা কবি আখড়াতে বুঝো ম'বি

আখড়া বন্দনা বেজনাবী, মগনে ঝুম'ব লাগে ভাবি ॥

আগেতে বন্দনা কবি গায়েব গবাম হবি

তা পরে বন্দনা বেজনাবী, ইঙ্গিতে ঝুম'ব লাগে ভাবি ॥

আস্ত্র মা সরসতী কঠে দাও ভব গ,

তবে আমি খেলব ঝুম'ব ॥

আস গ নাচনীরা। নাচ জু'ভিয়ে খেলা কবি ॥

গানগুলো থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথম গানটিতে মাছ ধবে ও গিয়ে আশ্রময় হয়ে 'ঝুমুর জু'ভবার' কথা আছে। অর্থাৎ ঝুমুর নৃত্যনিবপেক্ষ বিধিনিষেধহীন স্বাধীন সংগীত বটে। পরবর্তী দু'টি গানে 'ঝুমুর লাগাবাব' কথা আছে। এই ঝুমুর লাগা কথাটির অর্থ গান বা নাচ অথবা উভয়েই জন্ম ওঠা। চতুর্থ গানে 'ঝুমুর খেলা' পাওয়া যাচ্ছে; খেলা অর্থে গান এবং নাচ যে-কোনটি হতে পারে, অথবা দুটোই হতে পারে, তবে খেলা অর্থে নাচের দাবিটাই সংগত বলে মনে হয়। শেষ গানটিতে 'খেলা' শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট হয়েছে, এখানে নাচ জুড়ে খেলার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ঝুমুর খেলা বা শুধু খেলার অর্থ যে নাচ তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। তাছাড়া কবম নাচের গানও যে ঝুমুর, তা'ও বোঝা যায়।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বিশদ আলোচনার সাহায্যে ঝুমুর গানকে 'সাঁওতাল জাতির মৌলিক প্রেরণা-জাত' গান হিসাবে প্রমাণ কববার প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মতে ঝুমুর গান সাঁওতাল পরগণা জেলার মুণ্ডাভায়ী (? ) সাঁওতাল জাতির মধ্যেই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে কষ্টকল্পিত এবং ভিত্তিহীন তা ডঃ সূধীকুমার করণ তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার লোকখানে' প্রদর্শন কবেছেন। এটা অসংবাদিত সত্য যে সাঁওতালদের মধ্যে ঝুমুর নামের কোন সুর কিংবা গান প্রচলিত নেই। ডঃ ভট্টাচার্য ঝাড়খণ্ডী উপভাষা খেখানেই বুঝতে অসমর্থ হয়েছেন, সেখানেই সাঁওতালি ভাষা বা অন্য কোন ভাষার মিশ্রণের উল্লেখ কব্বেন। 'সাঁওতালি বাংলা ঝুমুর' কথাটি 'সোনার পাথরবাটি'র মতোই অসম্ভব বস্তু ছাড়া কিছু নয়। সাঁওতালদের মধ্যে যদি কিছু ঝুমুর গান অল্পপ্রবলিত হয়ে থাকে, তবে তা মাত্র-ভূমিজ কামার-কুমোর বাগালের প্রতিবেশী হিসাবে বাস কববার দলের ঘটেছে। আমরা অস্বীকার কব না যে, ঝুমুর আদিবাসীদের মৌলিক প্রেরণাজাত গান, এবং সাঁওতাল উপজাতি এত আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং ডঃ ভট্টাচার্য আদিবাসী বলতে সাঁওতাল ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ে কব সাহাজ্য থাকতে চান। তিনি ঝুমুর প্রসঙ্গে 'সাঁও জাতির ঝুমুরের উদ্ভূত' দিয়েছেন। কিন্তু 'সাঁও মুণ্ডাদের গানের বিশ্লেষণ' কবে ত্রুটি কভাসি সাঁওতালগোষ্ঠী বর্জিত গৃহীত কুমি-ভূমিজের গান বিশ্লেষণ কবে ঝুমুরের উৎস সন্ধান কববার চেষ্টা করেছেন। কুমি-ভূমিজ কামার-কুমোর বাগাল আদিদের মধ্যেই ঝুমুরের বাপক প্রচার। বর্চি জেলার ওরাঁও মুণ্ডাদের ঝুমুর গানের গায়নারীতি, সুর এবং বাজনা আলাচা ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ঝুমুরের সঙ্গে মেলে। আসলে ঝুমুর ঝাড়খণ্ড গোষ্ঠীবর্বিভিন্ন সম্প্রদায়ে গান, এত মগ সম্প্রদায় সাধারণতঃ ভাবনীয় আর্ধভাষার কোন উপভাষা কিংবা বিভাষায় কবা বলে এবং গানও বচনা করে। ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষায় যাবা কব বলে থাকে, তাদের আদিকাণ্ড মূলতঃ আদিবাসী, যদিও অনেক সম্প্রদায়ই বর্তমানে হিন্দুধর্মেও চেষ্টা করছে। সমতল বাংলার বাঙালীবা, কোনদিনই ঝুমুরকে 'আপন গীতসম্পদ হিসাবে আশ্রয় করে নি, ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী কিছু বাঙালী লোককবি নিত্যন্ত নাচনী নাচের আকষণে ঝুমুর গান সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ কবেছিল। বৈষ্ণবপ্রভাবের ফলে ঝুমুরে রাধাকৃষ্ণের অল্পপ্রবেশ ঘটে। ডঃ ভট্টাচার্যের মতে



বাঙালীবা রাধাকৃষ্ণেব নাম যোগ কবে আদিবাসীব সাংস্কৃতিক উপাদান ঝুমুরকে নিজেব লোকসংস্কৃতিব স্বাক্ষীকৃত করে নেয়। অর্থাৎ লৌকিক প্রেম-বিষয়ক ঝুমুবগুলো বাঙালীসংস্কৃতিব অঙ্গীভূত হতে পাবে নি। ঝুমুব কোনদিনহ বাঙালীব সাংস্কৃতিক উপাদান হয় নি। সত্যিহ ঝুমুব ঝাড়খণ্ডেব নিজস্ব প্রেমসংগীত' বাঙালীব দৃষ্টিকোণ থেকে একাঙ্কই আঞ্চলিক সংগীত।

ঝুমুর ঝাড়খণ্ডেব স্বল্পশিক্ষিত লোককবিদেব সচেতনভাবে সাহিত্য-সৃষ্টিব প্রয়াসেব ফল। এহ সব লোককবিদেব সম্মুখে আদর্শ হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলী ছিল। লৌকিক প্রেমবসেব চেয়ে বাধাকৃষ্ণ প্রেমবসে তাদেব কচি এবং আসাক্ত বাডবাব ফলে ঝুমুবে লৌকিক প্রেমগীতিব পাববর্ভে বাধাকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমগীতি বচিত হতে লাগল। পদাবলীব অনুকবণে লোককবিব তাদেব বচিত ঝুমুরে নিজদেব নামাক্তি করতে লাগল। আসলে তাব যা বচনা কবে, ত পল্লীসাহিত্য ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু উচ্চসাহিত্য সম্পর্কে তাদেব কোন ধারণা ছিল না, লোকসাহিত্যেব ধবন-বাবণ সম্পর্কেহ তাব ধ্যাক্তিবহাল ছিল। তাই পদাবলী সৃষ্টি করতে গিয়ে তাব লোকগীতিই সৃষ্টি করতে লাগল। জনত তাদেব রচিত ঝুমুব সানন্দে গ্রহণ কবল, কিন্তু লোকগীতিব ধর্ম অনুসাবেহ গানেব একটি লিখিত রূপ থাকাসজেঙ তা বিবর্তিত হতে লাগল, ভণিতায় আসল স্রষ্টাব নামেব বদলে বিভিন্ন গায়ক বিভিন্ন নামেব ডল্লেক করতে লাগল। ঝুমুরটি তখন আব ব্যাক্তিকবিব বচনা থাকল না, তা সমাজেব যৌথসৃষ্টিতে পবিণত হল। এইভাবেই ঝুমুব লোকসাহিত্যেব মধ্যে একটি গুরুত্বপূণ স্থান অধিকার করে। তবে পদাবলীব অনুকবণে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ঝুমুর বচনা করা হলেও 'উজ্জল নীলমণি'র কোন নির্দেশ বা অনুশাসন ঝুমুরে রক্ষা করা হয় নি। লৌকিক প্রেমের গানেব প্রথাসিদ্ধ বচনাশৈলী, প্রেমেব ভাব অনুভাবেক অবলম্বন করেই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ঝুমুব বচিত হযেছে। তাব ফলে এই সব গানে রাধাকৃষ্ণেব উপস্থিতি, বলতে গেলে, নিতাস্তই নামমাত্র, বস্তুতঃ এ গানেবও নায়ক-নায়িকা লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকারাই।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ঝুমুরকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় : ১) লৌকিক প্রেমবিষয়ক, ২) বাধাকৃষ্ণ প্রেম-বিষয়ক, ৩) পৌরাণিক, ৪) সামাজিক, এবং ৫) প্রহেলিকা-মূলক।

ঝুমুব যৌথসংগীত নয় ; তাই লৌকিক প্রেম-বিষয়ক ঝুমুবও একক কণ্ঠে গীত হয়। কখনো ঝাড়খণ্ডী যুবকযুবতী এককভাবে নির্জনে অবসর সময়ে

গান কবে, কখনো-বা নাচনী যুবতী তাব নৃত্য সহ একক কণ্ঠ গীত পরিবেষণ কবে। প্রেমের বিভিন্ন স্তর এই শ্রেণীর গানের উপজীব্য, বিবহ বেদনা প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ অল্পভূতি, তাই ঝুম্বের সর্বাধিক গান বেদনা মধুর বিবহ সংগীত। সংগীতে বেদনার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে; বেদনাই যেকোন মহৎ সৃষ্টির পশ্চাতে প্রেরণার কাজ কবে থাকে। বেদনাজাত গানে তাই অল্পভূতির গভীরতা বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। ঝুম্ব এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রথমে ঝাউখণ্ডী লোককবির প্রেম সম্পর্কিত উপলব্ধির গান উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

১ প্রেমের কথা বলতে নাই প্রেমের কথা কর্তে নাই | প্রেমের কথা বলতে গেলে তাবা হয় ত সাধুজন। প্রেম কব না বে মন, প্রেমে জাতিকুল যায় আব যায় জীবন ॥ বং ॥ প্রেমরসকে বাথ জলে তাথে কমল ফুল ফলে | ঐ ফলে হাত বাডালে সংশয় জীবন ॥ এ প্রেমের এল্লিগাবা বহিছে নদী স্রোতের পাবা | দে সাযবে আপ দিলে শ্যামা ব নিশ্চয় মরণ ॥ হাড় বাবের শেষ বাগী স্তন গে বাহ কমালনী | প্রবল কল দুগুন যাবে গেবে হাবাবে জীবন ॥

২ এমনি পিরিত্তির গুণ যেমন কাঁচা আমে মেশে তুন গো। আমে তুনে মেশা-মেশি হয় বৈশাখ মাসে। ও ভাব কবে যে ভাব বাগতে নাবে সেজন যায় গো নরকে ॥ বং ॥ এমনি পিরিত্তের লেঠা যেমন কা কাঁঠালের আঠা গো | ফল ধরে না ফুল ধরছে ধনি অভাগ্যাব দোষে ॥ টিমা ভাবে হয় গো জবা মণিহাবা ফণিব পাবা গো | এহ ভাবেব আশায় বে না থাকে তাকে বিশ্বাস কবে কে ॥

৩ লাল শালুকের ফুল ফুটে আ। বাহে, যাব সাথে যাব ভাব থাকে মাবলে কি ছুটে। বঁধু এত বাত কিসে, জাম এত বাত কিসে | পথে ঘাটে বিপদ হলে জানব কেমনে ॥ বং ॥ একে ও ভাদব গ্রাঁগাব বাতি বিজুল চমকে | এহেন সংকটে বঁধু এলে কেমন কবে ॥ ভাল চল এলে বঁধু বস পালঙ্কেতে | পা ধুয়াব নয়ন জলে মুছাইব কেশে ॥ দ্বিজ গদ্যাবে বলে আনন্দিত চিত্তে | অভাগিনী জেগে আছে তোমাবহ আশাতে ॥

প্রেমিকের জ্ঞান এতো উৎকণ্ঠ, এতো স্বপ্নযোগ, প্রেমের এমনি আনন্দমধুর গভীর পূর্ণতাও কিছু একদিন ব্যর্থ হয়ে যায়। যাব সাথে যাব ভাব থাকে মাবলে কি ছুটে—এমন বিশ্বাসভবা অকপট উচ্চারণ একদিন মিথ্যা প্রমাণিত

হয়। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা, প্রত্যাখ্যান, স্নেহ প্রবাস বা যে-কোনভাবে বিচ্ছেদ অনিবার্যতঃ ঘটে থাকে। বিবাহের কাল শুরু হয় আর বিবাহের যত্নের মধ্য দিয়েই প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমকে আবার গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পাবে। অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বেদনা-মধুর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সন্মুখীন হয় তারা। তাদের এই বেদনাই সংগীতের উৎসস্বরূপ শতধাওয় পুলে দেয়। বস্তুতঃ হয় মধুর ম বেদনার গান বিবাহসংগীত।

৪ আয়ল ববধা ঋতু পিয়া পবদেশ গে। বার্তমা বিতল জাগি ভাবিগুণ শেৎ গে ॥ চপলা চমকে ধন শাহাবই উদ্দেশ গে। শ্রাবণে বাবছে বুঁদা জমি ভিজি গেল গে ॥ হিয়া পীদি পালঙ্কেতে দিয়া ছাছি ঠেস গে। এমন সময়ে শামাব পিয়া পবদেশ গে ॥ বার্তা জাঁধাবি ঘোব নাহি স্নেজে লেশ গে। এমন সময়ে আমার পিয়া ছাডি গেল গে ॥ দ্বিজ হবিপদ কহে কহিছে নিঃশেষ গে। জীবনমরণে একা একাই থাকে বেশ গে ॥

৫ প্রেম কি সহজে হয় শাগাম দিগাম ভাবনে হয় | জুড়া প্রেম শান্তি কিসে শ্রেণ গে, শ্রাবণে আমি না বাসি পব গো, পুলে কথা গোচরে বলু গো ॥ বং ॥ তোমার রূপের প্রেমমাধুরী আমি না ভুলিতে পাব। খনে খনে মনে পড়ে তোব মুখের স্বব গো ॥ আগে তুমি দিয়ে আশা হবে কেনে নৈবাশা গো | পায়ে ধরি বিনয় করি বাসিও না পব গো ॥ এ হেন হাড়িবামে বলে ভাঙা প্রেম কি জুড় চলে | মনে ভাব ছিঁটা ছুধে বসে না সর গো ॥

৬ নিতান্ত কাঁদালে আমাবে তুমি এ দুঃখ জানাব কাহাবে আমি | বড় শেল দিলে গো অন্তবে। শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে আমি ভুলিতে না পাবি তোমাবে | যাবে যাও ধনি মনে রাখবে গো আমাবে ॥ বং ॥ নয়নেব তাবা তোমার অদর্শনে পুড়ে মবি আমি বিবহ আশুনে বল প্রাণ জুড়াই কেমনে | দারুণ মদন দিতেছে যাতন সে যাতনায় হিয়া বিদবে ॥ নিশ্চয় কহিলাম বচনসাব তুমি গেলে প্রাণ না বাখিব আব মুখে নাহি বাক্য সবে | মণিহাবা কণী যেন ভুজঙ্গিনী ছাড ছাড প্রাণ কাত ॥ কুলমান ধন সকলি সঁপিলাম আমি তবু ত আমাব হলে না তুমি | নরোত্তম ভণে আমায় এতদিনে ভাসাইলে অকুল পাখাবে ॥

প্রেম-ভাবনার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে লৌকিক প্রেমের এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক

ঝুম্বৰঙলো লৌকিক প্ৰেমের ঝুম্বৰ থেকে বচনাশৈলীৰ নিবীখে অবশুই পৃথক। বাধাক্ষয়বিষয়ক ঝুম্বৰ পদাবলীৰ আদৰ্শে বচিত। ঝুম্বৰকাবেবা পদকাবদেব বচনা অন্ধ অন্তকৰণ কবেছে বললে 'তুল বল' হয় না। কোথাও কোথাও বচনাৰ দিক দিয়ে পদঙলোকে ভেঙে সামান্য হেৰুওব কবে ঝুম্বৰ বচনা কবা হযেছে, ফলে গানঙলোনিশ্ৰাণ এবাং আ ডষ্ট হযে পড়েছে। লৌকিক প্ৰেমের ঝুম্বৰে জদযাভূতি প্ৰকাশেব যে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য কবা যায়, বাধাক্ষয়বিষয়ক ঝুম্বৰেব বহুক্ষেত্ৰেই তা দ্বিধা গ্ৰস্ত। পদাবলীতে শুষ্ক বাধাক্ষয় প্ৰেমের বিস্তৃত স্তৰ ঝুম্বৰেও কপাখিও হযেছে। তবে পূববাণ, স্মৃতিসাব, মান, খণ্ডিতা স্তব প্ৰয়াস বা মাখন হত্যাদি প্ৰথম স্তবঙলোগে ঝুম্বৰকাবদেব দৃষ্টি প্ৰশ্বেষণাবে শাবকণ বনেছে। বোন বোন কাল অবশু ঝুম্বৰ বচনায় শাশ্বেব মেব সাফল্য অর্জন কবেছে, ছন্দে-উপমায অলংকাৰে বহু ঝুম্বৰ উচ্চ কাবদ্যসম্পন্ন বচনায় উন্নীত হযেছে। পদাবলীৰ বৈষ্ণব অন্তবাগ-বস ঝুম্বৰ সকাৰিত হবান সংগে এবে বৈষ্ণব বসশাস্ত্ৰেব অন্তশাসন না মানাব বলে এঙলো লৌকিক তাবে স্পৰ্শে পূব প্ৰেমসংগীতে পরিণত হযেছে। বাউথণ্ডেব জনমানসকে ঝুম্বৰ বতোখানি অৰ্ভিত কবে বখেছে, ততোখানি অগ্ৰগানে প্ৰতিবিত কবেতে পাবে নি। ঝুম্বৰেব বিাযবস্ত প্ৰধানতঃ প্ৰেম, তাই সাধাবণ মাখনে বহু পেমসংগীতেব মধ্য দিয়ে তাঁদেব চুঃপবেদনা, হতাশা দীঘল্যাস ভোলবায় অন্তপ্ৰেবণা লাভ কবে। প্ৰেমসংগীত ঝুম্বৰ কাউথণ্ডাদেব অপবেব সম্পদ। পম, শাসে লৌকিক শাক কিংবা বাধাক্ষয়বটত, তাঁদেব অন্তবলোককে বস্ত কবে তোণো। এণানেই প্ৰেমসংগীত হিসাবে ঝুম্বৰ গানেব চৰম সাংগাং।

। চবণে যাবক কবেছে আলোক পাটলি স্মৃৎ চায় বে, | শাহাং মনুৰ বাজিছে  
 মনুৰ দেপি বতি মনুৰায় বে। দেপ ও স্তবল ভাঙ বে, বপেব তুলনা দিবাক  
 কাব ব ॥ বং ॥ পদাঙ্গুলে যাব নখর সুন্দব কৈ শোভা সাজ্যেছে তায বে |  
 অগ্ৰে স্মৃবিমল কোকনদদল মতি যেন বসে তায বে। বামবস্তা তক জিনি  
 যুগ্ম উক আছে বসনে চাকায় বে, | গমন মন্তব হেবি কবীবব দেখি মনে  
 লাজ পাষ বে। কটিদেশ জিনি শোভিত কিংকিনী হবি কেশবী পালাব  
 বে, | জ্বন সুন্দব অন্তহুর ঘর উপমা দিবাব নাহ ব। পয়োদবশোভা  
 অতি মনোলোভা সরল তবল বায় বে, | কুচে দেহি কথো কমলবালিকা  
 দেখ জলেতে লুকায বে। ভূজযুগ তাবে ততি চমৎকাব দালনী মাধুবী তায়  
 বে, | বলয়াবজিত মধুৰ সংগীত গুনি অলি লাজ পায বে। নীলমৰ্ত্তি শাড়ি

অতি উজ্জয়ারী আছে শোভা করি অধিকার রে, | কনকেরি লতে মণিমর-  
কতে জড়িয়ে রেখেছে তায় রে । গজমোতি হার কিবা শোভা তার মাতঙ্গ-  
গমনী তায় রে, | কণ্ঠ দোখি কল্প প্রবেশিল অসু ভণে দীন চৈতনায় রে ॥  
ঝুমুরটিতে বৈষ্ণব পদাবলীর অলুকের ফলে কিছুটা আড়ষ্টতা দেখা দিলেও  
সাফল্য যে নিতান্ত অর্কিষ্ণংকব নয় তা বোঝা যায় । রাধার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ  
প্রেমিক কৃষ্ণের মনে কি অতৃতপূর্ব আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, তা উপমার  
প্রয়োগের ফলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাসম্পর্কিত গানগুলোর মধ্যেও যেমন পদাবলীর  
অলুকের লক্ষ্য করা যাবে, তেমনি ঝুমুরকারদের নিজস্ব প্রেম-ভাবনার পরিমণ্ডলে  
বাধাকৃষ্ণেব প্রেমের আকাশকে ছোঁয়াব প্রয়াসও দেখা যাবে । পূর্ববাগ অলুরাগে  
পরিণত হলে সংকেত, অভিসার, মিলন, মান, কলহ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি বিভিন্ন  
স্তরগুলো যেমন রাধাকৃষ্ণেব প্রেমের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তেমনি লৌকিক প্রেমেও  
এই সব স্তর অনিবার্যতঃ এসে থাকে ।

৮ একদিন নিকুঞ্জবনে বাধারে পড়িল মনে ব্যাকুল হইল শ্যামবায় | দোসর  
নাহিক সাথে কেবল বাঁশবী হাতে কে আনিয়ে রাধারে মিলায় । এই  
চিন্তা করি হরি বলেন রে বাঁশবী মাও রাধা আছেন যেপায় / বাঁশি বলে  
বংশীধারী আমি কি যাইতে পারি আমার চরণ দুটি নাই । কৃষ্ণ বলেন  
বাঁশি তবে কিসে প্রাণ জুড়াইবে রাধা বই নাই উপায় বে | ও বাঁশি রাধা  
বল জুড়াক জীবন রে ॥ রং ॥ জান নাকি বাঁশি তুমি রাধাতে বিক্রীত  
আমি রাধা আমার জীবনের জীবন / বাধা মন্ত্র রাধা তন্ত্র রাধা আমার  
মূলমন্ত্র রাধা বিনে সাধন অকারণ রে ॥ রাধা নাম শুনিবার জন্ত বৃন্দাবনে  
অবতীর্ণ বনে থাকি করি গোচারণ | এম্মি প্রেমময়ী রাধা যার জন্তে নন্দের  
বাধা আজ মাথে করেছি বহন রে ॥ কহে ব্রজরাম দাস স্তন ওহে শ্রীনিবাস  
বাঁশিরে দোষ দেওয়া অকারণ | যা বলাবে কালশশী তাই ত বলিবে বাঁশি  
বাঁশি বল কি জানে মরম ॥

৯ যমুনাতটে নীপনিকুঞ্জ প্রস্ফুটিত তথা প্রসূনপুঞ্জ গুঞ্জরে অলি মাতিয়া |  
সেখানে মুরারী বাজাছেন বাঁশবী রাধা রাধা রাধা বলিয়া । চলে যায়  
গো রাধে চলিলেন রাধে দামিনীগতি জিনিয়া | ধনির চঞ্চলচিত্ত অঞ্চল  
পড়ে খসিয়া ॥ রং ॥ একে ত ভাদর রাতি আঁধারি তাহে একাকিনী  
চলে রাজকুমারী, ধনি, ক্ষণে পথ যায় ভুলিয়া, | সংকেতে মদন দেখান

তখন বিজুলি আলো জ্বালিয়া ॥ রসে দুৰু দুৰু কাঁপিছে হৃদয় পলকে  
বিলম্ব প্রাণে নাহি সয়, মনে মনে যায় উড়িয়া | ভাবে শ্রামতনু দহিছে  
অতনু তনু যায় যেন জ্বলিয়া ॥ শুনিয়ে সঘনে মুরলীর তান চমকি চমকি  
উঠে ত পরাণ, ধনির চরণ যাইছে টলিয়া, | ভবপ্রীতা অতি চঞ্চলমতি  
মাধবদর্শন লাগিয়া ॥

ঝুমুবে বিরহের গানের সংখ্যাই সর্বাধিক। রসঘন অন্তর্ভূতির প্রকাশ ঘটে  
বিরহসংগীতে। বিরহ-পর্যায়ের ঝুমুর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের হয়ে থাকে।  
খন বেদনায় অন্তর্ভূতি এবং ভাষাও বুঝি বা ঘন হয়ে উঠে। 'আব তাই স্বল্প  
কথাব মধ্য দিয়ে বিরহের গানে বিস্তৃত গভীর ভাবনাও বিস্তৃত হয়।

১০ কি বোল বালয়ে গেল কি আশুন জেলে দিল হায়,ব, জনমে না নিভিল |  
বড় প্রাণে দাগা দিল, না জানি সে কোন্ দেশে গেল ॥ রং ॥ নবঘন মেঘ  
হেবি চাতকিনীর আশাবারি শেষে বারিবিন্দু না পড়িল। 'আমি ভাবি  
যার জন্তে সে কেন ভাবে না মনে ভেবে-ভেবে পাঁজব খসিল। গোলাপ  
পলাশ ছেড়ে এসে বসলে শ্রীমলে রামকৃষ্ণেব আশা না মিটল ॥

১১ কিরা করে গেছে ফিরে কাল আসিব বলে। কাল নয়ন হৈল অন্ধ আশা  
পপ চেয়ে। বাঁকা গেন কেমনে ছাড়ায়ে, শরমভরম হরে নিয়ে গো ॥ রং ॥  
সমাজেতে হলাম দোষী যাহার লাগিয়ে। বেঁধেছিলাম সহচরী পাবাণেতে  
হিয়ে ॥ দ্বিজ গদাপবে বলে কি হবে ভাবিয়ে। কাঁদাইতে ভালবাসা  
নিষ্ঠুর কালিয়ে ॥

১২ নিশিতে স্বপনে রাই মাপবসন্ধানে যাব ক'ত আনন্দ হিয়ায় | ভাঙিল  
যুমেব ঘোর বিরহজ্বালায়, রে দিল ধরা নাহি যায় ॥ রং ॥ সখীগণে বলে  
প্যারী স্বপনে নাগর হরি আমাবে বসায় | আপনার বস্ত্র লয়ে চরণ পুঁছায়  
রে ॥ কুচয়ুগে ধরি জোবে রমণ করিবার তরে ও সে আমারে জাগায় |  
হারু বলে এ জনমে পাবে না কানাই ॥

১৩ আঁধার ভাদর রাতি দেখিয়ে তডপে ছাতি পতি নাই পালঙ্ক উপবে | সখি  
রে প্রাণ দহে মদনের শরে, কেমনে রহিব শূন্যঘরে ॥ রং ॥ একে ত অবলা  
বালা দোসরে যৌবনজ্বালা কেমনে রহিব শূন্যঘরে। বিনা সেই শ্রামধন  
না রাখিব এ জীবন ভবপ্রীতা হরিপদ ধবে ॥

ঝুমুরে বারমাসী সংগীতেরও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বারমাসী সংগীত বিরহ-  
সংগীতেরই অন্তর্ভুক্ত। ঝুমুর এই শ্রেণীর গানের মধ্য দিয়ে ঋতুচক্রে পরিবর্তন-

শীল প্রকৃতির পটভূমিকায় বিবহিনী নাবীব মনোবিশ্লেষণেব চেষ্টা করা হয়। কোন গানে প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য প্রাধান্য পায়, কোথাও বা নারীমনেব ভাবনাগুলো প্রাধান্য পায়।

১৪ মাঘ-ফাল্গুন বসন্তকালে ফুলে ফলে সখি ভবত ডালে | নানাফুল হেঁবি মনে  
পড়ে হবি আমি একেলা কুঞ্জেতে বইতে নাবি | আজও কুঞ্জে নাই এলেন  
বনমালী, চিত চঞ্চল দেহ ভাব ॥ বং ॥ চৈত্রে চাতকী বৈশাখে শবা  
শ্রিয় পিনে সখি জীযন্তে মবা | এনে গ্রামবায় মিলাও গো আমায় আমি  
একেলা কুঞ্জেতে বইতে নাবি ॥ ঠাক্যে ঠেয়মুনায বহত বাবি আঘাটে নবী ॥ নখ  
সঞ্চাবি | কাল মেব হেঁবি মনে পড়ে হবি আমি ঝাঁপ দিয়ে তবে মদি ॥  
শ্রাবণ মাসেতে বাবখা ভাবি দুক দুক কবে শ্রামেব দাছুবী | পড়িলে ভাদব  
অতি সে বাব কামিনীদেব মন চুবি ॥ আশ্বিনে অগ্নিকা দেবীব পূজা  
কার্তিকে কানাকে কবন বাজা | আঘেসেব সন্দে কানী পজে বঙ্গে যত  
গোপীগণ মিলি ॥ অগ্রহায়ণ পৌষ দু'মাস হেঁবি বাব মাসে কুঞ্জে না এলেন  
হবি | উল্ল মবি মবি দৈয় হন্তে নাবি দে গো গলায় ছুবি নখে মাব ॥ দ্বিজ  
গঙ্গাবামে নামে কুমুদী বাব মাসে কুঞ্জে না এলেন হবি | সব সখী মিলে  
দে গো শ্রুতন জলে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মবি ॥

বামাষণ-মহাভাবতের কাহিনী পৌৰাণিক কুমুদের উপজীব্য। কখনো কুমুদ-  
কাবেবা এক একট উপাখ্যান খবলখন কবে বেশ কয়েকটি কুমুদের একট  
পাণা বচনা কবে। বামাষণেব উপাখ্যানেব মধ্যে বামচন্দ্রেব বনবাস, সীতা-  
হরণ, ভবন-মিলন, বাবণ বধ এবং মহাভাবতের উপাখ্যানেব মধ্যে পাশা  
খেলা, অজ্ঞা বনবাস, ভীষ্মেব উপাখ্যান, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আদি সবিশেষ জনপ্রিয়।  
লোককবিগণ নাটকীয় মুহূর্তগুলো কুমুদে গীতবদ্ধ কবে কখনো-কখনো যথেষ্ট  
দক্ষতার পবিচয় দিয়ে থাকে। কৃত্তিবাসী বামাষণ এবং কাশীদাসী মহাভারতের  
কাহিনীই কুমুদকাবদের আদর্শ, তাই কাহিনীগ্ৰন্থনে তাদের তেমন কোন  
স্বকীয়তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

১৫ অখোধ্যা নগরে ঘব নাম বটে বসুবব সঙ্কেতে লক্ষণসহোদব বে, | ভবতেবে  
বাজ্য দিয়ে মোরে বনে পাঠাইয়ে আনন্দিত হয়েছেন তাব রে, | সীতাকে  
কবেছি হাবা বে, আমবা হুঁতাই বুলি পাগলেব পাবা বে ॥ বং ॥ যেদিন  
হতে গেছে সীতা চুই ভায়েব নাই দিশা ফলজল কিছুই খাই নাই বে |  
সীতা প্রাণেব বেগু দাঁহছে মোদের তহু কে দেখেছ সীতা বল না তোমবা

য়ে ॥ যে দেপাবে মোরে সাতা তাহ বে করব বাজ শুন বলি বানব  
বিবরণ বে | সীতা প্রাণেব বেগু দাহছে আমাদের তহু অবম বহিম কাঁদে  
দিশাহারা বে ॥

-৬ কৃষ্ণ অর্জুন দুইজন বধে কবি আবোধন উপনীত সমব মাঝাবে | হেবিয়া  
ফাল্গুনী কয় শুন প্রভু দয়াময় এ ছাব বাজো নাহ প্রযোজন, শুন শুন  
শ্রীমবুন্দন ॥ বং ॥ ধনুকাবণ তাজা কবি বাসনোন বগোপাব হে মুবাবী কবি  
নিবেদন | ছাব ন করিববণ পুনঃদ্বিবে যাববন বলি, প্রামায় স্বরূপ বচন ॥  
স্রোণশুক অশখামা কৃপাচাষ শল্য মাম পিতামহ গজাবি নন্দন | কেমনে  
কবিব হত বন প্রভু জগন্নাথ অনাব হতব পঞ্চজন ॥ একলক্ষ বাজাগণ  
শতপ্রাণা দুযোধন কেমনে কবিব বিনাশন | শোকবৈশি গজাবী মাতা  
ধতবান্ধি জ্যেষ্ঠ পিতা কাঁদবেক শত বাগণ ॥ টান হে হস্তব দড়া ফিবা ॥ হে  
বণেব ঘোড়া শিবিবেতে কবিব গমন | প্রাণা কথ বব জুড়ি বদি না  
দিবাবেন ছবি পদএতে কবিব গমন ॥

ঝুম্ববে মধ্য সামাজিক ঝুম্ববহ সবায়ক জীবনাসংস্কৃৎ সংগোষ্ঠান, দাম্পত্য-  
জীবন, আধুনিক নাবা ও বব, সামাজিক বাঁওবে খাড, সামাজিক দুর্নীতি ও  
বান্ধিচাব লোককাঁবব মনে কাঁবেবে সংকাঁব কবে, এঙলোখ ওপব তিথক দৃষ্টি  
ফেলে ঝুম্ববকাঁবেবা বন্ধবস উপভোগ কবেন এবং অম্মমুব ভাবায় স্লেব বিক্রপ  
সহযোগে ঝুম্বব পরিবেবণ কবেন—ফলে এহ শ্রেণীব ঝুম্ববঙলো অত্যন্ত সরস  
হয়ে ওঠে । সামাজিক ঝুম্ববেব মূল বসটিহ হল বন্ধবস, এব সঙ্গে প্রয়োজন-  
মতো স্লেব বা বিক্রপেব ফোডন দেওয়া হয়ে থাকে মাত্র । কাঁডগণ্ডেব প্রত্যক্ষ  
বাস্তব জীবন নিপুঁত এবং নিভেঙালভাবে চিত্রিত হয়ে থাকে এহ শ্রেণীব  
ঝুম্ববে ।

১৭ বাঁক্যে গেল মীনার মায়েব মন, যেমন কুকুবেব নেজেব মতন । বাজা  
মাছাজনের দেনা মীনার মা কিছুই জানে না আবহ তুজে বসনভূষণ । পাব  
বল্যে ছিল আশা মীনাব মায়েব ভালবাস, এটা কেবল নিশিব স্বপন ।  
যদি দ্বিথম পয়সাকাঁডি খাতে পাথর্যম ভাতমুহি উটা কেবল উপবি যতন ।  
দ্বিজ গদাধবে বলে মীনাব মায়ের কথায় চল্য এখন আমার নিকটে মরণ ॥

১৮ কলিয়ুগের দেখ রীতি পুরুষেব পালটেছে মতি | বউ-এর কথায় চলে পতি  
বউ-এব আঁচল ধরুকে | লাজে মবি লাজে মরি দেখে কঁলিব ঘোরকে ॥  
রং ॥ স্বামী স্ত্রী কোথাও গেলে স্ত্রী ফরুকে ফরুকে চলে | ছেলে কোলে



স্বামী চলে বউ চলে ছলরকে ॥ বৌ শুয়ে থাকে বিছনাতে পুরুষ যায়  
রাঁধনশালেতে | বৌকে কিছু বললে দেয় গাল শরম ভরম কাড়কে ।  
বউ-এর হুকুম তামিল করা এই হয়েছে কলির ধারা | বিপিন হল  
দিশাহারা ফেলে আঁধির লোরকে ॥

১০ ধরম করম সব ঘুচালি, তুঁই, ভাই-এ ভাই-এ লাগাঁই দিলি | বাপে-  
বেটায় মারামারি পিটাপিটি করালি রে করালি ; | ধগ্গ ধগ্গ ওরে কলি,  
সবাইকে তুঁই নিজের বশে ঘুরালি রে ঘুরালি ॥ রং ॥ তোর যুগেব এম্মি  
ধাবা ভাইবোনে হয় ঠশারা | তুঁহেই যে বে পথে-ঘাটে পিরিত করা  
শিখালি রে শিখালি । তোমাব কথায় নবনারী করে জুয়া-ডাকা-চুবি |  
রাঁড়ীরােকে কেনে রে তুঁই রংগীন শাড়ি পবালি বে পরালি । তোর কথায়  
নারীগণ ছাড়ে নিজ পতিধন | পরপুরুষেব সঙ্গে তাদেব তালে তালে  
নাচালি রে নাচালি । ছলচাতুরি মদখোরী প্রবঞ্চনা দালালগিবি  
বেজাগিবি চোরডাকাতে দেশটাকে তুঁই ডুবালি রে ডুবালি । ওবে কলি  
তোমার বোলে সতীশ চিপায় আঁপেব কলে | জবরজস্তি কেনে রে তাব  
সাধুয়ালি ছাড়ালি বে ছাড়ালি ॥

সবশেষে প্রহেলিকা-মূলক ঝুমুর । এই শ্রেণীর গানে সোজাসুজি মনোভাব  
বাক্ত না করে ধাঁধা বা প্রহেলিকার আকাবে গানেব অংশবিশেষ প্রকাশ করা  
হয় । প্রহেলিকাটুকুর অর্থ উদ্ধার কবতে না পারলে ঝুমুবেব শ্রবণ উপলব্ধি করা  
যায় না । এই জাতীয় ঝুমুরের আসল আকর্ষণ অই প্রহেলিকার মধ্যে নিহিত  
পাকে । সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমবিষয়ক ঝুমুরে এবং দেহতত্ত্বেব গানে  
প্রহেলিকার প্রয়োগ করা হয় । বলাবাহুল্য, ঝুমুরে প্রহেলিকার ব্যবহার  
অত্যন্ত সীমিত ।

২০ অম্বর শিবাক্ষে সমর্পণ করি তাহাতে আবার রামগুণ ধরি পচন্দ্র হরিয়া  
পরে | এই মাত্র বাণী কহি নীলমণি চলি গেল মধুপুরে । ত্যাজিল মোরে  
লম্পট নটবরে ॥ রং ॥ পরার্থে আশে যাহার বাস তার প্রাণবন্ধুবরে আশ |  
যক্ষেশ আশায় প্রকাশিত তায় পুনঃ সে না এল ফিরে । পিতা-সুত-যান  
রণধ্বজে যার সেই সদা প্রাণ দহে গো আমার নিকটে না হেরি তাহারে |  
কোকিল কুহরে ভ্রবণ বিদরে আর বাঁচিব কি করে । শুন প্রাণসখি স্বরূপ  
বচন রবিস্মৃত-ঋত করিব সেবন এ দুঃখ নিবারণ তরে | ভবপ্রীতা ভণে ডঙ্ক  
নারায়ণে লক্ষ পুর দরবারে ॥

২১ এক তরুণের তিনটি শাখা পঞ্চ বক্রে তার পত্রলেখা তিনপুর ছায়া ব্যাপিয়া |  
 বিনা ফুলে ফল ধরিয়াছে দু'টি বিনা রসে রস ভরিয়া | সাধুজন লও চিনিয়া,  
 ওহে গুরুজন লও চিনিয়া ॥ রং ॥ অই, ফলমধ্যে এক সুখের বসতি বিনা  
 খেয়ে রস আনন্দয়েনিত্তি, তাব, স্থিত্তি নাই থাকে বসিয়া | সে পুরুষ জাতি  
 না হয় যুবতী পঞ্চ ডিম্ব গেছে পাড়িয়া | সেই, পঞ্চ ডিম্বে ছেলে একটি বেথা  
 নিজে উড়ে কিন্তু বাপেবই পাথা জানে নাই পিতা বলিয়া, | পুত্রেরই  
 গর্ভেতে মাষেব জনম এদের কেবা স্বামী লও চিনিয়া । এ তত্বেব সাব  
 বেদে না পাইবে গুরু চক্ষুদান দিলে সে চিনিবে দীনা কয় গুরু সেবিয়া |  
 কাষ্টেব ভিত্তব আছয়ে অনল, অগ্নি, যতনে পাইবে ঘদিয়া ॥

॥ দুই ॥

### ভাদরিয়া ঝুমুর

ভাদরিয়া বা ভাদুরিয়া ঝুমুরকে কেউ কেউ কবম নাচেব গান বা পাতাশালিয়া  
 গীতেব সঙ্গে এক কবে দেখেছেন । কেউ বা বলেন, ভাদ্রমাসে অক্ষুষ্টিত গীতেব  
 নাম ভাদরিয়া ঝুমুর । অস্বীকার করবার উপায় নেই, কোথাও কোথাও  
 ভাদ্রমাসে অক্ষুষ্টিত কবম নাচের গানকে ভাদব্য বা ভাদরিয়া গীত বলা হয় ।  
 আমরা স্বীকার করি, উল্লেখিত ব্যাখ্যাগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে । তবু আমরা  
 ভাদরিয়া ঝুমুর নামটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে কবি । সাধারণ ঝুর এবং  
 ভাদরিয়া ঝুমুরের মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই । লৌকিক  
 প্রেম এবং রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়লীলা উভয় শ্রেণীর ঝুমুরেরই বিষয়বস্তু । এই দুই  
 শ্রেণীর ঝুমুরের মধ্যে মূল পার্থক্য গানের বচনশৈলী বা গঠনভঙ্গিতে এবং সুরে ।  
 আগলে ঝুমুরের একটি বিশিষ্ট সুরের নাম ভাদরিয়া, যেমন তামাড অঞ্চলে  
 প্রচলিত সুরের নাম তামাডিয়া এবং সেই সুরের ঝুমুরকে কেউ কেউ তামাডিয়া  
 ঝুমুর বলবার পক্ষপাতী । ভাদরিয়া ঝুমুরের সুর ক্ষুণ্ণ এবং উচ্চল হয়ে থাকে ;  
 এ সুরকে 'রঙিন' বলা হয় এই কারণেই । কবম নাচের গানের সুরের উন্নত  
 রূপ এই ভাদরিয়া সুর । তাছাড়া রচনামূল্যের দিকে দিয়ে এগান ক্ষুণ্ণত্বের পদের  
 সাহায্যে গঠিত হয় এবং সাধারণ ঝুমুর থেকে আয়তনেও ছোট হয়ে থাকে ।  
 গঠনরীতিতে 'সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 'তা হল প্রতি কলির দ্বিতীয়

পঙক্তি। এই দ্বিতীয় পঙক্তির গোড়ায় সাধারণতঃ চার অক্ষরের পরে একটি ষতি বা স্বল্পবিরতি থাকে, গায়নরীতির দিক দিয়ে একে 'শম' বলা যেতে পারে। নিম্নোক্ত গানগুলো লক্ষ্য করে দেখলেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যাবে।

- ১ ঘনঘটা রাতিয়া চমকে বিজলিয়া | থাকি থাকি, জলে বিরহ আশুনিয়া।  
কোথা আছ প্রিয়তম দেখ না আসিয়া | অদর্শনে, আছি মরমে মরিয়া।  
অধ কাঁপে থরথর হানে রতিপতিয়া | বিফলেতে, গেল যৌবন বহিয়া।  
ভরতকিশোরে বলে থাক ধৈর্ষ ধরিয়া | পূরাহব, আশা বদন চুমিয়া ॥
- ২ সারা নিশি রইলাম বসি বকুলভলায় গো | কমলিনী, ধনি তোমার আশায়  
গ। | শীতলী বাতাস বহে শীতে কাঁপে গা গো | সাড়া নাহি, সে ত ডাকে  
ইশারায় গো। | আর কি বিশ্বাস হয় তোমারি কথায় গো | নরোত্তমায়,  
ও বাদ সাধলে আমায় গো ॥
- ৩ পিয়া পিয়া বলিয়া কাঁদত বিনোদিয়া | শূনাভেল, মোর গোকুল নগরিয়া।  
আসিব বলিয়া পিয়া গেল ছাড়িয়া | দিবানিশি, ধনি রহল নিরথিয়া।  
অবলা জাতিয়া কেইসে ধরত হিয়া | মনে পড়ে, কালার নবীনপিরিতিয়া।  
বিধু অনাথে ভণে মনে মনে খুঁজিয়া | প্রাণনাথ, মম প্রাণ গেল হরিয়া ॥
- ৪ শীতলানিল হিল্লোলে তরুকোলে লতা দোলে | মেঘকোলে, দোলেসোহাগে  
চপলা গো। | নীরদঘটা নিরখি নাচিছে শিখিনী-শিখী | সেহ দেখি, বাড়ে  
বিরহের জ্বালা গো। | আমি শ্রাম বিরহিনী কাঁদি দিবসরজনী |  
একাঙ্কিনী, ভুল বিরহের খেলা গো। | ললিতা কয় রাধায় দ্বিজ ভবপ্রীতা  
গায় | পাবে শ্রাম, রাই হয়ো না উত্তলা গো ॥
- ৫ কোকিলার ডাক শুনি নিজমনে ভাবি গুণি | আমার কলপি-কলপি উঠে  
ছাতি রে, | ওরে পাখি, কেন ডাক নিশিভোর রাতি। | দিবানিশি  
কৈদে মরি না আসিল বংশীধারী | আমার ঝর ঝর ঝরে দু'টি আঁখি রে। |  
নিশি হল অবসান না আসিল বঁকা শ্রাম | শ্রাম আমায় দিয়ে গেল প্রেমে  
ফাঁকি রে। | সুন্দর বলে শুন গো রাধা তুমি যে প্রাণের আধা ! শ্রাম এসে  
মুছাবে দু'টি আঁখি রে ॥

॥ তিন ॥

### ঝুমুর গানের রং

ঝুমুর গানের জনপ্রিয়তার মূলে নাচনী নাচেব বিশিষ্ট ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সত্যি কথা বলতে কি ঝুমুর গান নাচনী নাচের লক্ষ্যেই রচিত হয়ে থাকে। ঝুমুরকারেবা প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে নাচনী নাচের দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা আছেন। ঝাড়খণ্ডের প্রেমসম্পর্কিত সব গানই কোন না কোন নাচের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যারা বলেন নূপুর বা ঘুঙুরের ঝম ঝম শব্দ থেকে ঝুমুর শব্দটির উদ্ভব, নাচনী নাচের কথা মনে রাখলে তাঁদের এ বক্তব্য সত্য বলেই মনে হবে। নৃত্যরতা নাচনীর পায়ে নূপুর বা ঘুঙুর বাঁধা থাকে, যার ফলে ঝম ঝম শব্দ ওঠাই স্বাভাবিক।

নাচনী নাচে পূর্ণাঙ্গ ঝুমুর গান তো গাওয়া হয়ই, তার ওপর প্রতিটি গানের শেষে 'বং' গীত গাওয়া হয়ে থাকে। ঝুমুরের রং গীতগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের হয়। বং গীতের সাহায্যে নাচকে হাল্কা এবং উচ্ছল করে তোলা হয়। কেউ কেউ ঝুমুরের রংকে নাচনী ঝুমুরের রং নামে অভিহিত করে থাকেন। আমরা এগুলোকে ঝুমুরের রং বলবার পক্ষপাতী। আমরা আগেই বলেছি, ঝুমুর ঘোঁপসংগীত নয়, ঝুমুর এককভাবে গীত হয়। ঝুমুর প্রধানতঃ নাচনী নাচেব সঙ্গেই জড়িত। যেহেতু এ-গান পুরোপুরি প্রেমের গান, তাই সারা বছর ধরে একক কণ্ঠে এ-গান গাওয়া চলে কিন্তু ঝুমুরের পরিপূর্ণ স্বাদ পেতে চলে নাচনী নাচ ভিন্ন অগ্রজ খোঁজ করলে আমাদের হতাশ হতেই হবে। তাছাড়া নাচনী নাচের ক্ষেত্র ছাড়া ঝুমুরে কখনো রং ব্যবহার করা হয় না। তাই এই রং গীতগুলোকে নাচনী ঝুমুরের রং না বলে ঝুমুরের রং বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করি। তাছাড়া ঝুমুরকে সাধারণ ঝুমুর, নাচনী নাচের ঝুমুর ইত্যাদি নামে বিভক্ত করারও কোন যৌক্তিকতা নেই; তার ফলে ঝুমুরের রসস্বাদে অকারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়। যে ঝুমুর কোন প্রেমিক বা প্রেমিকা নির্জনে একককণ্ঠে গুনগুন করে বা গলা ছেড়ে গেয়ে আনন্দলাভ করে, সেই ঝুমুরই নাচনী নাচের সময় গেয়ে দর্শকমনে অধিকতর আনন্দের সঞ্চার করা সম্ভব হয়। নাচনী নাচের-ঝুমুর বলে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত কোন ঝুমুর গান নেই। একই ঝুমুর অবসর সময়ে একককণ্ঠে যেমন গাওয়া হয়, তেমনি সেই ঝুমুরই পাঁতা নাচের গান বা নাচনী নাচের গান

হিসাবেও গাণ্ডয়া হয়। ঝুম্ব মূলতঃ প্রেমসংগীত। তাই ঝুম্বের রং গীতগুলো  
ও প্রেমসম্পর্কিত। প্রথম দশনেই প্রেমের জন্ম হয়, তার ওপর প্রেমিক  
যদি নয়নবাণ হানে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা প্রেমিকার থাকে না :

১ দাঁত নিশ চহখে কাজল অংগমুখে তার ছাঁচ পান

মার্য না ভাই মাব্য না নয়নবাণ | প্রেমের বাদী বহছে কুল উজান ॥

তাই প্রেমিককে দেখলে বুকেব মধ্যে বক্ত্রস্রোত ডগা-ন হয়, মন চঞ্চল হয় জাঁতি-  
কুল তো যায়ও, 'তাব ওপব প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে।

২ বসুধাকে দেখলে আমার ছদকে উঠে মন

পরিবিত করা না রে মন | পরিহিত্তে যায় জাঁতিকুল আব যায় জীবন ॥

একবার প্রেমের গল্পভূতি জেগে উঠলে সাজসজ্জায় বাহাব এনে নাযিকা  
নাযককে প্রলুক্ক কবে, কিন্তু নাযক যখন তার গলার মালা খুলে নেয়, তখন  
কপট ক্রেম্বে গাঘে হাত দেবাব অভিযোগে নাযককে অভিযুক্ত করে এবং বলে,  
এতগো যদি বাসনা, তবে নাযক কেন নাযকাব গৃহে অভিচারে যায় না।

৩ লৌতন প'খবের আডায় ভাজা মালার গাথান।

সাদ কব্যে পাবল মালা খুল্যে লিল লীলমাণ।

খুল্যে লিল ভাল ক'রল গাঘে কেনে হাত দিল।

অতই যদি বাঙ্গা ছিল ধরে কেনে নাই আল্য ॥

দে মালা দে দে গ তরা দে গ ব্রজনান্দনী।

চুসাক-দিয়া ভাজা মালা সুর সুর গাথানি,

দে মালা দে কানি আমি প'রব গলায় জানি জানি ॥

কিন্তু প্রেমের আনন্দরস আকর্ষণ উপভোগ করবার আগেই বেদনাময় পরিবর্তিত  
এসে যায়। কখনো প্রিয়জনের প্রবাস-জর্নিত বিচ্ছেদবেদনা, কখনো অব-  
হেলার বেদনা, কখনো কলঙ্ক বা প্রত্যাখ্যানের বেদনা নারীমনকে শতধা বিদীর্ণ  
কবে তোলে। বিবহ বা বিচ্ছেদই প্রেমের সবচেয়ে মধুব অঙ্কভূতি; তাই  
প্রেমের গানে বেদনাব পরিমাণ সর্বাধিক, বলা যেতে পারে, প্রেমের গানের  
অর্থই হল বিবহেব গান, বেদনাব গান।

৫ আমাব যৌবনকালে বিনা তেলে রূপ জলে

মরি তাই ত ভাবি মনে মনে, আমাব নব যৌবন গেল অকারণে ॥

৬ খার লাগি মোর শিনা সিঁদু, গো আনার সে ধন বইল বিদেশে।

যেন তা ভা খোলায় গহ ফুটে তাই বই ফুটে,

থেকে থেকে আমার প্রাণ কেঁদে উঠে ॥

৬ শিশুকালে ছিলাম ভাল পিবিতি কবো অঙ্গ কাল

তুমি সঁাদাবে বলো সঁাতাবে বলো মনে জানি নাই, আমি কানে শুনি

নাই ॥

৭ নপাল মাঝে উলকি আমাব সে কি ধুলে ধুয়া যায় ।

শাম কলঙ্কেব ডালি আমাব বইল মাথায় ॥

৮ নং ঠাণায় ভুলো গেল, পানসুপারি গাঁইঠে বাধা বহল ।

পানটি চুনটি শুকো গেল, স্তপাবি খয়েরটি ভালই ছিল ॥

প্রেম গলেও প্রেমের স্মৃতি থাকে ; সুখ গলেও সুখের জগ্ন দীর্ঘশ্বাস থাকে ।

বিশ্ব বা বিচ্ছেদবেদনা স্মৃতিসুখসাব ছাড়া কিছু নয়, তাই প্রেমগীতিতে

বিবহেৎ স্থান সবাব ওপবে ।

॥ চর ॥

বং ঝুম্ব

জীবনের দ্বৈত গীতিসংলাপে এক ধবনের ঝুম্ব গান গাওয়া হয়ে থাকে ।  
ঝুম্বকাব বিপিন মুখী এই গানকে 'পয়াব ছন্দে প্রেমের গান' বলে উল্লেখ  
করেছেন । গানগুলো প্রেমগীতি বলাতে বা বোঝায় তা যেমন নয়, তেমনি  
বচনাবীর্ষব দিক দিগেও পয়াব ছন্দে বচিত হয় না । গানে দুটি মাত্র চরিত্র  
স্ত্রী এবং পুরুষ, বলাবাহিন্য, এই স্ত্রী পুরুষ চরিত্র দুটি সবত্রই স্বামী স্ত্রী ।  
এ গানের আসন উদ্দেশ্য বঙ্গ প্রায়াসাব পরিবেশ সৃষ্টি করা । বিবয়বস্ত  
সাধাবগতঃ লসু হয়ে থাকে ; স্বামী-স্ত্রীব ঘবগেবস্থালিব সমস্তা, দাম্পত্য  
জীবনের সমস্তা তত্যাদি বিষয় নিয়ে যথেষ্ট বৌদ্ধিক এবং বদবাসিব নব সঙ্গে  
গানগুলো বচনা করা হয় । এসব গানের মধ্যে উচ্চস্তবেব কাবঙ্গ থাকে না,  
তবে জীবনবসেব অভাব থাকে না বলে লোকসাহিত্য হিসাবে এগুলোবও  
বিগিষ্ট স্থান আছে ! এই ধবনের ঝুম্ব গানকে বং ঝুম্ব বলা যোক্ত্য পাবে ।  
এ গান সাধাবগতঃ কুর্মালি এবং ঝাড়পত্ৰী-মিশ্রিত ভায়ায় বাচর্তু হয়ে থাকে ;  
ঝাড়পত্ৰী জনতা খুব সহজেই এই ভায়া থেকে বসগ্রহণ করতে পারে ।

একটি রং বুঝুর উদ্ধৃত করা হল। দুহু'লোর দিনে বিপথস্থ স্বামী জমিতে ফসল উৎপাদন করতে না পেবে শহরে গিয়ে উদরান্ন-সংগ্রহের চেষ্টার কথা স্ত্রীকে বলে ; স্ত্রী কিন্তু গাঁয়ের ভিটে ছেড়ে যেতে রাজি হয় না। কোনক্রমে স্বামীকে বোঝাতে না পেরে সে মোক্ষম অস্ত্রের প্রয়োগ করে : শহরে গেলে তার কুলমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তখন স্বামী আব তাকে ফিরে পাবে না।

পুরুষ : টাকায় হল্য ছপুয়া চা'ল আমি হলি অসামাল

ঘর করা শল্য বড ভার,

চা'ল চিনি কেরোসিন নাহি মিলে দিনেদিন

আঁধার ঘবে গাঁদাবণ্ড'দুর সার।

শিকায় টা'গা রহক হাঁড়ি যাব হামে গেরাম ডাড়ি

যাব হামে শহর মুল্লকে,

ষটি বাটি শিলালচা। বাঁধ গ ধনি খড়াচু ডা

খাটব সাহেব ঠিকাদারকে।

( রং ) পেট 'তা'বুড়া দিয়ে' ধান ব'হব কতদিন।

এমন সুন্দর জীবন ভেল যে মলিন ॥

স্ত্রী : তবে বলি প্রাণনাথ কাহে লেবে হামে সাখ

বাত্ তব হামে না গুনিব,

খশুরে কা ভিটামাটি র'হব হামে মাটি চাটি

তবু হামে বাজারে না যাব।

যদি যাই বাজারেতে পডব হাম নজবেতে

বাজারে কা লক ভয়ংকর,

পয়সা দেখায় কত ছলে আঁখি ঠারে সুকোশলে

লুটি লেবই এ জীবন সুন্দর।

( রং ) বাজারে কা লক বাবু বড়ী বদমাস।

নেহি যাবই বাজারেতে র'হব উপাস ॥

পুরুষ : এ বছর হয় নি ধান তাই হয়োছে অনেক টান

মাহাজনের ধান দিব কিসে,

বীজধান ছিল যত সব করে'য়ছি উদরসাং-অ

আগত্ বছর কা লাগাম চায়ে।

লা'গল গরু ছাগল ভেড়া বিকাই গেল কাড়াডা

তাই ত সুবদনী কাহে কবিস মনমানী  
প'টলাপু'টলী বাঁধ গে তাডাহডা,  
যাব হামে শহববাজার টাকা কবম ব'জগাব ।  
ছটমট ঘব বসাব এএটা কিত্তো দিব আলতা ফিতা,  
মাথাবাঁধা আব জবিজুতা, পায়েব মল আব পানেব বাটা ।

( বং ) কাহে ধনি অভিমানী ভাঁগলে চুড়ি ।

বাজাবে চল কিন্যে দিব শাঁকা আব শাড়ি ॥

স্ত্রী : কাহে কহিস এমন কথা পাজবে মোব লাগে ব্যাধা  
বড়ী রে অসঠা লাগে মনে,

পুষোক না পাববে যদি কাহে তলে কবনে শাদী  
গাছে তুলে' মুলে কাট কেনে ।

কলিয়ুগেব বলিহাবি দাগাবার্জ জু'চুবি

বাজাবেতে আছে বড বেশি,

চোব আসে সাধুব বেশে গলায় ছুবি দিবে শেবে

যাবে চলি কুলমান নাশি ।

( বং ) তাই ত বাজাবে হামি নেহি যাঅব ভাই ।

ডব লাগে পাছে বঁধু তুমাকে হারাই ॥

॥ পাঁচ ॥

উদয়া গান বা টা'ড় ঝুমুর

ধাডথণ্ডে নর-নাবীর দেহ-মিলনের সম্পর্কটা অচা'ন্ত সভ্য অঞ্চলেব মতো  
এখনো শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে ওঠে নি। যৌনতাই ঝাড়খণ্ডেব পাৰিবাবিক  
জীবনের দৃঢ় ভিত্তিভূমি রচনা কবে থাকে। এখানকাব আদিম মাতৃষেবা  
নিছক ভাবানুভূতিব জগতেব যে প্রেম তাব ওপর মোটেই আস্থাশীল নয়।  
প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব দেহ-মিলনঘটিত প্রেম তাদের মনোজীবন এবং সমাজ-  
জীবন গঠনে সবিশেষ সাহায্য করে থাকে। তাই ঝাড়খণ্ডের লোকসংগীতেও



যৌনপ্ৰেমৰেব বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ইতিপূৰ্বে বিভিন্ন ধৰনেৰে লোকগীতিৰ আলোচনা প্ৰসঙ্গে আমবা মে-সৰ প্ৰেমগীতি ব্যাখ্যা কৰাবাৰ চেষ্টা কৰেছি, সেগুলোৰ মনো ভাবগুৰুতি থাকলেও দেহজ প্ৰেমৰ তীব্ৰতাও সহডেহ অমুভব কৰা যায়। শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনেৰে প্ৰেমানুভূমিৰ সঙ্গে এ সৰ গানৰ একটা আত্মক সম্পৰ্ক আছে। বৈষ্ণৱ পদাবলীতে দেহজ প্ৰেম নিবন্ধ ভাবজ প্ৰনে পৰি সচেত্ৰে। তাই কুমুবে পদাবলীৰ অন্তৰ্ভবণ যোগানেই ঘটেছে, সেখানেই কুমুবেৰে প্ৰেমবোধ নিবন্ধ স্তম্ভাপহীনতাৰ পৰ্যবাসিত হয়েছ। কিছু বোনে কুমুবেৰে বাবাক্ষৰ নাম দুটি গল্পগীতৰে বাবহাৰ কৰে বৈষ্ণৱ বাঁত-বঙফাজকে অধীকাৰ কৰা স্তম্ভাপহীন স্থানৰ এবং স্বচ্ছন্দ ৰূপ দিয়েছে, সেখানেই পাউপগুৱেৰ কুমুবেৰে বোবা এাননাৰ ত্ৰিংশাশ্ৰয়ী দেহ-মিলনঘটিত প্ৰেমসংগীতেৰে অৰণ্য কৰেছে। বলাবাহুল্য, মে-সৰ গান বাবাক্ষৰে উপস্থিতসঙ্গেও কে কোন গোড়া বৈষ্ণৱেৰ মনে তীব্ৰ বিবন্ধিত উৎপাদনেৰে পনে যোগে। আসনে ঝাউপগুৱেৰে প্ৰেমগীত দেহমিলনেৰে তীব্ৰ অন্তৰ্ভবিতৰে বাবীৰূপ মাৰ। তৰে এযাবং সানোচিত প্ৰেমগীতিগুলা এৰে বাবে মনবাবণ নয, ৰূপকেৰে সাহাবো দেহমিলনেৰে ভাবনাকে গীতবন্দ কৰা হয়েছে--যদিও আবণটি প্ৰায়-স্বচ্ছ বলনে অন্তৰ্ভবিত কৰা হয়।

ঝাউপগুৱে কিছু কিছু গান প্ৰচলিত আছে, য সম্পৰ্কতঃ দেহমিলনকে তাশ্ৰয় কৰেহে বচিত এবং গীত হযে থাকে। স্বভাবতঃ এই সৰ গান লোকালয়েৰে সীমানাৰ মনো গীত না হযে মাঠে প্ৰাস্তবে অবণো গীত হয়। এই গানগুলোই উদয়া বা টাউড কুমুবে বলে পৰিচিত। কোন বোন অঞ্চলে উদয়া গান 'কবি গীত' এবং 'বাগালগীত' নামেও পৰিচিত। বাগালোবা বনে-অবণো উদয়া গীত গেযে যুৱতীনাৰীদেৰে দেহমিলনে আকৃষ্ট কৰাবাৰ চেষ্টা কৰে থাকে বলে সম্ভবতঃ বাগালগীত নামেও এ গান পৰিচিত লাভ কৰেছে।

উদয়া জাতীয় প্ৰেমসংগীত সম্পৰ্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য বলেহ, 'আদিম জাতিৰ লোকগীতিৰে বে অংশ যুৱক-যুৱতীৰ মিলন-প্ৰসঙ্গ অবলম্বন কৰিয়া বচিত, তাহাৰ প্ৰত্যক্ষ অভিব্যক্তি আদিম সমাজেও দুৰ্নীতিৰে পৰিচালক বিবেচিত হয় বলিয়া তাহা প্ৰায় সবদাই কতগুলি সাধাৰণ ৰূপকেৰে ভিত্তৰ দিয়া প্ৰকাশ কৰা হইয়া থাকে। ইহাদিগকে যথার্থ প্ৰেম-সঙ্গীত বলা যায়না। ইংৰাজতে ইহাদিগকে Courting song বলে। আদিম জাতিৰ এই শ্ৰেণীৰ সঙ্গীতেৰে মনো যে ৰূপকেৰে ব্যবহাৰ হইয়া পাকে, তাহা স্মৃষ্ণ শিল্পবোৱেহ

পরিচায়ক নহে। বরং স্থূল বস্তুরসবোধের পরিচায়ক।<sup>১</sup> অস্বীকার করবার উপায় নেই যে দেহপ্রেমের গান রূপকেব ভিতব দিয়েই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এগান লোকালয়ের মধ্যে গাওয়া নিষিদ্ধ, উদয়া গানই শুধু নয়। কোথাও কোথাও স্থূল প্রেমনির্ভর মুম্বও লোকালয়ের মধ্যে গাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে এই গানগুলোকে কেন প্রেমসংগীত বলা যায় না, বোঝা গেল না। দেহকে বাদ দিয়ে আজ পযন্ত কোন প্রেমসংগীত বচিত হয়েছিল কি না আমাদের জানা নেই। যে-কোন একজন দেহীকে আশ্রয় কবেই যেমন আমাদের মধ্যে প্রেমবোধ জাগরিত হয়, তেমনি সেই দেহীকে অবলম্বন কবেই আমাদের প্রেমানুভূতি গীত হিসাবে প্রকাশ পায়। অল্পভূতকে খতো সূক্ষ পর্ধায়েই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, প্রেম কোন স্থূলদেহকে কেন্দ্র কবেই অক্ষুণিত হয়। দাশনিক ভাবনায় নিষ্কাম প্রেমের শুক্ল ধাতু পাবে, কিন্তু বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ জীবনে নিরুক্ত নিষ্কাম প্রেমের কোন ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। তাই আমাদের মতে, মিলন প্রসঙ্গে গানও সংগতকাবণেই প্রেমসংগীতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে একদা দেহমিলনের প্রয়োজনেই প্রেম-গীত বচিত হয়েছিল। পবম্পব পবম্পরের প্রতি জৈব আকর্ষণ অল্পভব কবলে এই গীতের মাধ্যমে নব-নারী নিজেব কামনার কথা অবাবিতভাবে প্রকাশ করত।

উদয়া বা টা'ড মুম্ব কোন উৎসবকেন্দ্রিক গান নয়, কিংবা কোন বিশেষ ঋতু বা সময়-সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। সাবা বছব ধবে বনে-অরণ্যে এ গান গীত হয়ে থাকে। উদয়া যৌগসংগীত নয়, একক নিঃসঙ্গ নব বা নারীর কণ্ঠে এ গান গীত হয়। কেউ কেউ বলেন, আদিবাসীদের প্রেম সংগীতেব যে গানে পুরুষেব অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, তা পুরুষে গেয়ে থাকে এবং নারীব অনুভূতি-সম্পর্কিত প্রেমসংগীত নারী স্বয়ং গেয়ে থাকে। কথাটি ষে ঠিক নয়, তা আমবা কবম নাচের গান, ছো নাচের গান, মুম্ব আদি প্রসঙ্গে দেখিয়েছি। নারীব প্রেমানুভূতিব গানগুলোও পুরুষকণ্ঠে গীত হয়ে থাকে। উদয়ার গানগুলোও এব ব্যতিক্রম নয়। তবে উদয়া গানে নরনারীব বিশিষ্ট ভূমিকা সূক্ষরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে বলে বিষয়বস্ত অনুসারে নর এবং নারীর গান পৃথক হয়ে থাকে।

১ বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ ১১৭

নরনারীর অবৈধ মিলন ঝাড়খণ্ডেও নিন্দনীয়। তাই অবৈধ প্রণয় সব সময় গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত গানগুলোতে বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে দেহপ্রেমেব অকুণ্ঠ প্রকাশ আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

১ দেখে বাঢ়ালি তকে তুঁই না দিলে আমাকে

বুকের মাঝে শিম-ল ঝঁটি দলকে, সেই দেখে মন ললকে ॥

২ ডালিমের গাছটি ভারি টেঁড়া দিয়ে ডালিম পাড়ি

অই ডালিম বাথ মাঝ্যাঘবে, খিদা পালে খাব অক্ষকাবে ॥

৩ বঁধুর বাড়ি-এ পার্কে আছে বাবমাস্তা বে'লরে,

সেই বে'ল তু'লতে গেলে বুকে মাঝে শে'ল বে ॥

উদয়া গানে নাবীর অল্পভূতি-সংবলিত গানের সংখ্যাই বেশি। অবশ্য কবম নাচেব গান, টুসু গান, ছো নাচের গান, কুমুর আদি সব ধবনের গানের প্রেমগীতগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাবীর প্রেমাল্পভূতিকে আশ্রয় করেই রূপ লাভ করেছে।

৪ এত যদি ছিল মনে আগে না বলিলি কেনে

ষুমেব ঘোরে, ছঁড়া খেঁচরাই উঠালি মোরে, ষুমেব ঘোবে ॥

৫ দিব দিব পারুল তেল দিব বলোছিলে,

এ ত শামেব করববি হে ঘরে গেলে মনে পড়ে না।

দিব দিব বলোছিলে ঘি-এব মিঠাই দিব বলো,

আমড়া পাকায় মন ভুলালে বঁধু ছা'ডবে বলো।

দিব দিব বলোছিলে ফুলাম শাড়ি দিব বলো,

আলত' পাইডে মন ভুলালে বঁধু ছা'ডবে বলো ॥

৬ যখন ডালিম কু'লমুজিব পাবা, তখন ডালিম বিকাল্য টাকায় তিন থলা।

ডালিম থায়ে লে বে খালভবা, পাকা ডালিম রসেতে ভরা ॥

৭ যখন ছিলি মা-বাপেব ঘরে, লুকলুকানি খে'লতেছিলি একগলা জলে।

যেমন শোল মাছে উকাল মারে, চরবা শিম'ল ডাল ভাঙে পড়ে ॥

বাগালদের কেন্দ্র করে ঝাড়খণ্ডের রমণীমন প্রেমভাবনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে, একথা আমবা অগ্রহ বলেছি। উদয়া গানেও বাগাল-সম্পর্কিত কামনা-বাসনা বিচিত্র রূপলাভ কবেছে। বাগালের অবগো গোচারণ কবে থাকে, তাই এই সব অবগোগীতের নায়ক যে তারাই হবে, তাতে আর সন্দেহ কি!

- ৮ আমার পুঁ ম'ব বাগালি যায়, হাতে বাঁশি কাঁধে লাঠি নয়ান ধারে যায় ।  
ছকরী হেবো লে ল চাঁদবদন, যু'রবার বেলা শুনবি বাঁশির গান ॥
- ৯ যখন বেলা তালগাছের আড়ে, লুকলুকানি খে'লতেছিলম এক গলা জলে ।  
অ তু'ত ভাবম কি ল অস্তরে, কাড়াবাগাল আ'সছে উহরে ॥
- ১০ মাছপড়া পাখাল ভাত বাগাল বাবুর তরে,  
সাঁ গা ধরি বলবি বাগাল গঠ কত ধুরে ।  
বাগ'দ্যা রে বাগাল্যা গঠ গেল বহু ধুর ।  
শাড়ির ভারে চ'লতে নারি মাথায় তুল্যে ধব ।  
বাগাল পাব কবে দে, দারুস্ত কাঠের বঝা মাথায় তুল্যে দে ॥
- কোন-কোন গানে রূপোপজীবিনী নারীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—
- ১১ ছবরার মায়া রূপসুন্দরী, রা'তসংসারে র'জগার করে পাঁচসিকা করি ।  
হামাব হোক বরং বদনামী, তাউ কি ছা'ডব ব্রাহ্মণভাতারী ॥
- ১২ একটুকু খায়েছিলি দশটাকা নিয়ে আলি  
খাঁদ ওর ম'তন সুন্দরী হ'খাম ল, তিরিশ টাকায় বঁধু কিন্যে লিখম ॥
- কোন-কোন গানে পুরুষনারীর দ্বৈত কণ্ঠস্বরও শুনতে পাওয়া যায়—
- ১৩ আড়ায় আড়ায় যাও হে রাজা আড়ায় আড়ায় যাও,  
বুকেব মাঝে মাগিক জলে ফিবে কেন্ নাই চা'ম ।'  
'জলুক মাগিক পুড়ুক তেল তাই চা'লব ঘি,  
ঘরে আছে কন'চাঁপা ধুত'রা ফুলের কি ॥'

## পঞ্চম অধ্যায় জীবিকাশ্রয়ী গান

ষাডগুণে কিছু কিছু গান প্রচলিত আছে, যা সম্পূর্ণতঃ বৃত্তনির্ভর । আমরা এগুলোকে জীবিকাশ্রয়ী গান নামে চিহ্নিত করেছি । এদের মধ্যে পাটি গীত বা পট গান, বাদর নাচের গান, সাপ খেলানোর গান এবং পুতুল নাচের গান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এষ্ট শ্রেণীর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এ-গান জীবিকা-সংশ্লিষ্ট, তাই বিশেষ বিশেষ জীবিকার ক্ষেত্র ছাড়া এ গানের

স্বাধীন কোন ব্যবহার নেই; পট বাদ দিলে পট গানের স্বাধীন কোন অস্তিত্বই থাকে না। বৃত্তিনির্ভর গান হওয়ায় অন্ত পেশা বা সম্প্রদায়ের লোকেরা এগান কখনো গায় না; তাতে জাতিচ্যুত হবাব আশঙ্কা থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে এ গান সীমিত থাকলেও এব আবেদন ঝাডথঙী জনমানসে প্রভাব ফেলে থাকে। পটগানের বিষয়বস্তু পৌরাণিক হয়ে থাকে; অগ্রাগ্র জীবিকাশ্রয়ী গানে লৌকিক জীবনের কথাবস্তু স্থান পেয়ে থাকে এবং তা সাহিত্যরসসমৃদ্ধ হয়। বর্তমান অধ্যায়ে পটগান এবং বাদব নাচের গান— এই দু'শ্রেণীর গান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

॥ এক ॥

### পাটি গীত বা পট গান

ঝাডথঙ অঞ্চলে পটকে 'পাটি' এবং পটুয়াদের 'পাটিকার' বলা হয়। স্বভাবতই পটগান এখানে 'পাটি গীত' নামে পরিচিত। পাটিকাবা একটি বিচিত্র সম্প্রদায়েব অস্বভূক্ত। এবা পটের বিষয়বস্তু হিন্দুপুবাণ আদি থেকে নির্বাচিত কবলেও এবং দৈনন্দিন জীবনধাবায় হিন্দুযানি বজায় বাগলেও এদের বববাহসস্বজ্ঞ মুসলমান সমাজের সঙ্গে স্থাপিত হয়ে থাকে। এরা বৈষ্ণবদের মতো গলায় তুলসীমালা ধাবণ কবে এবং ত্রিলক ফোটা কাটে। এদের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী প্রতিনিয়ত গুঞ্জবিত হয়, পদাবলী কীর্তনে ঝাডথঙে এবা বিশেষ পাবদর্শী। বলতে গেলে গানই পেশা, কখনো কর্তাল বাজিয়ে, কখনো টু-টুঙ্গী (একতাবা) বাজিয়ে, কখনো সুবমাদল বা গোল সহযোগে, গৃহস্থবাডিতে পদাবলী গান শুনিযে ভিক্ষা কবে বেডাষ। বৈষ্ণব-পর্ষই যেন এদের হিন্দু সম্প্রদায়েব অস্বভূক্ত হবাব ছাডপত্র দ্বিযেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের করুণা এবং এখনো অর্জন করতে পাবেনি।

পাটিকাবদের আদি পেশা অবশুই পাটি দেগিয়ে ভিক্ষা করা। এই পাটি বা পটগুলো একান্তভাবে গীতনির্ভব। গীতের বিষয়বস্তুকে পটে চিত্ররূপ দেওয়া হয়ে থাকে। তাই পট বাদ দিলে এই গীতগুলোর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পট বাদ দ্বিযে এ গীত কখনোগাওয়া হয়

না। বিষয়বস্তুর নির্বাচন সব সময়ই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ আদি থেকে করা হয়ে থাকে। পাটি গীতগুলো নিঃসন্দেহে লোকগীতি এবং পাটিগুলো লোকশিল্প। পৌৰাণিক কাহিনীও গীতে লৌকিক রূপ পেয়ে থাকে। এরা কাহিনীচয়নে কখনো পুৰাণকথা কে অঙ্কভাবে অনুসরণ করে না। এদিক দিয়ে বিচার কবলে গীত-রচনায় এদের স্বকীয়তা এবং কিছুটা মৌলিকতা স্বীকার কবতেই হয়। সাধারণতঃ এরা পুরাণ থেকে উল্লেখযোগ্য খণ্ডিত উপাখ্যানগুলো কে বেছে নিয়ে গীতবদ্ধ করে এবং এই গীতের অনুসরণে ৭ট আঁকে। রুক্মলীলা, রামলীলা, নহষ রাজা, দাতা কর্ণ, হরিশচন্দ্র, স্কুমুনি বধ, মনসামঙ্গল, জগন্নাথ দর্শন, দুর্গাকালি আদি পালা পাটিকার-দের অত্যন্ত প্রিয়।

### ১ মনসামঙ্গল

জয় ম' মনসা দেবী জয় বিষহরি। পদ্মপাতে জন্ম মাযের মনসা সুন্দরী ॥  
লাগের হল্য পাট পালঙ্ক লাগের সিংহাসন। মঙ্গলা বডার পিঠে দেবীর আসন ॥  
দেবী বলে শুন বেণ্ডা মোর বাক্যি ধর। ডা'ন হাতে ফুলে জলে মনসা পূজা কব ॥  
যদি না পূজিবি বেণ্ডা মনসার ঘটবারি। ছয় পুত্র খাব রে ছয় বধ ক'রব রাঁড়ি ॥  
আড়চক্ষে চেয়ে বেণ্ডা মচড়ায় দাঁড়ি। কাঁধেতে তুলিয়া লাচে হৈতালের বাড়ি ॥  
বলে চেংমুড়ি কানীর নাগাল যদি পাই। মারিয়া হৈতালে বেটির কমব চুবাই ॥  
যদি না পূজিল বেণ্ডা মনসার ঘটবারি। ছ বেটা খেলা বেণ্ডার ছ বধ ক'রল রাঁড়ি ॥  
তবু মষ বাদ ছাড়ে চাঁদ অণ্ডকাবী। চাঁদের ভাষা সনকা পূজেন বিষচরি।  
মিছাই পূজিলি গ সনার গজেশ্বরী ॥ তিন গিন গায় গীত মধু সববাণী। সদাই সুর্যারে বলে জয় ব্রহ্মাণী ॥  
বেণ্ডার ছিল এক পুত্র বালা লগিন্দব। তার বিভা দিতে গেল নিছনি নগর ॥  
নিছনি নগরে আছে অমলা বেণ্ডানী। তাব ঘবে বাড়ে কণ্ডা বেহলা নাচনী ॥  
একদিন আশ্তে ছিল দনাদন বুঢ়া। সমন্ড ঘটায় গেল সেই আঁটকুড়া ॥  
সাজ কুটি সাজ মুটি বিভা আরস্তিল। নিজে পুরোহিত হয়ে বাকা পড়াইল ॥  
পিভা কবি লগিন্দব পালগিতে চাপিল। জয় তুলি তাকেব বাণ্ড বাজিতে লাগিল ॥  
সান্তালি পর্বত মূল লহাব বাসঘর। তায শুয়ে নিস্তা গেল বেহলা লগিন্দব ॥... বেহলা বলেন কে দাদা আইসে গো।  
এতদিনে জানিলাম বাপের আছে পো ॥ রাজিদিন

কৈঁচের মরি না দেখিয়া ঘরে। অভাগিনী বন্দী আছি লহার বাসঘরে ॥  
 অমিত্যাদি খিবি খাও বলি যে তুমারে। স্মৃথে নিত্রা যাও তুমি হাঁড়িরি  
 ভিতরে ॥ বুদ্ধি বল নেত গো উপায় বল মোবে। বেহলা নাচনী মোর  
 লাগে বন্দী কবে ॥...উডিল অন্ধারের গুঁড়ি কালির নিখাসে। জয় জয় বলি  
 কালি বাসরে প্রবেশে ॥ স্মৃতাৰ সঞ্চাবে কালি বাসবে সামাল্য। এতদিনে  
 লখিন্দবেব বিধি বাম হল্য ॥ বেহলা নখার কোলে যেন কলানিধি। যেমন  
 কন্যা তেমনি বব মিলাইল বিধি ॥ এমন সুন্দর নখাব কনখানে খাব। দেবী  
 জিগ্গাসিলে তাবে কি বোল বলিব ॥ বিষম আবতি দেবী কেন দিল  
 মোবে। লখিন্দবে থেতে মোব শক্তি নাহি সবে ॥ ঘূমেব আলিসে নখা  
 দিল পাশমুড়া। অবধাতে বাজে কালির দ্বন্দেব পয়বা ॥ হে বে ধর্ম চন্দ্র  
 সূর্য তুমরা থাক সাক্ষী। জা'তে গন্ধ বেছাব ছাওয়াল ধন্দে মাইল লাখি ॥  
 চাঁদ সূক্ষ্মকে সাক্ষী বাধি হানিল কামড। জালায় জলিয়া কান্দে বালা  
 লখিন্দব ॥ উঠ না গো উঠ কন্যা সায় বেছাব ঝি। তোরে আইল কাল-  
 নিত্রা মোরে খাইল কি ॥ সবাক্ থাকিতে বিষ ধবে আগচূলে। বিষেব  
 জালায় নখা হরি হবি বলে ॥ উচকপালী বেহলা চিরুণবরণ দাঁতী।  
 বাসরে খাইল পতি না পুহালি রাতি ॥ ভাল হল্য চাঁদ খণ্ডব মোর দোষ  
 হল্য। আব যে তুমাব ছটি পুত্র কি দোষে মরিল ॥ পুত্রের মরণ শুন্তে  
 চাঁদ আনন্দিত হল্য। হেঁতালেব বাড়ি লয়ে নাচিতে লাগিল ॥ ভাল হল্য  
 পুত্র মৈল কি ভাবাবধাদ। চেংমুড়ি কানী সহ ঘুচিল বিবাদ ॥ তিনখানি  
 কলাব গাছকে একুশতে কাটিল। নাপিয়া জাপিয়া বেহলা মান্দাশ বনালা ॥  
 মান্দাশ বনায়ে বেহলা যায় আঁটি আঁটি। মান্দাশ ভাঁসায়ে দিল গাঙ্গুড়িব  
 ঘ টি ॥ খেই ঘাটে কাপড কাচে নেতাই ধোপানী। সেই ঘাটে গেলে  
 মড়া উজ্জান বাহটানি ॥ কাপড কাচিয়ে নেতাই বান্ধিলেন বয়া। আপনার  
 পুত্র মেবে আপনি হলেন অবা ॥ নেতাই-এব সঙ্গে বেহলা দেবীপুবে গেল।  
 মনসার কাছে গিয়ে নাচিতে লাগিল ॥ নাচ বাছা বেহলা বাছিয়ে মাগ  
 বব। কি বব মাগিব মা গো কাঞ্চন সুন্দব ॥ দিলাম গো বেহলা  
 আমি দিলাম গোবে বব। ছয় ভাণ্ডব স্বামী লইয়া যাও নিজ ঘব ॥ ছ ভাণ্ডব  
 স্বামী বাঁচালেন মনেব হবিষে। সাত ডিঙ্গা নয়ে কিবে আপনার দেশে ॥  
 ছ ভাণ্ডব স্বামী জিয়াহয়া বেহলা এল ঘব। হেথা মনসার পূজা কবে চাঁদ  
 সদাগব ॥

মনসামঙ্গল পালাটিতে মনসামঙ্গলের কাহিনীটি স্বল্প পরিসরে দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও গায়কের স্মৃতিভ্রংশতাব জ্ঞাত অংশ বিশেষ লুপ্ত হয়ে গেছে, কোথাও বা সামঞ্জস্য বজায় থাকে নি। তা সত্ত্বেও মনসা মঙ্গলের মোটামুটি কাহিনীটি এর মধ্য দিয়ে স্পন্দবভাবে ফুটে উঠেছে। চাঁদ সদাগরের একশ'য়েমি, পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূব প্রতি দোষারোপ, পুত্রব মৃত্যুসংবাদে চাঁদের উল্লাস এবং হেতালের বাড়ি কাঁধে নিয়ে নৃত্য নিঃসন্দেহে পটগানটিকে অভিনবত্ব দিয়েছে; অত্র দিকে বেহলা নাচনীকে স্বামী'র সর্পাঘাতে মৃত্যুর কারণ হিসাবে অপবাদ বহন করতে হয়েছে। উচকপালী চিরুণদাতী অলক্ষণে বধু বলে চাঁদ সদাগর দোষারোপ করেছে। বেহলা এই অপবাদ স্বীকার করে নিয়েও মুখবার মতো পাল্টা আক্রমণ করেছে এই বলে— ‘আর যে তুমার ছ’টি পুত্র কি দোষে মরিল।’ বলাবাহুল্য, এ-অঞ্চলে প্রচলিত কেতকাদাসের মনসামঙ্গলের বেহলার চরিত্রের সঙ্গে পটেব এই বেহলার সামঞ্জস্য পূঁজে পাওয়া যায় না। বেহলা এখানে যেন ঝাডখণ্ড জনপদের বধুদের চরিত্রটিই লাভ করেছে। এইটুকু বাদ দিলে বেহলা চারিটি মনসামঙ্গলের কাহিনীর অনুসরণেই চিত্রিত হয়েছে। ঝাডগণ্ডে কেতকাদাসের মনসামঙ্গল অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ; মনসা পূজার সময় গ্রামে-গ্রামে এই পুঁপি গীত হয়ে থাকে। মনসার পূজা ঘবে-ঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই মনসামঙ্গলের গান এখানে এতো বেশি জনপ্রিয়। পটেব ক্ষেত্রেও দেগা যায়, মনসামঙ্গল পালাটিই সর্বাধিক জনপ্রিয় পালা।

## ২ জগন্নাথ দর্শন ॥

অপূর্ব কৌতুক কথা শুন সর্বজনে। নীলাচলে অবতার অমৃত কধনে ॥  
 এড়াবে শমন দায় চিন্ত দেহ যদি। কলিযুগে তব্বেবে মিস্তার ভবনদী ॥  
 বরণ চিকনকাল। নবধন শ্রাম। অহর্নিশি অহর্নিশি দেগ কালাচাঁদ ॥  
 কপালে মাণিক জলে সূবর্ণ মুকুট। ভগমগ কুণ্ডলে বলকে কর্ণফুল ॥  
 বিচিত্র বসন অঙ্গে কনক বরণ। সূভদ্রা ভগিনী মধ্যে ভুবনমোহন ॥  
 ভাইনে প্রভু বলরাম মধ্যেতে ভগিনী। তার বামে কালাচাঁদ আছেন  
 আপনি ॥ কে চিনিতে পারে প্রভুর অদ্ভুত নীলা। বাসনাটি চাপিয়ে  
 বসিল সপ্তশিলা ॥ বারবাটি কুম্বেডা প্রাচীর মেঘলাল। সিংহদ্বারে  
 বাজে জয় ঢোলেরি বিমান ॥ প্রথম গড়ুর স্তম্বে যেবা দেই কোল।



আনন্দেতে ভক্তগণ বলে হরি বোল ॥ সঙ্কার আরতি প্রভুর ঝলমল করে। রতন প্রদীপ জ্বলে প্রভুর গোচরে ॥ রতন প্রদীপ জ্বলে জয় ঘণ্টারি বাজনা। ধ্বনি শুন্তে হলায় দুর দারুণ যন্ত্রণা ॥ রহনে কুণ্ডেতে কাগ ত্যজিল জীবন। চতুর্ভূজ হয়ে কাগা যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ চতুর্মুখ ব্রহ্মা যে তার পাছে গড়াইয়া। বদন ছাড়ি অন্ন ঘাম ছাড়াইয়া ॥ ছি ছি করিয়া গৌরী না কাড়িলেন কর। কুকুরের উচ্ছিষ্ট খান দিগম্বর ॥ আধখানি কৈবল্য হর ফেলাইলেন মুখে। আধখানি কৈবল্য হর রাখেন মস্তকে ॥ হরসক করে গৌরী গৌরীমণি রথী। জগবন্ধু বিশ্বমায়া দেখা দেন পথি ॥ দেখিতে না পান গৌরী বস্তাণ্ড ঈশ্বরে। জটা হতে সেই অন্ন দিলেন তাহারে ॥ অন্নের বাজারে বিচার বিয়াল্লিশে বাজনা। সুবন্ন রাজ কুবির করে বিকা কিনা ॥ ভাত বিকায় পিঠা বিকায় আরো ভোগ লাড়ু। মধুরুচি ব্যঞ্জন তরাহ পাড়ু গাড়ু ॥ শূদ্রেরে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মনেতে খায়। মীলাচলে দেখুন প্রভু জা'ত নাহি যায় ॥ কড়ি দ্বিয়ে কিনে খায় কেউ হাড়ির ঝাঁটার বাড়ি। কনকচূর বালির মধ্যে যান গড়াগড়ি ॥ কনকচূর বালির মধ্যে খায় মাংস শু'ড়ি। বিমানে চাপিয়া বংশ যান সগ্গপুত্রী ॥ রাজা ছিলেন ইন্দ্রদবন উড়িয়া ভিতর। তারে আনিতে গেলেন ব্রহ্মা ষাট সহস্র বৎসর ॥ মাগ রাজা ইন্দ্রদবন বেছে মাগ বব। কি বর মাগিব প্রভু তুমা বরাবর ॥ আঠারটি পুত্র আছে পুত্রপুত্রী ভিতর। সকলগুলি কর নিপাত এই যে মাগি বর ॥ কেন রাজা ইন্দ্রদবন এবর মাগিলে। আঠারটি পুত্র কেন নিপাত করিবে ॥ বাপ যে সুপুত্র হলে বেটাবে পড়ায়। বেটা যে সুপুত্র হলে গয়ার সাগর যায় ॥ গয়ার সাগরে পুত্র হাতে নিবে কুশ। এক বাক্যে উদ্ধারিবে শতেক পুরুষ ॥ সুপুত্র হইলে পরে নাম যে বারিবে। কুপুত্র হইলে কত গালি খাওয়াইবে ॥ এই না কারণে প্রভু এই না মাগি বর। তথাস্ত দিলেন বর যা হ নরবর ॥

জগন্নাথ দর্শন পালাটিতে বৈষ্ণব ধর্মভাবনা প্রচার করা হইছে। ঝাডখণ্ডে অগ্র সব দেবতার। খুব বেশি স্বীকৃতি না পেলেনও পুরীর জগন্নাথের ওপর এদের অসীম বিশ্বাস। হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্র অনীহা থাকলেও এখানকার আদিম বাসিন্দাদের—কুমি, ভূমিজ আদি সম্প্রদায়ের জনজীবনে আচার অনুষ্ঠানে, লোকসাহিত্য-সংস্কৃতিতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব খুব তীব্র আকারে না হলেও সহজেই অনুভব করা যায়।

জগন্নাথদর্শন পালাটিতে খুব সম্ভবতঃ ইন্দ্রদ্রাঘ্ন বাজার উপাখ্যানও এসে মিশে গেছে। প্রথমার্ধের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্ধের একটা সুস্পষ্ট সীমাবেধা সহজেই নজরে পড়ে। ঠিক একই ধরনের সংমিশ্রণ পরবর্তী দুর্গাকালি পালাটিতেও ঘটেছে মনে হয়। পালাটির শেষ চার পঙ্ক্তিতে যমের পূর্বী কথ্য আছে, যা পালাটির সঙ্গে এনেবাবেই সম্বন্ধিতহীন। সম্ভবতঃ এটি একটি পঞ্চকল্যাণী পট।

### ৩ দুর্গাকালি পালা ॥

ভাপিনী ভৈরবী মাতা দুঃখ বিনাশিনী। এক মেঘে চলে মা দসব মেঘে পানী ॥ তুমি যাবে দয়া কব মা তাব কিবা দুখ। সুমেব উঠ্যে লিতে পারে হেলাইয়া বুক ॥ দুর্গা দুর্গা বল্যে আমাব দক্ষ হা কায়া। একবাব দে গো মোবে চবণেবি ছায়া ॥ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে বাণিলে নাবায়ণী। বাণিলে বর্নিক সূতে দক্ষিণ মশানী ॥ কৃষ্ণেবে সদয় হয়ে মা ক'সে হলে বাম। শ্বেতপদ্মে তুমায় পূজে সীতা পেল বাম ॥ ভদ্রকালী কপালিনী কবাল বদনী। মুপ হতে বেবায় কালীব চৌষটি ডাবিনী। চৌষটি ডাকিনী কালীর শযে চৌদ্ধ ঢেলা। হাতে ধবে ক্ষেত্রী খল্লব গলে মুগুমালা ॥ বাম হাতে কাতান কালীব ডান হাতে খল্লর। বক্তধারা বহে কালীব মুখেব উপর ॥ রণে ভঙ্গ কব্যে কালী মন্ত্যপানে চায়। সদাশিবের বৃকে পদ দেখিবাবে পায ॥ আধা জিব কাড়ি কালী কৈলাস পালান।

কৈলাসে পালান শিব বসেন যোগাসনে। হেনকালে পড়ো গেল নাবদেবে মনে ॥ মনেতে ভেবেছ মন এন্নি দিন কি যাবে। গুরু না ভাজিলে সে গোবিন্দ কোথা পাবে। হেথ কব দানপুণ্য সেথা গেলো পাহ। নিদারুণ যমের পূর্বী ধাব উধাব নাহ ॥

ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতিতে দুর্গাপূজা কিংবা কালিপূজার কোন ভূমিকা নেই। ঝাড়খণ্ডের অধিবাসীরা আদিম কালীব পূজা অংশ করে। কিন্তু তার কোন নির্দিষ্ট তাবিখ থাকে না, একটি নির্দিষ্ট বাবে বছরের যে-কোন সময়ই তাবা কালিপূজা কবে থাকে। ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতিতে এদের অন্তপ্রবেশ বহিঃবাগতদেব কল্যাণেই ঘটেছে। পালাটিতে স্বল্প কথায় দুর্গাকালির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে, যা খুব সহজেই সবল ঝাড়খণ্ডীদের মনকে প্রভাবিত কবে তুলতে পারে ॥

॥ দুই ॥

### বাঁদর নাচের গান

ঝাড়খণ্ডের বীরহোড উপজাতি বানর শিকারে অভ্যস্ত পটু। বানর মাংসও এদের অভ্যস্ত প্রিয় খাবার। এদেরই একটি শাখা ষাঘাবর জীবন ছেড়ে কোথাও কোথাও কুঁড়ে বেঁধে বাস করতে শুরু করেছে এবং 'বাঁজকার' (< বাজিকর ) নামে পরিচিত লাভ করেছে। এরা বানরের খেলা দেখিয়ে গৃহস্থবাড়ি থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে জীবিকানির্বাহ করে থাকে। বানর নাচাবার সময় তারা কিছু গানও গেয়ে থাকে; এই গানগুলো বাঁদর নাচের গান নামে পরিচিত। হাতের লাঠি মাটিতে ঠুঁকে ঠুঁকে তালরক্ষা করে গানগুলো গাওয়া হয় বলে এ গান সাধারণতঃ ছড়ার ছন্দে রচিত হয়; তবে ছড়ার মধ্যে যে অসংগতি এবং অর্থহীনতা লক্ষ্য করা যায়, এই গান তা থেকে মুক্ত। বাঁদর নাচের গানের বিষয়বস্তু সর্বাংশে লোকজীবনসম্পর্কিত; প্রায় সময়ই লোকজীবনের কৌতুককর দিকগুলো এর উপজীব্য হয়ে থাকে। জীবনরসধর্মিতা এই গানের প্রধান লক্ষণ। জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখে গীতবন্ধ করার ফলে গানগুলোতে কৌতুকের আবহ যেমন রচিত হয়, তেমনি সহজ স্বচ্ছ হাস্যরসধারার উৎসমুখও অব্যাহত হয়ে থাকে। ভাবে-ভাষায় ভঙ্গিতে-মেজাজে এগুলো ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের যোগ্য উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। বাঁদর নাচের গানের সংখ্যা অভ্যস্ত সীমিত। অনেক সময়ই পঁাতাশালিয়া গানের পদও বাঁদর নাচের গান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে বাঁদর নাচের গানের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রায় প্রতিটি গানেই কোন না কোন রকমের খাণ্ডপ্রসঙ্গ থাকে।

- ১ আঘন-কুঁটা ছাঁটা চ'ল ফাণ্ডন মাসে বিহা।  
চ'ং মাসে বাউ প'ডল নাই হল্য বিহা ॥
- ২ আল ধানের মাড রাঁধোছি কানা শাগের বেসাতি।  
সাঁজের বেলা দেঅর শালা লুচকাঁই ঝায় বেসাতি ॥
- ৩ খালে খালে চ'ল ভিজাবি গালে-গালে খাবি।  
কাছে আছে ষণ্ডরবাড়ি কন্ গাড়িটায় খাবি ॥
- ৪ আস্না পাতের দাস্না করল্যা পাতের দনা।  
দনায় দনায় মদ পবুশে হিলে কানের সনা ॥

- ৫ উড়কি ধানের মুড়কি বাদাম ধানের খই ।  
বন্ধমানে দেখ্যে আলাম গামছা-বঁাধা দই ॥
- ৬ আম ফলে ধঁকা ধঁকা তেঁত'ল ফলে বাঁকা ।  
নামাল দেশে দেখ্যে আলাম রাঁড়ির হাতে শাক্বা ॥
- ৭ নাগপুর কা ছাঁটা চাঁল বুচাভাঁড়ির পানী ।  
বৈঠল বৈঠল ভাত রাঁ'ধছে কেঁউঝব কা রানী ॥
- ৮ চাঁইবাসার স্ক্রু চিড়া শিশিবে নাই ভিজ়ে চিড়া ।  
পানীর বড় টানাটানি অহ জিহলগানার পানী ॥
- ৯ বাঁগা বাঁগা খেজাডি কাকাদচাং পিঠা ।  
ঝাঁট বিদাই দে আমার ধর কাঁইরাকচা ॥

## দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অধ্যায় ছড়া

লোকসাহিত্যবাসিক পণ্ডিতদের মতে, ছড়া শুধু লোকসাহিত্যেরই আদিম শাখা নয়, ছড়া সাহিত্যমাত্রেরই আদিম শাখা। কাব্য ছড়ার বিষয়বস্তু হল শিশু, আর কে না জানে শিশুর চখে চিবপুবাঙন অথচ চিবনুতন বিষয়বস্তু আর কিছু হতে পারে না। আশি বছরের-ও আগে ববীন্দ্রনাথ ছড়াকে প্রথম অঙ্ককার যাকে আলোচ্যে গন্য তাব অনন্তকবণীয় ভাবাভঙ্গিতে অনন্ত আলোচনা করেছিলেন। 'শিশু এবং' নাবীর প্রবাস্ত নিজস্ব সম্পদ ছড়া ববীন্দ্রনাথের স্বেচ্ছদৃষ্টি লাভ না করলে হযে শিখাশিখামানী বাড়ালিব কাছে বড়ে দীঘাল ধবে অবহেলিত তুচ্ছ বস্তু হিসাবেই অনাদবে অঙ্ককাবে পড়ে থাকত। 'শিশুবেলায় শ'না ছড়ার চুচবো অংশগুলো 'মোহনম্বেব মত' পবনশীকালেও তাব মনকে আচ্ছন্ন করে বেবেছিল। তিনি বলেছেন, 'আমি আমার সেই মনেব মুগ্ধ অবস্থা স্ববণ কবিযা না দেগিলে স্পষ্ট বুঝতে পাবিন না ছড়াব মাধু্য এবং উপযোগি প্রকী।' ছড়াব পবিবর্তন থাকতে পাবে কিন্তু তাব বিনাশ নেই। ববীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'এই সকল অসংগত অর্থহীন বদুচ্চারুক শ্লাকগুলি লোকস্মৃতিতে চিবকাল প্রবাহিত হরযা আশিতেছে।' কাব্য ছড়াব বিষয়বস্তু যেমন শিশু, তেমন শিশু মনই যেন ছড়াব রূপ ধারণ কবেছে। শিশু সহজ সবল, সাংসারিক জটিল প্যাচ-বডি, শিশু যেন প্রকৃতিবর্তক রূপান্তর এবং নামাস্তব, একই ভাবে বল। যেতে পাবে, ছড়াগুল-ও প্রকৃতিজ, পাবিপাশ্বিক প্রকৃতিই যেন ছড়াব রূপ পবিগ্রহ করেছে। ববীন্দ্রনাথ এই কাব্যেই বলেছেন, 'তাহাবা মানব যনে আপনি জন্মিয়াছে।'

ডঃ স্কুনার সেন ছড়াকে 'শিশু-বেদ' নামে অভিহিত কবেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে বচনা কোন ব্যক্তিবশেষের তৈরি বলে নির্দিষ্ট কবা যায় না, যা কোন এক মানবগোষ্ঠীকে প্রায় অনাদিকাল ধবে জন্মে-কর্মে-চিন্তায় মনস্ত্রিত করে এসেছে তাকে যদি বেদ নাম দিয়ে থাকি তবে অপৌরুষেয়

ছেলেমি ছড়া-গান গল্পকে শিশু-বদ বললে বোধ কবি অসঙ্গত হয় না।

শিশু-বেদ গ্রন্থ অথচ অগ্রন, তা দৃঢ়মূল ও সজীব—অক্ষয়বটেব মতো, যার বীজ বেদেব-ও অগোচর কালের . ১'১ উঃ সেনেব বক্তব্য বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায়, বেদ সেমন কান ব্যক্তি বিশেষের বচনা নয়, অথচ তা একটি নিপুল মানবগোষ্ঠীর জীবনকে সর্বস্তবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, ছড়া বা শিশু বেদ ও তরুণ। লোকসাহিত্যের অন্ত্যান্ত শাখাব মতো ছড়া-ও কোন ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয়, সামগ্রিক সৃষ্টি। ছড়া বহু পর্ববর্তন কীকাব করে ও অশ্লীল হযে আছে, কেননা এব মল শিশু মনেব গণ্ডীর যথানে বসেব কখনো অভাব হয় না, তাই ছড়ায় বখনো সবসনা এবং সজীবতাব দুর্দিন আসে নি। সেট অনাদিকাল থেকে ছড়া বা সঙ্গাবে শিশু মনকে সিক্ত কবে এসেছে, যেদিন মানবজীবনে না ছিল বেদ ন ছিল পুৰাণ শাস্ত্র, না ছিল সান্তিত্য। এহ ছড়াই মাহুবেব সান্তিত্যপ্রয়াসেব পথম নিদর্শন। তাই ছড়া শিশুর মতোই চিত্রপুৰাণে অথচ চিবনশন। আদিম মাতৃসেব অসংলগ্ন অক্ষুট চিন্তাবাশি থাকে ছড়াব মধ্যে বিধুত হয়ে আছে। 'আদম মানব কথা বলবাব চষ্টায় যা কবত তাকে বলতে পারি শব্দেব লোফাল্ফি গেলা, আবোল-তাবোল কথা খেলাখেলি। সেই খেলাব বশেষ্ট একদিকে বুদ্ধির অভিষেকে হিংটি' ছোটখ, মন্ত্রণেব উত্তব হয়েছিল অপবদিকে স্নেহদারায় নিব্ব'ব বহুযেছিল ছেলেমি ছড়া গানে।'২

শিশুবা যা কিছু দেখে সব কল্পনাব বড়ে বঞ্জিত, যা কিছু ভাবে সব কল্পনাব ভাষায় বচিত। তাহেব চিন্তাজগতে সংগত-অসংগত স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক প্রাকৃত ও অপ্ৰাকৃত বলে কোন জিনিষ থাকে না। প্রকৃতিব রাজ্যে অসংলগ্নতা, ও স্বাভাবিকতাই যেন তাব মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত কবে থাকে। ছড়াব মধ্যে শিশুর ভাবজগতেব এহ সব কল্পনাত উজ্জল বাদে বঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শিশুমন কোনটি ক্লাত্ম খাব কোনটি তরুত্ম তাব কোন সীমাবেখা টানায় আগ্রহী নয়। সব কিছুই তার কাছে 'এহ', 'গাহ' ছড়াতেও সেই সব বিষয়বস্তু অক্লত্ম, অকপট রূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। রামেন্দ্র সূন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন, 'স্নেহবিবশা জননী যখন গৃহ-কাণেব অন্ধকার

১ 'শিশুবেদ'—ভূমিকা, শ্রীভবভাবণ দস্তের 'বালা দেশের ছড়া'।

২ প্রাগুপ্ত—'শিশুবেদ'

মধ্যে, লোক নয়নের অন্তরালে অক্ষুট বাক্ অক্ষুটবুদ্ধি অপত্যের মুখের পানে চাহিয়া আপনার আত্মারনিগূঢ়তম প্রদেশ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, তখন তাহার বাক্যভঙ্গি কাব্যভঙ্গি কোন কোন সামাজিক কৃত্রিম প্রথার বা প্রণালীর কোন ধাব ধারিতে চাহে না। তখন স্বাভাবিক মানব চরিত্র কৃত্রিমতার পর্দার অন্তরাল সবাইয়া ফেলিয়া আপনার নয়নুষ্টি আবিষ্কার করে।<sup>৩</sup>

বন্ধনহীন শৃঙ্খলহীন শিশুমন জগতের মধ্যে বিপর্যয়, নিয়মহীনতা কিংবা শৃঙ্খলাহীনতা দেখলে শঙ্কিত বোধ কবে না, বরং উল্লসিত হয়। কোন কিছুই তার কাছে জটিল নিয়মজালে বাধা স্থিরচিত্র নয়। তার মন সর্বদা চঞ্চল এবং স্ফিবি, স্বভাবতঃই দ্রুত পরিবর্তনশীল। ছড়ার জগৎটাও এই একই উপকরণে গঠিত। তাই সব সময় ছড়াব মধ্যে কোন বিশিষ্ট অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ছড়ার মূলধনই হল সংহতি এবং সংগতির বেড়া ভেঙে চর্কিত চরণে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, অর্থ থেকে নিরর্থ্যে পরিক্রমণ। আশ্চর্য চমক, অলৌকিকতা, অর্থহীনতা, শব্দেব ব্যঞ্জনা এবং সংগীতময়তা, ছন্দের বিহবল দোলা এবং ধ্বনির গভীর হাট্টিক সুর ছড়াকে অগ্ন্যাগ্ন ছন্দোবদ্ধ সাহিত্যকর্ম থেকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা দিতে পেরেছে। এ-প্রসঙ্গে বীজনাগের কথা স্মরণ করা যেতে পারে : 'আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা কবিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল। বিবিধ বর্ণে বাঞ্জিত, বায়ুশ্রোতে যদুচ্চা ভাসমান। —দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক।'

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে দ্রুত সঞ্চরণশীলতা দেখে মনে হবে এই সব ছড়া মনুগ্ৰন্থচিত্র নয়, যেন—'ইহারা আপনি জন্নিয়াছে': অগ্ন কণায় স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাস্বদৃশ। মানুষের চিন্তা এত দ্রুত শব্দ থেকে শব্দান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সংগতিহীন অবস্থায় পরিক্রমা করতে পারে ভাবা যায় না। যেহেতু মানুষ চিন্তাশীল, তাই সে যুক্তিতর্কের অবতারণা না করে এমন সাবলীল পবিক্রমা কবতে গিয়ে পদে-পদে বিভ্রত বোধ করে। কিন্তু ছড়ার জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। সেখানে সে আপনাতে আপনি বিকশি ওঠে। লজিককে ছুয়ো দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। ছড়ার জগৎ শিশুর ভাব-জগতের প্রতিলিপি, বয়স্ক মানুষের স্মৃতিস্তিত দলিল নয়।

খাসল কথা, ছড়ার রচনা যাদের মানসলোকে ঘটেছে, তারা কোনদিন

লজিক নিয়ে মাথা ঘামায় নি। একটি সূত্র পেলেই হল; একটু গতি সৃষ্টি করতে পারলে তখন আব সূত্রান্তরে ষাঁকায় কোন অনুবিধে থাকে না। কথাবস্ত্ত অসংলগ্ন মনে হতে পারে, কিন্তু ছড়াগুলো একটু খুঁটিয়ে বিচার কবলে দেখা যাবে এক একটি ছড়া যেন চলমান চিত্রের মতো। বীলের পব বীল ক্ষত সঞ্চয়মান চিত্র আমাদের চোখে অব মনে আশা'সং হযেই বিষয় থেকে বিষয়ান্তবে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিটি ছড়ার মধ্যে একটি আভ্যন্তরীণ গতি আছে, যা বিভিন্ন ভিন্নধর্মী বস্তু মধ্যে একটা গতি বা মোমেন্টাম দেবার ক্ষমতা রাখে, ফলে অজস্র অসামঞ্জস্যের মধ্যেও সাবলীল প্রবহমানতা সম্ভব হয়। শেষতক এইসব বিচিত্র চিত্রময় অসামঞ্জস্যের মধ্যেও সামঞ্জস্য আভাসিত হয় এবং তা শিশুমনের ওপর তীব্র কোঁড়ুহল এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কবতে সক্ষম হয়।

ছড়া চমক, শব্দেব ব্যঞ্জনা এবং সংগীতময়তা, ছন্দেব এবং ধ্বনিব অলৌকিক মেল বন্ধনে গড়ে ওঠে। ছড়ার এই সব সাধারণ ধর্মের সঙ্গে কখনো কখনো অর্থহীনতা এমন নিবিড় ভাব জন্মায় যে তখন তাব অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। শব্দ, ছন্দ এবং ধ্বনি ঘোঁষবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি সংগীতময় পরিবেশ বচনা কবে যেখানে উদ্ভূত কথাব সঙ্গে অর্থহীনতা একই পবিবারের ষনিষ্ঠ আত্মীয়েব মতো পাশাপাশি বাস করবার সুযোগ পায়। চিত্রধর্মিতা ছড়ার একটি সাধারণ ধর্ম। চিত্রেব যেমন ভাষা আছে, তেমনি অর্থও আছে। ননসেন্স ভার্সে বা অর্থহীন ছড়ায় কিন্তু কোন সুস্পষ্ট চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাই বলে ছড়া একেবাবে অর্থহীন, ভালগোল পাকানো চিত্রের সমষ্টি এমন কথা ভাবা ঠিক নয়। ছড়ার মধ্যেও সার্থক জীবনধর্মী বিষয়বস্তু আছে, উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা সার্থক চিত্রও আছে। ছড়াগুলো বিশ্লেষণ কবতে পারলে অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে পারে। ছড়ার মধ্যে কোন গভীর 'আধ্যাত্মিক তত্ত্ব' নিহিত না থাকলেও 'ঐতিহাসিক তত্ত্ব' বা সামাজিক তত্ত্বের ছিঁটেফোঁটা থাকতে পারে। ছড়ার মধ্যে মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের বীজ নিহিত আছে। শিশুজীবনের অনেক গভীরগোপন দুজ্জের রহস্য এই ছড়ার আশ্রয়ে লুক্কায়িত আছে; সমাজজীবনেব বহু আনন্দবেদনার চূর্ণ স্মৃতিলিপির সন্ধান ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। ববীন্দ্রনাথের-উক্তি এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য: 'অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার



মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। কোন পুৰাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক কবিত্তে পারেন না।’

অধিকাংশ ছড়াকে স্বয়ং জাত বা স্বয়ংস্ফূ মনে হলেও বহু ছড়াই কিন্তু বিশেষ নিয়ম অনুসারে গড়ে টেঠেছে। বহুক্ষেত্রেই ভাবনা চিন্তা এবং বিষয়বস্তু বন্ধনে খাবন্ধ ছড়া সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ডঠেছে। সাধাবণ ছড়া বা ছেলে তুলানো ছড়াব মধ্যে ভাববীজ, বস্তুবীজ এবং সাহিত্যবীজের ত্রাহস্পর্শ সহজেই নজবে পড়ে। সে তুলনায় খেলাবুনোর ছড়াব মধ্যে সাহিত্যবীজের অভাব বিশেষভাবে পর্বনক্ষিত। তাব প্রাণকাবণ সাধাবণ ছড়া বা ছেলেতুলানো ছড় বন্ধ ম-মাসীদেব বাচ্য; কিন্তু পেলাধুলোব ছড়া শিশুবা নিজস্ব প্রয়োজনমতো বচনা কবে থাকে।

ছড়া একান্তভাবে সুব তাল এবং ছন্দ-প্রধান। পৃথিবীব সব দেশে সব মানবসমাজেই ছড়াব একটি নিশিষ্ট সুব থাকে। ছড়াব এই ধর্ম সম্পর্ক যাবা বিশেষভাবে গর্বািত তাবা যে কোন ভাষাব ছড়া উচ্চাবত হতে শুনলেই সেটি যে ছড়া তা সহজেই বুঝতে পাবেন। ছড়াব মধ্যে স্নেহবস এতো বেশি পরিমাণে থাকে যে তা সহজেই আমাদেব স্পর্শ কবে।

ছড়ার প্রধানতম উপজীব্য হল শিশু। শিশুই ছড়াব সর্বাধিক অংশ অবিকাব কবে আছে। তাছাড়া নাবীও তাব ঘবকল্পা, বাগ্নাবাডা নিয়ে বহু ছড়ায় উপস্থিত। লোকসাহিত্যেব অন্ত্যন্ত শাখায় যেমন নাবীব জীবনেব বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়ে থাকে, এখানেও তাব ব্যতিক্রম দেখা যায় না। নাবীজীবনেব সুখদুঃখ আনন্দবেদনাব কথাও তাই ছড়াকে সাহিত্যবসঘন করে বেখেছে। শিশু এবং নারীব পাশাপাশি ছড়াব মধ্যে জীবন্ত পশুপাখি বোদবৃষ্টি তুকতাক সব কিছুই আশ্রয় নিয়েছে।

ছড়া আসলে কবিত্তা, কবিত্তাছত্র বা কবিত্তাছত্রাংশ ছাড়া আব কিছু নয়। কবিত্তাছত্র বা ছত্র থেকেই ছড়াব উদ্ভব বলে মনে হয়। ছড়া শব্দটির ব্যবহার খুব প্রাচীন নয়। ঝাড়খণ্ডে ছড়া শব্দেব কোন ব্যবহার নেই। যে অর্থে আমরা এখানে ছড়া শব্দটির আলোচনা কবছি সে অর্থে ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় ছড়া নামেব কোন শব্দ নেই। ঝাড়খণ্ডে ছড়াকে ‘ছানাভুলান গান’ বলা হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডেব ছড়া বা ‘ছানাভুলান গান’ চরিত্রগত দিক দিয়ে অনেকাংশে বাংলার ছড়াব সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলেও এবং বৈচিত্র্য থাকলেও সেগুলোকে অজস্র উপবিভাগে বিভক্ত করে আলোচনার কোন

সুযোগ নেই। তাই ঝাড়খণ্ডের ছড়াকে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করবার পক্ষপাতী :

- ১ ঘুম-পাড়ানি ছড়া, ২ ছেলে-ভুলানো ছড়া, ৩ খেলাধুলার ছড়া,
- ৪ সাধারণ জীবনসম্পর্কিত ছড়া, ৫ কাহিনীবিষয়ক ছড়া, ৬ ঐশ্বরিক ছড়া।

**ঘুমপাড়ানি ছড়া :** ঘুমপাড়ানি ছড়ার মধ্যে তেমন কোন বৈচিত্র্য দেখা যায় না। ঝাড়খণ্ডে ছড়াকে ‘গান’ও বলা হয়ে থাকে। তাই ঘুমপাড়ানি ছড়াও গানের মতোই বিশেষ সুর ও তাল নির্ভর। সুর বাদ দিয়ে ছড়ার অস্তিত্বের কথা ভাবাই যায় না। ঘুমপাড়ানি ছড়ার বিষয়বস্তুও শিশু নিজে। প্রাণচঞ্চল শিশুকে ঘুম পাড়াবার জন্ত সুরে-সুরে ছড়া আউড়ে তালে-তালে তাকে চাপড়াতে হয়। ছড়ার কথায় ছন্দের দোলা যেমন থাকে, তেমনি থাকে অমুগ্ধতা ; এর সঙ্গে যুক্ত হয় সুর এবং তাল। স্বভাবতঃই সুর করে আওড়ানো ছড়া শিশু মনকে ধীরে-ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলে ; তখন শিশুব ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হয় না। ঝাড়খণ্ডের ঘুমপাড়ানি গানে মাসি-পিসির দর্শন পাওয়া যায় না, পরিবর্তে ‘ঘুম-করা’ নামক একটি কাহিনিক জীবের দর্শন মেলে। কখনো ‘নিদ্‌চড়’য়া’ বা নিদ্রাপাথি, কখনো ‘বনচড়’য়া’ বা বনোপাথি, আবার কখনো বা টিয়ে পাথিকে ডাক দিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করা হয়।

১ আয়রে ঘুম-করা। তকে দিব ডিম পড়া ॥

২ ছানা ঘুমা ঘুমা রে তর বাপ ঘুমাল্য।

ছানা ঘুমায় নাই ছানার প্রাণ হারাল্য ॥

৩ আয় রে নিদ্‌চড়’য়া নিতোই পাপা খায়।

কন্‌ চড়’য়া পাথি মারে পাপা রুটি খায় ॥

৪ আয় রে বনচড়’য়া বনে বনে যাই।

খঁকার মা পান খাঁয়েছে শাউড়ী বাঁধা দিয়া।

৫ আয় রে টিয়া লাকঝাঁপ দিয়া।

খঁকা আমাদের পান খাঁয়েছে শাউড়ী বাঁধা দিয়া ॥

৬। আয় রে পাথি ব’স রে ডালে। ভাত দিব রে সনার খালে ॥

খাবি দাবি গান করবি। আমদের খঁকাকে ঘুম করাবি ॥

এই ধরনের ছড়া আউড়ে যখন শিশুকে ঘুম পাড়ানো সম্ভব হয় না, তখন বাধ্য হয়েই শিশুকে ভয় দেখিয়ে মধু পাড়াতে হয়—তখন ভালুককে ডাকতে হয়।

৭ আয় রে ভালুক আঁদাড়ে পিঁদাড়ে থাক ।

খঁকার মা জলকে গেলে খঁকার কান খা ॥

৮ আয় ঘুমনি আয়, ভালুকে তেঁত'ল কুর্টাই খায় ।

ভালুকে হুন কুথায় পায়, ভালুকে তেল কুথায় পায়,

আন্লা মান্লা খাঁয়ে ভালুক বনুকে পাল্গাই যায় ॥

**ছেলে-ভুলানো ছড়া :** ছেলে-ভুলানো ছড়ারও উপজীব্য শিশু নিজের

রসবিচারের দিক দিয়ে ঘুমপাড়ানি ছড়ার সাথে এর কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। ছ' শ্রেণীর ছড়াই বয়স্ক নারীর রচিত। পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় সুরে-ছন্দে-তালে। ঘুমপাড়ানি ছড়ার সুর বিলম্বিত, শব্দযোজনায় দীর্ঘস্থরের প্রয়োগ এবং ছন্দ-তালও অত্যন্ত স্তম্ভগতির; শিশুকে ঘুম পাড়ানোই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার উদ্দেশ্য জাগ্রত শিশুর মনোরঞ্জন। কখনো খাটুবিমুখ শিশুকে অগ্রমনস্ক করে খাটুগ্রহণ করানো, কখনো ক্রন্দনরত শিশুর ক্রন্দন থামানো, কখনো-বা শিশুকে মজার হাসির খোরাক জোগানোই ছেলেভুলানো ছড়ার উদ্দেশ্য। স্বভাবতঃই এর সুর যেমন দ্রুত হয়, তেমনি ছন্দ-তালও। তাই এই জাতীয় ছড়া লঘুমাত্রার শব্দসমন্বয়ে রচিত হয়ে থাকে।

৯ খঁকা খঁকা ডাক পাড়ি। খঁকা যায় রে কার বাড়ি ?

শিঁকায় ডা'ল বাটায় পান। আম্দের খঁকাকে ডাকি আন ॥

আম্দের খঁকা খায় না ভাত। কুথায় পাব মাগুর মাছ ?

কা'ল যাব কপ্পাড়ার হাট। কিন্তে আ'নব মাগুর মাছ ॥

আম্দের খঁকার মন ঠাণ্ডা। একবেলা খায় দুধ মণ্ডা একবেলা খায় রস্তুা ॥

১০ চের চের পটাস। শুগুচু পঁড়ুচু ॥

চড্খুসলী ভাঁদা যায়। আম্দের খঁকা মাস ভাত খায় ॥

খঁকার মা খায় কজ্জি আম্ঠা। খঁকার বাপ খায় চের চের পটাস্ ॥

'চের চের পটাস' ছড়াটির আদিতে এবং শেষে ব্যবহার করা হয়েছে; এর অর্থ কি, ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু এই কথাটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের উল্লাসে ভরে উঠতে দেখা যায়। 'শুগুচু পঁড়ুচু' ছেলেদের ভোলাবার একটা উপায়কে বলা হয়ে থাকে। উঁচু খাটের ওপর বসে পা কুলিয়ে পায়ে পাতার ওপর শিশুকে বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে তার দুটো হাত ধরে 'শুগুচু পঁড়ুচু' বলে দোলা দিতে দেখা যায়।

ছোট ছোট শিশুদের তেল মাথাবার সময় একটু আধটু ব্যায়াম করানো

হয়। নিচের ছড়াটি টেনে-টেনে দু'টি দু'টি শব্দে ভাগ করে আউড়ে শিশুর হাত ও পায়ের কসরৎ কবানো হয়।

১১ কাঠ বাঁধ পাত বাঁধ বাবুকে বাঁধ / বাবু বাঢ়ে কর'ল বাঁধ ॥

শিশুকে নিজে থেকে উঠে দাঁড়াবার জন্তু ছড়া আউড়ে প্রলুব্ধ করা হয়—

১২ অলগ ডিডি পাপা খায়। মামা ঘরকে দৌড়ো ঘায় ॥

‘অলগ ডিডি’ শব্দটির অর্থ নিজে থেকে দাঁড়ানো; ‘ডিডি’ মানে দাঁড়ানো। একে আমবা শিশুভাষা বলতে পারি। এর আগে পাপা (পিঠে), হাবু (স্নান) শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করেছি, যা শিশুভাষার শব্দকোষের অন্তর্গত। এই সব শব্দে মাতৃস্নেহ লুকিয়ে আছে, স্নেহের ভাষাই এখানে শিশুভাষার রূপ নিয়েছে।

অনিচ্ছুক শিশুকে ছড়া বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে স্নান করানো হয়—

১৩ খুকু সিনাছেন গা ছুলাছেন হাতে তেলের বাটি।

ছুঁয়ে ছুঁয়ে চুল ঝা'ডছেন হিলছে সনার কাঁঠি ॥

শিশুর স্নান-ভোজন যেমন ছড়ার বিষয়বস্তু, তেমনি তাব কান্নাও। শিশু কেন যে কাঁদে, সবসময় তাব কোন হৃদিস মেলে না। শিশু কারণে কাঁদে, শিশু অকারণে কাঁদে। কারণ, শিশুর কান্নাই বল। কান্না থামাবার জন্তুও তাই ছড়া রচনা করতে হয়েছে। ছড়ায় কান্না-থামানোর জন্তু যেমন প্রলোভনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি শান্তিরও।

১৪ ধন কেনে রে কাঁদে শিশুরঘর যাতে ?

চিড়া মুচি গাঁঠ্যাই দিব রাস্তায় জল খাতে,

লাল কাপড়ের ছাতা দিব জুড়'াই জুড়'াই যাতে ॥

১৫ এত রাইতে কাহার ছালা কাঁদে। ঘুগুচু পা'ডুচু পা'খ ডাকে ॥

১৬ চূপ দে ন চূপ দে ন বিলাই আ'সছে।

বাবুর মতন ছালা গিলা গটাই গিলছে ॥

১৭ কাক কঁক বশের টাঁক। কাড়া হালটি কতকের ?

হোক ন আমার যতকের। আন ছুরি কাট পেট ॥

ঝাড়খণ্ডে জননীরা-স্নেহে আদরে কতো নামে ঘে ডেকে থাকেন তাব ইয়স্তা নেই। জননী যেন বিভিন্ন নামে সন্তানকে ডেকেও তৃপ্তি-প্রাপ্ত না। বাবু, সনা, টাকার গর্যা, ধন, মুহু, মুনা—কতো না ডাকে তাই এখানকার শিশুবা স্নেহসিঙ্কিত হয়ে থাকে। কিন্তু সোনা কিংবা ধন কিংবা টাকার গাগরী

বলে ডাকলেই কি জননীর অন্তরের গভীর আনন্দাহুভূতি এবং গৌরবের সব-  
খানি প্রকাশ পাওয়া সম্ভব? এর মধ্যে 'ধন' শব্দটি ছড়ায় সর্বাধিক ব্যবহৃত  
হয়েছে। এই ধন শুধু সম্ভান-সম্পদ নয়, তারো অতিরিক্ত অনেক কিছু।

১৮ ধন ধন ধন, হল'দ বাড়ির বন, (ক. লট্যা খাড়ার বন)

অই ধনকে যে দে'খতে নারে পুড়ুক তাহার মন ॥

এই ধন যার ঘরে নাই ( তারা ) কিসের গরম করে,

তার পুড়ো কেন্ নাই মরে ।

ধন ধন ধন, হল'দ ফুলের বন

অই ধনকে যে গা'ল দিয়ে'ছে পুড়ুক তাহার মন ॥

১৯ ধন গেছে রে কনখানে, বাসফুলের বন যো'ানে ।

সেখানে ধন কি করে । ডাল ভাঙে আব ফুল পাড়ে ॥

২০ ধন ধন ধন, যাই না বে বন,

ধবে নসি বন'াই দিব বতন সিংহাসন ॥

ছেলেভুলানো ছড়ায় নৃত্যের প্রসঙ্গও পাওয়া যায়—

২১ তা থই থই থুবা, ভা'ঙল খা'টের থুবা,

ভা'টাই নাচে স্কন্দরী বউ বশুে বাজায় বৃতা ॥

২২ মালকু'ড়ির হাটে ভালুক নাচে বাটে

মা'রের চটে, ভালুক গেল বাটে বাটে ॥

মাছ ধরতে বেরিয়ে-পড়ার কথাও এজাতীয় ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়—

২৩ আস্থ রে ছানাপনারা মাছ ধ'রতে যাব,

মাছের কাঁটা পায়ে লা'গলে দলায় চাপো যাব ।

দলায় আছে ছ পণ কড়ি গুণ্যে গুণ্যে যাব,

একটি কড়ি বেশি হলে লাড়ু কিণ্ডে খাব ॥

**খেলাধুলার ছড়া:** ঘুমপাড়ানি এবং ছেলেভুলানো ছড়ার সঙ্গে  
খেলাধুলার ছড়ার মৌল পার্থক্য এই যে, প্রথম দু' শ্রেণীর ছড়া বয়োজ্যেষ্ঠ  
আত্মীয়স্বজন, বিশেষভাবে মা-মাসিরা, আবৃত্তি করে শিশুকে ঘুম পাড়ান অথবা  
তার মনোরঞ্জন করে থাকেন, স্বভাবতঃই ছড়াগুলোও তাঁদেরই রচনা,  
অন্তর্পক্ষে, খেলাধুলার ছড়াগুলো শিশুদের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়ে থাকে,  
তারাই বিশেষ বিশেষ খেলার প্রয়োজনে এই সব ছড়া রচনা করে থাকে।  
বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ মানসজাত বলে প্রথম দু'শ্রেণীর ছড়ায় কল্পনার ব্যাপ্তি,

রসঘনতা, কবিত্ব, বাস্তববোধ এবং সৌন্দর্যচেতনা উজ্জ্বলরেখায় ফুটে উঠেছে ; খেলাধুলার ছড়া নিতান্ত শিশুমনজাত বলে এইসব গুণবর্জিত নিছক ছন্দ এবং ধ্বনিসর্বস্ব ছড়ায় অনেক সময় পর্যবসিত হয়েছে। বহুক্ষেত্রেই এই সব ছড়া অসংলগ্ন, অস্পষ্ট এবং নিরর্থ চিত্রের সমষ্টিমাত্র। সুরের এবং তাল-মানের বিচারেও বিশেষ পার্থক্য ধরা পড়ে। ঘুমপাড়ানি এবং ছেলেভুলানোর ছড়া বিলাসিত সুরে এবং টিমে তালে আবৃত্তি করা হয়, কিন্তু খেলার ছড়া দ্রুত লয়ের সুরে এবং তালে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে—বিভিন্ন খেলার চরিত্র যেন ছড়ার আবৃত্তির ভঙ্গি থেকেই ফুটে ওঠে। খেলার ছড়াও গানের মতোই সুর কবে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে, তাই এই শ্রেণীর ছড়ার ইংরাজি নাম game song বা খেলার গান সংগত মনে হয়।

খেলার মধ্যে অঙ্গসঞ্চালন জড়িত থাকে, যা ঘুমপাড়ানি বা ছেলেভুলানো ছড়ায় থাকে না। মুখে ছড়া আবৃত্তি করে অঙ্গসঞ্চালন করে খেলতে হয়, অনেকটা অভিনয়ের মতোই, তাই অনেকেই ছড়া-নির্ভর খেলা এবং খেলাব গানকে লোকনাট্যের উৎস মনে করেন। খেলার ছড়ায় যেমন কবিত্বের দর্শন মেলে না, তেমনি বসঘনতাও লক্ষ্যগোচর হয় না। সুরের চেয়েও তালের প্রাধান্য এছড়ায় বেশি; অঙ্গ সঞ্চালন ক্রিয়াই যেখানে মুখ্যস্থান অধিকার করে থাকে, সেখানে যে সুরের চেয়ে তালের প্রাধান্যই থাকবে তাতে সন্দেহ কি? এইসব ছড়ায় সংগতিরক্ষারও কোন আগ্রহ থাকে না। ছড়ার অগ্রতম প্রধান লক্ষণ চিত্রদর্মিতা; একটি চিত্র স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠবার আগেই আর একটি চিত্র এসে তার স্থান দখল করে নেয়। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে দ্রুত সঞ্চরণশীলতা খেলাধুলার ছড়াতেই বিশেষভাবে নজর পড়ে। আসলে তাল যেখানে লক্ষ্য, সেখানে বিষয়বস্তুর দিকে নজর দেবার কোন প্রয়োজনই থাকে না; তাই তালরক্ষা করে নিত্যনতুন বিষয়বস্তুর সমাবেশ করার ঝোঁক খেলাব ছড়ায় দেখা যায়। বিশেষ ধরনের খেলায় বিশেষ তাল থাকে, আর তারই জগু বিশেষ ধরনের ছড়ার প্রয়োজন পড়ে। স্বভাবতঃই প্রতিটি খেলাব ছড়া স্বতন্ত্র হয় এবং খেলাটিকে বাদ দিলে সংশ্লিষ্ট ছড়ার আব কোন বাবহারিক প্রয়োজন থাকে না। বলা যেতে পারে খেলার ছড়াকে পেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তার স্বাধীন কোন অস্তিত্বই থাকে না।

ঝাড়পেঙেও ছেলেমেয়েদের শ্রেণীগত এবং সম্মিলিত অঙ্গসঞ্চালনের খেলা

প্রচলিত আছে। অধিকাংশ খেলাতেই ছড়াব ব্যবহার হয়। চবিত্ত্রগত দিক দিয়ে বাংলাব খেলার ছড়াব সঙ্গে এদেব খুব একটা পার্থক্য নজরে পড়ে না। বস্তুতঃ বিশ্ব-শিশুমন সর্বত্রই খেলা এবং ছড়াব মধ্য দিয়ে নিজেদের মানাসিক ক্রকোব পবিচয় প্রকাশ কবে থাকে। ঝাড়খণ্ডেব বহু খেলার সঙ্গেই ছড়াব ব্যবহার থাকলেও সব সময় একটা বিশেষ নামে খেলাগুলোকে চিহ্নিত কবা হয় না। প্রায় সময়ই ছড়াব প্রথম শব্দ বা শব্দযুগলেব সাহায্যে খেলাব নামকরণ কবা হয়ে থাকে। ডু-ডু, ইকিড মিকিড, কদ'ল মাজা-মাজা, ঐতড়া-পাতড়া, শাঁক ল সবা, কুহলুকা (লুকোচুবি) ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত ছড়া-নির্ভব খেলাব কয়েকটা উদাহরণ। এব মध्ये ডু ডু (হাডুডু) খেলায় বিচিত্র বসেব বিচিত্র গঠনেব ছড়াব ব্যবহার সর্বাধিক লক্ষ্যগোচর হয়। হাডু ডু খেলা প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোব ভট্টাচাৰ্য বলেছেন, 'সমাজতত্ত্ববিদগণ যথার্থই অনুমান কবিয়া থাকেন যে, পুরুষদিগের মধ্যে প্রচলিত খেলামাত্রই খাদিম সমাজেব গাঞ্জীস\* গ্রামেব অবশেষ মাত্র। ইহাদেব মধ্যে আত্মবক্ষা এবং খাত্র মণেব যে সকল পদ্ধতি দেয়া যায় তাহা যুদ্ধনীতিসম্মত। বাংলাব হাডু ডু খেলাও তাহাই।'<sup>৪</sup> খেলাটিব মধ্য দিয়ে যথার্থই পৌরুষ প্রকাশ পয়ে থাকে। খেলাটি যে সংগ্রামেবই নিখুঁত অভিনয়, তা খেলাটির ধাবা এবং ছড়ার কথাবস্তু অনুধাবন কবলে বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই খেলায় দু'পক্ষেব খেলোয়াডেব মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আক্রোশ এবং শত্রুতা প্রকাশ পেয থাকে। খেলাটি পৌরুষমণ্ডিত হওযায ছড়াগুলো খুব একটা ভাবগর্ভ কিংবা সাহিত্যবসমৃদ্ধ হয় না, কিন্তু ছড়াগুলোব মধ্যে যে তীব্র গাঞ্জীলতা এবং ক্রওলয়েব ছন্দ ফুটে ওঠে তা কাবো দৃষ্টি এডায় না। এ ছড়া পুরুষেব খেলাব জগ্ন পুরুষেবই বচিত, অগ্নাগ্ন ধবনেব ছড়াব তুলনায় খেলাব ছড়ায় কবিত্ত্বগুণ মোটেই থাকে না, প্রায়শঃই অর্ধহীন হয়ে থাকে, নীত্রগতিপ্রবাহে চিত্তগুলোও যথাযথভাবে ফুটে উঠতে পাবে না—শুধু ছন্দাধাত এবং পৌরুষেব দিকটি সম্পর্কে আমাদেব সচকিত কবে তোলে।

২৫ একুড দোকুড ত্তুকুড নালা / লাডকাই লুডকুই বাঁশেব চাণা।

চাঁইচুঁই চডুই ডিম / লাঙল মাখা গকব শিং।

তাতা চুডি উনিশ কুডি ॥

- ২৫ অকল বকল টকল ঠিয়া | ধমসা নাগরা বাজে হিয়া ।  
ইস বিব করম ঠিস | ঠারে ঠুরে উনিশ বিশ ॥
- ২৬ উড়কুল তুড়কুল নলের বাঁশি | নল করোছে একাদশী ।  
হলুদ মানে তলুদ ফুল | টাকা মানে টগর ফুল ॥
- ২৭ আগড়ুম বাগড়ুম ঘড়াডুম সাজে | বাঁয় ঝটপট মুণ্ডব বাজে ।  
মুণ্ডর শাল পঞ্চমাল | কে কে যাবে কামার শাল ।  
কামার শালের বাঁয় পুয়াতি | বনের লে বা'হবালা কপ্তী ॥
- ২৮ অড়গাছ বড়গাছ | তার তলে জগন্নাথ ।  
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি | সুরু চা'ল কাটি ।  
কা'চতে কা'চতে হল্য ভাত | উঠ বুঢ়া জগন্নাথ ॥

ওপবেব ছড়াগুলো কোন না কোনভাবে বাংলার ছড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত । এগুলো হাড়ুড়ু খেলায় ব্যবহৃত হলেও হাড়ুড়ু শব্দের প্রয়োগ যেমন নেই, তেমনি শব্দভাষা এবং আকোশও অনুপস্থিত । নিম্নোক্ত ছড়াগুলো যে হাড়ুড়ু খেলার বিশুদ্ধ ছড়া তাতে কোন সন্দেহ নেই ।

- ২৯ হাড়ু-ডু খেলিয়ে | বাঘ মারি চালিয়ে,  
বাঘের তেলে | পদ্দীপ জলে,  
জলুক পদ্দীপ উড়ুক ধুঁয়া | চলি আয়রে ছুঁচামুহা ॥
- ৩০ একান দুকান তিকান ঠিয়া | নাক ডেডেন পেচামুহা ।  
পেচার উপর বা'জল ঢোল | অই শালা মাহাচোর ।
- ৩১ আম পাত্ জড়া জড়া | মা'রব চাবুক ছা'ডব ঘড়া ।  
অ রে পেচা সর'গাই ডাঁঢ়া | আ'সছে আমার খেপা ঘড়া ॥

অন্তান্ত ধরনের কিছু খেলার ছড়া নিচে উদ্ধৃত করা হল । এগুলোর মধ্যেও খেলাধুলার ছড়ার চরিত্রধর্ম সহজেই নজরে পড়ে । কোন কোন ছড়ায় কল্পনার ব্যাপ্তি, কবিত্বের স্পর্শ এবং অসংলগ্ন চিত্রাবলীর শৃঙ্খলাবদ্ধতাও দেখতে পাওয়া যায় । খেলাধুলার বিশদ বিবরণ অপ্রয়োজনবোধে পরিত্যক্ত হল ।

- ৩২ ইকিড় মিকিড় : ইকিড় মিকিড় দাঁত কিড়কিড় | লহালতি বে'লপাত  
বাড়ি-এ আছে নিমগাছটি নিম ঝরঝর করে | সদাগরের  
বেটাবিটি | নিত্ লিয়াই লাগে । খাঁড়ুড়ু ন কুঁচ্যা ॥
- ৩৩ কদ'ল মাজামাজা : কদ'ল মাজামাজা | ঘি মউটি রাজা ।  
রাজাঘরের লক আসোঁছে | একটি কদ'ল ঠিং যা ॥



- ৩৪ কদ'ল মাজামাজা—হিংবতী রাজা ।  
 আঙ্কা দিব বাঙ্কা দিব কানে দিব কডি  
 বেহার বেলা দে'খতে যাব দি চপ্ চপ্ দাঢ়ি ।  
 দাঢ়ি নাই ছুঢ়ি নাই টসর কাপডি  
 টসর করে খসরমসর বিল্লি করে মা'ও ।  
 একটি কদ'ল ঠিং যাও ॥
- ৩৫ জাঁতড়া পাঁতড়া : জাঁতড়া বে পাঁতড়া | মাহ্ তা'ন গেছে হাট ।  
 আশুন নাই পানী নাই | দে পব্বশন ভাত ॥
- ৩৬ শাঁক ল সরা : শাঁক ল সরা পদ্মপাতের ঘড়া,  
 যে নাই হুঁটে তার মা চিডা কুটে ডুম ডুম ডুম ॥  
 একটা চাঁদ দুটা চাঁদ | টাণ্ডেটুণ্ডে কাপড বাঁধ ।  
 চল নানী জলকে যাব,  
 জলের ভিতর ফুল ফুটোছে ফুলের বড কলি ।  
 শাগ ল লট্যা ল করমের ডালি ॥
- ৩৮ কুহুলুকা : আমার খেড়ী খুজ্যে দে | নাই ত মুঢ়ি ভাজ্যে দে ॥  
 আমার খেড়ী খুজ্যে দে । না'হলে নেটী চিম্টা দে ॥
- ৩৯ একেড় গেজা : একেড় গেজা । ডুমকি রাজা ॥  
 ভিনেক তেতা । চারে চুগ'ল ॥  
 পাচে পাঠি । ছয়ে ডাঠি ॥  
 সাতে সূত'ল । আঠে গুটি ॥  
 নয়ে নইচি । দশে ঘুগি ॥

মাঝে-মাঝে ছেলেমেয়েরা প্রমোত্তরবাচক খেলাতেও মেতে ওঠে । এই খেলায় শরীরচর্চার চেয়ে বুদ্ধির চর্চাই প্রধান । এ খেলা কথাসর্বস্ব । প্রমোত্তরের কথাগুলো ছন্দমিলের জগ্ন ছড়ার আকার ধারণ করে । যেমন—

৪০ একটা কথা শুন্ ।

কি কথা ? বেঙলতা । | কি বেঙ ? টুরি বেঙ ।  
 কি টুরি ? বাম্হন বুঢ়ি । | কি বাম্হন ? চণ্ডী বাম্হন ।  
 কি চণ্ডী ? পিঠা ষণ্ডী । | কি পিঠা ? তাল পিঠা ।  
 কি তাল ? খেজুর তাল । | কি খেজুর ? পেক মেজুর ।  
 কি পেক ? সনা পেক । | কি সনা ? আমি হাগি তু'ই গু থা না ॥

তথাকথিত রুচিশীল শুচিবায়ুগ্রস্ত লোকদের কাছে শেষ পঙ্কিটি আপত্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু যারা গ্রাম্যসাহিত্য-লোকসাহিত্যের চর্চা করেন কিংবা সমাজতত্ত্বের, তাঁদের পক্ষে এই ধরনের শব্দ এড়িয়ে যাওয়াটা কতোদূর সংগত, তা বিতর্কিত ব্যাপার। যে-কোন সমাজের লোকজীবনের স্বরূপ, রীতিরেওয়াজ ইত্যাদি সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞানলাভের জন্য কোন কিছুই পবিত্রাজ্য নয়। কোন শব্দ অত্র সমাজেব লোকের রুচিতে আঘাত করলেও সেই শব্দটি যে- সমাজে প্রচলিত সেখানে আর দশটি শব্দের মতোই স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দব্যবহারের মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ মাহুয়ের কিংবা কোন বিশেষ সমাজের মাহুয়ের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঝাড়খণ্ডী জনমানস যে- কোন মনোভাবকেই সরাসরি পরিচিত শব্দ দিয়েই প্রকাশ করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছড়া সংগ্রহকালে ‘ভাতার-খাকী’ শব্দ বদলে ‘স্বামী-খাকী’ করেছিলেন, ফলে রুচিশীল পাঠকের রুচি বক্ষা করা গেলেও শব্দটি ব্যবহারের তীব্রতা অনেক-খানি হ্রাস পেয়েছিল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই ধরনের পরিবর্তন সাধন যে সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর, তা স্বীকার করেছেন। অথচ তিনিও এই প্রশ্নোত্তরবাচক ছড়ার গ্রাম্যশব্দটি ব্যবহার না করে খুব সম্ভবতঃ দু’এক জায়গায় গোবর শব্দটির ব্যবহার কবেছেন। তাঁর মন্তব্য স্মর্তব্য : ‘কোন কোন ছড়ায় গোবর অপেক্ষাও এক অগাঢ়বস্ত্র খাইবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা এত অথাৎ যে তাহার নামও এখানে উচ্চারণ করা যাইতেছে না।’ আমরা এতোখানি প্রগতিশীল এবং রুচিবাগীশ না হয়ে রক্ষণশীলতা এবং গ্রাম্যরুচির সমর্থক হিসাবে মাঝে মাঝে এক আধটা গ্রাম্য-শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। রুচিশীল পাঠককে এই অংশটি দ্রুত পার হয়ে যাবার নিবেদন জানানো ছাড়া আমাদের করণীয় কিছু নেই।

**সাধারণ জীবন-বিষয়ক ছড়া :** বাস্তব সংসারের সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনার কাহিনী সাধারণতঃ এই সব ছড়ার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। ছেলে, ভুলানো গান, ঘুমপাড়ানি এবং খেলাধুলার ছড়ার সঙ্গে এই জাতীয় ছড়ার মৌলিক পার্থক্য এই খানেই। এগুলোকে সাধারণ ছড়া বা বাস্তব জীবন-বিষয়ক ছড়া-ও বলা চলে। ঘুমপাড়ানি এবং ছেলেভুলানো ছড়ার মতো এগুলোও বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্কী রমণীর, প্রধানতঃ মা-মুসিদের, রচনা। এগুলোতে বাস্তব জীবন-রসের যতোখানি আধিক্য দেখা যায়, ততোখানি

শিশুদের ছড়ায় দেখা যায় না। এই জীবনধর্মিতার জগুই এই ছড়া বহুলাংশে সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষ পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ কামনাবাসনাই এই সব ছড়ার মধ্যে প্রতিকলিত হয়ে থাকে। এই সব জীবন-কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র মুখ্যতঃ নারী হয়ে থাকে। নারীর কন্যা- এবং বধূজীবন এই ছড়ার বিষয়বস্তু ; নাবীর অন্নাগ্ন ভূমিকা এবং পারিবারিক জীবনও এর উপজীব্য হয়ে থাকে।

এই জাতীয় ছড়া ঘুমপাডানি কিংবা ছেলেভুলানো; কিংবা খেলাধুলো— কোন কাজেই ব্যবহার করা হয় না। এই ছড়া বয়স্কা নারী-রচিত হলেও এগুলো প্রধানতঃ ছেলেমেয়েরা অবসর সময়ে নিজেদের চিত্তবিনোদনের জগু আবৃত্তি করে থাকে। নিছক আনন্দলাভই যে এই ছড়া আবৃত্তির আসল উদ্দেশ্য তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

আমরা প্রথমে কন্যার বিবাহবিষয়ক ছড়াগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

৪১ জাঁগুর জাঁগুর ঘাটে রে ভাই জাঁগুর জাঁগুর ঘাটে,  
 কি করো জানিব ভাই রে খুকুর বিভা হচ্ছে।  
 হাই গুন গ খুকুর মা বসুন গ মা ডালে  
 ডালপাত ভাঙে দুটি যবুনার খালে।  
 সেই খালে বসে কন্যার বাপ পাখুড়া কন্যা দান করে।  
 কন্যা দান ক'রতে ক'রতে চইথে পড়ে লর  
 আন রে গামছা মুছাইব লর।

এই সব ছড়ায় পিতার ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য ; যেটুকু আছে তাতেও পিতার বিরুদ্ধে অপযশ, অভিযোগের কথাই দেখা যায়। উদ্ধৃত ছড়াটিতেও পিতাকে 'পাখুড়া' বা পাষণ্ড বলা হয়েছে। কন্যাপণ নিয়ে ঝাড়বণ্ডে কন্যার বিবাহ দেবার রীতি আছে। আর দশটি জিনিষের মতো কন্যাকে বিক্রয় করে পিতা অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই পিতাকে পাষণ্ড বলা হয়েছে ; তাছাড়া কন্যাদানের অধিকার তো পিতারই, তাই স্বশুরালয়ের সমস্ত দুঃখ-বেদনার জগুও পিতাকে দায়ী করা হয়ে থাকে বলে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু পিতাকে পাষণ্ড বলা হলেও তাঁরও যে একটি সুকোমল পিতৃ-হৃদয় আছে,—যেখানে সুখেদুঃখে লালিতা কন্যার জগু প্রচুর স্নেহরস সঞ্চিত হয়ে থাকে, তা আমরা ওপরের ছড়াটি থেকেই বুঝতে পারি। কন্যাদানরত দরঅশ্র-বিগলিত পিতার চিত্রটি আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

কন্ঠার বিয়ে দেওয়া মানেই নতুন জামাই-এর আবির্ভাব। জামাই আদর বড় আদর, কন্ঠার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে জামাই-এর ভালোমাহুঁষি এবং সুবুদ্ধির ওপর। জামাই যদি কষ্ট হয় তবে মেয়ের অদৃষ্ট অন্ধকার হতে সময় লাগে না। তাই তার সম্মান রক্ষা করা, তার যোগ্য আদর করা একান্ত দরকাব। ঝাডখণ্ডের প্রবাদে পাওয়া যায়, 'ঝি-জামাই বাকা কাঠ'। বক্র কাঠখণ্ড যেমন সহজে সোজা করা যায় না, তেমনি জামাই একবার বেকে বসলে শত সাধা-সাধনাতেও তুষ্ট করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই আদর-যত্ন ভালো ভালো খাবার দিখে জামাই বাবাজীবনকে তুষ্ট রাখতে হয়।

৮২ রম্হা বাড়ি-এ কে রে ভাই গাঁদার শুঁ'হুব কবে,

রম্হা শাগ ভাজ্যে দিব ঘি-মউরা দিয়ে'।

ঘি-মউরার বাসে, জামাই গেল ক্ৰম্যে'।

জামাইকে ঘূ'বাই আ'নব জড় ধুতি দিয়ে',

বিটিকে ঘূ'বাই আ'নব দুয়াহ শাঁখা দিয়ে'।

আ'জ থাক রে বরকন্ঠারা একটি মেজুব খাঁয়ে।

কা'ল যাবে রে বরকন্ঠারা সংসার কাঁদায়ে'।

আ'শু কাঁদে মাসিপিসি পেছু কাঁদে পব,

পব দেব'তা লাগাঁহ দিব যাবি পরের ঘব।

বাপে দিবেক শাড়ি শাঁখা মায়ে দিবেক তৈল,

অই শাড়ি পবে' যাবি বাবুয়ার ঘর।

'বাবু, বাবু' ডাক পড়োছে বাবু নাইথ ঘবে,

হালের বাড়ি ফালে দিয়ে' মাছধরানি গেছে।

তৈল দাও হলুদ দাও শুক্ক হয়ে' আসি

পান দাও সুপারি দাও ঠাকুর পূজায় বসি।

এই ছড়াটির অল্প কথাস্তর রূপটি-ও এই প্রসঙ্গে বিচার্য।

৮৩ কে রে ছলা বাড়ি-এ গাঁদার শুঁ'হুব করে।

হিঙের বাসে জামাই গেল ক্ৰম্যে।

জামাইকে নিয়ে' আন জড় ধুতি দিয়ে'।

বিটিকে নিয়ে' আন দুয়াই শাঁখা দিয়ে'।

আ'জ থাক রে বরকন্ঠারা পেক মেজুর খাঁয়ে।

কা'ল যাবে রে বরকন্ঠারা সংসার কাঁদায়ে'।

আগে কাঁদে মাসিপিসি তারপর কাঁদে পর,  
 পরদেবতা লিখেঁ দিলে যাবি পরের ঘর।  
 পবের বেটা মারে'্য দিল ধায়ে' অল্যা বাপেব ঘর।  
 বাপে দিল সুরু শাঁখা মায়ে দিল গিলাপ,  
 সেই গিলাপ পড়ে'্য গেল সীতা রাম রাম ॥

প্রথম পাঠটিতে সম্ভবতঃ শেষের দিকে অল্প কোন ছড়ার অংশবিশেষ এসে মিশে গেছে। দু'টি ছড়ার মধ্যে দৈর্ঘ্যে এবং বিষয়বস্তুব বিস্তৃতিতে যথেষ্ট অমিল থাকলেও মিলটাও সহজেই নজরে পড়ে। ঝাড়খণ্ডে জামাই-এর মর্খাদা অত্যন্ত বেশি। তার সম্মানবোধ বড়োই স্পর্শকাতর। তাকে খুশি রাখবার জন্য শাস্ত্রির সাধ্যসাপনাব অস্ত্র থাকে না। পুরুষশাসিত সমাজে কন্যার ভালোমন্দ জামাই-এর ওপর নির্ভব কবে থাকে। জামাই রুষ্ট হলে কন্যাকে শুধু যে শাঁখা-সিঁদুর ফেলে বাপের বাড়িতে চলে আসতে হয় তাই নয়, শবীবে নিপীড়নের চিহ্নও বয়ে আসতে হয়। ওপবেব ছড়াটিতে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

কন্যাবিদায়ের সময়ের আর একটি ছড়া উদ্ধৃত করা হল—

৪৪ উড়কি ধানেব মুর্চকি কলঙ্ক ধানেব খই,  
 গাছপাকা কলাপাকা গামছা-বাঁধা দই।  
 অ কিয়া ফুল অ কিয়া ফুল মাকে দেখ হে।  
 মা বড় কুবুন্ধ্যা আমার কাঁছে কাটো মবে,  
 সংসার বুঝিয়ে দেখ মা কার ঘর করে।  
 আশু যায় মা ধব ঘড়া পেছু যায় মা ঝাবি,  
 ঝারির চলনে আমরা চলিতে না পারি।  
 হাতের শাঁখায় লেপ লাগোছে,  
 গলার গজমোতি রক্ত ফুটোছে ॥

**কাহিনী-বিষয়ক ছড়া :** এই শ্রেণীর ছড়ার ভেতবেই কাহিনীর বীজ লুকানো থাকে। এক একটি ছড়া বিশ্লেষণ করলে এক একটি পূর্ণাবয়ব কাহিনী গড়ে ওঠে। কথা-কাহিনী এককালে পড়ে রচিত হত বলে অনেকের ধারণা। বিভিন্ন লোককথার মধ্যে-মধ্যে ছড়ার প্রয়োগ যেমন করা হয়, তেমনই বিভিন্ন বিষয়বীজ হিসাবে কাহিনীর সূত্রপাতেই সংশ্লিষ্ট ছড়ারও আবৃত্তি করা হয়।

বর্তমানে বহু কাহিনীবিষয়ক ছড়াই কাহিনী থেকে বিস্মৃষ্ট হয়ে ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনমূলক ছড়াতে পরিণত হয়েছে। ছড়াব সংশ্লিষ্ট কাহিনীটি বহুক্ষেত্রেই হারিয়ে গিয়েছে।

কাহিনী-বিষয়ক কিছু ছড়া ধাঁধা এবং রূপকথা প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করা যাবে। এখানে আমবা মূলতঃ লৌকিক জীবনসম্পর্কিত কাহিনী-বিষয়ক ছড়া নিয়ে আলোচনা করব। বলাবাহুল্য, এইসব ছড়াব বিষয়বস্তু লৌকিক জীবন হওয়ায় বাস্তবজগতের পরিচয় পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণে।

৪৫ দশ পন্থ বাবণ ভায়া কন পন্থে গেল ?

শিলাগড় পর্বতে চটো চালতারসে মিশে গেল ॥

একবার একজন লোক বেশ কিছু কাঁকড়া ধরে এনে রান্নাবান্নাব জন্তে অন্দর-মহলে পাঠিয়ে দিচ্ছেছিল। দুপুর হয়ে গেল, তবু লোকজনের ভিড় কমল না। এদিকে কাঁকড়াগুলোর কি সদগতি কবা হল, তা জানবার জন্তেও খুবই ইচ্ছে করছে। তাই শেষতক ধাঁধার মতো করে অন্দরমহলের উদ্দেশ্যে বলল, ‘দশপন্থ বাবণ ভায়া কন পন্থে গেল ?’ কাঁকড়ার দশটি পা, বাবণের দশটি মাথা, দুটোকে মিলিয়ে তালগোল পাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, ‘কাঁকড়াগুলোর কি ব্যবস্থা করা হল ?’ অন্দরমহল থেকে জবাব এল, ‘শিলনোড়া দিয়ে কাঁকড়াগুলোকে পিষে চালতারসের সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করা হয়েছে।’

৪৬ ‘সাত খাঁই খাঁই আঠে পা কটার মা গ হের।’

‘বরেউ খাঁইছে তের।’ ‘তবে মোর বাছাউ গেল।’

বরকনের ‘সাত্তা’র রাত। কনের মা খুব খুশি, কেন না মেয়ে সাত সাতবার বিধবা হয়েছে। কাজেই এহেন কুলক্ষণা মেয়ের আবার সাত্তা হবে ভাবতেই পাবেন নি। কিন্তু এ-আনন্দ বেশিক্ষণ থাকল না। কে যেন সেই মারাত্মক খবরটা তার কানে পৌঁছে দিল : ‘বরেউ খাঁইছে তের।’ তেরটি বউ গতায়ু হবার পর বর এবার চৌদ্দ বার বিয়ে করতে এসেছে। কথাটা শুনে কনের মা আর্তনাদ করে উঠেছেন : ‘তবে মোর বাছাউ গেল।’ বুঝতে পারলেন। মেয়ের চেয়ে জামাই আরো কুলক্ষণক। এতোকাল মেয়ে তবু জামাই মরলেও প্রাণটা নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে, এবারে দাঁড়ি-পাল্লার ভারটা জামাই-এর দিকে। কাহিনীর কৌতুকরস যের্মন উপভোগ্য। তেমনি দুই ভাগ্যহত স্বামীস্ত্রীর সংশয়াচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ আমাদের বেদনার্ত্তও করে।

**ঐশ্বরজালিক ছড়া :** কিছু কিছু ছড়াব মধ্যে জাদু, তুকতাক লুকিয়ে আছে বলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে। বিভিন্ন আচাবঅলুষ্ঠানের সাহায্যে যেমন প্রকৃতিক জগৎকে বশীভূত করা যায় বলে এরা বিশ্বাস করে, তেমনি জাদু-মন্ত্রের সাহায্যেও প্রাকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার কথায় এদের অটুট বিশ্বাস দেখা যায়। এই ধরনের ছড়াকে ঐশ্বরজালিক ছড়া বলা হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডের মানুষের জীবনে খবা এবং বৃষ্টি দুটোরই বিশেষ ভূমিকা আছে। সাধারণতঃ খবা এবং অনাবৃষ্টিই এখানে মুখ্য ভূমিকা অধিকার করে আছে। তাই বৃষ্টির জন্ম নানা বকমেব তুকতাক কবতে হয়। বৃষ্টি নামাবার ছড়া আমরা সংগ্রহ কবতে পাবিনি। বর্ষাবাবক এবং 'বোদ দে' জাতীয় দু'একটি টুকবো ছড়া আমরা সংগ্রহ কবতে পেয়েছি। একপা অনস্বীকার্য যে একদা এইসব ছড়া বয়স্ক লোকদের মধ্যে জাদুমন্ত্র হিসাবেই প্রচলিত ছিল, বর্তমানে এগুলো ছেলেদের মুখেই শোনা যায়। বলাবাত্তা, বৃষ্টি খেমে যাবে এমনি একটি গভীর বিশ্বাসে ছেলেব' এগসব ছড়া আউডে থাকে; বয়স্কদের মধ্যে এব ব্যবহারিক মূল্য লুপ্ত হলেও এগনো ছোটদের মধ্যে খেল খানাই বজায় আছে। নিচে বৃষ্টি থামাবাব ছড়া উদ্ধৃত করা হল।

১৭ এক পইলা মুটি / যায় বর্ষা উড়ি। জল যায় উড়ি ॥

১৮ কলাপাতেব বি'ডি / যায় বর্ষা ছি'ডি ॥

৪২ বোদ দিছে জল হছে / বাঁড্যা শিয়ালেব বেহা হছে ॥

অবিবাম বৃষ্টিবাদল হলে এক ঝলক বোঁত্র দেখবাব জন্ম আমবা সবাই আগ্রহী হই। যখন বোঁত্রেব কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না, তখন বোঁত্রকে আবাহন জানানো ছাড়া উপায় থাকে না।

৫০ চডচড্যা বোদ দে / মডমড্যা খাসি দিব ॥

আদম মানুষেব পক্ষে আগুন জালানো কঠিন সমস্যা ছিল। দু'টি কাঠখণ্ডকে ঘর্ষণ কবে তখনকাব দিনে আগুনপাদন করা হত। সবসময় কাঁজটা সহজ-সাধ্যও ছিল না। তাই ঐশ্বরজালিক ক্রিয়াবৃষ্টির জন্ম তাব ছাড়াও আবৃত্তি কবত।

৫১ ধনু ধনু পববতেব আগুন / ধরা মাথা কামাব পুরুষ ॥

কাঠখণ্ড থেকে আগুনপাদন সম্পর্কে ষাদের ধাবনা আছে, তাঁবাই জানেন দু'টি ভিন্ন জাতীয় কাঠখণ্ড ছাড়া আগুনগাব সম্ভব হয় হয় না; দু'টি কাঠখণ্ডের একটি পুরুষ অন্টা নাবী হয়ে থাকে। ছড়াটিতেও একই কাবণে দুই ভিন্ন

সম্প্রদায়ের পুরুষ-নারীর কথা বলে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে অগ্ন্যুৎসব ক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করবার চেষ্টা কব হয়েছে।

কিরে দেওয়া এবং কিরে কাটার ছড়াগুলোও ঐন্দ্রজালিক ছড়ার অন্তর্গত। ছড়া কেটে কিরে দিলে ছেলেমেয়েবা বিশ্বাস করে যে জাদুমন্ত্রেব মতোই তা কাজ কবে। ঝাডথণ্ডে কিবে দেওয়াকে ‘অডা’ দেওয়াও বলা হয়ে থাকে। কিরে দেওয়া হলে অঘটন ঘটে, এমন-কি মৃত্যুও ঘটে বলে তাবা বিশ্বাস করে। তাই যতোক্শণ না কিরের কাটান দেওয়া হচ্ছে, ততোক্শণ তাবা মান স্বস্তি পায় না।

৫২ কিরে দেওয়া : অডা অডা অডা / ঘবগুটি মডা।

ছড়া দিয়ে বা’র ক’বব কুড়ি ঘরেব মডা ॥

৫৩ কিরে কাটা : একট ধানে দুটি তুঁষ / কিবা ভাঙে ঠাসঠুঁস।

ঘটিব উপর বাটি / সাত কিবাকে কাটি ॥

ঝাডফুঁক, সর্পমন্ত্রেব ছড়াগুলোও ঐন্দ্রজালেব অন্তর্গত। আমবা অগ্নত্র মন্ত্র গান নামে এগুলোব আলোচনা কবেছি বলে এখানে সে-সম্পর্কে কোন আলোচনা কবা হল না।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### ধাঁধা

ধাঁধা লোকসাহিত্যের অগ্নতম বিশিষ্ট উপকরণ হলেও লোকগীতি এবং কথার সঙ্গে মৌল পার্থক্য এই যে, ধাঁধার মধ্যে মননশীলতা অল্পস্ব্যত হয়ে থাকে, কিন্তু লোকগীতি এবং কথার মধ্যে হৃদয়ানুভূতি নিহিত থাকে। একদা আদিম যুগে ধাঁধা জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে সমাজের প্রায় সর্বস্তরে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকায়, মনে হয়, ধাঁধার প্রয়োজন শেষ হয়ে আসছে।

ধাঁধা কবে কোন যুগে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল, বলা কঠিন। লোকসাহিত্যেব মধ্যে কোন শাখাটি প্রাচীনতম, তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্কের অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ছড়াই লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি। জনৈক



পাশ্চাত্য পণ্ডিত ধাঁধাকেই প্রাচীনতম সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, যেহেতু ধাঁধা রূপক বিশেষ এবং আদিম মন দু'টি বস্তুর সংসর্গ, তুলনা, ক্রিয়া এবং বৈপরীত্য লক্ষ্য করেই চিন্তাধারাকে একটি বাস্তব রূপ দিত, তাই ধাঁধাই লোকসাহিত্যে প্রথম সৃষ্টি। কিন্তু একেবারে আদিম সমাজে রূপক সৃষ্টি কি আদৌ সম্ভব? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'রূপকের পরিকল্পনা উচ্চতর রস এবং জীবনবোধের ফল,' যা আদিম সমাজে নাকি কল্পনা করা যায় না। অবশ্য এই আদিম সমাজ বলতে কোন যুগের সমাজকে বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। অল্প-স্বল্প চিন্তাভাবনা করতে পারে এমন সমাজে কেন যে রূপক সৃষ্টি সম্ভব নয়, বোঝা গেল না। দু'টি বস্তুর মধ্যে মিল-অমিল এবং সংসর্গ খুঁজে বার করা কিংবা তাদের মধ্যে তুলনা করার জগু উচ্চতর জীবন বোধের একান্ত প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ডঃ ভট্টাচার্য আরো বলেন, 'মননশীলতায় অগ্রসর কোন সমাজের সংস্পর্শে না আসিলে কিংবা তাহা দ্বারা কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত না হইলে সেই সমাজে ধাঁধার জন্ম হইতে পারে না।'<sup>১</sup> প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন, খৃষ্টান ধর্মে ধর্মাস্তরিত আদিবাসী সমাজ ছাড়া অন্য কোন আদিবাসী সমাজে ধাঁধার প্রচলন দেখা যায় না। তাঁর এই ধারণা একান্তই ব্রাহ্ম ঝাঁলে আমরা তাঁর এই বক্তব্য মেনে নিতে পারি না। কারণ, খৃষ্টান মিশনারীদের সংগৃহীত আদিবাসীদের ধাঁধা সংকলন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁদের আগমনের পূর্ব থেকেই আদিবাসী সমাজে ধাঁধা প্রচলিত ছিল। তাঁদের সংগ্রহ থেকে আমরা যে-সব ধাঁধা পাই, সেগুলোতে আদিবাসী জীবনসম্পর্কিত বিষয়বস্তুরই সন্ধান মেলে।

আদিম সমাজের জাহুক্রিয়ার সঙ্গে যে ধাঁধার একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তুচ্ছতাক অলৌকিকতার যুগে মানুষ অনেক কিছুই সরাসরি বলতে ভরসা পেত না। তাই সে রূপকের আকারে কিংবা বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে একধরনের সামঞ্জস্য রেখে কথাটা ঘুরিয়ে বলত। সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে এখনো ধাঁধার প্রচলন দেখা যায়। গাজন উৎসব, বিবাহ এবং অস্তোষ্টিক্রিয়ার সময় ধাঁধার ব্যবহার দেখা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রাচীনকালে আদিম সমাজে ধাঁধা লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ধাঁধার রচনা বা উত্তরদান কিছুটা

বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া সম্ভব হয় না। ধাঁধার বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিষ্ঠুর ধারণা এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া সেই বিষয়ে ধাঁধা বচনা করা সত্যিই অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'লোকসাহিত্যের সামগ্রিক সৃষ্টি (Communal creation) বা গোষ্ঠীগত বচনার যে একটি দাবী আছে, ইহাতে তাহা কতখানি পূর্ণ হয়, তাহা বিশেষ বিবেচনার বস্তু।'² কথটি ভেবে দেখবাব। ধাঁধার মধ্যে যেহেতু মননশীলতাব প্রয়োজন, তাই একযোগে বহুজনের মননশীলতা নিশ্চয়ই একটি ধাঁধার সৃষ্টিকার্যে সম্মিলিত হয় নি। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তি-সৃষ্টিব কথটি স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ব্যক্তি-সৃষ্টি ধাঁধাব আদিম রূপটি আমরা কেউ জানি না, সমাজের মানসিকতাব উপযোগী বলে সমাজ ধাঁধাটি গ্রহণ করেছিল, অগ্রমান করতে পাবি এবং মুখে-মুখে প্রচারিত হতে গিয়ে লোকসাহিত্যের অগ্ৰাণু শাখার মতো ধাঁধাও সামগ্রিক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ধাঁধাব ব্যবহার করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে ধাঁধা বা Riddle উপদেশমূলক শিক্ষাবিধি ছিল। ঝাউথগের আদিবাসী সমাজেও ধাঁধা লোকশিক্ষাব বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। জ্ঞানবুদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ বা পর্যবেক্ষণ সূত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কিশোর এবং তরুণদের মধ্যে সঞ্চারিত কবে দিতেন। ধাঁধার উদ্ভবটি সব সময়ই 'জনশ্রুতিমূলক' একথা অনস্বীকার্য। ফলে ধাঁধা এবং তার উদ্ভব এক অচ্ছেদ্য চিবস্তন বঁধনে বঁধা থাকে। অগ্ৰকথায়, বয়োজ্যেষ্ঠদের উপলব্ধ জ্ঞান অপরিবর্তিতভাবে ধাঁধার মাধ্যমে পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত এবং সঞ্চিত হয়ে থাকে। অনেক সময় এর মধ্যে আচাবধর্মিতাও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন আচাবমূলক গান বা লোককথাতেও এ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ধাঁধাব আকারে প্রমোত্তরের মাধ্যমে জাওয়া গীত, সাথী গান এবং আহীরা গানে জীবনের বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও পর নীতি শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে। ঝাউথগে ধাঁধাব অন্ততম নাম 'জান কহনী', নামেই প্রকাশ যে এর মধ্যে জ্ঞানের কথাই থাকে। সরাসরি উপদেশ না হলেও এগুলোর মাধ্যমে যে একটি পরিচিত বস্তুকে রূপকের আবরণে এবং মিল-অমিল ঐক্য-অনৈক্যের মাধ্যমে অনভিজ্ঞ চিত্তে চমক এবং বিশ্বয় সৃষ্টি

করে সেই বস্তুটিকে নবতররূপে আলোকিত করে তোলা হয়, তাতে সন্দেহ নেই। এর ফলে অনভিজ্ঞ শিশু-কিশোর-তরুণের মানসলোকে বস্তুটি বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। প্রতিদিন যেসব বস্তু বা ভাব আমাদের চোখ বা মনের গোচরীভূত হয়ে থাকে, তা'ও যে কতোখানি অপরিচিত থেকে থাকে, একটি ধাঁধার মধ্য থেকে তা আকস্মিকভাবে আবিষ্কার এবং উপলব্ধির আনন্দ থেকে বোঝা যায়।

ধাঁধার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় বা জাতির মানসলোকের সন্ধান সহজেই পাওয়া যায়। তাদের চিন্তবৃত্তি বা মননশীলতা কোন পর্যায়ের তা তাদের ধাঁধার গঠনভঙ্গি, বিষয়বস্তু ইত্যাদি থেকে অনায়াসে অনুমান করা যায়। ঘরগেরস্থালির জিনিষপত্র, দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিজগৎ, পশুজগৎ ইত্যাদি ধাঁধার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। নিছক কল্পনার জগতের পরিবর্তে বাস্তবজীবনের সঙ্গেই ধাঁধার সম্পর্ক; জীবনের প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব বস্তু বা ভাবকে নবতর আলোকে জনাচিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। সাহিত্য বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝে থাকি, এই শ্রেণীর রচনায় তা পুরোপুরি প্রকাশ না পেলেও এগুলো লোকসাহিত্যেরই উপকরণ। বাস্তব বস্তু বা ভাবকে সরস ভাষায় এবং চিত্রে রূপায়িত করে লোকজীবনে আনন্দ সঞ্চার করে ধাঁধা। চিত্রধর্মিতা ধাঁধার অগ্রতম বিশিষ্ট গুণ; ঐক্য-অনৈক্যের বিচিত্ররেখায় এর চিত্রকল্পগুলো নির্মিত লাভ করে থাকে; সম্ভাব্য উত্তরটি খুঁজে বের করবার কাজে এই চিত্রগুলো যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। 'কাঁচায় লদবদ পাকায় সিঁদুর/যে না ব'লতে পারে তার বাপ উদুর।' জিজ্ঞাসাকারীর ভঙ্গিটা বেশ আকমনাত্মক। জিজ্ঞাস্ত বস্তুটি সম্পর্কে আভাসে একটি রূপকচিত্র দেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, এর জনশ্রুতিমূলক উত্তর হল 'হাঁড়ি' বা যে কোন মাটির পাত্র। উত্তরটি খুঁজে পাবার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটি একটি বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ চিত্রে পরিণত হয়।

ধাঁধার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এ-শ্রেণীর রচনা সম্পূর্ণতঃ ঘোঁষভাবে উপভোগ্য। এর জগ্ন ক্রমক্ষে একজন জিজ্ঞাসাকারী এবং একজন উত্তর-দাতার প্রয়োজন। অবশ্য আজডায় বা মজলিসেই এর আসর বিশেষভাবে জন্মে ওঠে।

ধাঁধা প্রধানতঃ মস্তিষ্কজাত হলেও এর মধ্যে কাব্যগুণ একেবারে অনুপস্থিত থাকে না। জীবনরসসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে এর উদ্ভব বলেই এগুলো অত্যন্ত

সরস হয়ে থাকে। ভাবে-ভাষায় গঠনভঙ্গিতে রূপকে-উপমায় এগুলো কাব্য-ধর্মী হয়ে ওঠে।

লৌকিক ধাঁধার অন্ত্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এর স্বল্পায়তন বা সংক্ষিপ্ততা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কখনো একটি পঙক্তিতে, কখনো দুই থেকে চার পঙক্তিতে এর বিস্তার ঘটে থাকে। ঝাড়বগ্গের লৌকিক ধাঁধা প্রায় সবত্রই একটি বা দুটি পঙক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকে। স্বল্পায়তনের হলেও ছন্দোবদ্ধতা এর কাব্যধর্মিতাকেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট করে থাকে। ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রোতার মননে যে দোলা এবং আকস্মিকতার চেউ তুলে বিস্ময়, কৌতূহল এবং উৎকর্ষার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, ছন্দহীন রচনার পক্ষে তা সম্ভব হয় না। ছন্দের বাঁধুনি প্রায় ক্ষেত্রেই নিখুঁত এবং আঁটোসাঁটো; ফলে যুগ-যুগান্তর লোকমুখে প্রচারিত হলেও পরিবর্তনের স্রোতে একেবারে হাবিয়ে যায় না কিংবা সম্পূর্ণ অন্তরূপ ধারণ কবে না। আদিম মানুষের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফসল এই ধাঁধার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত হয়ে থাকে; ফলে এদের মধ্যে লোকমানসের পত্তীর চিন্তাশীলতা বা চিন্তার পত্তীরতা ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। বহু যুগের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, বস্তুজ্ঞান রসবোধের জাদুস্পর্শে সুসংহত ছন্দোবদ্ধতায় শাস্ত কালের ধাঁধার শরীর লাভ কবে থাকে।

ধাঁধার গঠনভঙ্গিতে পরিচ্ছন্নতা এবং সুসংবদ্ধতাও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। জনমানসে কৌতূহল অব্যাহত রেখে চিরকালীন স্থান পেতে গেলে এতু'টি গুণের সমাবেশ একান্ত প্রয়োজন। পরিচ্ছন্ন, সুসংবদ্ধ স্বল্পায়তনের মধ্যে কাব্যগুণ ও চিত্রময়তার নিগূঢ় সাহচর্যে ধাঁধা শ্রোতার সম্মুখে ইন্দ্রিতময়তার একটি শব্দী রূপ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং এই কারণেই জনচিত্তে মনোহারী অন্তর্ভবের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এর ভাষায় কোনরকম জটিলতা থাকে না; সুন্দর ভাষা, উপমা এবং রূপকল্পের প্রয়োগে এর শিল্পসৌন্দর্য বিকশিত হয়ে থাকে। প্রাক্ত চিন্তাধারা, যুক্তিতর্কের মেলবন্ধনে সুগঠিত ভাবনা একে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে। এর মধ্যে আনন্দ এবং রসের যেমন সন্ধান মেলে, তেমনি মেলে কৌতুক আর রহস্যময়তার সন্ধান।

হাস্তরসের সৃষ্টি ধাঁধার অন্ততম বৈশিষ্ট্য। হাস্তরস যেমন কৌতুকের সঞ্চার করে, তেমনি কৌতূহল এবং আগ্রহও বাড়িয়ে দেয়। (২) 'হুলুক বৃষ্টি মূলক যায়, দুটা ঠেঁগার মার খায়'—এর মধ্যে যেমন হাস্তরস আছে, তেমনি

কৌতুকও আছে। কেউ যদি বেড়াতে বেরোয় আনন্দে, আর সেই আনন্দ লাভের জন্তু তাকে প্রহার খেতে হয় তাহলে হাস্যরসের সঙ্গে কৌতুকরসের অনাবিল মিশ্রণ যে ঘটে, তাতে সন্দেহ নেই। এর জনশ্রুতিমূলক উদ্ভব হল ঢোল; ঢোল বাজাতে হলে দু'হাতে দুটো কাঠি দিয়ে পিটিয়ে বাজাতে হয়। কারো কারো মতে বুদ্ধি বা জ্ঞানের চর্চার চেয়ে নির্মল হাস্যরসসৃষ্টিই ছিল ধাঁধাব একমাত্র উদ্দেশ্য; বুদ্ধির চর্চা হয়তো বা উপলক্ষমাত্র ছিল। একথা অনস্বীকার্য যে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বা বস্তুর মধ্যে হাস্য-রসের উপাদান সঞ্চিত হয়ে আছে। আমাদের আপত্তি ধাঁধার মধ্য দিয়ে জ্ঞানচর্চা বা লোকশিক্ষাকে উপলক্ষমাত্র বলায়। যে সূচতুর ভাষাভঙ্গিতে সুসংবদ্ধভাবে এর মধ্যে পুরুষানুক্রমের উপলব্ধ অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে, তা নিছক হাস্যরসসৃষ্টির জন্তুই করা হয়েছে, এমন কথা আমরা মেনে নিতে পারি না। প্রবাদকে বাদ দিলে লোক-সাহিত্যের আব কোন শাখায় এমন স্বল্পায়তনে পরিচ্ছন্ন সুসংবদ্ধতায় মানুষ তার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে সূচতুর রহস্যময় বাগভঙ্গি মধ্য প্রকাশ করেনি। ধাঁধা প্রধানতঃ মননশীলতা থেকে উৎপন্ন, তাই এখানে লোকায়ত মননশীলতার উৎকর্ষই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে; হৃদয়ঘটিত সাহিত্য-রস বা হাস্যরস সেখানে নিতাস্তই সহচরের মতো পাশাপাশি থেকেছে মাত্র।

গঠনরীতির দিক দিয়ে ধাঁধা সাধারণতঃ একটি পদ থেকে তিন চারটি পদেও রচিত হয়ে থাকে। তবে ঝাড়খণ্ডের ধাঁধা প্রধানতঃ একটি দু'টি পদেই সীমাবদ্ধ থাকে। ছড়ার সধর্ম হওয়ায় এর মধ্যে ছন্দোবদ্ধ এবং সমিল হওয়ার দিকে একটি স্বাভাবিক ঝাঁক দেখা যায়। তবে সর্বত্রই ছন্দ এবং মিলেব প্রয়োগ করা হয় তা নয়; বরং বহুক্ষেত্রেই একটি পদে নিছক গণ্ডের আকারে একটি মাত্র প্রশ্ন বিধৃত করা হয়। এইগুলো যে প্রাচীনতম রচনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গণ্ডে-রচিত ধাঁধাও সহজ সরল ভাষায় চিত্রময়তা প্রত্যক্ষতা এবং বাস্তবতার আশ্চর্য মেলবন্ধনে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জনচিত্তে কৌতুহল এবং শ্রুতসুখ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। (৩) 'ম-মা-এ বিটিকে গড় করে'—চারটি শব্দের এই ধাঁধাটি উচ্চারিত হবার সাথে-সাথে শ্রোতা সচকিত না হয়ে পাবে না। এখানে যে চিত্রটি পাচ্ছি তা প্রাথমিক আচরণের বৈপবীত্যে গঠিত। যখন আমরা জনশ্রুতিমূলক উদ্ভবটি জানতে পারি, তখন স্বস্তি এবং আনন্দ দুইই পেয়ে থাকি। এর উদ্ভব হল, ভাতের

হাঁড়ি এবং ‘খাপরী’ (আকারে হাঁড়ির অর্ধেক, চওড়া মুখ মাটির পাত্র)। ভাত সেক হয়ে ষাবার পর ভাতের হাঁড়িকে নিয়মুখী করে খাপরীতে ভাতের কেন গালা হয় ; এই চিত্রটিকে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে চারটি শব্দের সাহায্যে লোককবি বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

গঠনরীতির দিক দিয়ে ধাঁধার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একটি বক্তব্য যখন একটি পঙক্তিতেই শেষ হয়ে যায় তখন তার পাদপূরণের জন্য কিংবা ছন্দমিল বজায় রাখবার জন্য কিংবা নিছক অলংকার হিসাবে ব্যবহারের জন্য একটি অতিরিক্ত পদের সংযোজন করা হয়ে পাকে, তাতে অবশ্য এর চবিত্তের কোন হেরফের ঘটেনা। এদিক দিয়ে দেখলে ধাঁধার সঙ্গে ছড়ার এবং কিছু কিছু লোকগীতির একটা ঘনিষ্ঠ মিল লক্ষ্য করা যায়।

৪ ভগ্নত বড় শক্ত পণ্ডিত র’হল বস্ত্রে,

গাছের ফল গাছেই র’হল বঁধটি গেল খস্ত্রে। পা’জ ( পদচ্ছিন্ন )

এখানে দু’টি পদের মধ্যে কোন সংগতি নেই, আসল প্রশ্নটি দ্বিতীয় পদেই রয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের ধাঁধাকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় : (১) প্রকৃতি বিষয়ক, (২) গার্হস্থ্যজীবনবিষয়ক, (৩) তত্ত্বও আচারমূলক এবং (৪) গাণিতিক ধাঁধা। এগুলোর মধ্যে তত্ত্বমূলক ধাঁধা সরাসরি ধাঁধার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না ; ঝুমুর এবং চুয়াগানে চর্চাপদের মতোই সন্ধ্যাভাবায় কিছু তত্ত্বকথা প্রকাশ করা হয়েছে। ঝুমুর এবং চুয়া লোকগীতি হলেও এগুলোর রচনায় ব্যক্তিকবির সাহিত্যপ্রয়াসের নজির খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু আচারমূলক আত্মীরা গান, সাখীগান, জাওয়াগীতে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এক ধরনের নীতি-উপদেশমূলক ধাঁধা খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এইসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন করে উত্তরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করা হয় না, পরবর্তী পদে তার উত্তরও দেওয়া হয়ে থাকে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে গ্রহনক্ষত্র প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়বস্তুই ধাঁধার আদি উপকরণ। দু’রের অন্যত্ব বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যেমন সক্ষম হয়, তেমনি তা আমাদের মধ্যে কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসারও উদ্দেশ্য করে থাকে। এদিক দিয়ে বিচার করলে প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধাগুলোই যে প্রথমে রচিত হয়েছে, তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না। তাই আমরা প্রথমে প্রকৃতি-জগৎ বিষয়ক ধাঁধা নিয়ে আলোচনা করব। এখানে একটা কথা মনে রাখতে

হবে, ধাঁধার বিষয়বস্তু সব সময়েই বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে ; নিছক কল্পনাজাত বিষয় এর অঙ্গীভূত হয় না। দৃষ্টিগ্রাহ্য, ফলে অমুভবগ্রাহ্য, বস্তুই মাতৃশ্বের মনে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি কবতে পাবে। এই সব বস্তু দূরে-অদূরে সর্বত্রই বিরাজ কবতে পারে এবং মানবিক চেতনাকে স্পন্দিত করে তুলতে পারে। তবে যে-সব বস্তুর উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, সেই সব বস্তুই ধাঁধার উপজীব্য হয়ে থাকে।

শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা, বাতাস, ঘূর্ণিঝড়, চন্দ্রসূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জ—সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তু ধাঁধার মধ্যে বিচিত্র রূপকল্পের সাহায্যে প্রকাশ লাভ করে। এই ধবনের কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল—

৫ ঝিকঝিক মানিকের ফঁটা অই ফুলটি পালি রে কুণা ?

বাত্ম্যাব দকানে নাই. বাজাব ভাঙাবেঙ নাই ॥ হল ( শিলা )

৬ ষি চপ চপ মাধবলতা, এই ফুলটি পালি কুণা ?

রাজার ভাঙারে নাই, কডি দিলে মিলে নাই ॥—হল

৭ আঁচিব ডু'বল পাঁচিব ডুবল ডু'বল বড় বড় মুচা।

স'রষা ডু'বতে জল নাই ডু'বল রথের চূড়া ॥—কুহড়া ( কুয়াশা )

৮ এক যে আছে মস্ত বড় বীর. উয়াকে চইথে দে'খতে পাই না ॥—হাওয়া

৯ আকাশ গুড়গুড় পাথরঘাটা, সাত শ ডালে দুটাই পাতা ॥—মেঘগর্জন,

শিলাবৃষ্টি, নক্ষত্রপুঞ্জ, চন্দ্রসূর্য

১০ সুফল ফুটে'য় আছে তুলইয়া নাই,

সুমরা মর্যে আছে কাঁদইয়া নাই,

সুবিছনা পড়ে'য় আছে শুয়ইয়া নাই ॥—তারা, চাঁদ ও আকাশ

বলাবাহুল্য, আকাশ বাতাস চন্দ্রসূর্য নক্ষত্রপুঞ্জ কোঁতুল সৃষ্টি করলেও দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিমাটি অভিজ্ঞতার ওপর এগুলোর তেমন সরাসরি প্রভাব নেই। তাছাড়া দূরের জিনিষ হিসাবে এগুলো রহস্যময়, কিন্তু প্রাণের নিগূঢ়স্পর্শে এগুলো ততোখানি অমুভবগ্রাহ্য বাস্ত্বরূপ নিতে পারে না। তাই এ-সম্পর্কে রচিত ধাঁধার সংখ্যাও কম।

শূন্যলোক থেকে দৃষ্টি ফেরাবার পরই আদিম মানুষের চোখে তার পারিপার্শ্বিক পৃথিবী অজস্র বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হয়ে বিশ্ময়কররূপে প্রতিভাত হত। তখন তার চারপাশে শুধু অরণ্যময় পৃথিবী ছিল; যেদিকে দৃষ্টি পড়ত, সেদিকেই গাছপালা ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ত না। তাই ঝাড়খণ্ডের

ধাঁধায় যে বিপুল পরিমাণে অরণ্যবৃক্ষ ফলমূল লতাপত্রের প্রসঙ্গ থাকবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। বস্তুতঃ অরণ্যভূমি ঝাড়খণ্ডের ধাঁধার এক বৃহৎ অংশ অরণ্যকে আশ্রয় এবং উপজীব্য করেই গড়ে উঠেছে। যে কোন বৃক্ষ তার অভিনব বৈশিষ্ট্যের গুণেই ধাঁধার রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র দাবি কবে থাকে। সরল মানুষের মনে কোঁতুল এবং মননশীলতায় স্পন্দন তুলতে পারে, এমনি ধরনের বস্তুবৈশিষ্ট্যগুলো রূপক, চিত্রকল্প এবং কবিতার একত্র দাম্বিলন ঘটিয়ে সাধারণতঃ ধাঁধার জন্ম দিয়ে থাকে।

ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী-অর্ধআদিবাসীদের জীবনে মহল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মহল থেকে শুধু মদই চোলাই করা হয় না, মহল অবগাচারী মানুষের জীবনরসের উৎস বললেও চলে। মহল সেক, ভাজা, চালভাজার সঙ্গে ভাজা মহলেব ঢেঁকি-পেয়াই ‘মহল লাঠা’ ঝাড়খণ্ডী জনতার অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। এর ফল ‘কচড়া’ থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তাই এরা সংবৎসর ব্যবহার করে থাকে। মহলের জন্মরহস্য, গঠনপদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তাই ধাঁধার উপজীব্য হয়ে থাকে।

১১: গাছটির নাম হীরা, তাই কল্যােছে গুড বাইগন জিরা ॥

—মহল, কচড়া, পবাগ।

১২ উপরে বাঁসা তলে ডিম ॥—মহল।

১৩ চাক ঢোল ভিত্তর খোল, নিংড়ালে পড়ে ঝোল ॥—মহল।

১৫ মা বিটির একেই নাম, ডুমকা হুঁড়ার ভিনু নাম ॥

মহল ( গাছ ও ফুল ), কচড়া।

সঙ্গনে গাছও ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। উষর ধূসর অরণ্যভূমিতে এই গাছ সারা বছর ধবে সঞ্জির সংস্থান করে থাকে; এর পাতা, ফুল ডাঁটা, এদের প্রিয় সজ্জি। সঙ্গনে ফুলের ফুটে ওঠা এবং পরে ডাঁটায় পরিণত হওয়ার মধ্যে যে অভিনবদ্র দেখা যায়, তা লোকমানসে বিশ্বয়ের সৃষ্টি করে থাকে।

১৫ গাছটির নাম লালবিহারী, তাই কল্যােছে তিন তরকারি ॥

১৬ মুটি ছিল খই হল্য, আন্তে আন্তে নেজ বা’ হরাল, দেখ ভগবান ॥

১৭ ছিল মুটি হল্য খই, আন্তে আন্তে নে গুড় বা’ হরাল অর্বাং হয়ে রই ॥

বিভিন্ন বুনো ফল—শাল, পিঁড়রা, তাল, বেল, বাকড় আদি—অভিনব বৈশিষ্ট্যের গুণে ধাঁধায় স্থান লাভ করেছে—



১৮ গুড়কু হেঁসেন গুড়কু শশা হেঁসেন হেঁসেন কান ।

জানবি ত জান নাই ত দে তিন মণ ধান ॥ —শালনী ( শাল ফল )

১৯ পাত্ চিকচিক ফলটি গেড়া, যে নাই জানে তার গুটি ভেড়া ॥ —পিঁড়রা

২০ উপর লে প'ড়ল ধুম, ধুম বলে আমার পঁদটা গুং ॥ —তাল

২১ মইখ বনে ষটি টাঁগা ॥ —বেল

২২ মাঝ বনে ফাল টাঁগা ॥ —বাকড়

২৩ কাকা হে কাকা, বীচ বাহির ফল পাকা ॥ —ভেলা

২৪ এতটুকু ডালে, কিষ্ট ঠাকুর দলে ॥ —তেঁতুল

বাড়ির সাজ্জ ক্ষেতে বেগুন, লঙ্কা আদির চাষ হয় । গাছ থেকে বেগুন তুলতে গেলে পেছনে ধরে টানতে হয় । এই বিচিত্র পদ্ধতিকে লক্ষ্য করে রচিত হয়েছে নিচের ধাঁধাটি—

২৫ জান কহনী জান, নেজে ধরি টান ॥

এখানে 'জান কহনী' শব্দটি লক্ষণীয় ; ঝাড়খণ্ডে ধাঁধা 'জান কহনী' কোথাও বা শুধু 'কহনী' নামেই সাধারণতঃ পরিচিত । 'শোলোক' এবং 'ভাঙন' শব্দও কোথাও কোথাও শোনা যায় ।

২৬ মা ঝাঁপড়ী, বিটি সুঁদরী ॥ —লঙ্কা

মাত্র চাবটি শব্দের ব্যবহারে এক অপূর্ব চিত্র-কবিতার সৃষ্টি । শব্দের মধ্যে বিস্ফোরণের অভাবিত ক্ষমতা যে নিহিত থাকে, তা এই ধাঁধাটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় । শুধু ধাঁধার নয়, কবিতারও কয়েকটি বিশিষ্ট গুণ এই রচনাটি থেকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় ! ছন্দোবদ্ধতা, চিত্রকল্প, বৈপরীত্য, সংক্ষিপ্ততা, পরিচ্ছন্নতা, সুসংবদ্ধতা এবং ইঙ্গিতময়তার এমন একত্র সমাবেশ বড় একটা ঘটে না । ধাঁধার চারটি শব্দ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার মনে যেন নিস্তরঙ্গ দীঘিতে আকস্মিক চেউ ওঠার মতো একটা আলোড়ন জেগে ওঠে । দু'টি বিপরীত চিত্র পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে কৌতুক ও হাস্যরসমণ্ডিত ধাঁধাটি আমাদের উপলব্ধিকে আনন্দময় করে তোলে । জননী এবং কন্যার মধ্যে কি অসম্ভব বৈপরীত্য ! রুক্মকেশিনী এলোকুস্তলা মাতৃহৃতির পাশাপাশি রূপোজ্জ্বলা অপরূপা সুন্দরী তনয়া ! লঙ্কাগাছে টকটকে লাল পাকা লঙ্কা ঝুলন্ত অবস্থায় না দেখলে এই অভাবিতপূর্ব চিত্রটির কথা কল্পনাই করা যাবে না ।

২৭ শাঁক লদীর পাক নাই, জল আছে ত মাছ নাই ॥ —ডাব

২৭ ক কেউ হাঁসে কেউ ভাঁসে কেউ কাদায় লটপট ॥

—শালুক ফুল, পাতা ও মূল

ওপরের ধাঁধাটিতে শালুক-সম্পর্কিত চিত্রের চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করলেই চলবে না, এর মধ্য দিয়ে ঝাড়খণ্ডের লোকমানসে যে প্রাজ্ঞতা, উপলব্ধির প্রগাঢ়তা এবং বাস্তব পার্শ্বের জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে তা'ও লক্ষ্য করে দেখা দরকার। এই পৃথিবীর আজব খেলায় কাবো-বা হাসিখুশিভরা জীবন, কেউ-বা জীবন-সমুদ্রে নিজেকে কোনক্রমে ভাসমান রাখতে ব্যস্ত, আবার কেউ-বা হতাশায়-বেদনায় বার্ষিকায়-অপমানে পক্ষে লুটোপুটি খাচ্ছে। চিত্রগৌরবে ধাঁধা লোকসাহিত্যের সব শাখার মধ্যে অদ্বিতীয়, কিন্তু অর্থগোববেও যে তা কতো গভীর হতে পারে তার নিদর্শন ওপরের এই ধাঁধাটি।

লাউ কুমডোব লতা-পাতা ফল, আলুমুলো ভুট্টা ইক্ষু সব কিছুই লোক-মানসে কোন না কোন প্রকারে বিশ্বয়ের সৃষ্টি কবে। তাহ এসব বস্তুও বিচিত্র রূপকল্পেব মাধ্যমে বাঁধাব উপকরণ হয়ে থাকে।

২৮ গাঠিটা ব'হল বাঁধা, চ'বতে গেল পাধা ॥ —লাউ-কুমডোর ফল ও লতা

২২ পাত্ চ'বতে যায়, ছাগল রহে বসো ॥ —লাউ-কুমডোব পাতা ও ফল

৩০ ঝাপঝুপা গাছটি, তাব তলে শাঁকটি ॥ —মূলো

৩১ এ হেন মটা ঝাবঝুগাটা কাপড়ের তলে থাকে।

ছানায় দে'পলে মাগে, ঠাকুব পূজায় লাগে ॥ —জম্বা'র ( ভুট্টা )

৩২ চিকচিক পাতা লিকলিক ডাঁড়ি, খাতে মধু ফেলাতে চপা ॥ —আখ

৩৩ ম'ধ বলে বুটী চুল শুখায় ॥ —বাবই ঘাস ( sabai grass )

৩৪ উপব লে প'ডল ছুবি, ছুবি বলে আমি ঘুবি ঘুবি পডি ॥ —বাঁশ পাতা

৩৫ তিন শিক্কা তিবিং বিক্কা, পাত বাক্কা ফল থাক্কা ॥ —পানিফল

৩৬ পালো বে ছানাপানারা, মুই কঁকড়ং ॥ —চিহঁড

জীবজন্তু ও প্রকৃতিজগতের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জীব। তাই ধাঁধার মধ্যে মানবশরীর বিভিন্নরূপে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। বস্তুতঃ মানবশরীর নিয়ে আদিম যুগ থেকে মানবমনে যে প্রশ্নের সঞ্চার হযেছিল, আজো তার শেষ হয়নি। ঝড়খণ্ডের আদিম মানুষও মানব শরীরের রহস্যভেদ করবার চেষ্টা কবেছে, যার প্রকাশ ধাঁধার মধ্যে মেলে। একটি ধাঁধায় শরীরকে চতুষ্কোণ পুঙ্করিণীর রূপকে কল্পনা করা হয়েছে; পদযুগল যেন বৃক্ষের মতো; বক্রিশিপি দাঁত 'পেপেল' এবং জিহ্বাকে পাতা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে—

- ৩৭ চাঁর কুণ্ডা পথ'রটি মনহর গাছটি ।  
বস্ত্রিটা পেঁপেল আছে তার একটি পাতা ॥
- ৩৮ ঝুড় তলে মুটুর-মুটুর মুটুর তলে ফেঁ ।  
ফেঁ তলে ফেঁদেড়-ফেঁদেড় বল্ ত ভায়া কে ? —ভুরু, চোখ, নাক ও মুখ
- ৩৯ উত্তর দক্ষিণ পুরুব পচ্ছিম ছাঁচা, কন্ ফলটা কাঁচা ॥ —জিভ
- ৪০ একটুকু কানি, শুকাতে না জানি । —জিভ
- ৪১ কা'টলে বাঁচে, না কাট'লে মরে ॥ —নবজাতকের নাভিছেদন
- ৪২ নওয়াতে পারি, ভা'ঙতে নারি ॥ —চুল
- ৪৩ হাহ গেল. হাহ আলা ॥ —মন, দৃষ্টি
- ৪৪ গাছটা গেল চলি, পাতটা রইল বাঁসি ॥ —পায়ের ছাপ

সন্তোপ্রসূত শিশু আদিম মানবের মনে এক পরম বিশ্বয়ের বস্তু হয়ে দেখা দিয়েছিল। দশমাস মাতৃগর্ভে থাকবার পর শিশু জন্মগ্রহণ করে; জন্মগ্রহণ করেই সে মাতৃস্তন পান করে থাকে। তার মুখে দাঁত থাকে না, তবু সে মাতৃস্তন চোখে। এই দৃশ্যটি তার মনে অভাবিতপূর্ব কবিত্বময় এক চিত্রসৃষ্টির প্রেরণা জোগায়। লোককবির মনে হয়, শিশু যেন ঠিক দশে-মাসে বা কালে-ভদ্রে আসা কোন আত্মীয়কুটুম্বের মতো। খাসি মাংসের আয়োজন করে কুটুম্বের সম্মানরক্ষা করতে হয়, কিন্তু যে খাসি কুটুম্বের সামনে হাজির করা হয় তার যেমন কোন হাড় নেই, তেমনি কুটুম্বেরও কোন দাঁত নেই। এখানে খাসি মাতৃস্তন এবং কুটুম্ব হল শিশু নিজে।

৪৫ দশে-মাসে আলা কুটুম খাসি থাকে বলে।

খাসির ত হাড় নাহ, কুটুমের ত দাঁত নাই ॥

মানুষের নিজস্ব পরিবেশে বহু জীবজন্তু এবং কীটপতঙ্গ ঘুরে বেড়ায়। এদের স্বভাবধর্ম এবং আচরণের মধ্যেও মানুষ বিশ্বয়ের সঙ্গে কৌতুকরস উপভোগ করে থাকে; তাই দেখা যায় এরাও ধাঁধার উপজীব্য হতে পেরেছে।

৪৬ একটা গিরায় ঘরটা ডাঁড়ায় । —বোলতার চাক

৪৭ ম'ধ বনে সুরু চাউলের পুড়া । —আম পি'পড়ের বাসা

৪৮ গুজরু আঁড়ার গুজরু কাল, তাডাতাড়ি যায় শিম'ল পাল । —ইঁদুর

৪৯ ম'ধ বনে বুটী ঝাঁজির ফেলায় । —কালো বিষ পি'পড়ে

৫০ আট পা বোল হাঁটু, মাছ ধ'রতে যায় লাহুঁ ।

শুকনা বাঁধে ফেলি জাল, মাছ ধরি খায় চিরকাল ॥ —মাকড়সা

৫১ কুখিবল মতন জিনিষটা, ঢেঁকিব মতন আহাব কবে । —ছারপোকা

৫২ দুই সতীনেব একেই বা, কাব বা' ডিম কাব বা ছা ॥ —চিল ও ঘোড়া

৫৩ আঁকা বাঁকা নদীটি দিক চবনে যায়,

সাত রাজার কপাট খুলি কাঠকলাই খায় ॥ —ঘুণ

৫৪ গাছে ঠেং জলে পদ । —জোনাকী

৫৫ গাই ত গপী লয় দ্দ ত মিঠা ।

ষোল শ সতীনেব একটা পিঠা ॥ —মৌচাক

কোন কোন ধাঁধাব উত্তর একটি মাত্র শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। ধাঁধার আড়ালে 'একটি সংক্ষিপ্ত জনশ্রুতিমূলক কাহিনী' থাকে; সেটি পবিবেষণ কবে ধাঁধাব উত্তর ব্যাখ্যা কবে বোঝাতে হয়। ঝাউপগুও এই ধবনেব বহু ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়; বলাবাহুল্য, এগুলো সর্বক্ষেত্রেই জীবজগৎ-সম্পর্কিত ধাঁধা।

৫৬ 'ধুমধুমাসি ধুমাসি বাইতে কেনে বুলছিস ?'

'টিপটিপাসি টিপাসি মাথায় কেনে পডছিস ?'

বাত্রিবেলা মল্লয়াতলায় একটি শেয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গাছেব ডাল থেকে তাকে দেখে মল্লয়া খোঁটা দিয়ে বলল, ও ধুমসী মাগী, বাতেব বেলা ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন ? তাই শুনে শেয়াল টুপটাপ ঝবেপডা মল্লয়াকে ভেংচি কেটে বলল, তুই-ই বা আমাব মাথায় ওপব পডছিস কেন ?

৫৭ 'কালিঝুলি আওয়লে, পানি নাই পাওয়লে ।'

'অবে দাঁচি লাজ নাই, লোহ নাই পাওয়লে ।'

জোক এমনিতেই কালো, বক্ত খেয়ে তা আরো কালো হয়, এমনি একটি জোককে দেখে একটি চিংড়ি মাছ বিক্রপ করে বলল, কালি-ঝুলি মেখেই তুই এসে হাজির হলি, গা-ধোবাব মতো জলও পেলি না কোথাও ? তার কথা শুনে জোক চিংড়ি মাছেব দাঁড়ির প্রতি কটাঙ্ক কবে বলল, ওরে দেডেল, তোর লজ্জাসবম নেই। তোব গায়ে কোথাও এক ফোঁটা রক্তও তো নেই।

অতঃপর নিয়ে কিছু জলচব জীব এবং কীটপতঙ্গসম্পর্কিত ধাঁধা উদ্ধৃত করা হল।

৫৮ ইং চংচং চিডিং ঠেং, চ'খ গুজগুজ মাথাই নাই । —কাঁকড়া

৫৯ মাঝ পথ'বে কাডার লাড । —কচ্ছপ

৬০ বার বছরের খাসি, এক কুটাই মাস। —গেঁড়ি শামুক

৬১ বাপরে বাপ, মাথায় প'ডল চাপ,

ঘর পালাল্য বাহিব বাটে, আমি পালাব কন্ব বাটে।

—জাল, জল ৬ মাহ

৬২ নাে খায়, চইথে হাগে। —মাছ ধ'ববাব ঘুনি

৬৩ ডাঙড় ডাঙুব ডাঙড়, বাবা পা'কতে বেটােব কেনে নেঙড়। —বাঙাচি

ঝাডথগুেব মাহুেবের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় যে সব উপকরণ ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই ধাঁধাব উপকরণ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে। ঝাডথগুের ধাঁধাও সবসময়ে যে বিষয় অনিবার্ধ শক্তি হিসাবে প্রেবণা জুগিয়েছে, তা নয়। যা চোখে পড়েছে এবং কিছুটা কৌতূহল সৃষ্টি কবেছে, তাই এে উপকরণ হয়ে লোকশিক্ষা এবং শিশু-কিশোব-তরুণের বুদ্ধি পবীক্ষাব জন্ম ব্যবহৃত হয়েছে।

কৃষিকােব জন্ম হলচালনা, বীজবপন. বোপণ, নিডান, ছেদন আদি অনেকগুলো কার্যধারাকে ক্রমাগুে পালন করতে হয়। হলচালনার জন্ম গরু এবং হালুয়ার ( হলচালনাকাবী ) প্রযোজন পড়ে। এ সমস্তই ধাঁধাব বিষয়বস্তু।

৬৪ ঘসর ঘসর ঘসকা, তিনমুড দশ পো। —হু'টি বলদ ও হালুয়া

৬৫ ছড়'য়ই করি হাঁতডাঁই বুল্লেক,

চিপিচিপি আগে ফুট'াই দিলেক। —বীজবোনা, বোয়া, নিডান ইত্যাদি। কামাবেব পেশার উপকরণ এবং প্রকরণও কম গুংসুকা জাগায় না। তার বাতাস করবাব চর্ম-নির্মিত যন্ত্র 'চাপুয়া', গনগনে লাল লোহাকে পিটিয়ে মনের মতো রূপ দেওয়া,—এসব লোককবিব মনে বিষয় আব কৌতূকেের উদ্বেক কবতে সক্ষম হয়েছে।

৬৬ ঘবের লে বা'হরাল্য কুকুর,

কুকুব বলে আমাব পেটটা ফাকার-ফুকুর। —চাপুয়া

৬৭ হুই বহিন কালী, পাদে আলাপালি। —চাপুয়া

৬৮ লাল ধানে কাল্যা মাবে, তাব ঘর উপারে। —গরম লোহা ও হাতুডি

কুমোবেব হাঁডি-কুঁডি বানাবার চাক, হাঁডি বানাবার রীতি-পদ্ধতিও ধাঁধার বিষয়বস্তু।

৬৯ এক টপ্নি ঝাটাটি, ছাতার প'বা মাথাটি। —কুমোেরের চাক

- ৭০ একাঁই একাঁই ফলে, এক সঁগে পাকে । —হাঁড়ি তৈরি করা ও পোড়ানো  
 ৭১ সাজালে সাজে বাজালে বাজে,  
 হেন ফুল ফুটো আছে বাজাবেব মাঝে । —হাঁড়ি

চবকার নড়বড়ে দাঁত, ফোকলা পাটি। চক্ষুর্কর্ণহীনতাসত্ত্বেও তার বড় বড় বুলি  
 (দর্ঘব শব্দ) ধাঁধা রচনার পরিবেশ গড়ে তুলেছে—

- ৭২ দাঁত লড়লড ফগ্‌লা পাটি, চ'থ মুখ নাই মুহের চাটি ।  
 ঘবগেরস্থালিব বিবিধ আসবাবপত্র, যেমন চাষবাস, রান্না-বার্না, নাচ-গান,  
 বিলাসবাসন ইত্যাদি সম্পর্কিত উপকরণ নিয়েও কিছু কিছু ধাঁধা বচিত  
 হয়েছে ।

- ৭৩ একটা বুটীর দাঁতগাই সূদা । —চিকণি ।  
 ৭৪ চা'বধারে তাব হাডগড মাঝখানেতে সঁাতি  
 বাঁশ বনে তাঁতি । —দড়ির খাট  
 ৭৫ একটা বুটীব আঁতগিলাই শুধা । —দড়িব খাট  
 ৭৬ ইঘর যাই উঘর যাই, ডুম কবি কাচাড খাই । —ঝাঁটা  
 ৭৭ একটা বুটীর পিঠে দুধ (= স্তন) । —কুলো  
 ৭৮ ঢ'গা মামার পঁদ কানা । —শিকৈ  
 ৭৯ যতই দিবি ততই খায়, নে" গডালে পেছ্যাই যায় । —দড়ি পাকানো  
 ৮০ টিপিক টিপিক যায়, নেজে আহার খায় । —ছুঁচসুতো  
 ৮১ পায়ে কাদা মাথায় কাদা, ডাঁটাই আছে ঠাকুর দাদা । —বাড়ির ছাদ  
 ৮২ যাছিস ত দি'ই যা নাই যাছিস ত দিস না । —দরজায় শেকল তোলা  
 ৮৩ রাজাঘরের মেনি গাই, হাজার টাকাব মরিচ খায় । —শিলনোভা  
 ৮৪ লহার গাই লহার বাছুর, দুধ দেয় উছুল উছুল । —তেল পেয়াই যন্ত্র  
 ৮৫ চামচিকা ভুঁইনিকা, তার দাম চ'ন্দ সিকা । —কোদাল  
 ৮৬ রূরকু মামার ঢাঁগা পাঁজ । —গাড়ির চাকার দাগ  
 ৮৭ মাথা রার্থে জল খায় । —লক্ষ বা ডিবে  
 ৮৮ লিকলিক বাতাটি, তাব সঁগে কথাটি । —বই  
 ৮৯ ছঁকরে গাই, ঠিকরে বাছুর । —বন্দুক ও গুলি  
 ৯০ লেদা গাছে বদা ছঁকরে । —বন্দুক  
 ৯১ পুটক আঁড়ায়, পাহাড় ধসকায় । —ধানের গাদা ও পাই-পইলা

ঝাড়খণ্ডের প্রিয় বাতায়ন হল মাদল, ঢোল, নাগবা, ধমসা। এগুলোকে নিয়েও ধাঁধা রচিত হয়েছে—

২২ মামার ছাগল ছুলেই মেমায়। — মাদল

২৩ বনের লে বা'হরাল্য কাড়া,

কাড়া বলে আমার পেটে চাড়া। — ধমসা

তত্ত্ব ও আচারমূলক ধাঁধা সম্পর্কে আমরা এখানে কোন আলোচনা করব না। জাওয়া, আহীরা, সাখী এবং চুয়া গানে প্রাক্শোভনমূলক যেসব প্রসঙ্গ আছে, তার মধ্যে ধাঁধার মেজাজমর্জি থাকলেও সদর্পে সেগুলো ধাঁধা নয়। আমরা যথাস্থানে এসম্পর্কে আলোচনা করেছি।

গাণিতিক ধাঁধার সংখ্যা ঝাড়খণ্ডে খুবই কম। একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

২৪ খাপড় জমা টুসকি খরচ; বাকি রইল কত ? — আট

দু'টো করতল এক না করলে 'খাপড়' বা তালি হয় না। অতএব, 'খাপড় জমা' বলতে দশ আঙুল অর্থাৎ দশ বোঝাচ্ছে; দু' আঙুল দিয়ে টুসকি দিলে দুই খরচ হয়ে যাচ্ছে—বাকি থাকছে আট। আসলে প্রশ্নকর্তা যখন এই ধাঁধাটি জিজ্ঞেস করে তখন খাপড় এবং টুসকি দুটোই সে চোখের সামনে দেখিয়ে ব্যাপারটাকে বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ করে তুলে থাকে।

## তৃতীয় অধ্যায়

### প্রবাদ

ঝাড়খণ্ডে প্রবাদ শব্দটি একেবারেই অপবিচিত শব্দ, কিন্তু প্রবাদ ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় অপ্রচলিত নয়; বরং এই উপভাষার মধ্যে অসংখ্য প্রবাদ প্রচলিত আছে। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় প্রবাদের প্রতিশব্দ হল 'দাঁতকথা' বা শুধুই 'কথা'। সাধারণ মানুষ যখন প্রবাদের প্রয়োগ করে, তখন তার আগে বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা করে; যেমন, 'কথায় আছে', 'কথায় বলে', 'সেই বলে না' ইত্যাদি। বৃত্তে অসুবিধা হয় না, ঝাড়খণ্ডে 'কথা' শব্দটি প্রবাদের সমার্থক। শুধু প্রবাদের প্রতিশব্দ হিসাবেই নয়, পুরাকথা বা কাহিনীর প্রতিশব্দ হিসাবেও 'কথা' শব্দের ব্যবহার হয়।

এই 'দাঁতকথা', 'কথা' বা প্রবাদও ধাঁধা, ছড়ার মতো লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপকরণ। প্রবাদের মধ্যে শুধু দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার প্রকাশই যে থাকে তা নয়। মননশীলতাও এর অন্ততম চারিত্রগুণ। এদিক দিয়ে বিচার করলে ধাঁধার সঙ্গে প্রবাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে। উভয়েই সংক্ষিপ্ত পরিসরের হয়ে থাকে, উভয়েই গড়ে-পড়ে রচিত সরস রচনা এবং উভয়ের অর্থই সবাসরি প্রকাশ পায় না—বরং বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করে অর্থোদ্ধার করতে হয়। যেহেতু প্রবাদের মধ্য দিয়ে মননশীলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাই কাবো কাবো মতে আদিম সমাজ বা উপজাতির সমাজ কিংবা লোকসমাজের নিম্নস্তরে প্রবাদ উদ্ভব লাভ করতে পারে না। তাঁরা বলেন, এই শ্রেণীর সমাজে কোথাও প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্যগোচর হলে ধরে নিতে হবে, তাদের অতীতজীবনের গৌরবময় ঐতিহ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। যে-সব আদিম সম্প্রদায় হাজার বছর ধরে নিজেদের আশুত্ব বজায় রেখে এসেছে, তাদের মধ্যে উঁচুস্তরের মননশীলতা বিকাশ লাভ না করলেও সমাজ-মানসের উপযোগী মননশীলতা অবশ্যই গড়ে ওঠে। আদিবাসীরাও বিভিন্ন বিষয়ে আভিজ্ঞতা অর্জন কবে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতো উন্নত সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ প্রবাদের রচনা কবতে না পারলেও তাদের মননশীলতাব উপযোগী প্রবাদ নিশ্চয়ই রচনা করে। তাই আদিম সমাজ, উপজাতি সমাজ কিংবা নিম্নস্তরের লোকসমাজে প্রবাদের উদ্ভব একেবারেই সম্ভব নয় এমন কথা আমরা বিশ্বাস করি না। প্রবাদের উদ্ভব-কাহিনী যথেষ্ট রহস্যাবৃত হলেও সামাজিক প্রয়োজনেই যে এর উদ্ভব ঘটেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন বিষয়ে বারবার একই অভিজ্ঞতা অর্জন কববার পব তাব ভিত্তিতে এক একটি প্রবাদ রচনা অস্বাভাবিক নয়। এই আভিজ্ঞতা সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলীর পরি-প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। প্রবাদ মূলতঃ কাহিনী-ভিত্তিক। প্রায় প্রতিটি প্রবাদের পশ্চাৎপটে কোন না কোন কাহিনী বা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। বর্তমানে কাহিনীটি লুপ্ত হয়ে গেলেও প্রবাদটি যথারীতি অস্তিত্বরক্ষা করে চলেছে। প্রবাদ কাহিনীর সারবস্তু মাত্র। এখনো বহু প্রবাদের পশ্চাৎপটে কাহিনীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রবাদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। কোন একটি সংজ্ঞার সাহায্যে প্রবাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে কোন সংজ্ঞাকেই একেবারে অস্বীকার করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেশ-



বিদেশের বিভিন্ন পণ্ডিত প্রবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যিনি যে সমাজের বা দেশের অন্তর্ভুক্ত তিনি সেই সমাজ বা দেশের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদেব কথা স্মরণে রেখে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন; ফলে কিছুটা একদেশদর্শী হয়ে পড়লেও কোন সংজ্ঞাই অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নয়। স্পেনদেশীয় একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—A proverb is a short sentence based on long experience. অর্থাৎ প্রবাদেব আয়তন সংক্ষিপ্ত এবং উপজীব্য দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা। স্বল্পায়তনেব মধ্যে প্রবাদেব এই সংজ্ঞা আমবা গ্রহণযোগ্য মনে কবি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই সংজ্ঞার ‘সংক্ষিপ্ততা’ এবং ‘দীর্ঘ অভিজ্ঞতা’কে গ্রহণ না করে সংজ্ঞার মধ্যে প্রবাদেব বিষয় এবং উদ্দেশ্য না থাকার অভিযোগ তুলেছেন।<sup>১</sup> কোন সংজ্ঞাব সাহায্যেই যে কোন বিষয়কে সর্বাংশে সুস্পষ্ট কবে তোলা যায় না, তা তো সর্বজনস্বীকৃত সত্য। যে কোন বিষয়ের বহুদিক থাকে, যা স্বল্পায়তন সংজ্ঞার সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না; তাই বিভিন্ন সংজ্ঞাব মধ্য দিয়ে একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক প্রকাশ পেয়ে থাকে। ডঃ ভট্টাচার্যেব প্রদত্ত সংজ্ঞাটি এই রূপ—‘প্রবাদ গোষ্ঠীজীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি।’<sup>২</sup> এই সংজ্ঞাটি যে সর্বাংশে সম্পূর্ণ, এমন কথায় আমরা বিশ্বাস করি না—যদিও একটু লক্ষ্য কবলেই বোঝা যাবে এটি দেশ বিদেশেব পণ্ডিতদেব প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞাব নির্ধারিত মাত্র, তবে সংজ্ঞাটি যে প্রবাদেব অনেক ক’টি বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত কবতে পেবেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লক্ষণীয় ডঃ ভট্টাচার্য এখানে শুধু ‘সংক্ষিপ্ত’ নয় ‘সংক্ষিপ্ততম’ শব্দটিব প্রয়োগ করেছেন এবং ‘অভিজ্ঞতা’র কথাও স্বীকার করেছেন।

লোকসাহিত্যেব অগ্ৰাণ্ড শাখাব মতো প্রবাদও গোষ্ঠীজীবনেব সম্পদ। কিন্তু গোষ্ঠীগতভাবে বহুজন মিলে ধাঁধা, প্রবাদ আদির সৃষ্টি করে নি, বরং এব পশ্চাতে ব্যক্তিমানসেব বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, রসবোধ এবং সৃজনশীলতাই যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ কবে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে আদিম কৌম সমাজব্যবস্থায় ব্যষ্টিব কোন স্থান ছিল না বলেই ব্যক্তি-সৃষ্ট সমস্ত রচনাই সমষ্টিব সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। প্রবাদেব উৎসও বিশেষ কোন ব্যক্তিমানসে,

১ বাংলাব লোকসাহিত্য, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১

২ প্রাক্তপ্ত, পৃ ১৬

কিন্তু লোকজীবনের রীতি-অনুসারে ব্যক্তি-সত্তা গোষ্ঠী-সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ায় প্রবাদ অপৌক্ষবেয় রচনায় পরিণত হয়েছে।

প্রবাদ সমাজের অন্তঃস্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই প্রবাদের মধ্যে দিয়ে সমাজমানসের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সমাজের মধ্যে প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সব কিছুই প্রবাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বান্ধকৌতুক এবং বক্রোক্তি প্রবাদের প্রাণসম্পদ। সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড-গুলোকে প্রবাদের মধ্যে তির্যক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এক একটি প্রবাদ রচিত হয়, যার মধ্যে বিস্ফোরণের ক্ষমতা নিহিত থাকে। Proverb photographs the varying lights of social usages ; the experience of an age is crystalized in the pithy aphorism.<sup>৩</sup> প্রবাদ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। সামাজিক আচার-ব্যবহারের ছবছ প্রতিচ্ছবি প্রবাদের মধ্যে বিদ্যুত হয়ে থাকে ; প্রবাদে বিশেষকালের বিশেষ অভিজ্ঞতা সংক্ষিপ্ত পরিসরে রূপ পরিগ্রহ করে। এই অভিজ্ঞতা সরাসরি সহজভাবে প্রকাশ পায় না, বরং রূপকের আধারেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। বক্রোক্তি এবং বান্ধকৌতুক প্রায় সমগ্রই রূপকের মধ্যে সংগুপ্ত থাকে।

গুণগতভাবে প্রবাদের বিচার করে দেখলে দেখা যায়, এর মধ্যে সংক্ষিপ্ততা, অর্থবহতা এবং সরসতা অপরিহার্যভাবে বিদ্যমান থাকে। A proverb is a saying in more or less fixed form marked by 'shortness, sense, and salt', and distinguished by the popular acceptance of the truth tersely expressed in it.<sup>৪</sup> অর্থাৎ প্রবাদ এমন একটি উক্তি বা বাণী যা কমবেশি একটি অপরিবর্তনশীল আকারের হয়ে থাকে, সংক্ষিপ্ততা, অর্থবহতা এবং সরসতা যার বিশেষত্ব এবং এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত সত্য গোষ্ঠী বা সমাজ কর্তৃক সাধারণভাবে স্বীকৃত। এখানে আকারের দিক দিয়ে প্রবাদের অপরিবর্তনশীলতা, সংক্ষিপ্ততা, অর্থবহতা এবং সরসতার ওপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তেমনি গোষ্ঠী-স্বীকৃত সত্য যে প্রবাদের আত্মস্বরূপ তা'ও স্বীকার করা হয়েছে।

৩ Oriental Proverbs : Ed. Dr. Mahadev Prasad Saha

৪ Oral Literature in Africa : Ruth Finnegan.

রূপকের আধারে রচিত সমস্ত প্রবাদের বিষয়বস্তু যে মালুয়, তাতে সন্দেহ নেই। মালুয়ের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার প্রবাদে উজ্জল বেগায় অঙ্কিত হয়ে থাকে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, প্রবাদে মানবচরিত্রের দুর্বলতার দিকটিই সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে; সমালোচনার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এবং তির্যক দৃষ্টি মানবিক দুর্বলতার ওপর নির্মমভাবে বর্ণিত হয়েছে। এদিক দিয়ে দেখলে প্রবাদে মানবচরিত্রের সংগুণাবলী মোটেই যোগ্য সমাদ্দব লাভ করে নি। আসলে প্রবাদের মাধ্যমে ক্রটি-বিচ্যুতির যতোখানি সূকঠোর সমালোচনা করা হয়, গুণাবলীর প্রশংসা তার সামান্যতম অংশও করা হয় না।

প্রবাদে নব অপেক্ষা নারীর সমালোচনাই বিশেষভাবে করা হয়ে থাকে। প্রবাদের রচনার ক্ষেত্রেও তাই এর অপেক্ষা নারীর প্রাধান্যই বেশি। সত্যি কথা বলতে কি প্রবাদের ব্যবহার পুরুষসমাজ অপেক্ষা নারীসমাজেই সমদিক লক্ষ্যগোচর হয়ে থাকে। নারী শুধু প্রবাদ রচনাই কবে না, ধারণ এবং বহনের বিশেষ দায়িত্বও পালন করে থাকে। নারীর চেয়ে নারীর কঠোর সমালোচক আর কে হতে পারে? তাই দেখা যায়, প্রবাদে নারীর বিভিন্ন আচার-ব্যবহার সম্পর্কে যতোখানি তীক্ষ্ণ এবং নির্মম বিক্রম বর্ণিত হয়ে থাকে, পুরুষের ক্ষেত্রে তা নামমাত্র বললেও চলে।

সমাজ-সংসার পাবিবারিক জীবন প্রবাদে সর্বাধিক স্থান অধিকার করে আছে। সামাজিক রীতি-নীতি আচাব-ব্যবহারের প্রতি ঝাঁজালো বক্রোক্তি যেমন করা হয়েছে, তেমনি পারিবারিক জীবনের বিচিত্র সম্পর্ক, আত্মীয়স্বজন এবং তাদের কোঁতুককব আচরণের প্রতি বাঙ্গ এবং কটাক্ষও বারে-বারে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, এই শ্রেণীর প্রবাদে বহু ক্ষেত্রেই রূপক ব্যবহার করা হয় না; নিবলংকার নিরাবরণ ভাষায় এই শ্রেণীর প্রবাদ অপ্রতিহত-গতিতে মর্মভেদ করতে সক্ষম হয়। ঝাড়খণ্ডের প্রবাদেও এই ধরনের বিষয়-বস্তুই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

প্রথমে পরিবার বা কুটুম্বজীবন-সম্পর্কিত প্রবাদগুলো উদ্ধৃত করে আলোচনা করা যেতে পারে। যে কোন সমাজেই বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গুষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমে দুটি অনাত্মীয় পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তাবন্ধন গড়ে ওঠে। কুটুম্বিতার মাধ্যমে দু'টি পরিবার একটি কুটুম্ব পরিবারে পরিণত হয়। ঝাড়খণ্ডে এই বন্ধন বা কুটুম্বিতা গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ-দু'টি পরিবার পরম্পরের স্নেহদুঃখের অংশীদার হয়।

বরকনের নির্বাচন, বিবাহের আচাৰ-অহুষ্ঠান, আয়োজন-সমাবোহ সমস্তই প্রবাদে শাণিত বান্ধ বিক্রপেৰ মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ কৰেছে।

১-২৭ ধৰা-বাঁধা বেহা, মন সঘদা সাঁগা ॥ সাঁগা আৰ ম'গা ॥ নিসন্তুণাব কি,  
 তাৰ গণন-গাঁপন কি ॥ সাঁগা-উ মায়া, ন খঁজা-উ বলা ॥ ভাঙা ঘৰে  
 খঁজা বলা, বেহালা পুৰুষ ছাড়া সাঁগা ॥ গায়েব কন্যা শিঁঘন নাথী ॥  
 দুনিয়া পা'কলে কনিষাব অভাব ॥ যেমন দাদা ভজহবি, তেমনি দিদি  
 মঞ্জদবী ॥ সাত খাঁই খাঁই আঠে পা ॥ মিংগা বিবি বাজি, কি ক'ববেক  
 কাজি ॥ কুলেব কন্যা চেপটি অ ভাল ॥ জল খাবি ছাণ্ঠে, ঘৰ জুডবি  
 জাণ্ঠে ॥ তুকং লগন তুকং বিহা ॥ যাহাব সঁগে মজে মন, কিবা  
 হাড়ি কিবা ডম ॥ এক মায়াকে আনাগানা, দু' মায়াকে ছিঁড়া কানা।  
 তিন মায়া যাব ঘাডে হাঁডি, চা'ব মায়া যাব গলায় দ'ড ॥ কন বেহাকে  
 দু' ঘৰ আলতা ॥ কন বিহাব ওবে আগ ঘইডে আলতা ॥ উঠ ছুঁচী  
 তব বেহা, পাত্ৰব ঘবেব শুযা ॥ যাব বেহা তাব মনে নাই, সাঁই  
 পডশীব ঘুম নাই ॥ পবেব নিয়ে' ববেব বাপ, লুটো লিলেই মনস্তাপ ॥  
 নাচে কুদে ববিযাতি, যাব লাগে কডিপাতি ॥ ঢোল বাজাবি সিদা  
 লিবি কন্যা দেখছিস কেনে ॥ পবেব বিহা, ডাঁটাই ঠিহা ॥ বেহাব  
 মজা বাজনা, জমিব মজা খাজনা ॥ ঢাকে ঢলে বিহা, কাঁসিতে কেনে  
 মানা ॥ সেই মাগী ভাতাব কবে, হবে দবে গকেই পড়ে ॥ আঘন  
 মাসে চুঁটাব-অ সাতটা বহ ॥

যে-কোন পবিবাবে পিতামাতাব ভূমিকা সৰ্বাধিক গুরুত্বপূণ। মাতা-সম্পর্কিত  
 প্রবাদে মহিমাই প্রকাশ পেয়ে থাকে, কদাচিৎ শ্লেষ বা বক্রোক্তি ব্যবহার  
 কৰা হয়।

২৮-৩৩ চিডা বল মুচি বল ভাত্ৰেব পাবা নাই। মাসি বল পিসি বল মায়েৰ  
 পাবা নাই ॥ মাই থা'কলে কি কেউ মাসিব তবে কাঁদে ॥ মায়েই  
 জানে ছালাব বেদন ॥ ছানা ন' কাঁদলে মা-অ ছুদ খাওয়ায় নাই ॥  
 কামেব ( কন্যাব ? ) মা ভিতবি, ববেব মা বাহাবি ॥ মায়েব নাম  
 চুটকি বাঁদী, বেটার নাম সুলতান খান ॥

সন্তানেব জন্মদাতা হিসাবেই পিতার বিশিষ্ট ভূমিকা প্রবাদেও স্বীকৃত।

৩৪-৪১ আয় থা'কলে বায়, বাপ থা'কলে বেটা ॥ বাপে নাই পুত্ৰে, টঁগা  
 ধরি মুতে ॥ বাপকা বেটা পছিম কা ঘড়া, কুচ নাই কুচ পড়া থড়া ॥

বাপের কালো নাই চাষ, বেনা বনে বাস ॥ বাপের কাবণে সংমাইকে  
গড় ॥ ভিন্নু ভাতে বাপ পড়শী ॥ ভিন্নু ঘরে বাপ পড়শী ॥ নিজে  
বাঁ'চলে বাপের নাম ॥

প্রবাদে মাসিপিসির সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায় না; ব্যঙ্গ এবং বক্রোক্তি  
শিকার হতে হয়েছে মাসিপিসিদের।

৪২-৪৫ খড সম্পন্ধে পুয়াল মাউসী ॥ ধান সম্বন্ধে পুয়াল মাউসী ॥ ঘরঘর  
মসি ঘরঘর পিসি ॥ মসি বলি পদ চিমটায় ॥

পুত্র যতোদিন পারে নিষ্কর্মার মতো পিতৃ-অন্ন ধ্বংস করে থাকে। তাই পুত্র  
সম্পর্কিত প্রবাদে পুত্র-প্রসঙ্গ অশ্রদ্ধা এবং তচ্ছিলোর সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।

৭৬-৫৮ খাঁই হাগে শুঁই জাগে, সে পুত কোন কাজে না লাগে ॥ পুত আর  
ভুত ॥ ছুঁকে না করিহ দয়া, ছুঁদের আঠারটা মায়া ॥ যত ছানা,  
তত দেনা ॥ ছানাব লে ছানার শু ভারী ॥ কলের ছানা গলে, ধুলার  
ছানা বলে ॥ ঘুমা'ল ছানাব কিসের ভাগ ॥ যে-ছানা কাঁদে না, সে  
ছানা দুধ পায় না ॥ পুত খা'কতে আঁটকুড়া ॥ হওয়া পুতে আঁটকুড়া ॥  
ঘরেউ ভাত নাই, মায়েউ পি'টেছে ॥ কলের শভা ছানা, কানের শভা  
সনা ॥ ছানা হাগে বাঁ'চতে, বুঢ়া হাগে ম'রতে ॥

ঝাড়খণ্ডের পরিবারে বধূর জীবন যে অত্যন্ত যন্ত্রণার ছিল, তা আমরা  
অন্যত্র বলেছি। প্রতিনিয়ত গালি-গালাজ, ব্যঙ্গবিদ্রূপ তো ছিলই, তার ওপর  
ছিল শারীরিক নিৰ্যাতন; এমন-কি ক্ষুধার অন্নও তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে  
দেওয়া হত না। অত্যাচারে নিগ্রহে অতিষ্ঠ হয়ে তাই অনেক সময় বধু  
গোপনে পিত্রালয়ে পলায়ন করত। প্রবাদের মধ্যেও বধুব যন্ত্রণাজর্জর রূপটি  
সহজেই নজরে পড়ে।

৫৯-৬৬ কাজে নাই পাইটে বহুড়ী, লাউ কা'টেতে দৌঁড়াদৌঁড়ি ॥ কলির  
বহু ঘরভাঙানি ॥ থাক বিটি সহে', সব যাবেক বহে' ॥ বাদলে-বাদলে  
বেলা যায়, ছচরা বহু তিনবার খায় ॥ বউ বিরাল মাছি, তিন নাই  
বাছি ॥ আসরে না পাই ঠাঁই, ঘবে আসি মাগীকে কলাই ॥ যাকে  
ঘর করাব নাই, তাকে দিয়ে বরাবর রাইতে উথুন দেখা করাব ॥  
বউ পালালে ঠেঁগা ধরো কি লাভ ॥

জামাই পরিবারেরই একজন হলেও জামাই-এর প্রতি আদর কিংবা ব্যঙ্গ-  
বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সামাজিক চিন্তাভাবনার একটি বিশিষ্ট চিত্র প্রকাশ পায়।

কণ্ঠাব মঙ্গলামঙ্গল জামাই-এব মেজাজমজির ওপর নির্ভর করে, তাই জামাই-এর আদর না কবে উপায় নেই; অগ্নিদিকে জামাই পরিবারবহির্ভূত লোক এবং কণ্ঠার অপহাবক হওয়ায় পরাজিতের বেদনা লুকোবার জন্তু তাকে রঙ্গব্যঙ্গ, শ্লেষবিদ্রুপ এবং বক্রোক্তির তীক্ষ্ণ আঘাতে জর্জবিত কবা হয়। প্রবাদে এ-আঘাত অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে ধবা পড়ে।

৬৭-৭০ ঝি-জামাই বাঁকা কাঠ ॥ জামাই-এর ভাই খঁজা বলা ॥ যা'চলে জামাই খায় না, রুটি, সকাল হলে ঢেঁকি চাটি ॥ ভাদব মাসেব খবায় ঘরজামাইয়া পালায় ॥

প্রবাদে মামার ভূমিকাও মোটেই শ্রদ্ধেয় নয় ববং তীব্র বক্রোক্তিই মামাব ভাগ্যে জুটে থাকে।

৭১-৭২ ছুঁই যায় নাই মামু, বলে ছামু ছামু ॥ মামাঘর-উ যা, ডুম'ব তল-উ তা ॥ প্রবাদের রচয়িত্রী হিসাবে নাবীব উল্লেখযোগ্য অবদানেব কথা অস্বীকার করা যায় না। নাবীই নাবীব চারিত্রিক দুর্বলতাব খবর রাখে বেশি। তাই নারীর নিষ্ঠুর সমালোচক নারীই হয়ে থাকে। নাবীর আচাব ব্যবহাব, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যঞ্জে-কৌতুকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রায়িত হয়েছে প্রবাদে।

৭৩-৮১ ঝুড়ি কাঠের রা'ধনা, রা'ডী মেয়্যার কাঁদনা ॥ িটি ছ্যাল্যাব বা'ড, কর'ল বাঁশের বা'ড ॥ ইয়ায় নাই উয়ায় দড, ঢররা চইখে কাজল পর ॥ চোব ছিনার মুখে দড ॥ কামারিনের ছানা হল্য, কুম্হারিন ডা'ল ভাত খাল্য ॥ সরষা বাঢ়ে ফলে, মায়া বাঢ়ে ছলে ॥ বৃন্দাবনে সবাই সতী নাম কিনেছেন রাই ॥ আ'খ বাড়ির শিয়াল রাজা বনের রাজা বাঘ। বেহা ঘরে মেয়া রাজা সমান খুজে ভাগ ॥ ভাত দিবার ভাতাব নাই, কিল মারার গুঁসাই ॥

ঝাড়পণ্ডের পরিবারজীবনে কুটুম্বের স্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। তাব আদর-অভ্যর্থনা তাই যথায়োগ্য সম্মানের সঙ্গেই কবতে হয়। এর ফলে গৃহস্বামীর যথেষ্ট খরচপত্রও হয়। তাই প্রবাদে বিমিশ্রভাবনায় কুটুম্ব চরিত্রটি চিত্রিত হয়েছে।

৮২-৮৮ কুটুমের লাগি মরালি হাঁস, ছানার পনার সবারেই মাঁস ॥ অতিথ আনে নাখে দড়ি, কুঁচ্যা খায় শালের বাড়ি ॥ সাঁঝের কুটুম বজাঘাত ॥ লিলজ কুটুমকে বিছন ধানের ভাত ॥ আলে গেলেই কুটুম, নিত

ভাঁওয়ের চাষ ॥ আঘা'ল কুটুম ভাগ্যে মিলে ॥ বাঁধ লক্ষ্যে চাষ,  
কুটুম লক্ষ্যে বাস ॥

পরবর্তী প্রবাদগুলোতে রাজা-প্রতিবেশী, ধনী-দরিদ্র আদি সম্পর্কে সরস  
মন্তব্য করা হয়েছে ।

৮২-১০৫ আশুনে নাই মানে অদা, রাজা নাই মানে দাদা ॥ বাজা-উ  
দাদা, ন আশুনে-অ অদা ॥ বাজা বাদী ঘব চলে, পডশী বাদী ঘর  
চলে না ॥ দে'খব রাজার হড়বডি, নাই ত দিব গডবডি ॥ রাজার  
বাগানের আম, বাঁদরে-বাঁদরে ছাড়া-কামড়া ॥ রাজার পাদে গন্ধ  
থাকে না, পরজাব পাদে থাকে ॥ আপনার গায়ে কুকুর বাজা ॥  
আ'জ বাজা, কা'ল ফকিব ॥ পডশী নাই যুথা, টাঁপ ছাডবি তুথা ॥  
ঘট্ট'লকে থামচ'ল, নেঙট'লকে চিপক'ল ॥ যার গায়ে লাল গামছা,  
তা'ব কথা শুড খা' মচা ॥ যাহার গায়ে নাই কামি. তাহার কথা  
নাই মানি ॥ গরীব লক ফডিং খায়, ঘডায় চড়ে' জল ঘাট যায় ॥  
গরীব লক মাদার পায়, ঘন ঘন দববার যায় ॥ গরীবের রাগ পেটে  
পচে ॥ নিতভকাকে দেয় কে ॥ নিধন্যার ধন হলে দিনে দেখে তা'ব ॥  
আশুচিন্তা, নিজের স্বার্থসিদ্ধি'ব কথা সগাই ভাবে । পবের সম্পদদর্শনে এবং  
উন্নতিতে ঈর্ষ্যাবোধ করা, সমালোচনা ক'বা মানবসমাজের অতি সাধারণ  
ঘটনা । তাই অল্প-মধুর রসে জাবিত হয়ে এইসব চিন্তাও প্রবাদের মধ্য  
দিয়ে প্রকাশ লাভ করেছে । আসলে প্রবাদে অশ্লের দুর্বলতা, লোভ, ঈর্ষ্যার  
প্রতিই কটাক্ষ করা হয় ।

১০৬-১২২ নিজের কথা বললে নিজেকেই পরাচিত ক'বতে হয় ॥ নিজের জীবন  
পরের ধন, সবাই দেখে ॥ আপনার চুল বাচুক, পরের চুল  
পুড়ুক ॥ আপনার বুইখে তরি, পরের বুইখে মরি ॥ আপ কুচি  
ভজন, পর কুচি শি'গার ॥ আপনার কুটা'র, আপনার ঘাড়ে ॥  
আপনার ঘডার ঘাঁস, কা'টতে কিসের লাজ ॥ ই বাঁহি কামড়ালেউ  
দুখায়, উ বাঁহি কামড়ালেউ দুখায় ॥ উপর দিগে মুঁহাঁই খু'কলে  
আপনার মুঁহেই পড়ে ॥ নিজে না ম'রলে কেউ স্বরণে নাই যায় ॥  
পবের দেখি করি হায়, যেউ থাকে সেউ যায় ॥ পরকে হাজার  
কর পর লগ ভাল, দুখে আঁগার গুল দুখ লয় কাল ॥ পর জর  
উনহানে নিয়ে ভর ॥ পরের মুড ছাতায়ের কুড়, বুক করে ছর ছর ॥

ধান কুঁটলে চাল হবেক, পবেব নিন্দ কবো কি হবেক ॥ আপনাব  
 গুণ জানে নাই খেদী, পবেক বলে চেপানাখী ॥ পবেব বমহাবাড্ডিএ  
 বাদবে বাদবে লডাহ ॥ পবেব ধনে ববেব বাপ, লুটা লিলেই  
 মনস্তাপ । পবমন্দয পুৰী ক্ষয ॥ আনলকেব আন চিহ্না, কুলকেব  
 কুচিস্তা ॥ পবেব ধনে পদ্ধানী ॥ পবেব বাগে ভুঁয়ে পাও ॥ চাল'নেব  
 পদ ঝবঝব বাব, চাল'ন পবেব বিচাব কবে ॥ খায় নিন্দ পবে  
 চাটা ।

ধনসম্পত্তি, ঢাকাকড়ি-সম্পর্কিত ৩ বধেবটি প্রবাদ—

১৩০ ১৭৬ টাকা ফাকা ॥ হাতে নাই চ'ন্দ কড়া, মিনসা বা'র লেকবা পাড়া ॥  
 হাতে নাই পয়সাক'ড়, মশায় যাছে সেকবা বাড়ি ॥ অল্প ধন,  
 বিকন মন ॥ ধন যাহ বাড়ডানি' লাব । অল্প বনে মাহাজনি  
 কবে, খাওক খা'বতে মাহাজন মবে । নিকড়ি খাব হাট, হাট  
 দোঁগ হিষা ফাট ॥ কড়ি আব দড়ি, এহ গিনাহ কাচ দয় ।  
 ফেল কড়ি মাথ তেল, তুঁত কি আমাব পব ॥ দে পয়সা, বুগলী  
 খসা ॥ টাকাব বেটা, পা ব কাটা ॥ পাচ টাকায় কুহলা গাহ,  
 বকনা বাছুব, চাব পাহ ছপ ॥ মিনসানেব কড়ি বাধে খায় না ॥  
 হাতে নাই পয়সা কড়ি, লাড কাটেতে দৌড়ানোঁড়ি ॥ মন আছে  
 ত ধন নাই, মন আছে ত মন নাই ॥ সনা গনো হাজাব বাব,  
 মাতুষ তোলে একবাব ॥ পনেব মধ্যে ধন, মিন গুড়া শণ, ই বণ  
 আব উ বণ ॥

ভাগ্যাভাগ্য দৈবচিন্তাও প্রবাদেব বিষয় হয়ে থাকে বপনো কখনো এব  
 মধ্য দিষে লৌকিক ধর্ম প্রকাশ পায়, কখনো নীতিকথা আশ্রিসিত হয়ে  
 ওঠে কখনো-বা সর্কতাবাণী উচ্চাৰিত হয় ॥

১৪৭ ১৮০ এক কথা দুই বল, লগ ঠাকুব ফল জন ॥ ঙ্গবেব মাব জুবেব শাব,  
 নাই দিলে নাই নিস্তার ॥ ধবণ মবণ পানী, সহদেব বলে এ তিন  
 না জানি ॥ নিশাসে বিশ'স কি ॥ হব্যাব ধন হর্যা' লিল, মটকা-  
 মটকি সার হল্য ॥ যা ছিল গুঁড়িবাঁড়ি, সব লিল হর্যা গুঁড়ি ॥  
 কপালগুণে কাপাস ফুটে ॥ ঠাকুবেব ক'বতে বদাব জাহিবা  
 বেশি ॥ যে খায় চিনি, তাকে দেয় চিন্তামণি ॥ যাব যখন চলে,  
 মুতে বাতি জলে ॥ লাডু খাছি স্ববগ যাছি ॥ স্ববগ যাব, লাডু



থাব ॥ ঝাড়া গোলক বিন্দাবন, হেসেন মটা মুলা দরশন ॥ রাখে  
 হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে ॥ জীউ মরে আপনার দখে,  
 কি ক'রবেক হরিহর দাসে ॥ যেমনি গুরুর তেমনি চেলা, মাগে  
 হস্তকী দেয় ভেলা ॥ ল'ও গুরুর ভ'ও চেলা (আন্ধা গুরু বা'হরা চেলা)  
 মাগে গুড় ত লায়ে চেলা ॥ খাটুয়াকে ভগবান নাপুয়া ॥ তেল  
 দে'থলেই দেবতা, হাল বা'হলেই তেলকা ॥ হাল বা'হলে চেলা,  
 তেল দে'থলে ভূত ॥ তুরুং দান মাহাপুণিয়া ॥ যত দান, তত  
 মান ॥ নি-খাওয়ার ধন স্বরগ ॥ নি-সাথীকে ভগবান সাথী ॥ মা'নলে  
 শিব না মা'নলে পাথর ॥ যে জীউ দি'য়েছে, সে আহার দিবেক ॥ যে  
 ঠিনে জল, সেই ঠিনেই গঙ্গা ॥ ছড়মুড় যাত'রা, যা করে বিধাতা ॥  
 হেঁতরুপী ভগবান ॥ কলি যুগে ধর্মের পঁদে শূলি ॥ যা থাকে  
 কপালে, তাই হবেক সকালে ॥ সবার দুয়ারে টকা টকা, গুরুর  
 দুয়ারে লবডকা ॥ যা দেখি নাই নিজের নয়ানে, পত্নুক না যাই  
 গুরুর বচনে ॥ সূমকে গরাম ডরায় ॥

মানবচরিত্রের মতো মানবসমাজের সাংস্কৃতিক উপকরণ অবলম্বন করেও বহু  
 প্রবাদ বচিত হয়েছে। ঢেঁকি মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান  
 অধিকার করে আছে। ঢেঁকির আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই সম্ভবতঃ মানবজাতি  
 সর্বপ্রথম যন্ত্রসভ্যতার গোড়াপত্তন করে। ঢেঁকি সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবাদ  
 নিয়ে উদ্ধৃত করা হল।

১৮১-১৮২ আলয়মালয় দিন যায়, বা'ত হলে ঢেঁকশাল যায় ॥ আলয়মালয়  
 দিন যায়, রা'ত হলে ঢেঁকি বাটে ॥ দিন গেল আলহে মালহে,  
 সাঁঝের বেলা ঢেঁকি চাটে ॥ ফপরা ঢেঁকির আওয়াজ বেশি ॥  
 ঢেঁকশাল যাবি, ন পাটরা কুঁড়া খাবি ॥ সাথে কি কুকুর ঢেঁকশাল  
 যায় ॥ টাপার চুপুর কার ? আউস ধান যার। এমন ক'রলে  
 হয় ? মাথা কুটলেউ লয় ॥ ঢেঁকি স্বরগে গেলেউ ধান কুটে ॥  
 ঘরের ঢেঁকি কুম্হীর ॥

গরুবাহুর ছাগল-ভেড়া আদি গৃহপালিত জীবজন্তুও প্রবাদেদের উপকরণ হিসাবে  
 ব্যবহৃত হয়েছে। এই সব জীবজন্তুর চারিত্রিক গুণাগুণ প্রকাশ পেয়েছে,  
 কখনো বা এই সব জীবজন্তুর রূপকে মানবচরিত্রের বিভিন্ন দিক সমালোচিত  
 হয়েছে।

১২০ ২১৬ রইল বলদা ঘবে, না বইল হালে, তার দুঃখ সৰ্বকালে ॥ দুখালি  
গাই এব লাপি-অ সহায় ॥ দুখালি গাই-এর গঁডরানি-অ সওয়াদ ॥  
বাঁড়ে-বাঁড়ে লডাই হয়, বাছুবের ঠেঙ যায় ॥ যেমন গরু তেমন  
বাগাল ॥ বাট গরুকে বাউরী বাগাল ॥ কুট্যা গরুব ভিন্ন গঠ ॥  
কুটী গরুব বুড আশরা ॥ কুড্যা গরুর বু'ড আশ্রয় ॥ হি'সাবেব  
গরু বাধে খায় না ॥ গাই ন গরু, স্তখে ঘুমায় হারু ॥ কুলহর  
গরুর আমাবস্তা নাই ॥ গঠে গণায়, পাঘাঘ নাহ বাঁধায় ॥ সাঁঝে  
সাত হাল, সকালে এক হাল-অ নাই ॥ বিকা গবব মূল নাই ॥  
বিকা গরুব দাঁত দে'থতে নাই ॥ গরু বুঢ়ালে শিং বাটে, মালুঘ  
বুঢ়ালে মু বাটে ॥ মালুঘ বুঢ়ায় আঁতে, গরু বুঢ়ায় দাঁতে ॥ গুটি  
নিয়ে' চাষ কবে, বুটী নিয়ে' বাস কবে ॥ খা'শে ছিল তাঁতি তাঁত  
বুগ্গে, গবহ হল্য আঁড্যা গরু কিন্তে ॥ খুঁটার জোবে কেডুক নাচে ॥  
দুখে উঠায় ভাত, কাডায় উঠায় ঘাট ॥ বাডায় কি জানে সূজি  
ঘাঁটা'ব সওয়াদ ॥ কাড়া মরে হদে, মালুঘ মবে মদে ॥ মবা ঘডাব  
পাদে-উ লাভ ॥ হাগ ঘডা পাদ ঘডা, যাতে হবেক ধমকগডা ॥  
আটে পিঠে দড, ত ঘডার পিঠে চড ॥

বন্য জীবজন্তু-সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবাদও ঝাড়খণ্ডের লোকমুখে প্রচলিত  
আছে ।

২১৭-২৩৪ মবা হাতী হাজার টাকা ॥ মা'বি ত হাতী, লুটি ত ভাণ্ডার ॥ মরদ  
কা বাত, হাতী কা দাঁত ॥ মাধের জাড বাধের ঘাডে ॥ নাচারী  
বাঘ খাঁকডী খায় ॥ বাঘ চিন্হে গপাল ঠাকুব কাডাব মতন শিং ॥  
ভালুক কি শালুক চিন্হে, চিন্হে গাটার উইমেকা ॥ লেদা গাছে  
ভালুক নাচে ॥ শিয়ালেব গুয়ে কাজ, শিয়াল বলে আমি পর্বতে  
হাগি ॥ সোব শিয়ালেব একেই বাহা ॥ এক শ'শার বার বাঁসা ॥  
খোঁচা বলে হামাব ঠেঙশালকে আলে হামি জল খাব ॥ ছাডা ঘবে  
কটাশ রাজা ॥ বড বড বাঁদবের বড বড পেট, সমুন্দর ডে'ঘিতে  
মাখা করে হেঁট ॥ মাকড মরালে ধকড হয় ॥ এক বাঁদবের মু'  
পু'ড়লে শ বাঁদবের মু' পুডে ॥ বাঁদবের হাতে শ্যালেগ্গেরাম ॥  
হরিণের শিং-এ মাছি বসে না ॥

গৃহপালিত অগ্ন্যন্ত জীবজন্তু-সম্পর্কিত প্রবাদ—

২৩৫-২৪৫ ছাগলের ঘাবা উ কি ধান মাডান যায ॥ ছাগল-অ চ'ববেক,  
ঠবকা-উ বা'জবেক ॥ যাহে ঋণ তাহে ঋণ বুটী ভেডী কিন ॥ গঠ  
ভেডী পকাই মবে ॥ কুকুব গু হ প ত্, ন দযাব কণাউ সত্ ॥ চৈদড  
কুকুব বাসাতে হুঁকে ॥ সাথে কি কুকুব পাটব কুঁটা খায় ॥ বিবালেউ  
কি দুধ খাতে ছাডে ॥ খডা বিলাহ-এব আবশুলা পথ্যা ॥  
সাথে কি বিবাল গাছে উঠে ॥ উশাস মাটি বিবালে বুনে ॥

ঝাডগণের অত্যন্ত সুপর্বিচিত কাকপক্ষীর রূপকেও প্রবাদে মানবচবিত্ত্রের  
সমালোচনা করা হয়েছে ॥

২৭৬-২৫৬ বে'ল পা'কলে কা'বার ক ভাগ ॥ কা'ং কুকুট কা'ওয়া,  
নি-বা'ঘাকে কবে ঘাওয়া ॥ ভাত ছন্দানে কা'ওয়ার অ'ব প ॥  
কান নাই দেখোই কা'ঘাকে পেদ ॥ চৌ'টহ-এব বুতলে আশমান  
নাই রূপে ॥ হরবব হই মবে ঘাঁড হাঁস, ভিম খায় দারগাবাবু ॥  
টিয়ায় খাল্য ধান, পেচাব মাশায় ধুমকুম ॥ চাডে মবে পেচা,  
তালগাছে শাঁবে মাচা ॥ পেচা পবেব চডবেই দেখে ॥ আঘা'ল  
বঘলী'ব পু'ঠি তিতা ॥ থাক বঘলী মোর পাশে, আম আ'সব  
কান্তিক মাসে ॥

সাপ-বাঙ সবীক্ষপ-বীটপ ওঙ্গ আদি'ব বিচিত্র আচ'ণের সঙ্গে মাল্লষেব  
আচার-আচরণেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লোকমানসে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ধরা পড়ে ।  
তাই মাল্লষেব বিভিন্ন আচরণ-প্রসঙ্গে কটাক্ষ বা বক্রোক্তি স্বভতে গিয়ে  
প্রবাদে এই সব প্রাণী'ব রূপকেবও ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্যগোচর হয় ।  
২৫৭ ২৭৭ সাপেব লেথা বাঘেব দেখা ॥ ছট সাপাকে বড সাপা, বড সাপাকে  
বিধাতা ॥ সাপেব মুখে গঁদ ॥ সাপ অ মবে, ডাঁগ অ না  
ভাঙে ॥ সাপে খালেউ খাবেক, বাঘে খালেউ খাবেক ॥ বেঙ  
বি'ধতেউ সনাব কা'ড ॥ জুয়ানে বেঁধ অ চেহ'বা ॥ বেঁধেড কি  
জানে মধুব মবম ॥ যদি হবে গচই শোল, তাখে বড গঙগোল ॥  
অতি সিঘানেব গলায় দডি, কুঁচ্যা খায় শালের বাড়ি ॥ কৈ'কলাসেব  
দোড, বাকণেব মোড ॥ পতঙ্গ মা'বতেউ মাতঙ্গ ॥ উকু'গা মুড,  
পয়জাব-খাউকা তু'ড ॥ কান তলে উথুনের ডেবা ॥ কৈ'ডবই-এর  
একটা ঠেঙে ভা'ঙলে নাই বাতায় ॥ চু'ট্যায় ঢোল কাটে ॥ ছুঁচা  
মবালে হাত বাসায় ॥ বাঁবা খাঁকডী ছাল্যা'ব বশ ॥ ডাঁডায়

জানে গুডেব সন্ধান ॥ উই উটুব কুজন, গড়া ভাঙে তিন জন ॥  
ছুঁচাব চাকব চামচিকা, তাব মাইনা চ'দসিকা ॥

পাঁভন্ন ধবনের খাও এবং পানীয় দ্রব্যও প্রবাদেব উপজীব্য হয়েচে । বিচিত্র  
খাও এবং বন্ধন-পাবনাকে উপলক্ষ্য কবে মানবসমাজেব বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা,  
খাচাব ব্যবহাবেব ওপব গুণ প্রকাশ কবা হয়েচে ।

২১৮-৩২০ কুখাবাব কে, আমড়া নাও . ৮ ॥ কিসেব লাগি কি, সনলা শাগে  
ঘি ॥ যেই দানের সেই চা'ল, বাঁদ'নী গুণে খা'ল খা'ল ॥ চি  
হি ফ'লি কুচচি ফ'ল, ভাত নাশ ক'গিজ ডি ব'ল ॥ থাকুক পিঠা,  
ভাও'ই বাঁদ ॥ যে জল বহে, সে কি শ'য়ে মবে ॥ দযা কপি দিই  
গুন, ভাত মাবে তিন গুণ ॥ গুজেব আশু, বণেব পেছু ॥ তেল  
পু'ডলে ঘি, ঘি পু'ডলে খাপি কি ॥ বাঁদাব ভাত গাল উদাব ॥  
পেটে ভক মখে লাজ, সে বঁদুয নাই কাজ ॥ জালে স'দ্যাদ, ন  
ঝালে স'দ্যাদ ॥ লিষাদিষা খাবাখাবি, পা'দ্যা-দা'দ্যা ভা'য়া-  
চাবি ॥ নাশ কাজ, ত খত ভাজ ॥ গহ'-অ জলপান, তান্তি-অ  
মু'নিস ॥ পু'রা চা'ল ভাতে বাটে ॥ যাব জগু প্রাণ কাঁদে, ধান  
ভাঙে ভাত বাঁধে । যাব জগু প্রাণ কাঁদে না, চা'ল খা'কতে  
ভাত বাঁধে না ॥ ভকে না মানে কাঁচা, বৃমে না মানে অদা ॥  
ভাত আব কাঠ ফু'বালে জগান দিষা মু'স্কিল ॥ ভাত ফু'বালে ধার  
মিনে, কাঠ ফু'বালে বাব মিলে না ॥ বেহা নবে মাড ভাত বলি কে  
জানে ॥ পালে পাঠি, না'হলে পাববণে খাও ॥ গো পা'ত বাঁধে,  
সেই তবকাবি পায না ॥ আদে 'খলা'য় পায চকায় মকায় খায ॥  
খাবাব লক অনেক, ক'ববাব কেউ নাই ॥ আম গাবি, ন হই, জাম  
খাবি, ন হই ॥ ভূলে ভালে পাঠকাবি, ঝোলেঝালে তরকাবি ॥ যমের  
মু'হে পি'চবা ভাজা ॥ পেটে আছে হালি, দাঁতে ঠে'কছে বাণি ॥  
আঘা'ল পেটে অমু'ত-অ তি'ত ॥ পলায় পালে বিব খাতেউ বাজি ॥  
ভাজা খালে তেলেব খবচ ॥ সঝা আ'ডুলে ঘি নাই উঠে ॥ ভাতকে  
টানটান, পিঠাকে ছ মণ পান ॥ সমযেব শি'গার, আকালেব ভাত ॥  
ছানায়-পনায় মাসেব পিঠা ॥ খাব ত পেট ভঁবি, শুব ত পা'ট  
ভবি ॥ ব'সলেউ ভাত, চ'বলেউ ভাত ॥ মদনমহন ঘি পায না,  
ভানুককে সাডে সাত মণ ॥ উদ খাতে খুদ নাই, শেলে বাজায়

শিংগা ॥ ছুতার বড় বন্ধু, ধান দিলেই চিড়া ॥ মাঠে গঠে নাই  
ধান, কিসের অত মুসিয়ান ॥

ঝাড়খণ্ডের জনজীবন একান্তভাবে কৃষিকর্মের ওপর নির্ভরশীল। আমরা অগ্রত্ৰ বলেছি, এখানকার লোকভাবনা সম্ভান-কামনা এবং শস্ত্র-কামনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে থাকে। তাই কৃষিকর্ম ঝাড়খণ্ডী জনতার জীবনচর্চাব অঙ্গবিশেষ বললে অতুক্তি করা হয় না। কৃষিকর্মের বহু অভিজ্ঞতা প্রবাদে বিধৃত হয়ে আছে। ব্যবহারিক জীবন থেকে আহৃত এই সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে ঝাড়খণ্ডী কৃষকদের বিশিষ্ট ভ্রাতৃছেব সন্ধান পাওয়া যায়, তবে কৃষি-সম্পর্কিত প্রবাদে সব সময় যে ব্যঙ্গ শ্লেষ বা বক্রোক্তির ব্যবহার হয়, তা নয়; কোন কোন প্রবাদে ঐতিহাস্যসাবী কৃষি-অভিজ্ঞতাগুলো সবাসরি রূপ লাভ করেছে। অস্বীকার করবাব উপায় নেই যে, প্রবাদের বিশিষ্ট ধর্ম অন্তর্মুখী-নতার পরিবর্তে এই সব প্রবাদে বাহ্যমুখীনতাই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তাই বলে এগুলো প্রবাদ নয়, এমন-কথা বলা ঠিক নয়। ব্যবহারিক জীবনের বহু অভিজ্ঞতা এই সব প্রবাদেব মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে বলে এগুলোকে প্রবাদ ছাড়া অত্র কোন নামে চিহ্নিত কবা সঙ্গত নয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ঝাড়খণ্ডে খনাব বচন বা ডাকের বচনের প্রচলন নেই। অধুনা পাঁজি-পুঁথির কল্যাণে স্বল্প-শিক্ষিত দু'চার জন গৃহস্থ কৃষকেব মুখে এ-জাতীয় বচন এক আধটা শোনা যায় মাত্র। কৃষিসম্পর্কিত কতকগুলো প্রবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করা হল। এগুলোতে জমি তৈরী, বীজ বপন, ফসলের পরিচর্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে, এমন-কি কৃষক সম্পর্কেও কিছু অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে।

৩২১ ৩৪২ খাঁকুয়াই চষি ঘর নাই পশি ॥ চাষে রূপ নাশে ॥ পেট কহ কহ  
আফাই ডাকে, শুকনা ধানে বাদল ডাকে ॥ যে আইড চষে  
সেই রইল বসি, নাঢ়াকাটা মা'রল ঠাসি ॥ নিত্ ভাঁওয়ে চাষ ॥  
চারীব চাষ, মুসলমানের পরবাস ॥ অলপ চষি, বৈশ্বর ঘ'ষি ॥  
শ সনলা হাজার কলা, কি ক'বেক আকাল শালা ॥ ভা'গমানের  
আ"খ বাঢ়ে, অভাগাব ধান বাঢ়ে ॥ যার আ"খ তার শুড়,  
কুঁডাসুবা পেঁড চুষ ॥ নাঢ়া মার খায়, শুমছা হেঁসূরে ॥ আগে  
ব'দ, পবে খ'দ ॥ ব'দ গুণে খ'দ ॥ বাইগণ বাড়ির লঙ্কাউ ঝাল ॥  
মাটি লক্ষ্মী কপাল গুণে থাকে ॥ আশায় মরে চাবা, ধিয়ানে

মরে যুগী ॥ খড় নাই, আবাদ খায় ॥ বাপের কালে নাই চাষ,  
ধানকে বলে ছুস্বা ঘাঁস ॥ অবলার সঙ্গে চাষ, অদেখার সঙ্গে  
ঘরবাস ॥ আদা বাড়িটা কাদা হবেক, বাইগন বাড়িটা ভাস্তে  
যাবেক ॥ শালের ধান গলে, বাইদের ধান গাইদ ॥ জল  
প'ডছে গাইদে, ধান লাগাব বাইদে ॥

প্রবাদের চলনভূমির সমাজ বা লোকজনের সামগ্রিক রূপ প্রবাদের মধ্য দিয়ে  
প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রবাদ যে-কোন অঞ্চলের সমাজজীবনের দর্পণবিশেষ।  
প্রবাদে লোকভাবনা অকপটে নিরাবরণ ভাষায় প্রকাশ পেয়ে থাকে। মানুষ-  
জনের রুচি, রসবোধ, নীতিবোধ এবং জ্ঞান প্রবাদে প্রতিকলিত হয়ে থাকে।  
তাই প্রবাদে কোনরকম সংস্কার বা শব্দব্যবহারে বিন্দুমাত্র দ্বিধার ভাব পরি-  
লক্ষিত হয় না। প্রবাদ-রচয়িতা অশ্লীল, গ্রাম্য বা ইতর, যে কোন শব্দই  
হোক না কেন, নির্দিষ্ট সাবলীল চঙে সে শব্দের ব্যবহার করেছে। আমরা  
অগ্রত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে, অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা নিতাস্তই  
আপেক্ষিক বস্তু; একই বস্তু বা ভাবনা এক সমাজে শ্লীল, অগ্রসমাজে অশ্লীল  
বিবেচিত হতে পারে। যে অঞ্চলের লোকসাহিত্য আলোচনা করা হবে,  
অশ্লীলতার অভিযোগ তোলার আগে সেই অঞ্চলের রুচি এবং রসবোধের  
আলোচনা এবং বিচার প্রথমে করা দরকার। ঝাড়খণ্ডের লোকমানসে  
তথাকথিত অশ্লীল এবং গ্রাম্য বস্তু বা ভাবনা পূব একটা বিকারের সৃষ্টি করে  
না। নিম্নোক্ত প্রবাদগুলোতে তথাকথিত 'অশ্লীলতা' এবং 'গ্রাম্যতা'  
নির্বিচার প্রকাশ লাভ করেছে; এ-জাতীয় কয়েকটি প্রবাদ ইতিপূর্বে অগ্র  
প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৩৪৩-৩৬১ পঁদে নাই চাম, সেনাপতি নাম ॥ দিতে ন খুতে, টঁগা ধরি  
মুতে ॥ রাগে হা'গলে নিজেকে ফে'লতে হয় ॥ হা'গায় না মানে  
বাষা ॥ লিলজের পঁদে গাছ বা'হরালে লিলজ বলে আমার  
ছাঁ'হবা হচ্ছে ॥ হা'গতে জানে নাই বন্ধুক ঘাড়ে ॥ মড়া-উ  
কি পাদে ॥ বুঢ়া পঁদেও আসন লাঠা ॥ পঁদে নাই টেনা, রাম  
সিং-এর বেনা ॥ পঁদে নাই ছালচামড়া, খাতে খুজে পাকা  
আমড়া ॥ ব'সতে দিলম পি'চা, পঁদে লা'গল' শূলা ॥ ধাইকেউ  
পঁদেদে কথ্য ॥ যার যখন চলে, মুতে বাতি জলে ॥ অভাগায়  
মাগ পালে বাসে মায়ের পারা, নিভাতারী ভাতার পালে বাসে

বাপেব পাবা ॥ লিখে দিল্যম কলাপাতে, পঁদ মাবাব পথে-  
খাটে ॥ অডতল বডতল, সেই বুচিব পঁদতল । পঁদ নেংটা,  
মাথায় ধংটা ॥ হা'গব ড নাই বাট অ ছা'ডন নাই ॥ হাগপ্তিব  
লাজ নাই ত দেগান্তিব কি লাজ ॥

কিছু কিছু প্রবাদে বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে সবস মন্তব্য শোনা যায় । এ  
গুলোর মধ্য দিয়ে বিছুটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ য প্রকাশ পায় না, তা নয়,  
তবে এগুলোর মধ্যে যে ক্রীতহানুস বী অভিজ্ঞ ও প্রকাশ পায় ন, এমন  
কথা শুদ্ধিক নয় । সত্য কথা বলতে কি এইসব সম্প্রদায়-ভিত্তিক প্রবাদে প্রায়  
প্রতিটি সম্প্রদায়েব কিছু ন কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই প্রকাশ পাবে—নিছক বিদ্বেষ  
এব উপজাব্য হয় না । চারাত্তরক চুবনগা, বচিচর আচরণ ইত্যাদির প্রতি  
বক্রোক্তি করা হয়েছে, কখনো-না-সবাসর্ব বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যক্তি করা হয়েছে ।  
সমগল বাংলা থেকে আগত ব্রাহ্মণ, শৌ, বনে আদি সম্প্রদায় সম্পর্কেও  
প্রবাদে সবস মন্তব্য করা হয়েছে —

৩৬২ ৩৭৩ কানাগক বামতন দান, বাতন বলে আন পান ॥ বামতন গেল  
ধব, লাউল তুনা ধব ॥ লগ বনা গাত, সূতা-বেগা মাগুধ ॥  
গঙ্গাব মাই খাট, ব'স্টেবে ন'হ জা'ত ॥ জা'ও গেলেহ ব'স্টম ॥  
ব'স্টম টম টম হাঁড়ব ত্তবে পৈও বাখো থুকড়া খাবাব মন ॥  
সকাল সিনান বিকাল ভাণ, বে জানাব বাত্না জা'ত ॥ জা'ও  
বাঙালি, মিঠুন তেলী ॥ মোল্লাব দোড মসজিদ তক ॥ এক  
উড়িয়ায় গা উজড, এক বুড়িয়ায় বন উজড ॥ বুগাব ঘবে ঢেঁকি,  
যুগি ম'বছে বকি ॥ শুঁড়িব সঙ্গে চলবি হাট, হাতে লিবি  
জুমটা কাঠ ॥ অতি লভে তাঁতি মবে ॥ তাঁতি-অ কি মুমিস,  
ন খই-অ জলপান ॥ তাঁতি বকা ॥

ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল কুম্বি-কামাব-কুম্বোব মুচি আদি বিভিন্ন সম্প্রদায়েব উপ-  
জাতিগত বৈশিষ্ট্য, বিচিত্র বীক্ষ-সংস্কার, আচার-আচরণও এাদে বিশিষ্ট  
স্থান লাভ কবেছে ।

৩৭৭ ৩২৬ সাঁওতালব বাগ, কাডাব বাগ ॥ মাঝি পাজিব ছা, ঝাঁপ দি'ই  
দি'ই চুনহাকে যা ॥ গোড হোড কড়া, তিন ধর্ম ছাড়া ॥ কু  
কুডমি, তিসা সাঁওতাল ॥ কল কুডমি কড়া, বেদবিধি ছাড়া ॥  
ট'ড কুডাম লেটেপেটে ॥ কুডমি আজি চিনি, খায় পানী ॥

বাঁশ বনে ডম কানা ॥ লাপিতের ঠেউ ছাপিত ॥ লাপিত  
 দে'থলেই নথ বাটে ॥ লাপিতের আশি, ধবাব বাসি ॥ ফাটে  
 ফুটে ধবাব কি ॥ নদী পাইবালে কেঁচটা বাজা ॥ মুঁচির শাঁপে  
 কি ডাংবা মবে ॥ তাঁতি কামাব মুঁচি, তিনেব কথায় মুতি ॥  
 তাঁতি কামাব কুম্হাব, এ তিন বড ছিনাব ॥ কুম্হাবেব ঠাকার  
 ঠুকুব, কামাবেব এক ধা ॥ কন কামে কামাব বাণ্ড ॥ খাড্যা  
 বাঁড্যা ॥

একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ কববাব জন্ম প্রবাদে অনেক সময় কয়েকটি সমন্বয়  
 চিত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়ে থাকে। এগুলোর মন্যে প্রবাদেব বিশেষ ধর্ম  
 বক্রোক্তবে চেয়ে সবসত্তাব প্রাপ্য দেথা যায়।

৩২৭-৫০৬ গাছেব মধ্যে তুলসী পাতেব মধ্যে পান। তিঁতিব মন্যে বাধিকা  
 পুৰুব ভগবান ॥ ধবেব শভা আঁচব পাঁচিব পেতেব শশা পান।  
 কনোব শভা শিশু ছাল্যা যেমন লৌণনচাঁদ ॥ চাবা চিনহায়  
 আক্কে তাঁতি চিনহায় পাঁহে। ভাওব-ছাড়া মাষা চিনহায়  
 পাঁচাব-পিঁচিব চাইলে ॥ মাছেব মন্যে রহ, শাগেব মধ্যে পুই,  
 ছাতুব মধ্যে উর ॥ জাছেব মজা ছিঁড়া কাঁপা বোদেব মজা  
 ছাতা। বুঢ়ালে পিঁচিব মজা মাষা পানকাটা ॥ মুঁচিব  
 মজা লুনলফা ভাওব মজা ডাল। গৌণন পিঁচিতেব মজা  
 আঁপি ঠাবাঠা'ন ॥ হাঁডিকে বেডি ছাঁডিকে শাডি, ছাঁডাকে সাজে  
 নিশি দাটি ॥ জনহাঁব পডায় দাতেব বড খুশি, মাছপডায়  
 খাণ্ডায় দুটি গৌশি। চাঁল ভাজা পাতে মজা দে'থতে মজা  
 মুডি। এক ছাণ্যাব মা ক'বতে মজা দে'থতে মজা ছাঁডি ॥  
 ছাগলবাগাল কানকেট্‌বা ভেডাবাগাল গাণা। ম'ব বাগাণা হিটিং  
 টিডিং গকবাগাল বাজা ॥

কখনো কখনো প্রবাদে কোন কোন স্থানেব বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে কটাক্ষ কবা  
 হয়। সব সময়ই যে এগুলো অভিজ্ঞতা প্রসূত হয়ে থাকে, তা নয়, ববং  
 কোঁতুকবস স্থষ্টিই যেন এগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে ব্যঙ্গ-বক্রোক্তিব বাঁজ  
 যে একেবাবেই থাকে না, তা'ও নয়।

৪০৭ ৪১২ ভিতর ভংভং দুয়ারে কুলুপ, তবে জানবি শিলাদা মুলুক ॥ মুখে  
 পান মাষায় চাদি, তবে জানবি মাটিয়াবাঁধি ॥ থাকে ঠেকা



মাথায় বাটি, তবে জানবি পাথরাঘাট ॥ পাইটা ডাগব মুখে  
দড, তবে জানবি নরসিংগড ॥ মুখে পান হাতে চুন, তবে  
জানবি মানভূম ॥ কুঠ আব কাইলৈরিয়া, এই নিয়ে পুরুলিয়া ॥  
রচনামূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাদ লোকসাহিত্যের অন্তর্গত শাখা থেকে  
নিঃসন্দেহে সংক্ষিপ্ততম। স্মৃতিতে সংবক্ষণের জগৎ এবং প্রয়োজনমতো  
প্রয়োগের জগৎ প্রবাদের সংক্ষিপ্ত হওয়াটা একান্তই আবশ্যিক।

৪১৩-৪৬০. করু নাই গম্‌হা, আ'জ পুরিমা ॥ যার হাত, তার পাত ॥ সব  
কথা ধুর, ফকিরার মা ঘুর ॥ যাহা বাহার, তাহা তিপার ॥  
চোবের রাগে ভূঁয়ে ভাত ॥ যাকে কবি হীন, সেই রাখে দিন ॥  
মবদ বড যধা ॥ মনে নাঠ পাপ, কিসেব সস্তাপ ॥ ফুলা মরে  
জাড়ে ॥ শগডেব পাটি তল উপর ॥ দশ লাগে, ত ভূত  
ভাগে ॥ নিত্‌ রুগীকে অমুদ কত ॥ একা নদী বোল কশ ॥  
সোলুকে মুলুক মারে ॥ রকা কাম, চখা দাম ॥  
চোরকে-উ শিঁকা বাঁছক ॥ ভূতের-অ জনম দিন ॥ দুশমনকে-উ  
উঁচু পিঁচা ॥ দেশ গুণে ভেঁশ ॥ ছিঁড়ে ফাটে মিঞা জানে ॥  
শালুক-চিন্‌হা গপাল দাস ॥ ভাঙা জুঁয়া'ল গরাম থান ॥ যত  
জাঁক, তত ফাঁক ॥ হববর তিন তের ॥ অন্য কথা ভেডের  
ভেডের ॥ লুডি বুডি খুডি, খুডি বুডি লুডি ॥ আকালের মেঘ  
সকালে ॥ ইঁচলি দিয়ে' শোল বাঝা ॥ উথ'লে খুট খুট,  
তেলাই-এ খুত খুত ॥ ক'রতে লাবি কিছু, থাকি সবার পিছু ॥  
কান টা'নলেই মুড আসে ॥ কানার লে জিরপা ভাল ॥  
গাছের ছাহা, মানুষের রাহা ॥ ধুবকে শল-অ ভারী ॥ ধুরের  
মরণ পাশ ॥ পরকে অঝা, ঘরকে বঝা ॥ পাগের উপর  
কলগা ॥ যত ফুডরে, তত ধড়রে ॥ বতর পাইরালে বছব  
পাইরায় ॥ বাঁশ মরে ফুলো, মানুষ মরে বুলা'য় ॥ বে'ট হালকে  
কাঠের ফাল ॥ লহায় লহা কাটে, জা'তে জা'ত কাটে ॥  
হরে দরে একেই হাঁটু ॥ হাথের আলিসে মচ বাঁকা ॥ মারের  
লে থাকান বেশি ॥ বিটির নাম চাঁপা ॥ গাঁ সম্পকে মুচি  
কাকা ॥ না'চতে জানে না মাদল্যার দধ ॥

প্রবাদের মধ্যে মিল অল্পপ্রাস যেমন দেখা যায়, তেমনি গল্প-পত্নের ব্যবহারও

সবিশেষ লক্ষ্যগোচর হয়। প্রায়-গত প্রবাদের প্রথম শব্দের সঙ্গে শেষ শব্দের মিল আমাদের এর ছন্দোবদ্ধতাব ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। ছন্দোবদ্ধ প্রবাদের মিত্রাক্ষর রচনার সৌষ্টব্যও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৪৬১-৪৭৮ গজখপ খালভরা, কামের বেলায় আঁচল-ধরা ॥ হাতের লাঠি, পথের সাথী ॥ আঁগা গুণে পাঁগা, লহা গুণে টাঁগা ॥ নিজের নাই খাতে, খাঁদার মা সাথে ॥ হাজারে গুজার নাই ॥ পরের দেখি করি হায়, যেউ থাকে সেউ যায় ॥ সঙ্ দবে, লহা ভাঁসে ॥ যদি চলে মনহারী, কি করে জমিদারি ॥ আঁধার ঘরে দিনের আল, যৎক্ষণ জলে তৎক্ষণ ভাল ॥ সাঁজে সএ৩ ন্যা সকালে ছড়া, তবে হবেক লক্ষীর গড়া ॥ দোস্তী ক'রতে ক'রতে কুস্তি ॥ রঙ ক'রতে তঙ ॥ কাটে-কুটে কাটিয়ার, লু'টো খায় বাহুয়ার ॥ মার মার, ন পগার পার ॥ বাইদ চাষা বকরাসা ॥ মাগনার উপর চাখনা ॥ নাই কাম, ত ধান ভান ॥ আঁটকুডার ধন কাট কুড়ে ॥

প্রবাদে সব সময় সমিল ছন্দের ব্যবহার হয় না। ছন্দ কিংবা মিলহীন প্রবাদের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। তা ছাড়া নিরক্ষর জনতা প্রায় সময়ই ছন্দোবদ্ধ প্রবাদের প্রয়োগ করতে গিয়ে গড়ে রূপান্তরিত করে ফেলে। প্রবাদ গড়ে রচিত হলেও প্রবাদের বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে ॥

৪৭৯-৫১৮ ন মন লহা তা'তবেক, ন রাধা না'চবেক ॥ ঘর ভা'ঙলে সুই, সিঁদ দিলে ভং ॥ রাগের গুরুগু'সাই নাই ॥ পাথরে পাঁচ কিল, কি ভাতে সাত কিল ॥ গাঁ যাওয়া, গাছ চটা ॥ পেটের বলে বল, ন বাঁহির বলে বল ॥ লোম ব'াছতে কয়ল ফাঁক ॥ বাইগন বস্তায় স'রষা ধ'রবেকেই ॥ আঁকাডা চা'লের মধ্যে দকান ॥ জল ঠেঁগালেউ কি ধুরে যার ॥ যার না'পতে নাই, তার পাইটা ডাগর ॥ চালের কুমড়া-উ চালকে ভারী ? ॥ উয়ার এক হাত সনা এক হাত রুপা; উয়ার সঙ্গে কি ? ॥ ভাব জিনিষটা বেশি দিন থাকে নাই ॥ গড়া কাটি উগায় জল ॥ গলা ক'রতে ডেঁহগা রাস্তা ॥ এক গাঁয়ে কি দুদিন আমাবস্তা ॥ কি ডুবেই কি শালুক ॥ নাখে কাজ ন বাসাতে কাজ ॥ কানার ঠেঁঙ ঢড়ায় পড়ে ॥ হাল

ছাড়ি বেলার বাট ॥ এক হাতে মাদল বাজে না ॥ আচারে  
লক্ষী বিচারে পণ্ডিত ॥ গরজ বড় মরদ ॥ চাকরি নকরী জলের  
তিলক ॥ খীর পানী পাথর কাটে । দিন যায় কথা থাকে ॥  
দিন গেলে ঋণ কে খায় ॥ না রহে বাঁশ না বাজে বাঁশরি ॥  
পারি নারি মুহে কেনে হারি ॥ যা'চতে গেলে মাণিক হীন ॥  
পচা আদার ঝাল বেশি ॥ সমের ধন শয়তানে খায় ॥  
গায়ের বাসে ভূত পালায় ॥ গাছে ঘুধি হিড ফাট ॥ গাঁ বড়,  
তার উপব কুল্হি ॥ কুচ্যা খুজে আইডতল ॥ ছাপর বনের  
টুই উদাম । জলের সময় জল স্ন্যাদ ॥ খই খাতে ভগা  
ল'ডছে ॥

কিছু কিছু প্রবাদ মাত্র দু'টি শব্দের সংযোজনের ফলে রচিত হয়ে থাকে ।  
এই জাতীয় প্রবাদই সম্ভবতঃ সংক্ষিপ্ততম হয়ে থাকে । দু'টি বিপরীত মেরুর  
শব্দের মধ্যে বক্রোক্তির সাহায্যে ভাবসামঞ্জস্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয় । শ্লেষের  
তীব্রতাও সহজেই আভাসিত হয়ে ওঠে ।

৫১২-৫২৮ চাবা আর ভুঁষা ॥ মড়া আর মাড়া ॥ মাটি আর মা-টি ॥  
ছানা আর পনা ॥ বকা আর পকা ॥ ছাকড় আর মাকড় ॥  
হাতি আর লুথি ॥ একা আর বকা ॥ কথা আর কাঁথা ॥ চাঁদে  
আর মেনী বাঁদরের পঁদে ॥

বলাবাহুল্য, এগুলোর সাহায্যে সব সময় সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না । এর  
ফলে এগুলোকে প্রবাদ হিসাবে গ্রহণ করা কতোখানি যুক্তিযুক্ত, তা বিতর্কিত  
ব্যাপার । তবে এগুলোও অনেকাংশে অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানেরই প্রকাশ  
মাত্র ; এগুলোও শ্লেষ এবং বক্রোক্তির ব্যবহারে রীতিমতো শাণিত ।  
তাছাড়া সাধারণ মানুষ এগুলোকে প্রবাদ হিসাবেই ব্যবহার করে থাকে বলে  
আমরাও প্রবাদ হিসাবে সংকলিত করেছি । ইংরাজিতে Proverbial Phrase  
নামে চিহ্নিত খণ্ডপ্রবাদগুলোকে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত প্রবাদমূলক বাক্যাংশ  
বলে অভিহিত করেছেন । এই জাতীয় খণ্ড প্রবাদগুলো যেমন সাধারণতঃ  
বাক্যাংশ হয়ে থাকে, তেমনি খণ্ডিত ভাব এবং অর্থও প্রকাশ করে থাকে ।  
তবে রচনারীতির দিক দিয়ে এগুলো প্রবাদেব সমগোত্রীয় হয় । এই  
ধরনের খণ্ড প্রবাদ ঝাড়খণ্ডে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রচলিত আছে ।

৫২৯-৫৬৫ উবগারীকে বাটে মারা ॥ আউখের গুড় পুইয়ে মারা ॥ ভাত

ঘরে সুই বিকা ॥ বাঁশ গাড়ি কবা ॥ শাঁশা ঘুমান ॥ ভামী  
ধবা ॥ কাল্‌হা জিয়া হওয়া ॥ চুল্‌হায় বসাঁই উল্‌হান ॥  
চ'থের কাজল চুরি করা ॥ পালখীর দামে কল্যা বিকান ॥  
উড়ে আশ্বে ছিঁড়ো পড়া ॥ হাঁ কাঁটলে ফফশ গুণা ॥ ম'রতে  
ব'লে লুমে থাক ॥ লদী না দেখেই নেংটা হওয়া ॥  
ব'গাব মাকে ট'গা দেখান ॥ হল্য বৃষ্টির রথ দেখা ॥  
ঘবের খাঁই শিখান ॥ চথো স'রষা ফুল থানান ॥ গরবে পবব  
দেখা ॥ ডবে পি'পড়া গাঢ়া খুজা ॥ তেলায় চেলা ভাঁগা ॥ তেলুয়া  
মাথায় তেল লেসা ॥ না-পাবাকে ঠে'লোঁ ভাগান ॥ পেটে খাঁয়ে  
পিঠে লাদা ॥ সুঁচা মু বুচা হওয়া ॥ আঢ়া কাম বাঢ়া করা ॥  
ঘরের লাজকে বা'হবের লাজ করা ॥ লাপ'্যাই পাখ্যা বনান ॥  
পশ্চিম দিগে বেলা উঠা ॥ হাত আহড়ে সূ'ঢ়াকা ॥ বাঁ হাতে  
ডান হাতে পয়সা খরচ করা ॥ সাপের মুখের লে বাঘের মুখে ॥  
সাঁওতাল পাড়ায় লং বিকা ॥ মাঝি পাড়ায় লবঙ বিকা ॥ মাছের  
তেলে মাছ ভাজা ॥ ভর তাকে মাদ'ল ভাঙা ॥ এক গাঢ়ার  
লে বা'হর'াই আর এক গাঢ়ায় সামান ॥

**Idiom** বা বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছও অনেক সময় প্রবাদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বলাবাহুল্য, এগুলোর মধ্যেও প্রবাদেদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না।

৫৬৬-৫৮২ জলে আঙুনে ॥ ঝোলেঝালে অঞ্চলে ॥ তেলে হুনে ছং ছাং ॥  
ধনু'মার ॥ কুল্‌ছাড ॥ পিতম ভাঁড়া ॥ কাঁধে কুকুরে শিকার ॥  
এক গহা'লের গরু ॥ মজল্যা বাসাত ॥ গোল আলুর জা'ত ॥  
লা'পত্যা পু'জি ॥ ভাদর গহলী ॥ গুড়তুড় ॥ পাত ঠে'কায় সাপ ॥  
তু'ই চুস মু'ই চুস ॥ সতীন বাইদ ॥ ডাল-ভাঙা কশ ॥ নওয়া  
নওয়া নলিতা ॥ আশার সংসাব ॥

কোন কোন প্রবাদ বা খণ্ডপ্রবাদেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কাহিনী এখনো শুনতে পাওয়া যায়। যেমন ওপরের 'কুল্‌ছা ডা' এবং 'পিতম ভাঁড়া' খণ্ড প্রবাদ দু'টি। ধলভূমের মাটিয়াবাঁধি গ্রামে জর্নৈক কলু এবং পিতম মাহাত নামে দু'বন্ধু ছিল। কলুকে কেউ কিছু দিলে সে না নেবার ভা'নু'করে আরো বেশি আদায় করবার 'চাড' (<চাল) দেখাত। অল্প দিকে পিতম লোককে ঠকিয়ে জিনিষপত্র হস্তগত করত। এই থেকে অই খণ্ড প্রবাদ দু'টির সৃষ্টি। 'গুড়তুড়'

খণ্ড প্রবাদটি বাংলার লোককথার 'জিসমিস' বস্তুর সমার্থক এবং সমান্তবাল ঝাডখণ্ডী লোককথা থেকে উদ্ভূত। 'খাবার বল্যে আনলি যাকে, সেই খাল্য আমার তিন ছাকে' (৫২০) প্রবাদটিও কাহিনীমূলক। এক চিল পাখি খাবার ভেবে একটি বিডালকে তার বাসায় নিয়ে এসেছিল। শেষ তক বিডাল চিলের খাবার না হয়ে উল্টে সে চিলের তিনটি শাবককে খেয়ে পালিয়ে যায়। চিলের আক্ষেপোক্তি থেকে এই প্রবাদের সৃষ্টি। 'পারি কি লারি, তু'ষকুড কি পা'শকুড', 'ম'রল গংগা কালগুয়ারী', 'কি ডুবাই কি শালুক উঠে', 'ওত'তা ভালী, ঘরে ঘরেই' (৫২১-৫২৪) আদি প্রবাদও কাহিনীমূলক। আমরা আগেই বলেছি, প্রবাদ প্রধানত: কাহিনীমূলক; প্রবাদের উৎপত্তির মূল কাহিনীটি প্রায় ক্ষেত্রেই লুপ্ত হলেও প্রবাদটি সমাজমানসে স্থায়ী আসন অধিকার করে টিকে আছে। 'বাম ডাঙুয়া ফতে সিঙা' এবং 'যত হাঁসি তত কারা, বল্যে গেছে রাম সন্নী (৫২৪-২৬) প্রবাদ দুটিও যে কিংবদন্তীমূলক তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কোথায় ছিল বামডাঙা কিংবা কে ছিল ফতে সিং বা 'বাম সন্নী' (শর্মা?) আজ আব খুঁজে বাব করা সম্ভব নয়।

সবশেষে আমাদের সংগৃহীত ঝাডখণ্ডের বিভিন্ন স্বাদেব আরো কিছু প্রবাদ উদ্ধৃত করে এই আলোচনার সমাপ্তি টানা হচ্ছে।

৫২৭-৭০২ রাম না জন্মিতেই রামায়ণ ॥ মন ঠাণ্ডা ত কাঠায় গণ্ডা ॥ গলার মধ্যে মালা, কুটুমের মধ্যে শালা ॥ যে যত পায়, সে তত চায় ॥ কবে পা'কবেক তাল, তৎকে অনেক কাল ॥ তর হাড়ে কাজ কি মাসে কাজ ॥ মনের সুখে গেলি হাট, হাট দেখি হিয়া ফাট ॥ বুঢ়া মারি থুনের দায় ॥ মা'রব ব'ললে ডর থাকে, দিব ব'ললে আশ থাকে ॥ জামিন হয় দিতে, গাছে উঠে ম'রতে ॥ বা'হরে ঢাকা ভিতরে গোল ॥ বা'হরে ঢাকটোল, ভিতরে গঙগোল ॥ ছিঁড়ে ফাটে মিঞা জানে। উপর কঠা খথর বাঁশ, ধার উধার বার মাস ॥ পাত্র দেখ্যে বি, পাত দেখ্যে ঘি, যার গহনা তাকে সাজে, অস্থ লকে ঠরকা বাজে ॥ বেহা গেলে ছামড়ায় লাপি ॥ যন ডালে করি ভর, সেই ডালেই মড় মড় ॥ নআ নআ নলিতা, পুন্না হলে বিষপিত্তা ॥ সবেই ভাল সবেই মন্দ, পিয়াজ রগুন একেই গন্ধ ॥ ঘ'ড়ের ফাঁস ঘাড়ে ॥ পথে পালি কামার, ফাল পাজাঁই দে আমার ॥ সব বুদ্ধি লটর পটর, এক

বুদ্ধি চিৎপটম ॥ আঙুরা ধুলে কালি যায় না ॥ আঁটকুড়ার আঠ'র  
 মন, বাঁঝির সোল মন ॥ মন সাচাত কাঠুরায় গজা ॥ ডালুয়া উঁহুরের  
 নেজেই চিন্হায় ॥ কাঁহা খুজ চেঁড়, ঘরে হাঁ চেঁড় ॥ চেঁকার ডরে  
 পালাই ন তেঁত'ল তলে বাঁসা ॥ যদি দেখ চালের টুই, তবু বাঁধ  
 গণ্ডা দুই ॥ রীতা মা'তলে গীতা, মন হরষের কথা ॥ দৌড় ধাপে  
 বার, ঘরে বসি তের ॥ ছুনিয়া ডু'বলে এক হাঁটু জল ॥ ভর  
 বতরে মাদ'ল ছেঁদা ॥ এক কাম দুই আড়'তি ॥ বাধা চাল দুইই  
 মার ॥ শ কথায় সতী ভুলে, এক কথায় মাগী ভুলে ॥ প'রতে  
 হবেক শাঁকা, ত মুখটা কেনে বাঁকা ॥ কুখাউ কিছু নাই, খুছা  
 ভগ'তা কাম'াইছে ॥ যেমন কাম তেমন ফল, মশা মা'রতে গালে  
 চড ॥ ব'সতে দিলম কস্থল, ফিঁচা কুট কুট করে ॥ কার ঘরে  
 ডিঁগা ডিঁগা, কার ঘরে ডাল মুরগা ॥ বে'ল খাইতে তিতা,  
 পরের পুরুষ মিঠা ॥ চোর পালালে বুদ্ধি বাঢ়ে ॥ শুনা কানা ভুনা,  
 পথ পায় না তিনজনা ॥ নাচ আর মাছ, সব সময় লাগে না ॥  
 ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, জল ঠেঁগালেউ কি ধুরে যায় ॥ ইঞ্জিতে পণ্ডিত  
 বুঝে মুখা বুঝে কিলে, সাঁইপডশী বুঝে তখন চখে আঙুল  
 দিলে ॥ একটা হস্তকী সারা গাঁয়ের আন্দাশী ॥ বুদ্ধি থা'কলে বাপ  
 ঘরে ছা হয় ॥ যে যত দেড় ফুট্যা মাহুষ, সে তত বদমাইস ॥  
 বসি বসি খালে লদীর বালি-এউ কুল্যায় নাই ॥ চল ব'ললেই  
 কাঁধে ঝুলি ॥ এমন জায়গায় বসবি যেমন কেউ না বলে উঠ,  
 এমন কথা বলবি যেমন কেউ বলে না ঝুঠ ॥ দে'থলেই চোর,  
 না'হলে গগাঁই মর ॥ কি ক'রবেক বেতনে, মারি দিব থেঁটনে ॥  
 একেই অলের বিঁঝা, কার লাগে খসরমসর কার লাগে তিতা ॥ পূর্বে  
 যার পরে তার, যুগে যুগে অবতার ॥ যেইসাকে তেইসা, খইসাকে  
 দাইদা ॥ অল-অলক্ষের বারি, জল খায়ে খায়ে মরি ॥ অশ্রু যুগের  
 ঘুঘি আড়া পেছু দিগে শিয়াড়া ॥ আঝ ক'রতেমাঝ ঘর, মাঝ ঘর  
 ক'রতে ভিতর ঘর ॥ আঁতের বল নাই, গভরিরেই তেজ ॥ আন  
 শু'নতে আন, নেজে ধর্যে টান ॥ কথা যাবি, ন. ঘরেই আছিন ॥  
 গাছ চড়ার লে পেছু ঠেলা লকেই বেশি ॥ গা'হতে গা'হতে  
 গলা ব'হতে ব'হতে নালা ॥ গুণ থা'কলে কাঁদি, চুল থাকলে

বাধি ॥ চ'ললে চল্লিশ বুদ্ধি, না চ'ললে হতবুদ্ধি ॥ চইখ-অ  
 নাই, আর চ'খশুল-অ নাই ॥ চিন না চিন, লৌতন দেখেই  
 কিন ॥ ছট দেখে আঢ়ায়, বড় দেখে ঢাড়ায় ॥ জাইত-অ  
 গেল, পেট-অ নাই ভ'রল ॥ জীউ যায় নাই ছটকটারি সার ॥  
 দহরা কাপড়ের তেহরা জাড, নিকাপড়কে পাথর আড় ॥  
 দিয়াকেই দিয়া, অদিয়াকে আশুড দিয়া ॥ মিত সিনানের গায়ে  
 মইল, গা বাসাছে চেকা খইল ॥ নপে ছি'ডবেকটার তরে বঠিনের  
 খজ ॥ ব'লতে সে বনে নাই, না ব'ললে চলে নাই ॥ বুঢ়া লক  
 আর লদী ধারের গাছ ॥ ভকালে আনলা-উ রুচায়, বুমালে  
 খাচুরা খাইটেউ মিদায় ॥ ভাই হল্য সনা ম'রল, দুটা কাঁথা  
 হামারেই হল্য ॥ মরালে অ-মব মরে ॥ মনের দুখে অরুণে  
 বাস ॥ মা'নলে শিব না মা'নলে পাথর ॥ যত লকের তত  
 কপা, সইতে লারি যাব কথা ॥ যাব যাব ঠেঁগের ধূলা নিয়েই  
 যাব ॥ যার যক্ষ নাই, তার মহক্ষ নাই ॥ যে পাইরাবেক  
 মাঘ মাস, সে দে'খবেক বার মাস ॥ যাহার যখন মাথা ফাটে,  
 সেই তখন চুন খুঁজ্যে বলে ॥ লিলজ নাচে ভেঠর দেখে ॥ সাপ-  
 অ না মরে, ডাঁগ-অ না ভাঙ্গে ॥ হাঁসো হাঁসো কথা বলে, মুনশা  
 বলে পিয়াদাই লহে ॥ হাঁ'সতে হাঁ'সতে মা'রব ঠনা, বা'জবেক  
 যেন ঝনঝনা ॥ খাবার বেলা লুবুর সুবুর, কাজের বেলা পেংঘা ॥  
 নামেই তালপুকুর, ষটি-অ ডুবে নাই ॥ চিরকাল গেল কুচা  
 কুচাই আ'জ বলে হাটবার কবে ॥ রূপের গরব ছুদিন বই  
 ত লয় ॥ অলগলতা ডগে বাঢ়ে গড়ায় জানে না ॥ বাপের নাম  
 শাগপাত, ছাল্যার নাম মিঠাই দাস ॥ চা'র আনার থুকড়ী,  
 দশ আনা পদগন্ডমী ॥ কমরে যদি আছে বল, মুঢ়া কদা'ল ধর ॥  
 যার পেটে ঘা সে বলে বা'চব, যার টাঁকে ঘা সে বলে ম'রব ॥  
 ছেল্যা খেলাই গেল দিন, আ'জ বলে ডাহিন ॥ ছিল ঢেঁকি হল্য  
 তুল, কা'টেতে কা'টেতে নিরমুল ॥

## চতুর্থ অধ্যায়

### রূপকথা

রূপকথা যে অত্যন্ত সুপ্রাচীন সৃষ্টি তাতে কোন সন্দেহ নেই। রূপকথা লোকসাহিত্যের অগ্ন্যন্ত শাখাব মতো যুগে যুগে মৌখিক ধারায় প্রচারিত হয়েছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজের মূল কাঠামোর অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। As popular legends and tales they claim of course the highest possible antiquity, being older than the *Jatakas*, older than the *Mahabharata*, older than the history itself. From age to age, and from generation to generation, they have been faithfully handed down by people rude and unlearned, who have preserved them through all the vicissitudes of devastating wars, changes of rule and faith, and centuries of oppression. They are essentially the tales of the people.<sup>১</sup>

এখানে ‘রূপকথা’ শব্দটি সব ধরনের কথা বা কাহিনীর পরিচয়-জ্ঞাপক শব্দ হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। For lack of more adequate English term, ‘fairy tale’ is frequently extended to describe other types of nursery tales that have nothing to do with fairies or supernatural beings<sup>২</sup>. আমরা ‘রূপকথা’ শব্দটি ইংরাজি fairy tale এব প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছি। সাধারণভাবে কথা বা কাহিনীর মধ্যে রূপকথা, ব্রতকথা, পূবাকথা এবং ইতিকথাও পড়ে। এখানে শুধুমাত্র রূপকথা নিয়েই আলোচনা করা হবে। বর্তমানে ‘লোককথা’ শব্দটি অত্যন্ত প্রচলিত। লোককথাকে রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথা এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। রূপকথা এবং ব্রতকথার মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা অত্যন্ত কঠিন। ব্রতকথা সম্পর্কে আমরা অল্পত আলোচনা করছি। উপকথা মূলতঃ পশুপক্ষী-সম্পর্কিত কাহিনী, আয়তনে সংক্ষিপ্ত, বাস্তবজীবন

১ Charles Swynnerton : *Romantic Tales from the Punjab*, London 1908

২ The Companion Guide to World Literature. Mentor Book, New York



ও পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত; এ-কাহিনী আসলে পশুপক্ষীর রূপকে মানুষেরই কাহিনী। ঈশপের উপকথা কিংবা উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই'-এর কাহিনীগুলোকে উপকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু যে সব কাহিনীতে পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের 'চরিত্রও থাকে,, সেগুলোকে কি নামে অভিহিত করা যায়? কিংবা যে সব কাহিনীতে পশুপক্ষীর প্রাধান্য থাকলেও কেন্দ্রীয় চরিত্রটি মানুষ এবং তারই প্রয়োজনে সমস্ত কাহিনীটি আবর্তিত হয় তাকেই বা কি নামে অভিহিত করা যায়? আমাদের মনে হয় এই ধরনের কাহিনীকে-ও রূপকথার অন্তর্গত করা উচিত।

ডঃ স্কুমার সেন কথা, রূপকথা এবং ব্রতকথার উৎস নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন, "...'কথা' সর্বনামজাত অব্যয়। অর্থ 'কেমন করে'। গল্প শুনতে শুনতে এখনকার শ্রোতার। যেমন কোঁতুহল-প্রেরিত হয়ে বলে 'তারপর, তারপর'। দু'হাজার আড়াই হাজার বছর আগেকার শ্রোতার। সেই ভাবাবেশে উদ্ভিক্ত হয়ে বলত 'কথা, কথা'। তার থেকে শব্দটি চলিত হয়ে গেল গল্প অর্থে, পদোন্নতিও হল অব্যয় থেকে বিশেষ্যে এবং স্ত্রীলিঙ্গে। তারপরে গল্প বলা অর্থে এর থেকে নামধাতুর সৃষ্টি হল 'কথায়তি'। ক্রিয়াটি অনতিকাল পরে অর্থ সম্প্রসার করে 'ক্র' ধাতুর সমাধক হয়ে পড়ে।...

বাঙলায় লৌকিক কাহিনী অর্থাৎ folk-tale বা fairy tale অর্থে একদা অপূর্বকথা শব্দটি চলিত ছিল। কালক্রমে লোকমুখে অপূর্বকথা পরিবর্তিত হল অপূর্ব কথায়। তারপর অপরূপ কথায় অবশেষে 'অপ'-বাদ ত্যাগ করে দাঁড়াল রূপকথায়। অঞ্চল বিশেষের কথ্য ভাষায় এবং সর্বত্র শিশু রসনায় আদি র-কারের প্রতি বিমুখতার ফলে শব্দটি দাঁড়িয়েছে উপকথায়।<sup>১৩</sup>

ডঃ সেনের মন্তব্যকে ব্যাখ্যা করলে এটা সুস্পষ্ট হয় যে তিনি folk-tale এবং fairy-tale এর মধ্যে যেমন সীমারেখা টানেন নি, তেমনি রূপকথা এবং উপকথাকেও এক এবং অভিন্ন বলেছেন। আমরাও তাঁর মত সমর্থন করি। কারণ উপকথা শব্দটি উচ্চারণ করলে কোনক্রমেই পশুপক্ষীর কথা আমাদের মনে আসে না। শব্দটির মধ্যে যে কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাব এবং অবজ্ঞা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপকথা' প্রবন্ধটি<sup>৪</sup> স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, 'উপকথা নামটির

পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ডাব আত্মগোপন করিয়া আছে বলিয়া অনুভব করা যায়—নকলের প্রতি আসলের, মেকির প্রতি খাঁটির, নীচের প্রতি উচ্চের যে অবজ্ঞা সেই ডাব। ...পক্ষান্তরে রূপকথা নামটির চারিধারে একটি রহস্য-ঘন মাধুর্য, একটি ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন করিয়া আছে। নামটি আমাদের হৃদয়ের গোপন কক্ষে গিয়া আঘাত করে ও সেখানকার সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলির মধ্যে একটি সাড়া জাগাইয়া দেয়। সমালোচক বোধ হয় উপকথা নামটিই পছন্দ করিবেন; কিন্তু রসপিপাসু পাঠক যে রূপকথা নামটির পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিষ্কার বোঝা যায়, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপকথা শব্দটির পরিবর্তে রূপকথা শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি 'folk-tale' এবং 'fairy tale' এর মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন। তাঁর মতে, 'কোন কোন লোক-কথা অতিরিক্ত রোমান্সধর্মী, কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে ইহারা স্বাধীন বিহার করিয়া থাকে, ইংরাজিতে ইহাদিগকে 'fairy tale' ও বাংলায় রূপকথা বলা হয়'।<sup>৫</sup> উপকথা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'কতকগুলি কাহিনী একমাত্র পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়া থাকে, কোন কোন কাহিনীতে নরনারী ও পশুপক্ষী উভয়েই সমান অংশ গ্রহণ করে। ইহাদিগকে ইংরাজিতে 'Animal Tale' বলে'।<sup>৬</sup> সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তিনি লোককথাকে রূপকথা এবং উপকথা এই দুটি বিভাগে ভাগ করবার পক্ষপাতী; ব্রতকথা লোককথার লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় তাকে তিনি এর মধ্যে তৃতীয় স্থানভুক্ত করেছেন। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথার মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভবপর নয়। রূপকথা অনেক সময় ব্রতকথায় পরিণত হয়ে থাকে। সব শ্রেণীর কথার মধ্যে রোমান্স আছে, কল্পনাবও বিস্তার আছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে গল্প বা কাহিনী রচনা সম্ভব বলে মনে হয় না। শিশুদের সংসারানভিজ্ঞ মনে বাধাবন্ধহীন কল্পনার রাজ্য এবং বাস্তব পৃথিবীতে খুব একটা পার্থক্য থাকে না। রূপকথা এবং উপকথার কাহিনী তাদের কল্পনায় সমানভাবে বিদ্বিত হয়ে থাকে।

রূপকথার বিরুদ্ধে অলীকতা ও অবাস্তবতা সম্পর্কে এঁই যে অভিযোগ

সে-সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাস্তব জগতে যে শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি রূপকথার রাজ্যেও সেই মানবমনের আদিম-সনাতন নীতিরই আধিপত্য। সেই পরিপূর্ণ সূত্বের সন্ধান, সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেই আশাতীত শক্তিসম্পদ লাভ, পাপপুণ্যের জয়পরাজয়—পৃথিবীর সমস্ত পুৰাতন জিনিষই এই নূতন রাজ্যের অধিবাসী। পৃথিবীর চিরপরিচিত মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত হইয়া, রূপকথার রাজ্যের আলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়।' তাই বাস্তব-অবাস্তবের একটা অলীক সীমারেখা টেনে রূপকথা এবং উপকথার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্ত নয় বলেই মনে হয়।

আমরা 'রূপকথা' শব্দটিই ব্যবহারের পক্ষপাতী, যদিও আমাদের আলোচ্য অঞ্চল ঝাডখণ্ডে রূপকথা শব্দটি একেবারে অজ্ঞাত। ঝাডখণ্ডে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা আদি সব ধরনের কথার জন্ম একটাই সাধাবণ নাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে—'কহনী', কোথাও বলা হয় 'রা'ত কহনী'। নিবন্ধের শীর্ষক, 'কহনী' রাখাই যুক্তিযুক্ত ছিল, কিন্তু আমরা রূপকথা এবং 'কহনী'র মধ্যে পার্থক্য দেখি না বলে 'রূপকথা'ই বাখা হল।

রূপকথাব সঙ্গে সবাসরি বাস্তবজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। তবে এর মধ্যে অনেক সময়ই রূপক এবং সংকেতেব সাহায্যে মানব-চরিত্র এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। অলৌকিক ঘটনাবলীর মধ্যেও লৌকিক জীবনের অনেক ঘটনার ইঙ্গিত থাকে। বাস্তবজীবনের আদিম-সনাতন কামনা-বাসনাগুলো, বিচিত্র অভিজ্ঞতারূপি কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে রূপকথায় আত্ম-প্রকাশ করে থাকে। অনেক সময় ইতিহাস কিংবা ইতিহাসাশ্রিত গল্পকথা বিকৃত রূপে বা পরিবর্তিত অলৌকিকতার ছদ্মবেশে রূপকথার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব, অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিক ঘটনাবলীর মেলবন্ধনে রূপকথা তার আশ্চর্য শরীর লাভ করেছে। রূপকথায় চমকের পর চমক রয়েছে; শিশুরা অবাকবিস্ময়ে জলজল চোখে রূপকথা উপভোগ করে এবং কল্পনার পাখায় ভর করে রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্রদের সাথে এ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ে। এই চমক তথা বিস্ময় রয়েছে বলেই রূপকথায় সব সময় একটা 'তারপর' জেগে থাকে, যতোক্ষণ না কথকের মুখে 'আমার কহনী ফুরালা' শোনা যায়।

রূপকথার চরিত্রগুলো কোথাও তাদের ব্যক্তিকতা কিংবা স্থানিকতা পায় নি এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নামাঙ্কিত করা হয় নি ; শুধু বলা হয়ে থাকে, অনেক অনেক দিন আগে কোন এক দেশে একজন রাজা কি একজন রানী কি একজন রাজপুত্র কি একজন রাজকন্যা কিংবা একজন গরীব অথবা কুঁড়ে লোক ছিল। দেশ-কাল-পাত্র কোনটিকেই নামাঙ্কিত করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

‘এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালীবাহন ; কাশী, কাঞ্চী, কনোজ, কোশল, অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাহার রাজত্ব এ সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতাস্তই তুচ্ছ ছিল, আসল যে কথাটি গুলিলে অস্তুর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুতবেগে চুষকের মতো আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা...।’

আসলে রূপকথা মানুষেরই গল্প কিন্তু এর মধ্যে কখনো বিমূর্ত কখনো অমূর্ত অতিপ্রাকৃত আত্মা কিংবা জাদুকরী চরিত্রের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। রূপকথার গল্পশরীরের অন্তরালে এইগুলোই আত্মার মতো বিবাজ করে চমক এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। নাই-দেশের এই চরিত্রগুলো তাই রূপকথাকে সদাসর্বদা রসসিক্ত এবং সঞ্জীবিত করে রাখে।

লোকসাহিত্যের অগ্ৰাণু শাখার মতো রূপকথাও অতি সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রচার লাভ করে থাকে। রূপকথার মধ্যে এমন একটি অমর জীবনীশক্তি আছে যা দেশান্তরিত বা ভাষান্তরিত হলেও বিনষ্ট হয় না। তাই বলা যেতে পারে, লোকসাহিত্যের মধ্যে রূপকথা সর্বাধিক প্রাণবান শাখা। রূপকথা নাই-দেশের কথা। নির্বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের কাহিনীই রূপকথার কাহিনী। তাই যে কোন রূপকথাই সর্বদেশীয়, সর্বকালীন এবং সর্বজনীন হয়ে থাকে।

রূপকথায় কোন রকম জটিলতার স্থান নেই। গঠনভঙ্গি অত্যন্ত সহজ, সরল ; কখনভঙ্গিও এক অননুকবণীয় সারল্যমণ্ডিত। বিভিন্ন পরিবেশ এবং প্রতিবেশ রচনায় কাহিনীতে পুনরাবৃত্তি অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। রূপকথাকে

হৃদয়গ্রাহী এবং আকর্ষণীয় করে তোলাবার জ্ঞান মধ্যে মধ্যে ছুঁড়াব প্রয়োগ এর অগ্ন্যন্তম বৈশিষ্ট্য। এই ছুঁড়ানুলো সাধাবণতঃ করুণ সুরে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে; ঝাডথণ্ডে রূপকথার মধ্যবস্তী এই সব ছুঁড়াকে ‘রদন’ (রোদন) বলা হয়ে থাকে।

রূপকথার বিষয়বস্তু অসংখ্য। পশ্চিমবঙ্গ এ-পর্ষন্ত পাঁচ শতাধিক সুস্পষ্ট মৌলিক বিষয়বস্তুর (motif) সন্ধান পেয়েছেন। লোকবৃত্তের বিষয়বস্তু এবং সাধারণ প্রবাদ-প্রবচন আদিও ওপব ভিত্তি কবে এমন সব বিষয় বিকশিত হয়ে উঠেছে, যাদের মধ্য থেকে নিষ্ঠুর বাজা, নিষ্ঠুর বিমাতা, হিংস্রটে ভগ্নী, উৎপীড়িত স্ত্রী, ঈর্ষালু সপত্নী আদি অনড় চিবস্তন চবিত্ত্রেব সন্ধান পাই। এই বিষয়বস্তুগুলোকে আরো সুন্দর ভাবে গড়ে ওঠাবাৰ জ্ঞান সুরোগ এবং সাহায্য দিয়েছে অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিক ঘটনাবলী। জাহুদগু, জাহু অজুবী, অলৌকিক কায়াবদল এবং পুনর্বাৰ রূপপরিগ্রহ, অপ্ৰাকৃত বিবাহ এবং জন্ম-বৃত্তান্ত রূপকথাকে আমাদের চিবকালীন কল্পনাব জগতেব দলিল হিসাবে রূপায়িত কবেছে। কিন্তু তাই বলে কাহিনীতে কিংবা গল্পবসে খাপছাড়া ভাব আসে না, ববং আবো নিবিড হযে ওঠে। এ-সম্পর্কে জনৈক পশ্চিম ব্যক্তি বলেছেন—Despite the setting in a never-never land where any sort of supernatural event may occur, the story has an inner consistency, and once the strange element in the situation is accepted, the other aspects of the tale have reality. The fairy tale always has a happy ending : virtue is rewarded.<sup>১</sup> রূপকথা যদিও নীতিকথা প্রচারের উদ্দেশ্যে বচিত হয় না তথাপি, এর মধ্যে আমাদের বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ধর্মান্দর্ষ আদি বোধেব প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই পড়ে থাকে। বাস্তব জীবনে আমবা অগ্নায় এবং অধর্মেব পাষণ্ড লীলা দেখে থাকি, বাস্তব জগতে সম্ভব না হলেও কল্পনার জগতে আমরা পাপ এবং অধর্মেকে দণ্ডিত দেখতে উৎসুক। তাই রূপকথায় সব সময়ই পাপ এবং অধর্ম শাস্তিলাভ করে থাকে। রূপকথার অগ্ন্যন্তম বৈশিষ্ট্য হল কাহিনীতে অনিবার্ঘতঃ একটা মধুর পবিণতি থাকে। নায়ক-নায়কাব মৃত্যুতে কাহিনী সাধাবণতঃ শেষ হয় না। যে কোন অলৌকিক উপায়ে তারা পুনর্জীবন লাভ কবে থাকে। যে-কাহিনী

নায়ক-নায়িকার মৃত্যুতে শেষ হয়ে থাকে, তা নিঃসন্দেহে বিকৃত, অধঃপতিত রূপ অথবা কথকের স্মৃতি-ভ্রংশেব পরিণতি। আদিম মানব কোনদিনই মৃত্যুকে স্বীকাব করতে রাজী হয় নি। তাই তারা পুনর্জীবন, কায়াপরিবর্তন এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাস করত। মৃত্যুঞ্জয়ী মানবের একটি সুন্দর রূপকথা পুরাণে একটি বিখ্যাত উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে, সেটি হল নচিকেতার উপাখ্যান।

লোককথার ওপর অধ্যয়নের জন্ম অধ্যাপক ষ্টীপ্ টম্‌সন একটি আন্তর্জাতিক নিয়মেব প্রবর্তন করেন। এই নীতি Index of Tale Types নামে পরিচিত। তিনি লোককথাগুলোকে টাইপ-অনুসারে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করেন : প্রথমতঃ পশুপাখিব কাহিনী ( Animal Tales ), দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোককথা এবং তৃতীয়তঃ হাস্যবসাত্মক এবং টুকবো কাহিনীমূলক ঘটনা। একে Type Index-ও বলা হয়ে থাকে। টম্‌সন সাহেব প্রতিটি টাইপকে এক একটি সংখ্যাব সাহায্যে নির্দিষ্ট কবে দেন। বলাবাহুল্য এর সাহায্যে-ও প্রতিটি রূপকথাব সূত্র অধ্যয়ন সম্ভব হয় না। কেননা একই রূপকথাব মধ্যে একাধিক টাইপ বা আদর্শ থাকে, যাব ফলে কোন রূপকথাই স্বাধীন এবং অল্প আদর্শনিরপেক্ষ হতে পারে না।

অধ্যাপক টম্‌সন এরপব কাহিনীগুলোকে motif বা অভিপ্রায় অনুসারে পুনর্বিভাগ করেন। এই পুনর্বিভাগটিই motif index নামে পরিচিত। তিনি A থেকে Z পর্যন্ত বিভিন্ন অভিপ্রায় অনুযায়ী ভাগ করেন যার মধ্যে পশুপক্ষী ( animals ), নিষেধাজ্ঞা ( taboo ), ইন্দ্রজাল ( magic ), বিস্ময় ( marvels ), রাক্ষস ( ogres ), পবীক্ষা ( tests ), পণ্ডিত ও মূর্খ ( the wise and the foolish ), প্রতারণা ( deception ), ভাগ্য বিপর্যয় ( reversal of fortune ), সুযোগ ও ভাগ্য ( chance and fate ), পুরস্কার ও শাস্তি ( rewards and punishments ), পাশবিক নিষ্ঠুরতা ( unnatural cruelty ), অস্বাভাবিক বিবাহ ( unusual marriage ) আদি অভিপ্রায়-গুলো অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি লোককথার আলোচনা সর্বত্র টম্‌সন সাহেবের এই অভিপ্রায়-সূচী অনুসারেই করা হয়ে থাকে। অবশ্য এই রীতি অনুসারেও রূপকথাব সূত্র অধ্যয়ন সব সময় সম্ভব হয় না। কেননা একটি মাত্র অভিপ্রায়-মূলক রূপকথা প্রায় সর্বত্রই বিরল। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কোন রূপকথার একাধিক অভিপ্রায়ের সমাবেশ ঘটলেও একটি কেন্দ্রীয় অভিপ্রায়ও থাকে। বহু পরিবর্তনের মধ্যেও এই কেন্দ্রীয় বা মূল অভিপ্রায়টি

সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে। তবে রূপকথার বিচার শুধুমাত্র অভিপ্রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি রূপকথার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে, সেটির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শুধুমাত্র অভিপ্রায় অনুযায়ী রূপকথার বিশ্লেষণ করা হলে তাতে পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা থাকে, রস-বিচার অনেকাংশেই অবহেলিত হয়ে পড়ে। তাই লোককথার আলোচনায় অভিপ্রায় এবং রস-বিচারের সমান ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়।

রূপকথা-সমৃদ্ধ যে কোন দেশ বা অঞ্চলের মতোই ঝাড়খণ্ডও রূপকথার ঐশ্বর্যে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ। অজস্র রূপকথা ঝাড়খণ্ডের গ্রামে-গ্রামে লোকমুখে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাচীন-প্রাচীনাঙ্গের মৃত্যুর ফলে রূপকথা শোনার কিংবা শোনবার আগ্রহে যেন কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়ে গেছে। তাছাড়া শিক্ষা ও শিল্প প্রসারের ফলেও জনজীবনের অকৃত্রিম প্রাণচাঞ্চল্য যেমন লুপ্ত হয়ে আসছে, তেমনি লোকসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণও স্তিমিত হয়ে আসছে। তবু এখনো ঝাড়খণ্ডের গ্রামে-গ্রামে দিনেব কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলায় রূপকথার আসর বসে। কথকের চারপাশ ঘরে বাচ্চাদের এখনো ভিড় জমে। গরু-ছাগল চরাবার সময় দিনের বেলাতেও গরু-ছাগল বাগালেরা গোচারণ মাঠে মহা-ছায়ায় বসে 'কহনী' বলে থাকে। দু'রেব হাতে বা মেলায় যাবার সময় পথের ভ্রম ভোলার জন্তু পথচারীরা রূপকথা বলে থাকে। রান্নার দেবী থাকলে মা-মাসিরা শিশুদের সন্ধ্যাবেলায় জাগিয়ে রাখবার জন্তু রান্নার ফাঁকে-ফাঁকে 'কহনী' শোনায়, তেমনি অবুঝ শিশুদের ঘুম পাড়াবার জন্তু-ও 'কহনী' শোনাতে হয়। বিয়ে-বাড়ির আনন্দ-উৎসবের অন্ততম অনুষ্ঠান যে 'কহনী' শোনানো এবং শোনা, তা আগেই বলা হয়েছে। আসলে ঝাড়খণ্ডের রূপকথার প্রাণপ্রবাহ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখনো গতিশীল।

ঝাড়খণ্ডের রূপকথা সংগৃহীত হয়েছে অত্যন্ত কম। শত শত রূপকথা ক্রমশঃ 'অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এখন পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকটি রূপকথা মুদ্রিত করে রসিকজনের নিকট উপস্থিত করা হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য-র 'বাংলার লোকসাহিত্য', ৪র্থ খণ্ডে, বর্তমান গবেষকের প্রবন্ধ 'খলভূমের রূপকথা' (মধ্যাহ্ন ১৩৩৪) তে, এবং অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পশ্চিম সীমান্ত-বঙ্গের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে কয়েকটি মাত্র রূপকথা সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের ভাষা কিংবা গল্প বলার ভঙ্গি কোনটাতেই রক্ষিত হয় নি। কৃত্রিমতা কিছুটা এসেছে অস্বীকার করবার উপায় নেই, তবে আঞ্চলিক উপভাষার

কাহিনী অহুসরণ করে রস-গ্রহণ কবার দুস্তর বাধা যে তার ফলে অতিক্রম করা গেছে, তা'ও অনস্বীকার্য। বর্তমান নিবন্ধে-ও আঞ্চলিক উপভাষা রক্ষা করা হয় নি। রূপকথাগুলোর মূল কথাবস্তুই এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সীমান্ত বাঙলার লোককথা আলোচনা-প্রসঙ্গে ডঃ সূধীরকুমার করণ বলেছেন, সীমান্ত বাঙলার লোককথারও একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তা কল্পনার রঙে রঞ্জিত রূপকথা নয়—আদিম বিশ্বাসনির্ভর উপকথা। তিনি বলেছেন, 'এই সব অঞ্চলের লোককথারও নিজস্ব একটি রূপ আছে, এসব কাহিনীতে কল্পনার রং চড়ানো হয়নি। আদিম বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই লোকজীবনের বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মাত্র। এগুলিকে কাহিনী না বলে আদিম পূজাপদ্ধতির ভাষামন্ত্র নামে অভিহিত করলেও দোষেব হবে না। দৈত্য-রাক্ষস-পরী-হরীর রূপকথাব কোন রূপই এর মধ্যে নেই। এ ক্ষেত্রে কথা-নায়ক হচ্ছে অপদেবতা অথবা ডাইনী, গুণী অথবা ভূত, আব তারই সঙ্গে একান্তভাবে সম্পর্কবান আদিম মানুষেব সমাজ।'<sup>৮</sup> আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ডঃ করণ পশ্চিম সীমান্ত বাঙলা বা ঝাড়খণ্ডে রূপকথার অস্তিত্বের কথা একেবারে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি কবম ব্রতকথার নজির টেনেছেন। কিন্তু ব্রতকথা যে রূপকথাই অধঃপতিত রূপ তা তো স্বীকৃত সত্য। এই কাহিনীর মধ্যে ব্রতকথা এবং পুরাকথার উপস্থিতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ডাইনী-সম্পর্কিত কাহিনী কিংবা রাখাল-রন্ধিনী কাহিনী লোককথা নয়, ওগুলিকে পুরাকথা বা myth বলা-ই বাঞ্ছনীয়। ডঃ করণের গ্রন্থ রচনাকালে ঝাড়খণ্ডেব কোন রূপকথা সংকলিত হয়নি বলে এবং তাঁর নিজের সংগ্রহেও সম্ভবতঃ কোন রূপকথা ছিল না বলেই তিনি এষ্ট মন্তব্য কবেছিলেন। কেননা আমাদের সংগৃহীত রূপকথা আলোচনা কালে আমরা দেখাব, কাহিনীর মধ্যে হুবী-পরী না থাক, রাজপুত্র-রাজকন্যা আছে, রাক্ষস আছে, এবং রূপকথার রূপও আছে। ঝাড়খণ্ডে আদিম সমাজব্যবস্থাব অবশেষ এখনো আছে, তাই বলে এখানকার জনজীবনে রাজা-মন্ত্রী অপরিচিত চরিত্র ছিল এমন কথা ভাববার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলে মনে হয় না। আদিম সমাজব্যবস্থাতেও গোপী-নায়ক বা দল নায়ক ছিল। রাজার পরিবর্তে লোককথায় হয়তো একদা এই



মলনায়কই ছিল। রূপান্তর এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে কোন জাতিই বিকাশ লাভ করে থাকে। স্বভাবতঃই তাদের ভাষা-সংস্কৃতিতে যেমন রূপান্তর এবং পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি তাদের লোককথাতেও রূপান্তর এবং পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তা রোমান্সধর্মী রূপকথাতে উন্নীত হয়েছে। তাই ঝাড়খণ্ডে রূপকথা নেই, একথা যুক্তিযুক্ত নয়।

ডঃ করণের অন্ততম অভিযোগ হল এখানকার লোককথা কল্পনার রঙে রঞ্জিত রোমান্স নয়। কল্পনার ব্যাপ্তি উন্নত মানসিকতার পরিচয়, তাই ঝাড়খণ্ডের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কল্পনার ব্যাপ্তি থাকা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু কল্পনার ব্যাপ্তি না থাকলে কোন কাহিনীই রচনা করা সম্ভব নয়। ব্রতকথাই হোক আর পুরাকথাই হোক, রূপকথাই হোক আর উপকথা, সর্বত্রই কল্পনা সর্গোরবে স্থান পেয়ে থাকে। তাই ঝাড়খণ্ডের লোককথা রূপকথাব মধ্যেও এই কল্পনার ব্যাপ্তি সহজেই নজবে পড়ে।

প্রথমেই কলাবতীর গল্প নিয়ে আলোচনা করা যাক। এখানে একটি কথা বলে বাধা ভালো, এই নিবন্ধে আলোচিতব্য সমস্ত লোককথা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেষণ করা হবে; যেখানে অপ্রয়োজনীয় মনে হবে, ছুড়া বা 'রদন'গুলোও বাদ দেওয়া হবে।

১ এক যে ছিল বাজা। তার সাত ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়েব নাম কলাবতী। রাজপুত্রেরা রাজ গভীর অরণ্যে শিকার করতে যেত। একদিন ছোট রাজপুত্র একটি আশ্চর্য আশ্রফল নিয়ে আসে, এবং প্রতিজ্ঞা করে যে সে কাউকে এই ফলটি খেতে দেবে না। যে খাবে তাকেই বিয়ে করবে সে। ঘটনাক্রমে কলাবতী সে ফলটি খেয়ে ফেলে। যখন কলাবতী ভাই-এর প্রতিজ্ঞার কথা শুনল তখন সে আত্মহত্যার জ্ঞান কাছের নদীতে গেল। তাকে ফিরিয়ে আনবার জ্ঞান প্রথমে রাজা নদীঘাটে গেল এবং রাজকন্যাকে ঘরে ফেরার জ্ঞান ডাক দিয়ে বলল,

কলাবতী, কলাবতী, ঘর কেনে নাই আস,

শুখনা ভাত খাড়ারখুড়ুর বেগুন পড়া বাস।

নদীতে একগলা জলে দাঁড়িয়ে কলাবতী বলল,

যা"ক যা"ক সোব যা"ক হোক হোক বাসি

বাপ হয়ে শশুর হবে ই জীবন কি রাখি।

কলাবতী ঘরে ফিরল না। একে একে রানী এবং বড়ো রাজপুত্রেরা এল।

সবাই একই ভাবে কলাবতীকে ডাকল। কলাবতী সবাইকে তাদের সঙ্গে ভাবী সম্পর্কেব কথা তুলে ফিবিয়ৈ দিল। সবশেষে এল ছোট রাজপুত্র। সেও কলাবতীকে ঘরে ফেরাব জন্তু ডাক দিল,

কলাবতী, কলাবতী, ঘবে কেনে নাই আস  
শুখনা ভাত পাডারখুড়ুব বেগুন পড়া বাসি।

ততোক্ষণে কলাবতী নদীর জলে ডুবুড়ুব। কোনমতে মুখ তুলে বলল,

যা"ক যা"ক সোব যা"ক হোক হোক বাসি  
ভাই হয়ে ভাতার হবে ই জীবন কি রাখি।

কলাবতী উঠল না, নদীর জলে ডুব দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাবপর তারা দুজনে ভাসতে ভাসতে অণু এক রাজহুে গিয়ে পৌঁছল এবং সেখানে ঘর বেঁধে সুখে সংসাৰ করতে লাগল।

রূপকথাটি ঝাডগণ্ডেব ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক প্রাচীনত্বেৰ কথা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করেছে। কলাবতীর গল্পে আদিম সমাজেব ভ্রাতাভগ্নীতে বিবাহবন্ধনেব কথা বাক্ত হয়েছে। ভাবতবর্ষেব প্রাচীনতম ভৃগুণ্ডেৰ অংশ-বিশেষ এই ঝাডগণ্ড। ভ্রাতাভগ্নীতে বিবাহেৰ সর্বশেষ সংবাদ আমরা প্রাচীন মিশরে পেয়েছি; তাও পাঁচ হাজার বছরেৰ কম নয়। এই রূপকথাটির মধ্যে যে-অভিপ্রায়টি প্রধান, তা হল incest motif বা অগম্যাগমন অভিপ্রায়। ভ্রাতাভগ্নীর বিবাহ সব সমাজেই নিষিদ্ধ (taboo), অথচ এই রূপকথাটিতে তাই ঘটেছে। এ-বিবাহ স্বাভাবিক নয় বলে একে টমসন সাহেবেৰ অন্বাভাবিক বিবাহ (unnatural marriage—T110) অভিপ্রায়েৰ অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আত্রফলটিকে আশ্চর্য ফল বলা হয়েছে, তাই এখানে ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বস্তুর (magic object—D 800) অন্তর্গত ঐন্দ্রজালিক ফল অভিপ্রায়েৰ সংকেত আছে। এই ফলটি যে খাবে রাজপুত্রেৰ প্রতিজ্ঞা অহুসারে সেই তার বধু হবে। দৈবক্রমেই হোক বা যাই হোক, কলাবতী ফলটি খাওয়ার ফলে ভ্রাতার সঙ্গেই তার বিবাহ হয়েছে; সামাজিক বিধিনিষেধ (taboo) ফলটির ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার জন্তু এখানে অবহেলিত হয়েছে। লক্ষণীয়, বাধানিষেধ উপেক্ষা করা সত্ত্বেও রাজপুত্র-রাজকন্যা কোন শাস্তি লাভ করেনি, শুধু তাদের পরিচিত দেশ-ঘর-সমাজ আত্মীয়স্বজন সব কিছু পরিত্যাগ করে দেশান্তরী বা স্বেচ্ছানির্বাসিত হতে হয়েছে।

২ এক রাজার সাত ছেলে এবং এক মেয়ে। রাজারানী ঙ্দের রেখে

যারা যান। রাজকুন্ডার নাম মাধুরী। বড়ো ছ'জন রাজকুমারের বিয়ে হয়েছিল। ছোট রাজকুমার এবং রাজকুন্ডা মাধুরীর বিয়ে হয়নি। রাজকুমারেরা শিকার বড়ো ভালোবাসত। ওরা মাধুরীকে তার বৌদিদের কাছে রেখে শিকারে যেত এবং পশুপক্ষী মেরে নিয়ে আসত। একদিন মাধুরী বৌদিদের রান্নাবান্নার সাহায্যের জন্ত সজনে শাক কুটছিল। হঠাৎ তার হাত কেটে গিয়ে সমস্ত শাকে রক্ত লেগে যায়। খাবার সময় রাজকুমারেরা সজনে শাক ভাজার বেশ তারিফ করল। বৌয়েরা জানাল শাক কুটে গিয়ে মাধুরীর হাত কেটে রক্ত লেগে যায়, আর তাই শাক ভাজা অত বেশি মিষ্টি লাগছিল। বড়ো ছ'জন রাজকুমার মনে মনে ভাবল, যার কয়েক বিন্দু রক্ত অত সুস্বাদু তার মাংস না জানি কতো সুস্বাদু! তারা মাধুরীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। ছোট রাজকুমার কিন্তু সেই রক্তমাখা শাক ভাজা খায় নি। শিকার থেকে ফেরার পরই মাধুরী তাকে সব কথা বলেছিল। সে কিংবা মাধুরী প্রথমে ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতে পারে নি। তারপরে মাচা বেঁধে ছ'ভাই যেদিন মাধুরীকে জানাল, সেদিন ওকে নিয়ে ওরা শিকার-শিকার খেলবে, তখন দু'টি ভাইবোন সব বুঝল। চোখের জলে একে অন্নের কাছে বিদায় নিল। বোন বলল, 'দাদা, তুমি আমার মাংস খেও না। তুমি মাছ আর কাঁকড়া ধরে এনো। ওরা যখন মাংস খাবে তুমি খাবে মাছ, আর ওরা যখন হাড় চিবাবে তুমি চিবাবে কাঁকড়া। তারপর আমার উজ্জিষ্ট মাংস আর হাড় তুলে নিয়ে একটি উইটিবির ফোকরে ফেলে দিচ্ছি মাটি চাপা দিয়ে।' কাঁদতে কাঁদতে মাধুরী মাচায় গিয়ে দাঁড়াল। বড়ো রাজকুমারেরা কিছুতেই তাকে তীরবিদ্ধ করতে পারল না। তখন ছোট রাজকুমারকে তীর ছুঁড়তে বলল, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হল না। বড়ো রাজকুমারেরা তখন তাকেই হত্যা করার ভয় দেখাল। তখন মাধুরী কাঁদতে কাঁদতে ছোট রাজকুমারকে বলল, 'দাদা' বোনের মাংস খাবার জন্ত দাদার কাছে যেনে বোনকে মারতে চায়, সেখানে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। তুমি তীর ছোঁড়'। তখন ছোট রাজকুমার অনিচ্ছায় অস্ত্রমুখে তীর ছুঁড়ল, কিন্তু সেই তীরেই মাধুরীর মৃত্যু হল। বড়োরা যখন মাধুরীকে কাটতে কুটেতে ব্যস্ত, তখন ছোট ভাই মাছ আব কাঁকড়া ধরবার জন্ত বেরিয়ে গেল। খাবার সময় সে মাধুরীর কথামতো পর্যায়ক্রমে মাছ আর কাঁকড়া চিবোল। শেষে পরিত্যক্ত মাংস আর হাড়গুলো নিয়ে গিয়ে একটি উইটিবির ফোকরে

মাটি চাপা দিল। কিছুকাল পরে ওখানে একটি সুন্দর বাঁশ গাছ গজিয়ে উঠল। এক ডোম বাঁশটি কেটে বাঁশি বানালা। তারপর সেই বাঁশি বাজিয়ে ভিক্ষে করতে বেরল। বড়ো ছ'জন রাজকুমারের দোরে বাঁশি না বাজাবার জন্য বাঁশিটি ডোমকে মিনতি করল—

ইয়াব ঘবে বাজা'স না রে ডমু ভাই

ই ত বঠে ছুসমণ ভাই।

ছোট ভাই-এর দোবে বাজাবার জন্য বাঁশি ডোমকে বলল—

ইয়ার ঘরে বাজাবি রে ডমু ভাই

ই ত বঠে সহদর ভাই।

বাঁশিব স্ববে ছোট রাজকুমার মাধুরী কঠিন চিনতে পাবল। সে ডোমকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাঁশিটি হস্তগত করল। বাঁশিটি সযত্নে ঘরে তুলে রেখে সে রোজ গরুর পাল নিয়ে মাঠে যেত। কিরে এসে দেখত কে যেন তার ঘরদোর নিকিয়ে বেখেছে। রান্নাবান্নার কাজও শেষ। দিনকতক সে এই ঘটনা লক্ষ্য করল। কিন্তু রহস্যভেদ করতে পারল না। তখন একদিন বাড়ির এক কোণে লুকিয়ে থাকল। মাধুরী বাঁশি থেকে বেরিয়ে ঘর দোর নিকোচ্ছে এমন সময় ছোট রাজকুমার আড়াল থেকে বেরিয়ে তার চুলের গোছা ধরে মুখ বুঝিয়ে দেখল যে সে মাধুরী। তখন সে বাঁশিটি পুড়িয়ে দিল। অমনি মাধুরীর গা জ্বালা শুরু হল। তখন রাজকুমার তার গায়ে আমলা-মেথি-চুয়া-চন্দন লাগিয়ে দিল। দেখতে দেখতে মাধুরীর গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে গেল। তারপর দুই ভাইবোনে সুখেদুখে মিলেমিশে বাস করতে লাগল।

এই রূপকথাটি ঝাড়খণ্ডের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক প্রাচীনত্বের কণাঠি ব্যক্ত করে। কাহিনীটিতে প্রথমেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে ক্যানিবালিজম বা নরমাংসলোলুপতার অভিপ্রায় (G 10)। পৃথিবীর সর্বদেশেই নরমাংসাহার অভিপ্রায়ের রূপকথার চল আছে। আদিম জাতিদের মধ্যে একদা নরমাংসাহার প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ শত্রুর বা অগ্র গোলীর লোকের মাংস তারা ভক্ষণ করত; তারা বিশ্বাস করত, তার ফলে মৃত ব্যক্তির ক্ষমতা বা গুণ তারা অর্জন করতে পারবে। কিন্তু এখানে নিছক নরমাংসাহারের প্রবৃত্তিই প্রবল এবং যার মাংস ভাঙ্গা খেল সে তাদের সহোদর। এই রূপকথাটি সারা ঝাড়খণ্ড জুড়ে সামান্য হেরকের ছাড়া প্রায় একই আকারে দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বে ঝাড়গ্রাম-বাকুড়া অঞ্চল পশ্চিমে

মধ্যপ্রদেশ উক্তবে সাঁওতাল পবগণা এবং দক্ষিণে ময়ূবভঞ্জ—এই চতুঃসীমাব মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী প্রাচীন আদিবাসী-অর্ধআদিবাসী সমাজে এই কাহিনীটি প্রচলিত আছে।

এই কাহিনীর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায়, অগ্নায়ভাবে নিহত ব্যক্তির সমাধির ওপর বাঁশগাছের জন্ম ( Reincarnation in plant—tree—growing on grave—E 6 31 )। এ ছাড়া বাকশক্তিসম্পন্ন বাঁশি অভিপ্রায়টিও দৃষ্টি আকর্ষণ কবে ( F 810 ? )। এখানে Transmigration of soul বেশ সুপ্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। অনার্যসংস্কৃতির আত্মা আশ্রয়পবিবর্তনমূলক মীথ্-এব ইঙ্গিত এখানে আছে। Sir E.B. Tylor তাঁর Religion in Primitive Culture, II. গ্রন্থে বলেছেন, The temporary migration of souls into material substances, from human bodies down to morsels of wood and stone, is a most important part of the lower psychology. আলোচ্য রূপকথাটিতে husk-mythও প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বাঁশিটি মাধুবী husk হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিগ্রহীতাব সাময়িক অন্তপস্থিতিতে কেউ যদি এই আবরণটি নষ্ট কবে কিংবা পুড়িয়ে ফেলে তবে সে তাব কায়াপবিবর্তনের ক্ষমতা হাবিয়ে ফেলে। মাধুবী বাঁশগাছে কায়াপবিবর্তনকে Transformation বা রূপান্তর অভিপ্রায় হিসাবে গ্রহণ কবা যায়। W.R S. Ralston এই Husk-myth কে an expansion of a Hindu myth<sup>৯</sup> হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এই আবরণটি পুড়িয়ে দেবাব পর গাত্রদাহ শুরু হলে বিভিন্ন দেশেব রূপকথায় প্রলেপ হিসাবে বিভিন্ন জিনিষের ব্যবহার লক্ষ্য কবা যায়। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের রূপকথায় আমলা-মেথি-চুয়া-চন্দনের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলোও অনার্যসংস্কৃতির চিহ্নাবশেষ।

রূপকথাগুলো আদিম অনার্যগোষ্ঠীর লোকেদেব সৃষ্ট, একথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এখানে যেসব বাজা-বাজপুত্রদের কথা বলা হয়েছে তারা আসলে আদিবাসী সমাজের দলনায়ক এবং তাদের পুত্রবর্গ ছাড়া কেউ নয়। কাহিনীগুলোতে বাজপুত্র-বাজকন্যাদের অন্তপ্রবেশ পরবর্তীকালে ঘটে থাকার অসম্ভব নয়। প্রায় গল্পেই শিকারের কণা আছে; স্ভাবতঃই রূপকথাগুলোতে

আদিম মানবের শিকারবৃত্তির যুগের কথাই বলা হয়েছে, ধরা যেতে পারে। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, কপকথার বিশিষ্ট ধর্ম অল্পসাবে প্রায় কাহিনীতেই সাতজন বাজপুত্র এবং একজন রাজকন্যার কথা বলা হয়েছে। এই কপকথাগুলোর কোনটিই আদিম পূজাপদ্ধতির ভাষামন্ত্র নয় কিংবা কথানায়ক-নায়িকাগণ অপদেবতা অথবা ডাইনী গুণী অথবা ভূত নয়।

মানুষের জীবন তুচ্ছ হিংসা-লোভ পবিত্রীকাতবতা আদিম ভয়াবহতায় ভবা। সপত্নীহিংসা, সপত্নী-পুত্রকন্যাদেব প্রতি ঘৃণা কিংবা নন্দভাজের বিষাক্ত সম্পর্ক এখনো ঝাউখণ্ডের দৈনন্দিন জীবনে পরিলক্ষিত হয়। ঝাউখণ্ডের কপকথাও তাই এই সব অভিপ্ৰায়েব সমাহারে এক অনবদ্য সম্পূর্ণতা লাভ কবেছে। সপত্নী-হিংসা এবং তাব ফলশ্রুতি যে কি মাঝামাঝি হতে পারে তাব পবিচয় আমবা নিচের কপকথাটি থেকে সহজেই অনুভব কবতে পাবি।

৩ এক বাজাব সাত বানী। বাজাব ছেলেপিলে নেই। এক সাধু তাঁর দুঃখ শুনে বললেন, ‘যাও, অই যে আম গাছ দেখছ, ওখান থেকে আম পাডবে। ডান হাত দিয়ে টিল ছুঁড়ে, বাম হাত দিয়ে শূণ্ডে সাতটি আম লুফে নিয়ে বানীদের দিয়ে। বানীবা যেন স্নান করে শুদ্ধ পবিত্র মনে জনে-জনে একটি কবে আম খায়, তাহলেই সন্তান হবে।’ বাজা সাধুব কথামতো আম পেড়ে বাজমহলে ফিবে পাটরানীব হাতে সব ক’টি আম দিয়ে সাধুব কথা বললেন। ছোট বানী তখন আডালে, বাগ্নাঘবে। ওর কপর্যোবনের জন্ম বডো বানীবা সবাই তাকে হিংসা কবত। তাই বডো বানীবা ওকে ফাঁকি দিয়ে সাতটা আম নিজেরাই ভাগাভাগি কবে খেয়ে ফেলল। ছোটবানী এসে ওবা কি খেল জিজ্ঞেস কবতেই ওবা জলে উঠে দাঁত খিচিয়ে উঠল। তখন ছোট রানী ফেলে-দেওয়া আঁটি সাতটি খেয়ে শিলনোড়া ধুয়ে জলটাও পেয়ে ফেলল। যথাসময়ে ছোট বানীর গড প্রকাশ পেল, কিন্তু বডো বানীদের কোন গর্ভলক্ষণ দেখা গেল না। রাজা ছোট বানীর ওপব সঙ্কষ্ট হলেন। সপত্নীবা হিংসায় জলতে লাগল। প্রসবেব দিন কতক আগে রাজা বিশেষ কাজে বাজ্যভ্রমণে বেরুলেন। দু’টি সোনার ঘণ্টা রূপোব ঘণ্টা দিয়ে বললেন, ‘যদি ছেলে হয় সোনার ঘণ্টা বাজাবে, আব যদি মেয়ে হয় তে রূপোব ঘণ্টা। ঘণ্টাব শব্দ পেলেই আমি যেখানে থাকি না কেন সেখান থেকে চলে আসব। অকারণে কিছু ঘণ্টা বাজিয়ে না।’ যথাবালে ছোট রানী সাত ছেলে আব এক

মেয়ের জন্ম দিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বড়ো রানীরা বাচ্চাগুলোকে তক্ষুনি গোবরগাছায় সরিয়ে রেখে পোড়া কাঠ ঠুটকো ঝাঁটা এনে ছোট রানীর বিছানায় রেখে দিল। তারপর রূপোর ঘণ্টাটি বাজিয়ে দিল। রাজা এলে রাজাকে দেখাল ছোটরানী এই সব পোড়া কাঠ ঠুটকো ঝাঁটা প্রসব করেছে। রাজা রেগেমেগে ছোটরানীকে সেই মুহূর্তে ঘোড়াশালে নির্বাসন দিলেন। তারপর ক্ষুধাচিত্তে আবার রাজ্যভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন। একটু রাত্তির হলে বড়ো রানীরা বাচ্চাগুলোকে কুমোরের গর্তে ফেলে দিয়ে এল; ভাবল, শেয়াল-কুকুরে খেয়ে ফেলবে। এদিকে সকালবেলা নিঃসন্তান কুমোরদম্পতি ওদের পেয়ে হাতে স্বর্গ পেল। আদরের-ষত্রে বাচ্চাগুলো বেড়ে উঠতে লাগল। একদিন কাঠের ঘোড়া আর মাটির পুতুল নিয়ে সাত ভাই এক বোন রাজার পুকুরে গেল। ওরা বলতে লাগল, 'কাঠের ঘড়া মাটির পুতুল, পানী পিঅ।' স্নান করতে-করতে রানীরা অবাক হয়ে ঘটনাটা দেখল। রানীরা ওদের চিনতেও পারল, দুর্ভাবনা বাড়ল। তাই বাচ্চাগুলোকে ডেকে আদর করে বিষ-মেশানো মিষ্টান্ন খাইয়ে মেরে ফেলল আর একটা গর্তে ফেলে দিল। ওখানে একটি সুন্দর গাছ হল। তাতে নানান রঙের আটটি ফুল ফুটল। গন্ধে চারপাশ ভরে উঠল। চাকরের মুখে খবর পেয়ে রাজা এলেন ফুল পাড়বার জন্য। পারুল ছিল প্রায় নাগালের মধ্যে। রাজাকে দেখে পারুল অল্প ফুলদের ডেকে বলল—

রাজা মশাই ফুল খু'জছে দিব কি নাই

ভাইরে, দিব কি নাই।

অল্প সাতটি ফুল তখন বলল—

দিঅ না দিঅ না ফুল পারুল বহিন সগ্গে ফেঁক ডাল

এত এত ছালা থা'কতে মায়ের ঘড়াশাল।

ফুলেরা সব হাতের নাগালের ওপরে উঠে গেল। এবার রানীরা এল, কিন্তু কেউই ফুলের নাগাল পেল না। হাত বাড়ালেই ফুলগুলো ওপরে উঠতে উঠতে আসমানে নাচতে শুরু করে। তখন ফুলেরা রাজাকে বলল, 'ছোট রানীকে ঘোড়াশাল থেকে নিয়ে এলে তবেই ফুল পাবে'। ছোট রানীকে তক্ষুনি নিয়ে আসা হল। ওকে দেখে সব ক'টি ফুল রূপরূপ করে তার কোলে ঝরে পড়ল। আশ্চর্য, রাজা দেখল, ওরা আর ফুল নেই, সাতটি সুন্দর ছেলে আর একটি

ফুলকণ্ঠা ছোট রানীর কোল আলে' কবে ডুালছে। রাজা বললেন, 'এক করে হয়'। ছেলোময়েবা বলল, 'যেমন কবে মানুষেব পেটে মানুষ না জন্মে পোডা কাঠ ঠুটকো কাঁটা'ব জন্ম হয়'। তখন বাজা সব বুঝতে পাবলেন। বডো রানীদেব বাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ছোট রানী আব সাত ছেলে এক মেয়ে নিয়ে বাজ্য আ'বাব সুখে ঘর বাঁধলেন।

রূপকথাটি 'সাত ভাই চম্পা'র একটি রূপান্তর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রূপকথাটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঝাড়খণ্ডে এসেছে, নাকি এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রচা'বিত হয়েছে, তা তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার। তবে এই রূপকথাটিতে যে আদিম রুক্ষতা পরিলক্ষিত হয় তা পশ্চিমবঙ্গের প্রভাববর্জিত। গল্পটিতে সপত্নীহিংসা এবং পাপের শাস্তি বেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া তু'কতাক এবং ম্যাস্কিকের ছু'ডা'ছু'ডি সমস্ত কাহিনীটিকে একটি অসাধারণ অলৌকিকতা দিয়েছে। গাছ থেকে আম পাডা কিংবা আম বেঁটে পাওয়াব মধো কিছু কিছু Ritual বা আচা'ব-অনুষ্ঠান ছু'নিরীক্ষ্য নয়। পোডা কাঠ ঠুটকো কাঁটা ঝাড়খণ্ডে ভূত প্রেত ডাইনী তাডাবার অলৌকিক জাদুদণ্ড হিসাবে এখনো ব্যবহৃত হয়। কাহিনীটিতে এগুলো ব্যবহা'বেব ফলে গল্পবস আরো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। Huskmyth এব সন্ধান এখনেও পাওয়া যায়। কিন্তু পার্থক্য এই এখনে Huskটি নষ্ট করবাব কোন প্রয়োজন পড়ে নি। মৃত শিশুদেব আত্মার কায়াপবিবর্তন যেমন সহজভাবে প্রথমে বুক্ষে এবং তাবপর সাতটি ফুলে সংঘটিত হয়েছে, তেমনি ফুলগুলোব কায়াপবিবর্তন ঘটেছে শিশুশরীরে। রূপকথাটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এটিব মধ্যে নানান উপকরণ এবং অভিপ্রায়েব সংমিশ্রণ ঘটেছে।

রূপকথাটির মধ্যে অনেক কা'টি অভিপ্রায়েব সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায় হল Talking Flowers বা বাক্শক্তিসম্পন্ন পুষ্প। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায় হল মৃত শিশুদেব সমাধিব ওপব ফুল গাছেব জন্ম (Reincarnation in plant growing on grave—E631)। তৃতীয়ত: পাশ্চিক নিষ্ঠুরতা (unnatural cruelty), বিমাতাগণ শিশুদেব প্রথমে গোবর গাডায়, পরে কুমোবেব গর্তে নিক্ষেপ করেছিল এই কা'য় যে শেয়াল-কুকুর তা'দেব খেয়ে ফেলবে। কিন্তু দৈবেব রূপায় তারা রক্ষা পেয়ে যায়, কুমোরদম্পতি তা'দেব তুলে নিয়ে গিয়ে লালনপালন কবে। পরে বিমাতারা



যেদিন তাদের পুকুরঘাটে দেখে, সেদিন বিবাস্ত্র মিষ্টান্ন খাইয়ে মেরে ফেলে। ফলে এখানে চতুর্থ অভিপ্রায় নিষ্ঠুর বিমাতা (cruel stepmother) সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। সপত্নীঈর্ষ্যা (jealousy of co-wives)-ও এর অগ্ন্যতম অভিপ্রায়। বড়ো রানীরা ছোট রানীর রূপসৌবনের জ্ঞান তাকে ঈর্ষ্যা করত; তার ওপর ছোট বানী যখন গর্ভবতী হল এবং আটটি সন্তানের জন্ম দিল তখন তাদের ঈর্ষ্যা চরমে ওঠে। বিধি-নিষেধ (Taboo) এর আর একটি অভিপ্রায়। সাধু শুদ্ধ পবিত্র মনে আম খেতে বলেছিলেন। কিন্তু ঈর্ষ্যাকাতর বড়ো রানীরা ছোট বানীকে প্রতারণা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, স্বভাবতঃই তারা মনের শুদ্ধি এবং পবিত্রতা হারিয়েছিল, ফলে তারা সন্তানের জননী হতে পারে নি। শেষতক তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল, যা আর একটি অভিপ্রায় হিসাবে ধরা যেতে পারে। আম ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বস্তু হিসাবে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে; আম খেয়ে ছোটরানী সন্তানের জননী হতে পেরেছিল, এটি magic remedies for barrenness অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া বিজয়িনী ছোট রানী (successful youngest queen) অভিপ্রায়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৪ এক রাজার সাত ছেলে। বড়ো ছ'টি ব্যবসা করে, শিকারে যায়, রাজত্ব দেখে। কিন্তু ছোট রাজপুত্র একেবাবে কুঁড়ের বাদশা। কেউ তাকে ভাল বাসত না। একদিন সে রাগে অভিমানে কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেল। একটি শাহড়া গাছে সে কোপ লাগাতে শুরু করল। তখন সে শুনতে পেল কে যেন বলছে, 'ধারে ধারে কেটো ওরে মধ্যখানে আমি আছি বসে।' তখন ছোট রাজপুত্র একটু একটু করে গাছটা কেটে ফেলল। দেখল ভেতরে একটি ফুল রয়েছে। ফুলটি হাত দিয়ে ছোঁয়ামাত্র একটি পরমাসুন্দরী রাজকন্যা হয়ে গেল। শাহড়া ফুল থেকে তার জন্ম বলে তার নাম হোল শাহড়াবতী। ছোট রাজপুত্র পরম আদরে তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে এল। শাহড়াবতীকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হত না। তার মতো সুন্দরী তখন সারা তল্লাটে কেউ ছিল না। তার গায়ের রঙ ফুলের মতো, তার মাথায় মেঘবরন বারো হাত লম্বা চুল। একদিন রাজপুত্রেরা ব্যবসায় বেরুল। যাবার সময় শাহড়াবতীকে নির্দেশ দেওয়া হল, স্নান করবার জ্ঞান সে যেন নদীতে না যায়। বিদেশ থেকে ছোট রাজপুত্র শাহড়াবতীর জ্ঞান কি আনবে জিজ্ঞেস করায় শাহড়াবতী জানাল যেন ছোট রাজপুত্র তার জ্ঞান একটি

তসব শাড়ি আব একটি বেগুনী রঙের শাড়ি নিয়ে আসে। শাহডাবতী বাইরে যায় না। রাজমহলের ভেতর রোজ স্নান করে। একদিন মাথার চুল খুব ময়লা হয়েছে দেখে দাসীদের বলল, ‘চল নদীতে যাই, এ চুল বাড়িতে পরিষ্কার করা যাবে না।’ নদীতে চুল ঘষতে ঘষতে এক গাছা চুল উঠে গেল। পাছে চুলে জড়িয়ে মাছ মবে তাই শাহডাবতী পাতাব পৌটলায় মুড়ে চুলটি জলে ভাসিয়ে দিল। সেই নদীব নিচেব ঘাটে অগ্র দেশের রাজা স্নান করছিল। পুঁটুলির ভেতর বারো হাত লম্বা চুল দেখে চুলের রূপসীকে খুঁজে বের করবার জন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে যেখানে শাহডাবতী স্নান করছিল সেখানে চলে এল এবং শাহডাবতীকে জোর কবে ধবে নিয়ে গেল। শাহডাবতী জানাল তার ছ’ মাসের ব্রত উদ্‌যাপন না হলে সে বাজাকে বিয়ে করতে পারবে না। এদিকে বাণিজ্য খেকে ফিরে শাহডাবতীকে না পেয়ে ছোট রাজপুত্র পাগলের মতো হয়ে গেল। তসর শাড়ির স্কুল বানিয়ে এবং বেগুনী রঙের শাড়ির পাগড়ি বেঁধে যোগী বেশে রাজপুত্র ঘর ছেড়ে বেরুল। পথে রাখালদের কাছে টিকটড দু’টি পাখি কিনে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই রাজার দেশে এসে পৌঁছল। রাজার দ্বারে সে কাবো হাতে ভিক্ষে নিতে চায় না। এদিকে শাহডাবতী রাজপুত্রের কণ্ঠস্ব শনে চিনতে পেরেছে। রাজপুত্র যখন শাহডাবতী হাতে ছাড়া আব কারো হাতে ভিক্ষে নেবে না জানাল, তখন রাজা কুকুর লেলিয়ে দিয়ে রাজপুত্রকে মবে কেলল। শাহডাবতী বলল, ‘যোগীকে বাজবাড়ির বাইবে পোডাতে নেই।’ বাজা যোগীকে পোড়াবার জন্ত রাজবাড়ির ভেতরেই চিতা সাজাবার আদেশ দিল। তখন শাহডাবতী বলল, ‘আমি কখনো যোগী পোড়ানো দেখিনি, আমি যোগী পোড়ানো দেখব।’ যখন চিতায় আগুন দাউ দাউ করে জলে উঠল, তখন শাহডাবতী চিতায় ঝাঁপ দিল। দুই রাজাও সঙ্গে সঙ্গে চিতায় ঝাঁপ দিয়ে শাহডাবতীকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা কবল। সবাই এক সাথে পুড়ে ছাই হল। এদিকে সেই টিকটড পাখি দু’টি বাজপুত্র আর শাহডাবতীর হাডগুলো বেছে জডো করল। তারপর অমৃতকুণ্ড খেকে জল এনে ছিটিয়ে দিল। অমনি ওরা বেঁচে উঠল। তারপর ওরা একটি প্রকাণ্ড মাঠের চাবপাশে ঘুরল, আর দেখতে-দেখতে ওখানে একটি আশ্চর্য বৃন্দর রাজবাড়ি তৈরী হল। ওখানেই ওরা সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

রূপকথাটি বিদ্যাচমকের মতো রামায়ণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শাহডাবতী এবং সীতার মধ্যে সমান্তরাল মিল না থাকলেও আপাতঃ মিল খুঁজে বের করা কঠিন নয়। সীতার জন্ম হয়েছিল মাটি থেকে, শাহডাবতীর শাহড়া গাছ থেকে। রাবণ সীতাকে কেশাকর্ষণ করে অপহরণ করে, শাহডাবতীর বেলাতেও সুদীর্ঘ কেশ তার সর্বনাশের মূল কারণ অর্থাৎ সেও অপহৃত হয়েছিল। রাবণের মতো দুষ্ট রাজারও পরিসমাপ্তি মুতু্যতে। সীতার অগ্নি পরীক্ষার মতো শাহডাবতীও চিতাতে বাঁপ দিয়েছিল এবং পুনরায় বেঁচে উঠেছিল। শাহডাবতীর গল্পে Myth-এর স্পন্দন পাওয়া যায়। W. Grimm হয়তো এই ধরনের Myth-কেই the broken down forms of forgotten myth বলেছেন। রূপকথাটিতে আরো বয়েকটি জিনিষ লক্ষণীয়। প্রথমতঃ সমাজজীবনের বিশেষ ছাপ রয়েছে রাজার ছেলের কুডুল হাতে কাঠুরে বৃত্তিতে। রূপকথাটি যে অত্যন্ত প্রাচীন তা এখান থেকেই উপলব্ধি করা যায়। রাজা অভিধাটি সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। এ কাহিনী সেই সময়ের যখন পেশা কিংবা বৃত্তিগত শ্রেণীবিন্যাস ঘটেছিল। মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় প্রধানের বা সর্দার বা গোষ্ঠীনেতাকের ভূমিকা কিছু কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি লাভ করেছে মাত্র। অবশ্য বর্তমান ঝাডখণ্ডেও গ্রাম-প্রধান বা সর্দাররা এখনো স্বহস্তে মাটি কাটা, লাঙল চালানো, কাঠ কাটা, ফসল কাটা কাজগুলো করে থাকে; এখানকার সমাজ-ব্যবস্থা আদিম কোম বা গোষ্ঠীজীবনকে এখনো অনেকাংশে অনুসরণ করে চলেছে।

দ্বিতীয়তঃ গাছের ভেতর ফুল, ফুলের ভেতর রাজকন্যা শাহডাবতী একমাত্র রূপকথার অলৌকিক জাদুমন্ত্রেই সম্ভব। এখানে সহজেই অলৌকিক জন্ম, বিস্ময়, রূপপরিবর্তন আদি অভিপ্রায়গুলো দৃষ্টিগোচর হয়। তৃতীয়তঃ বাধানিবেধ; শাহডাবতীকে নদীতে স্নান করতে যেতে নিবেধ করা হয়েছিল, এবং সে তা শোনে নি বলে বিপদে পড়তে হয়েছিল। চতুর্থতঃ রাজপুত্র এবং শাহডাবতীর virtue জয়ী হয়েছে এবং পাপী রাজার vice বা পাপ জীবনের মূল্যে শাস্তি পেয়েছে। এই অভিপ্রায়টি অবশ্যই নীতিমূলক। পঞ্চমতঃ মৃতের পুনর্জীবনলাভ অভিপ্রায়টি (Resuscitation) অল্প একটি অভিপ্রায় অমৃতকুণ্ডের জল (Water of life)-এর মেলবন্ধনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এই অভিপ্রায়টিও রূপকথার সব দেশেই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হতে দেখা যায়। এ ছাড়া উপকারপ্রাপ্ত প্রাণীর (এখানে টিকটড় পাখি) কৃতজ্ঞতামূলক সেবা এবং অলৌকিক রাজপ্রাসাদ (মাঠের চারপাশে

ঘোবাব ফলে আশ্চর্য বাজপ্রাসাদের সৃষ্টি ) অভিপ্ৰায়গুলোও উপেক্ষণীয় নয় । বাজপুত্র এবং শাহডাবতীব পুনৰায় জীবিত হয়ে-ওঠার মধ্যে আদিম মানুষের মৃত্যুকে পবাজিত কবে, অমৃতকে লাভ কববার দুর্বার ইচ্ছা পবিষ্কাব ফুটে উঠেছে । মানুষের জীবন-চেতনা মৃত্যুকে ব্যর্থ কবে কাহিনীটিকে একটি সার্থক রূপকথাব মহিমা দান কবেছে ।

৫ এক যে থাকে সুখী আৰ দুখী । সুখীবা বডো লোক । সুখীৰ বডো অহংকাব, দুখীকে মুখে রা ও কাডে না । দুখীবা বডো গবীব, তুলোব ব্যবসা কবে খাষ । একদিন বোদ্ধুবে তুলো শুকোছে, এমনি সময় ঝড় উঠল । সব তুলো উডে যেতে লাগল । দুখীও তুলোব পেছনে পেছনে দৌড়তে লাগল । যেতে যেতে কলাগাছ কলাকাঁদিব সাপে দেখা হল । ওরা বলল, ‘দুখী, কোথায় চললি ।’ দুখী বলল, ‘আমার তুলো উডে যাচ্ছে, তাই তুলোব পেছনে দৌড়ছি ।’ পথে ঘোডাব পালের সাপে দেখা হল । ‘শিব’ ঘোডাটা বলল, ‘দুখী, তুই কোথায় যাচ্ছিস ?’ দুখী বলল, ‘আমবা বডো গবীব, তুলোব ব্যবসা করে খাই । তুলোগুলো সব ঝড়ে উডে যাচ্ছে, তাই পেছনে-পেছনে দৌড়ছি ।’ দুখী আবো এগিয়ে চলল । এবাবে বাস্তায় গকব পালেব সাপে দেখা হল । গকব পালেব জিজ্ঞাসাব জবাবে সে একই কথা বলল । দুখী এগিয়ে যেতে যেতে একেবাবে সূৰ্যেব ঘবে গিয়ে ঢুকে পডল । সূৰ্য ঠাকুব দুখীকে দেখে বলল, দুখী, তুই এলি, এবাব তোব কথা বল ।’ তখন দুখী তাদেব ঢুংখেব কথা জানাল । সূৰ্য ঠাকুব বলল, ‘অই উত্তব দিকেব পুকুবে ডুব দিয়ে আয় । মোট তিনবাব ডুব দিবি, বেশি দিস না । দু’ বাব ডুব দিলে তোব খুব গহনা হবে. তিনবার ডুব দিলে তুই রূপসী হবি ।’ দুখী পুকুবে ডুব দিতে গেল । দু’বাব ডুব দিতেই তাব সারা গায়ে সানা হীবো-মাণিক্যব গহনা আলমল কবে উঠল । তিনবাব ডুব দিতে সে অপকূপা স্তন্দরী যুবতী বাজকথাব মতো হয়ে গেল । স্নান কবে সে সূৰ্য ঠাকুবেব কাছে ফিবে এল । সূৰ্য ঠাকুব একগাটা শাড়ি দিয়ে বলল, ‘তোব যেটা খুশি পবে নে ।’ কতো দামী শাড়ি, দুখী এতো শাড়ি জীবনে দেখে নি । ও বলল, ‘আমি সস্তা শাড়িটাই পরি ।’ সূৰ্য ঠাকুব বলল, ‘না না, তুই দামীটাই পব ।’ দুখী কিন্তু সেই সস্তা শাড়িটাই পবল । তখন সূৰ্য ঠাকুব বলল, ‘তোব যা যা খুশি নিয়ে নে । যেতোগুলো বইতে পাববি, সব নে ।’ দুখী দেখল তার চাব পাশে থবে-থবে কতো দামী জিনিষ সাজানো

বয়েছে। যে কোন লোকেরই লোভ হবে। কিন্তু দুখী গরীব, ওসব জিনিষে  
ওর লোভ হোল না; কি হবে ওসব নিয়ে, তুলো ব্যবসা করে তো খাবার  
জোটাতে হয়। দুখী ছোট্ট পেড়ীতে দু' চাবটে সস্তা শাড়ি আর জিনিষ  
ভরে নিল। সূর্য ঠাকুর বলল, 'ওই ছোট্ট পেড়ীতে ক'টা জিনিষ ধরল ?  
একটা বড় পেড়ীতে সব ভবে নে।' দুখী কিন্তু ছোট্ট পেড়ীটাই নিল। সূর্য  
ঠাকুরকে বলল, 'আমি এবার যাই।' সূর্য ঠাকুর বলল, 'তাই যা। তোর  
আব কোন দুঃখ থাকবে না। তুই বড় উদার, তোব লোভ নেই; আমি  
বড়ো খুশি হয়েছি। তোর অই পেড়ীর জিনিষ কোনদিন শেষ হবে না। যা  
চাইবি, তাই পাবি।'

দুখী আবার সেই পপ ধরে ঘবে ফিবে চলল। আবার গরুব পালের সাথে  
দেখা হল। ওরা বলল, 'দুখী, তুই ফিবে এলি ? চল তোব সাথে আমরাও  
যাই।' দুখী'র পেছনে-পেছনে গরুব পাল চলতে লাগল। এবার ঘোড়ার  
পালের সাথে দেখা হল। ওরাও বলল, 'চল, আমরাও তোব সাথে যাই।  
দুখী, তুই বড়ো কাহিল হয়েছিস, তোর পেড়ীটা আমাদের পিঠে তুলে দে,  
আব তুইও কাবো পিঠে উঠে বস।' দুখী ঘোড়ার পিঠে পেড়ী রাখল, নিজে  
চাপল। কিছু দূব যেতে কলাগাছ কলাকাঁদির সাথে দেখা হল। ওরাও  
দুখী'র সাথে চলল। দুখী'র মা দূব থেকে দুখীকে দেখে চৈচিয়ে বলতে লাগল,  
'ওগো, আমাদের দুখী ফিরে আসছে। সঙ্গে আছে কলাগাছ কলাকাঁদি,  
ঘোড়ার পাল, গরুব পাল, ঘোড়ার পিঠে পেড়ী-পেটবী।' দুখী'র মায়ের  
খুশির অস্ত্র নেই। দুখীদের দুঃখ কাটল।

দুখী'র রূপ, গাভরতি গহনা, ধনসম্পত্তি, কলাগাছ, ঘোড়ার পাল গরুব পাল  
দেখে সুখী'র খুব হিংসে হল। বলল, 'আমিও তুলোর ব্যবসা করে দুখী'র মতো  
সব নিয়ে আসব।' সুখী তুলোর ব্যবসা করে। একদিন ঝড় এল। ঝড়ে-ওড়া  
তুলোর পেছনে সুখী দৌড়তে লাগল। পথে পড়ল কলাগাছ কলাকাঁদি, ঘোড়ার  
পাল, গরুব পাল। সুখী কাবো কথার জবাব দিল না, কারো িকে ফিরেও  
তাকাল না। সুখী সোজা সূর্য ঠাকুরের ঘরে চলে গেল। সূর্য ঠাকুর সুখীকেও  
উত্তর দিবেব পুকুবে স্নান কবে আসতে বলল। বলল, 'মনে রাখিস, তিনবার  
ডুব দিবি, বেশিও না কমও না। দু'বার ডুব দিবি, গা-ভরতি গহনা পাবি।  
তিনবার ডুব দিবি. ঞালো-কবা রূপ পাবি।' সুখী আনন্দে ডগমগ হয়ে  
পুকুরে স্নান করতে গেল। দু'বার ডুব দিল, গা-ভরতি গহনা হল। তিনবার

ডুব দিল, আলো-করা কপ হল। সুখী ছিল দারুণ লোভী। ভাবল, আব একবার ডুব দিলে না জানি আবো কি পাব। যেই আর একবার ডুব দিয়েছে, অমনি কোথায় গেল গা-ভবতি গহনা আর আলো-করা রূপ। সুখী তার আগের চেহারাও হাবাল, দেখতে ভীষণ বিশ্রী হয়ে গেল। সুখী কাঁদতে-কাঁদতে সূর্যের কাছে গেল। সূর্য বলল, 'আমি কি করতে পাবি, নিজের দোষে চাববার ডুব দিয়ে তো এই দশা ঘটালি। দুঃখ করে আর কি হবে। নে, শাড়ি গাদা থেকে তোব পছন্দ মতোন শাড়ি বেছে নিয়ে পবে নে।' বলে একগাদা শাড়ি দেখিয়ে দিল। সুখী একটা খুবই দামী শাড়ি পরল। সূর্য ঠাকুব বলল, 'তোব যা যা খুশি, পেড়ী ভবে নিয়ে নে।' সুখী একটা মস্ত বড়ো পেড়ী ভবে জিনিষপত্রব নিয়েছে, বইতে তাব ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। একটু হাতে আবার একটু জিবিয়ে নেয়। সুখী খুব কাঁদতে লাগল। গরুব পালকে দেখে পেড়ীটা পৌঁছে দিতে বলল। গরুব পাল ওব ওপব বেগে ছিল, এবারে তেডে এসে লাগি আব জুঁতো লাগাল। সুখীব পেড়ী-পেটা পড়ে গেল, শাড়ি ছিঁড়ে গেল। এবাবে দেখা হল ঘোডাব পালেব সঙ্গে। ঘোডাবাও বেগে ছিল, সুখীব কথায় লাগি লাগাল। সুখীব প্রাণ যায়-যায়। সে আব কোন দিকে না তাকিয়ে কলাগাছকে পেছনে ফেলে ছেঁড়া কাপড়ে এলোচুলে হতকুচ্ছিং চেহারা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিবল। সুখীব দশা দেখে সুখীব মা কেঁদে ফেলল, সুখীবা এবার খুব গবীব হল, আব দুখীবা খুব বডোলোক হল।

রূপকথাটি অবিকল একটি ব্রতকথাব মতো। ব্রতকথার প্রতিটি লক্ষণ এর মধ্যে বর্তমান। সূর্যপূজাব ব্রতকথা হিসাবে সহজেই এটিকে স্বীকাব করে নেওয়া যায়। অবশ্য সূর্যব্রত ঝাড়গণ্ডেব কোথাও চল নেই বা এটি ব্রতকথাও নয়। এমনও হতে পাবে, কোন দিন এটা ব্রতকথাই ছিল। আবার কোনদিন এটা ব্রতকথা হিসাবে ব্যবহৃত না হলেও এটা যে ব্রতকথাব স্বীকৃতি পেতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্রতকথা এবং রূপকথাব মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট সীমাবেথা টানা সম্ভব নয়। ডঃ হাশুশেয ভট্টাচায ঠিকই বলেছেন, 'বিশ্লেষণ কবিয়া দেপিলেই বৃত্তিতে পাবা যাইবে যে অনেক প্রচলিত ব্রতকথাই রূপকথা কিংবা উপকথার ক্ষেত্র হইতে আসিয়াছে এবং অতি সহজেই ইহাদেরব মধ্য হইতে পর্মীয় লক্ষ্যটুকু পবিত্যাগ কবিয়া ইহাদিগকে পুনবায়ু-রূপকথা কিংবা উপকথাব ক্ষেত্রে ফিবাইয়া লষ্টয়া আসিতে পাবা যায়।'<sup>১০</sup> সুখী দুখীব

কাহিনীতে রূপকথার বিভিন্ন অভিপ্রায় যে আছে তা একটু পরেই বিশ্লেষণ করে দেখানো যাবে। এটি যে ব্রতকথারও লক্ষণাক্রান্ত, প্রথমে তাই বিশ্লেষণ কবে দেখানো হচ্ছে। ব্রতকথায় দৈব বা ভাগ্যই মুখ্যস্থান অধিকার করে থাকে। লৌকিক দেবতা থাকলেও তা যে দৈবেরই রূপক চরিত্র, তাতে সন্দেহ নেই। ব্রতকথায় দৈব অনুরূপ এবং নিগ্রহ একটি অপরিহার্য অভিপ্রায়। মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনাই ব্রতকথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে। অলৌকিকতাব স্পর্শ থাকলেও প্রায়-বাস্তব জীবন-ধর্মী উপাখ্যানই ব্রতকথার বিষয়বস্তু। সুখী-দুখী গল্প বিশ্লেষণ কবলেও আমরা এই লক্ষণগুলো সহজেই খুঁজে পেতে পারি। সুখী দুখীর জীবনে দৈব বা ভাগ্যই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লৌকিক দেবতা সূর্য এখানে উপস্থিত থাকলেও দৈবই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ কবেছে। দৈবের প্রসাদে দুখী সুখের জীবন পেয়েছে, আর সুখী স্বচ্ছল জীবন হারিয়ে দুঃখের জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। দৈব যেন নানান রূপে সুখী এবং দুখীকে পরীক্ষা কবেছে; দুখী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভাগ্যবতী হয়েছে এবং সুখী তার অপবিমিত লোভের জন্য ভাগ্যহীনা হয়েছে। সুখের এবং দুঃখের দু'টি সংসারের দু'টি চবিত্র তাই দৈব মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা-বাসনা সহ যে-ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে কাহিনীটি একটি জীবনধর্মী উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে।

এই রূপকথাটির প্রধান অভিপ্রায় দৈব অনুরূপ এবং নিগ্রহ। দুখী তার উদার নিলোভ স্বভাবের জন্য দৈব অনুরূপ লাভ কবেছে এবং অযথা লোভের জন্য সুখী দৈব কর্তৃক নিগ্রহীত হয়েছে। দ্বিতীয় অভিপ্রায়টি হল বাকশক্তিসম্পন্ন বৃক্ষ (কলাগাছ) এবং পশু (ঘোড়া এবং গরু)। তৃতীয় অভিপ্রায় ইন্দ্রজাল বা জাদু; তিনবার ডুব দিলেই গা-ভবতি গহনা এবং আলো-করা রূপ একমাত্র জাদুমন্ত্রেই সম্ভব, এখানে তিনটি ডুব ইন্দ্রজালের কাজ করেছে। চতুর্থ অভিপ্রায় বাধা-নিষেধ; সুখ তিনবারের বেশি ডুব দিতে নিষেধ কবেছিল, সুখী লোভে পড়ে চারবার ডুব দিতে গিয়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পঞ্চম অভিপ্রায় অফুবন্ত জিনিষপত্রের পেড়ী-পেটা (inexhaustible treasure); দুখীর নিলোভ স্বভাবের জন্য সূর্য ঠাকুর তার পেড়ীকে অফুবন্ত ভাঁড়ারে পরিণত কবেছিল। ষষ্ঠ: দয়ালু এবং সাহায্যকারী বৃক্ষ ও পশু; দুখীর নিরহংকার স্বভাবের জন্য কলাগাছ, গরুর পাল ও ঘোড়ার পাল তাকে সাহায্য ও সেবা কবেছিল। এছাড়া নিলোভের পুণ্ডার এবং লোভীর শাস্তিও এই কাহিনীর

অন্তিম উল্লেখযোগ্য অভিপ্ৰায়। বলাবাহুল্য এখানে কিছুটা নীতিকথাও প্রকাশ লাভ করেছে, যা রূপকথার ধর্ম না হলেও ব্রতকথার ধর্ম।

অতঃপব আমরা রূপকথার আলোচনা শেষ করব সেই কথাগুলো দিয়ে যা শোনাবাব জন্ম ছেলেবেলায় ঠাকুবমার গল্প কখন শেষ হবে তার অপেক্ষা কবে থাকতাম :

আমার কহনী ফুরাল্য / লট্যা গাছটি বুঢ়াল্য।

কেনে বে লট্যা গাছ বুঢ়ালি ?—গরুয় কেনে খায়।

কেনে বে গরু খা'স ?—বাগালে কেনে চরায় নাই।

কেনে বে বাগাল চবা'স নাই ?—গুলিনে কেনে ভাত দেয় নাই।

কেনে রে গুলিন ভাত দিস নাই ?—ছাল্যা কেনে কাঁদে।

কেনে বে ছাল্যা কাঁদিস ?—পি'পডায় কেনে কামডায়।

কেনে রে পি'পডা কামডা'স ?—জল কেনে কবে নাই।

কেনে বে জল করিস নাই ?—বেঙ কেনে ডাকে নাই।

কেনে রে বেঙ ডাকিস নাই ?—সাপে কেনে খায়।

কেনে বে সাপ খা'স ?

আমার চাষ ন বাস, আমার টুরি বে'ই আশ ॥

## পঞ্চম অধ্যায়

### ব্রতকথা

ঝাড়থণ্ডে খুব বেশি ব্রতেব প্রচলন নেই। কবম এবং জিত্তিয়া এখানকাব প্রধান ব্রত। ধরম পুজাকেও ব্রতায়ষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। জিত্তিয়া এবং ধরম ব্রত প্রধানতঃ পুত্রসন্তানের মঙ্গলকামনায় উদ্ঘাষিত হয়ে থাকে; এই দু'টি ব্রতের লক্ষ্যবস্তু সন্তান। এই দু'টি ব্রত কিন্তু করমের মতো সর্বজনীন নয়। করম ব্রতে গ্রামের যে কোন কুমারী কন্যা অংশগ্রহণ করতে পারে, এমন-কি ছোট ছোট ছেলেরাও অংশগ্রহণে অধিকারী হতে পারে; কিন্তু জিত্তিয়া বা ধরম ব্রতে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে না; যে-পরিবারে



ব্রত অল্পষ্টিত হয়, শুধুমাত্র সেই পবিবাবের লোকেরাই অংশগ্রহণ করতে পারে। কেউ কেউ বাঁধনা উৎসবকেও গো-ব্রত হিসাবে উল্লেখ কবাবর পক্ষপাতী। বাঁধনা পরব ঝাড়খণ্ডে ব্রত হিসাবে উদ্ঘাপিত হয় না। এমন কি টুঙ্গু পবব, যা পশ্চিমবঙ্গে তোষলা ব্রত নামে পবিচিত, ব্রত হিসাবে পালিত হয় না। ব্রতের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হল, এটি উদ্ঘাপনের জন্তু ‘বার’ ( <ব্রত ? ) বা উপবাস একান্ত প্রয়োজন। বাঁধনা বা টুঙ্গু পববে উপবাসের কোন প্রয়োজন পড়ে না। তাছাড়া ব্রতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, ব্রতকথা, বাঁধনা বা টুঙ্গু পূজাব পেছনে কোন ব্রতকথা খুঁজে পাওয়া যায় না। কবম, জিতিষা এবং ধবম ব্রতের সঙ্গে ব্রতকথাও সংশ্লিষ্ট বযেছে। ধবম পূজা প্রসঙ্গে আমবা ব্রতকথাব সাবাংশ এবং গানের অংশবিশেষ উল্লেখ কবেছি। সাম্প্রতিককালে বাঁধনা পরবেব সময় পূবাণ থেকে আহৃত কপিলা গাভীর কাহিনী অবলম্বনে বচিত কপিলামঙ্গল গীত হতে শোনা যায় ধলভূমে। কিন্তু এই উপাণ্যানকে ঠিক ব্রতকথা বলা যায় না।

ব্রতকথা চবিত্রগত দিক দিয়ে লোককথাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ব্রতের সঙ্গে জড়িত বলেই এই সব কাহিনীকে লোককথা থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়, অল্পথা ব্রতকথা এবং লোককথাব মধ্যে সূক্ষ্ম সীমাবেখা টানা সম্ভবপর নয়। ঝাড়খণ্ডের ব্রতকথায় কোন পৌবাণিক দেবতাব স্থান নেই; লৌকিক দেবতাবাই সাধাবণ মানুষেব আবাধ্য দেবতা। এই সব দেবতা যে শুধুমাত্র কল্যাণই কবে থাকেন, তা নয়, এদের মধ্যে শুভ এবং অশুভ দু’টি ক্ষমতাই বিদ্যমান। এ’বা ইচ্ছা কবলে ইষ্ট যেমন কবতে পাবেন, তেমনি অনিষ্টও করতে পারেন। ভক্তেব প্রতি এ’বা যেমন ববাভয় দান করে থাকেন, তেমনি যারা এ’দের বিরুদ্ধাচরণ করে, এ’বা তাদের সমুহ সর্বনাশও করে থাকেন। এরা কষ্ট হলে ক্ষেতে ফসল ফলে না, ফললেও এ’দের কোপদৃষ্টিতে সে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, এ’রা বাম হলে সম্ভানলাভে বঞ্চিত হতে হয় সাধাবণ মানুষকে, সম্ভান জন্মগ্রহণ কবলেও এ’দের অশুভ দৃষ্টিতে রোগগ্রস্ত হয়, অকালমৃত্যু হয়। তাই সাধারণ মানুষেব কাছে লৌকিক দেবতাদের গুরুত্ব এবং মযাদা অত্যন্ত বেশি। তবে লৌকিক দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের ভক্তদের যে খুব একটা দ্বন্দ্ব থাকে, তা’ও না, বরং প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় দেবতা এবং ভক্ত পরস্পরেব এতোই অন্তরঙ্গ যে একে আন্তর সূখে-দুঃখে আনন্দে-বেদনায় সমানভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। লৌকিক দেবতা এবং

লোক উভয়েই যেন একই রক্তমাংসে গঠিত। মানুষের মতোই লৌকিক দেবতাদের আচাৰআচরণ, জীবন চর্চা, প্রয়োজন পড়লে তাঁরা মানুষের বেশে লোকসমাজে নেমে আসেন। লৌকিক দেবতাব মধ্যে দেবত্ব যতোখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি মনুষ্যত্ব লক্ষ্যগোচর হয়। মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পাবেন বলেই এই সব দেবতা মনুষ্যসিত স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়ে লৌকিক জীবন যাপন করছেন, এবং অস্তিত্বের দুর্লভ আনন্দ-বস ভোগ করতে পাবছেন। এই কাবণেই এঁরা পূর্বার্ণে ধর্মগ্রন্থে স্থান পান নি, সাধাৰণ মানুষের ভক্তিপ্রদা মেহমমতায় বচিত ব্রতকথায় এঁরা পবম মযাদায় স্থান লাভ কবেছেন। মানুষের সুখ-দুঃখের সহচর দেবতাব কথা বলে ব্রতকথাগুলো একান্তই লোকায়ত, তাই ব্রতকথাব মধ্য দিয়ে দেবতাব কথা বলা হলেও এগুলো লোককথাব লক্ষণাক্রান্ত, স্বভাবতঃই এগুলো লোক-সাহিত্যেব বিশিষ্ট উপকরণ।

বিষয়বস্তুর বিচারে লোককথ এবং ব্রতকথাব মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তাই পণ্ডিতরা মনে কবেন যে, ব্যবহারিক প্রয়োজনে লোককথাই ব্রতকথায় রূপান্তরিত হয়েছে। ব্রতকথা আচাৰঅনুষ্ঠানমূলক হওয়ায় কাহিনীব মধ্যে পবিবর্তনসাধন করা হয় ন , একটি বিশিষ্ট রূপলাভ কববাব পর যুগে যুগে ব্রতোদযাপনেব কালে একই কাহিনী অপবিবর্তিত ভাবে আবুদ্ভি করা হয়ে থাকে। ব্রতকথাগুলো আচাৰমূলক হওয়াব ফলে এগুলো বিলুপ হয়ে যাওয়াব শঙ্কা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। জিতিয়া এবং ধবম পূজাব ব্রতকথা বর্তমানে অত্যন্ত সীমিতভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। কবম ব্রতকথা ঝাড়খণ্ডে এখনো জনপ্রিয়তাব তুঙ্গে, এব কাবণ, এই পূজাব অনুষ্ঠান ঝাড়খণ্ডেব সবত্রই যেমন হয়ে থাকে, তেমনি এই ব্রতে সবাই অংশগ্রহণ কবতে পাবে। আমবা এখানে কবম পূজাব ব্রতকথাটি বিবৃত কবে বিচার-বিপ্লষণ কবে দেখব।

“কবম ঠাকুবেব কথাশোন শোন সব ‘বার্ণাণ’ বা (ব্রতীব), কবম ঠাকুরের কথা বলি মন দিয়ে শোন। কবম ঠাকুর ত শুধু দেবতা নয়, বাজাও। তাব কাছে যা চাওয়া যায়, সব পাওয়া যায়। যে যা মানিত করে সুর তাব ফল ফলে। যে তাঁর পূজা কবে তাব ঘব ধন-ধাণ্ডে, সম্ভান-সম্ভতিতে ভবে যায, দুখে-ভাতে সুখে থাকে। কবম ঠাকুর ভারী বাগীও। যে তাঁকে মানবে না, তাব

সর্বনাশ হবে। তার ঘর-সংসারে আগুন লাগে, ধনসম্পত্তি খোয়া যায়, পুত্র-কন্যা মরে যায়।

সে অনেক দিন আগেকার কথা। কোন এক গ্রামে কবমু আর ধরমু নামে দুই ভাই স্নুখে বাস করত। তাদের খাবারের অভাব ছিল না, জমিজমা ছিল। দু'ভাই বিয়ে-খা করে মনের আনন্দে দিন কাটাত। চাষ-বাসে তাদের দিন কেটে যেত, বারো মাসে তের পরব করত; আনন্দ ছাড়া যেন তারা আর কিছু জানত না। যে-ঠাকুরের পূজায় ওবা সবচেয়ে আনন্দ পেত, তা এই করম ঠাকুরের পূজে। হাঁড়িয়া পিঠের ছড়াছড়ি। কুটুয়ে ঘব ভরে যেত; সন্ধ্যায় তারা পূজে করত আর সারা রাত্রি মদ আর হাঁড়িয়ার নেশা করে ঢোল-ধমসামাদল বাজিয়ে নেচে-গেয়ে করম ঠাকুরকে খুশি করত। তারপর বাত শেষে করম ঠাকুরকে সাত সমুদুর তের নদীর পারে পৌঁছে দিত। তারপর স্নান করে এসে আগের দিনের রান্না-করা বাসি ভাত এবং নুন-তেল-হলুদবর্জিত বাসি ডাল কচুপাতায় খেয়ে পাবণ কবত। একদিন হয়েছে কি, বড় ভাই কবমু বাসি ভাতে পারণ না কবে গবম ভাতে পারণ কবল। ধরমু ভেবেছিল, বাসি ভাতই কি আর গবম ভাতই কি, সব সমান, পাবণ করা হলেই হল। গবম ভাত খেয়ে পারণ করার ফলে ওদিকে করম বাজার গা জ্বালা শুরু হল। অমৃত কুণ্ডে বার-বার ডুব দিয়েও গায়ের জ্বালা শেষ হল না। করম ঠাকুর তাই বেজায় বেগে গেলেন। করমু'ব সংসাবে সর্বনাশ হুডুমুডু কবে ভেঙে পড়ল।

(কোন কোন স্থানে ব্রতকথা'ব এই প্রথম স্তরেই অল্পরূপ কথা শুনেতে পাওয়া যায়। ওরা বলে: কবমু'ব আর ধরমু দু'টি ভাই এক সাথে বাস করত। করমু করত ব্যবসা আর ধরমু করত চাষ। ধরমু চাষের কাজ শেষ কবে ভাদ্র মাসে কবম ঠাকুরের পূজা করত। একবার ধরমু বন্ধুবান্ধব আত্মীয়কুটুম্বের সাথে মদ-হাঁড়িয়া খেয়ে নেশাভাং করে সারারাত করম পূজার নাচে মত্ত রয়েছে। করমু বাণিজ্য থেকে ফিবেই এই কাণ্ডকাব্যখান' দেগে রেগে আগুন। করমঠাকুরকে টেনে লাথি মেবে দুবে ফেলে দিল সে। করম ঠাকুর রাগে-অপমানে ক্ষেপে আগুন হয়ে গেলেন।)

বারতির শোন। করম ঠাকুরের কোপে করমু আর ধরমু বণ্ডা করে পৃথক হয়ে গেল। করম ঠাকুরের দম্মায় ধরমুর সংসারে সম্পদ, সুখশান্তি; করম ঠাকুরের অভিশাপে করমুর সংসারে অভাব, যন্ত্রণা, অশান্তি। করমু আর তার বউ নিরুপায় হয়ে খেটে খেতে শুরু করল। ধরমুর চাষবাসের কাজে

সাহায্য কবে, কিন্তু যা খাবার পায তাতে পেট ভবে না। একদিন ধবমুঘবে 'বেগাব' খাটবাব জন্তে মেহর্নাথ চাষীমজুরদেব ভীষণ ভিড। করমু জ'মি তৈবি কবাব কাজে যোগ দিল, তাব বউ সেই জমিতে ধান বোপণেব কাজে। সকালেব খাবাব মানুষেবা সবাই পেল। কবমু 'শাব তাব বউ ভাবল, ঘবেব লোক বলে তাদেব খাবাব পেতে দেবি হুছে। কিন্তু যখন ওবা সন্তি-সন্তিই খাবাব পেল না, তখন দুঃখ পেল না, ভাবল, ঘবেব লোক বলেই ধরমু ওদেব খেতে দিতে ভুলে গেল। মনকে সাহুনা দিল : সকালে না হোক, ক্ষতি নেই—চুপুবে পেট ভবে খাওয়া পাব। কিন্তু চুপুবেও ওবা খাবাব পেল না, ধবমু যেন ওদেব খেতে দিতে ভুলে গেছে। ঠিক আছে, ওবা ভাবল, সঙ্কায় বেশ ভালো কবে খাওয়া পাবে। কবম ঠাকুব যাব ওপব বাম, তার ভাগ্য চিবকালেব মতো নষ্ট হয়ে যায়। সঙ্ক্যাতেও ওবা খাবাব পেল না। খিদেব জ্বালায় নাড়িভুঁড়ি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। স্বামীস্ত্রী দু'জনে মিলে পবামর্শ শুরু হল : কি করা যাবে এবপব। ধরমু তাব নিজের ভাই, সে-ও তাব মুখে তাকাল না? প্রতিশোধ চাই। বউকে বলল, 'চল, যতোখানি বোপণ কবেছিস, উপড়ে ফেলে দিবি; 'শাব আমি যতোখানি আল তৈবি কবেছি, কোদাল চালিয়ে শেষ কবে দিয়ে আসব।' শ্রাবণ মাস। কবম কবম বৃষ্টি হুছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বেবিযে গেল মাঠে। কবমু আল কেটে ফেণাবাব জন্তে সেই কোদাল ভুলেছে কে যেন তাব হাতে এসে ধবল, বলল, 'পবদাব কাটবি নে, তুই তোব নিজের দোষে এই ভোগাস্তি এনেছিস। কবম ভান্বে পাবণ করে তুই কবম ঠাকুবের গায়ে জলুন ধবিযে দিযেছিস। সাত সমুদ্র পবে নদীব পাবে অমৃতকুণ্ডে কবম ঠাকুব জালা নেশাবাব জন্তে ডুবছেন আব উঠছেন। তোব কবম কপাল বাম। সাত সমুদ্র পবে নদীব পাবে গিয়া কবম ঠাকুবকে খুশি কবে নিযে আয়, 'আ বাব সব দিবে পাবি।' কবমু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তাব বউকে ডকে নিযে গবে দিবল। 'শাবপব সাবাবাও স্বামী-স্ত্রীতে সলাপবাগর্শ কবে স্থিব কবল, কবমু কবম ঠাকুবকে নিযে আসবাব জন্তে সেই বাস্তিবেই বেবিযে পডবে। তখনো মোবণ ডাকে নি, গায়েব সবাই ঘুমিয়ে বযেছে; কবম অন্ধকারে গা টেনে কবম ঠাকুবের উদ্দেশে বেবিযে পডল।

কবমু হাঁটছে, হাঁটছে, হেটেই চলেছে। ভোব হল, সূঁষ উঠল, চাব-পাশে আলো ছড়িয়ে পডল। বেলা যতো বাড়ে কবমুঘবে ঠিদে ততো বেশি বেডে যায়। আগেব দিনে খাবাব জোটে নি, তাব ওপব এতো বেশি পথ

হাঁটা হাঁটি। কাঁহাতক আব সহ্য হয়; একটু জিবিযে নেবাব জন্তে মাঠেব ওপব এক জায়গায় ছায়া দেখে বসে পডল। কিন্তু ছায়া কপাল, সে ছায়াও দাঁড়াল না। অবা ক হল সে, ছায়ায় বসল আব সে ছায়াও দূরে সবে যাচ্ছে! কবমু বলল, ‘খুন্তোবি, কবম কপাল বাম হলে একটু ছায়াও মিলবে না?’ কবমু যখন এই কথা বলে চলতে শুরু কবল, তখন সেই ছায়া তাকে ডেকে কথা বলল: ‘কোথায় যাচ্ছ ভাই?’ মামুযেব গলাব আওয়াজ পেয়ে কবমু অবা ক হয়ে তাকাল। দেখল, খডেব বোঝা মাথায় নিয়ে একটু লোক হেঁটে চলেছে, তাবই ছায়ায় সে বসেছিল। কবমু জনাব দিল, ‘আমাব কবম কপাল বাম হয়েছে। তাই কবম ঠাকুবকে আনতে যাচ্ছি।’ তখন লোকটি বলল, ‘ভালোই হয়েছে ভাই; কবম ঠাকুবকে আমাব ‘আদ্বাশ’ ( <ফা. অবজ্ঞাশত = আবেদন ) জানিয়ে জেনে নিযো, বাবো বছব খবে আমি কেন হাঁটা থামাতে পাবছি না কিংবা খডেব বোঝাও কেন মাথা থেকে সবাতে পাবছি না।’ আবাব এগিয়ে চলেছে কবমু। সামনে পডল একটা পুকুর; আয়নাব মতো ঝকঝক কবছে তাব জল। কবমু ভাবল, যাক, জল পেয়ে হলেও পেট ভবানো যাবে। তেষ্ঠায় হাঁসফাঁস কবে পুকুবে নেমে যে-মুহুর্তে এক ঝাঁজলা জল মুগে তুলবে, দেখল, সমস্ত জলে লক্ষ লক্ষ পোকা কিলবিল কবছে। হাতেব জল ফেলে দিয়ে আবো এগুল, যদি গভীবেব জলে পোকা না থাকে। ঝাঁজলা ভবতি জল তোলে আব ফলে দেয়। শুধুই পোকা। ‘কবম কপাল বাম’, বলে বিড় বিড় কবে বকতে-বকতে কবমু যখন চলে যাচ্ছে, পুকুবিট ডকে বলল, ‘ভাই, তুমি কোথায় যাচ্ছ?’ কবমু বলল, ‘আমাব কবম কপাল বাম হয়েছে, তাই কবম ঠাকুবকে নিয়ে আসতে চলেছি।’ পুকুবিট বলল, ‘ভালোই হল ভাই, আমাব আদ্বাশটি কবম ঠাকুবকে পৌঁছে দিয়ে, জেনে নিযে’, এতো এতো বছব খবে পড়ে আছি, আমাব জল গরু-বাছুবও কেন ভোঁষ না, আমাব জলে কেন এতো পোকা।’ কবমু ঘাড় নেড়ে এগিয়ে চলল।

কে জানে এখনো কতো দূবে কবম ঠাকুবেব দেশ। পেটে দানাপানি নেই। কবমু যেন ক্রমশঃ নিশ্বেজ হয়ে আসছে। পৌঁছতে পাববে কি না তাব ভয় লাগছে। হঠাৎ সামনে অনেক গাছ দেখে ভাবল, নিশ্চয় ওতে ফল খবেছে, এবপব পেট ভবে ফল খাবে। কাছে গিয়ে দেখল, সব ডুমুব পেকে গাছেব তলায় পড়ে সব ছড়িয়ে রয়েছে। সাবা গাছে পাকা ফল।

তাড়াতাড়ি কিছু ফল কুড়িয়ে দেখে শুধু পোকা। ভাবল, কবে থেকে নিচে পড়ে আছে, তাই এতো পোকা ; গাছে চড়ে টাটকা ফল খাবে। গাছের ফল ভেঙে দেখে, ভেতরে হাজারো পোকা কিলবিল করছে। তখন করমু গাছ থেকে নিচে নামল, বলল, 'এখানেও করম কপাল বাম।' কবমুকে চলে যেতে দেখে ডুমুর গাছ বলল, 'তুমি কোথায় চলেছ, ভাই ?' থিদের জালা, তার ওপর সবার একই প্রশ্ন ; করমু যেন বিবক্ত হল, বলল, 'কোথায় আবার, করম কপাল আমার ভেঙেছে, তাই করম ঠাকুরকে খুঁজতে বেরিয়েছি।' ডুমুর গাছ বলল, 'আমার একটু উপকার করো ভাই। করম ঠাকুরের দেখা পেলে আমার কথাও জিগোস কোর, আমার ফল জনপ্রাণী কেউ ছোঁয় না, আমাব ফলে কেন এতো পোকা।' সম্মতি জানিয়ে করমু তার পথ খুঁজে-খুঁজে ক্লাস্ত পায়ে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেল।

তখন দুপুরবেলা। দূরে একটি কুটির দেখতে পেল সে। হঠাৎ এতোক্ষণ বাদে তার বিড়ির নেশা যেন চাগিয়ে উঠল। কুটিরের দরোজায় উঁকি দিয়ে দেখল, ভেতরে এক বুড়ি পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। আশ্চর্য, তার দু'টি পা উলুনে চুকিয়ে দেওয়া রয়েছে ; দগদগ করে আশুন জলছে, অথচ বুড়ির পা পুড়ছে না। দু'হাত দিয়ে বুড়ি চিংড়ি নাছ বেছে চলেছে একটি চুবড়িতে। বুড়ির কাছে করমু আশুন চেয়ে আশুন পেল না। বুড়ি বলল, 'আমাব উঠবার উপায় নেই।' আবার 'কবম কপাল বাম' বাল কবমুকে চলে যেতে দেখে ডুমুর গাছের মতোই বুড়িও প্রশ্ন তুলে তার করম কপাল বাম হওয়ার এবং কবম ঠাকুরের খোঁজে যাত্রার কথা জেনে নিল। তারপব বুড়ি কবমুকে ডেকে বলল, 'করম ঠাকুরকে আমাব দুঃখের কথা জানাবে ; বারো বছর ধরে আমার পা আশুনে ঠেকিয়ে ধান সেদ্ধ কবছি আব দু'হাতে চুবড়ির চিংড়ি মাছ বেছেই চলেছি অথচ আজো কেন না আমার পা দু'টো পুড়ল, না ধান সেদ্ধ হল, আব না চিংড়ি মাছ বাছা শেষ হল।' কবমু আবার এগিয়ে চলল। এবার সামনে পড়ল গরুর পাল। করমু ভাবল, এবার বৃন্নিব করম ঠাকুর সদয় হলেন ; এবার গাই দুয়ে দুপ খেয়ে পেট ভবব, আর যে সহ হয় না। কিন্তু হা কপাল, যেই সে একটি গাভীর কাছে এগিয়ে গেছে, অমনি সেটি তাকে তাড়া করে এল, লাগি মেরে গুঁতিয়ে করমুকে বিব্রত করে তুলল। কবমুর মনে বড়ো দুঃখ হল। এখানেও করম কপাল বাম, দুঃখের ভারে সে যেন ভেঙে পড়ছে। তবু সে পা বাড়াল সামনের দিকে। গরুর পালের যেটি

‘শিরোমণি’, সে কবমুকে প্রশ্ন কবে তার গল্পবাস্থানের কথা জেনে নিল। তারপর সে তাদের নিজেদের দুঃখের কথা প্রকাশ করল। ‘আমরা এসে এতোকাল এখানে বয়েছি, অথচ আমাদের ‘গলা-গুঁসাই’ (<গোপালক-গোস্বামী) পেলাম না। আমাদের এ দুঃখ কবে কাটবে, তুমি করম ঠাকুরের কাছে থেকে দয়া করে জেনে নিয়ে এসো ভাই।’ করমুর পথ যেন শেষ হয় না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পায়ের শিরা-উপশিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। তবু করমু হাঁটছে, যেন ছুটে চলেছে সে। সন্ধ্যার আগেই তাকে করম ঠাকুরের কাছে পৌঁছতে হবে। হঠাৎ সামনে অনেকগুলো ঘোড়া দেখতে পেল। জয় কবম ঠাকুব, এবার বুঝি দুঃখের দিন শেষ হল। ঘোড়ায় চড়ে খুব শীগগির কবম ঠাকুবের কাছে পৌঁছে যাব, কবমু ভাবল। কিন্তু যেই না কাছে গিয়ে একটি ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে উঠেছে, ঘোড়াটি এমনিভাবে পিঠে ঝাঁকানি দিল যে কবমু মাটিতে পড়ে গেল। ঘোড়ায় লাপি আব কামড়ের চোটে নাজেহাল হয়ে ধুলো বেড়ে কবমু ছুটে পালাচ্ছিল, তখন ঘোড়ার দলের নেতা ডেকে বলল, ‘এমন হস্তদস্ত হয়ে কোথায় চলেছ ভাই?’ কবমু তার সব কথা জানিয়ে বলল, ‘আমার কবম কপাল বাম, করম ঠাকুবকে খুঁজতে বেবিয়ে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি, আব হাঁটতে পাবছি না।’ ঘোড়াদের নেতা দুঃখ প্রকাশ করল, বলল, ‘তোমার এই দুঃসময়ে তোমাকে সাহায্য করতে না পাবার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তবু আমাদের কথা করমঠাকুরকে জানিয়ে, এক যুগ আমাদের কোন গলা-গুঁসাই নেই, কোন্ দোষে আমাদের এই দুর্দশা?’

সন্ধ্যা হয় হয়, হাঁটতে হাঁটতে কবমু যেখানে এসে পৌঁছুল, তারপর আর এগুনো যায় না। শুধু জল, থই থই জল। করমু কি করবে ভেবে পেল না, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে সে কাঁদতে শুরু করল। এই তবে সাত সন্মুদ্র তের নদী। এতো কাছে এসে ফিরে যেতে হবে, করম ঠাকুরের দেখা সে পাবে না? তার কাগুর শব্দে একটি ভাসন্ত কাঠের গুঁড়ি তার কাছে এগিয়ে এল; বলল কি হয়েছে ভাই, তুমি কাঁদছ কেন?’ করমু চমকে তাকিয়ে দেখল, তার সামনে প্রকাণ্ড হাল্লর ভাসছে। ভয় পেয়ে সে কিছুটা সরে বসল। হাল্লরকে কথা বলতে শুনে কবমু অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তারপর তাকে তার সব কথা খুলে বলল। শেষে বলল, ‘আমার করম কপাল বাম, তাই এতোটা পথ এসেও সাত সন্মুদ্র তের নদী পেরুতে পারলাম না।’

তখন হাঙ্গব বলল, 'তার জন্তু এতো ভাননা কিসেব ? আমাব পিঠেব ওপব চড়ে বস, আমি তোমাকে সমুদ্রুব পাব কবে দিচ্ছি।' কবমু বলল, 'তোমাকে বিশ্বাস কি, যদি মাঝ সমুদ্রুরে আমায় খেয়ে ফেল, তখন ?' হাঙ্গব বলল, 'আমাকে বিশ্বাস কব, আমিও তোমাব মতোই দুঃখী। আজ বাবো বছব ধবে আমি ডুবতে পাবছি না, আব কোন কিছু খেতেও পাবছি না। আমি তোমাকে পাব কবে দেব, তবে একটা শর্তে—কবম ঠাকুবের কাছ থেকে তুমি আমাব এই দুঃখেব কাবণ জেনে নিয়ে আসবে।' কবমু সন্মতি জানাল। হাঙ্গবটি ডেকে বলল, 'তবে এসো।' কবমু হাঙ্গবের পিঠে চড়ে বসল। তবতব কবে জল কেটে হাঙ্গবটি এগিয়ে চলল। ওপাবে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'তোমাব জন্তু আমি এখানেই অপেক্ষা কবব। শীগগিব ফিবে এসো।'

ওপাবে মাটিতে পা বেখে কবমুব আনন্দ আব ধবে না। দূব থেকে সে কবম ঠাকুবের নিবাসউদ্যান দেখতে পেল। কাছে পৌঁছে কবমু দেখল, কবম ঠাকুব অমৃতকুণ্ডে ডুবছেন অব উঠছেন। কবমুব যেন খবব তব নয় না। সেও অমৃতকুণ্ডে বাঁপ দিয়ে পাত্র সাতাব খেটে চলল, কবম ঠাকুবের কাছে পৌঁছে তাঁকে ছু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধবল। কবম ঠাকুব চাঁচিয়ে উঠলেন— 'কে আমায় ধবেছিস ছেড়ে দে; আমাব সাবা গা ছু কবে জ্বলছে—না ডুবলে আমি জ্বলে থাক হযে যাব।' কবমু বলল 'কে, তোমাব এই দশা কবেছে ঠাকুব, না বললে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না।' কবম ঠাকুব বললেন, 'কবমু নামে একজন চান্দা আমাব পূজো কবে 'পাস্তা ভাতে' ( বাসি ) 'পাননা' ( পাবণ ) না কবে গবম ভাতে পাবণ কবেছিল, তাবপব থেকে আমাব এই জ্বালা।'

কবমু কৈঁদে ফেলল, বলল, 'ক্ষমা কব ঠাকুব, ক্ষমা কব ঠাকুব, ক্ষমা কব, আমিই সেই কবমু। তোমাব কোপে পড়ে আমিও অনেক কষ্ট পেয়েছি। আমি তোমার পূজো কববাব জন্তু তোমায় নিয়ে খেতে এসেছি।' ঠাকুব বললেন, 'তুই আমায় অস্পৃশ্য কবেছিস, শীগগিব চলে যা তুই এখান থেকে।' কবমু যেন ডাক ছেড়ে কৈঁদে উঠল, বলল, 'তোমায় আমি কিছুতেই ছাড়ব না ঠাকুব। তুমি ছাড় আমাব কোন গতি নেই। তোমাকে না নিয়ে আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না।' কবম ঠাকুব যাবেন না, কবমুও ছাড়বে না। শেষ তক কবমু কবম ঠাকুরকে টেনে নিয়ে অমৃতকুণ্ডেব পাড়ে তুলল।

সেদিন ভাদ্রমাসের পার্ব্বৈকাদশী তিথি। আকাশে একাদশীব চাঁদ, ঝিবঝিব



করে আলো ঝরে পড়ছে। দু' একটা হালকা মেঘ মাঝে-মাঝে টাঁদের মুখ ঢেকে দিচ্ছে! দু' একটা নিশাচর পাখির গলা পাখলানোর শব্দ করমুর কানে আসছে। করমু ঠাকুরের স্পর্শে যেন পবিত্র হয়ে উঠছে। সন্মুখে কবম ঠাকুর। পূজোর কোন উপকরণ নেই, শুধু ভক্তি আর দু'চোখের জল। করম ঠাকুর তুষ্ট হলেন। করমুর মাথায় হাত রাখলেন; আশীর্বাদ করলেন, 'আগেকার সম্পত্তির লক্ষণ সম্পত্তি ফিরে পাবি। সুখ আর শান্তি তোর সংসারে অচল হবে।' করমু অশ্রু-ভেজা কণ্ঠে বলল, 'ঠাকুব, তুমি না গেলে আমি কিছুতেই সংসারে ফিরে যাব না। আমি এইখানেই পড়ে থাকব আর তোমার পূজো করব।' করম ঠাকুর তার মাথায় শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, 'পাগল আর কি, আমি কি আর যেতে পারি রে, তুই ঘরে ফিরে যা। আমি সব সময় তোর সঙ্গে থাকব, যখন দরকার পড়বে আমায় ডাকিস। আর শোন, এই যে গাছটি দেখছিস না, যার তলায় আমরা বসেছি, আজ থেকে এর নাম হবে করম গাছ। আজকের এই তিথি, ভাদ্রমাসের একাদশী তিথিতে এই গাছের ডাল আঙিনায় পুঁতে মদ-হাঁড়িয়া-পিঠে খেয়ে সারা রাত আত্মীয়-স্বজনের সাথে আনন্দ-নৃত্য করবি। পরের দিন সকালবেলা নিয়মমতো বাসি ভাতে পারণ কবে অনুষ্ঠান শেষ করিস।'

কথা শেষ করে করম ঠাকুর যেই আবার অমৃতকুণ্ডে নেমে যাবেন, করমু আবার তাঁকে টান দিল। বলল, 'ঠাকুব, রাত্তায় আসবাব সময় অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে; তারা সবাই আমার মতোই কষ্ট ভোগ করছে। ওরা আমার পথ চেয়ে বসে রয়েছে, ওদের দুঃখের কারণগুলো না বলে দিলে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না।' করম ঠাকুর বললেন, 'পরের কথায় কাজ কি, তুই তোর সব পেয়েছিস, ফিরে যা।' করমু বলল, 'তা হয় না ঠাকুর, ওরা যে আমার পথ চেয়ে বসে থাকবে।' তখন করম ঠাকুর দৈব ধরে করমুর মুখ থেকে খড-মাথায় মালুঘটিব, ডুমুর গাছের, পুকুরের, গাভীদলের, বড়ির, ঘোড়াদের এবং সবশেষে হাঁপরের কথা শুনলেন এবং ওদের দুঃখের কারণ-গুলোও করমুকে বলে দিলেন। করমু সাষ্টাঙ্গে ঠাকুরকে প্রণাম করল। ঠাকুর অমৃতকুণ্ডে নেমে গেলেন। করমু উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পথ ধরল।

বারতি-রা, শুনছ তো সব। পূজোর নিয়ম শুনলে, অনিয়ম করলে তার কি কল ফলে তা'ও শুনলে। করমু এবার ঠাকুরের পূজো শেষ করে ঘরে

ফিরছে, তোমরা ঠাকুরকে ফুল দাও। (এই সময় চার পাশ থেকে বাবতি বা ডালাব ফুল কবম ডাল দুটোব ওপব ছুঁড়ে দেয়।)

বারতি-বা শোন। কবমু আনন্দে ডগমগ হয়ে ছুটেতে ছুটেতে সমুদ্রেব ধাবে এসে পৌঁছল। এদিকে হাঙ্গব অপেক্ষা কবে আছে, কখন কবমু ফিবছে, কবমুকে দূব থেকে দেখে হাঙ্গব জিগোস কবল, ‘ভাই কবমু, আমাব দুঃখেব কাবণ কি জেনে এলে আমায় সব খুলে বল, নইলে আমি স্বস্থি পাচ্ছি না।’ কবমু হাসতে হাসতে বলল, ‘ধীবে বন্ধু, অত আতুব শলে কি চলে? আগে আমায় ওপাবে পৌঁছে দাও, তাবপব আমি সব কথাই খুলে বলব।’ হাঙ্গব কিছুতেই বাজি হয় না। তখন কবমু বুঝিয়ে বলল, ‘তোমাকে যদি এংনই সব কথা খুলে বলি, তাহলে তুমি জাল ডুবে যাবে, আমি হাব পাব হও পাবব না।’ হাঙ্গব কি যেন ভাবল, তাবপব বলল, ‘ঠিক আছে এসো, ওপাবে গিয়ে কিন্তু বলতেই হবে। কথা দিচ্ছ?’ কবমু ষাড নেড়ে সম্মতি দিল। তবতব কবে করমু হাঙ্গবেব পিঠে চড়ে ওপাবেব ডাঙায় গিয়ে পৌঁছল। হাঙ্গবেব পিঠ থেকে নেমে কবমু বলল, ‘হাঙ্গব ভাই, বাবে বচব আগে এক বাজবন্তাকে তুমি গিলে খেয়েছিলে, মনে পড়ে?’ হাঙ্গব কিছুক্ষণ ভাবল, তাবপব বলল, ‘হ্যা, মনে পড়ে।’ কবমু বলল, কবম ঠাকুর বলেছন, অই বাজবন্তাব গলায় ছিল ‘শতেশ্ববী’ (শতনবী) হাব। সেই হাব তোমাব পেটে এংনো আছে। ওটি ডগবে ফেলে বামুন-বোষ্টমকে দান কবলেই তুমি ডুবেতে পাববে আর সব কিছু খেতে পাববে।’ এই কথা বলতে না বলতেই হাঙ্গবটি একটি শতেশ্ববী হাব ডগবে ফেলল। বলল, ‘কবমু ভাই, বামুনবোষ্টম কোথায় পাব, তুমিই আমাব বামুনবোষ্টম, তুমিই এটি নাও।’ কবমু হাবটি হাতে তুলে নিল। ‘বিদায় কবমু ভাই’ বলতে বলতে হাঙ্গবটি জলে ডুবে গল। কবমু ‘বিদায়’ বলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

কবমু এবাব মহা উৎসাহে ঘবমুখো ছুটে চলল। ষোডাদেব দলপতি কবমুকে দূবে দেখতে পেয়ে ছুটেতে ছুটেতে এগিয়ে গল। বলল, ‘কবমু ভাই, আমাদেব কিছু কথা করম ঠাকুরেব কাছ থেকে পেয়েছ কি?’ কবমু বলল, ‘পেয়েছি’। ঠাকুর বলেছেন, তোমাদেব বাখানেব (গোষ্ঠেব) উত্তরকোণে অজস্র মনি মানিক্য পোতা রয়েছে, সেগুলো কোন বামুনবোষ্টমক দান কবলে তোমাদেব গলা শুঁদাই জুটবে, আশ্রয়ও মিলবে।’ ষোডাদেব শিরোমণি বলল, ‘বামুনবোষ্টম আব কোথায় পাব, তুমিই সেগুলো খুঁড়ে নাও, করমু

ভাই ; সব তোমাকে দিলাম।’ করমু খুশি হয়ে গর্ত খুঁড়ে দেখে রাশি-রাশি মণি-মাণিক্য। ওর যেন আনন্দ ধরে না। এতো মণি-মাণিক্য নিয়ে যাবে কি করে, করমু যেন চিন্তিত হল। ঘোড়াদের দলপতি বলল, ‘ওগুলো আমাদের পিঠে তুলে দাও ; অত্র গলা-গুঁসাঁইতে কাজ নেই, আমরা তোমার সাথেই যাব।’ করমু অত্র ঘোড়ার পিঠে মণি-মাণিক্য তুলে দিয়ে নিজে দলপতির পিঠে চড়ে ঘরমুখে চলতে লাগল। ( বারতি-রা আবার পুষ্পাঞ্জলি দেয়, কেননা করমু করম ঠাকুরের রূপায় ধনবান হয়ে ঘরে ফিরছে। )

এবার পথে পড়ল গরুর পাল। শির গরুটি করমুকে ঘোড়ার পিঠে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হল। বলল, ‘তুমি তাহলে করম ঠাকুরকে পেয়ে গেছ করমু ভাই। করম ঠাকুর আমাদের আদ্যশ শূনে কি বললেন, শীগগির বল।’ করমু বলল, ‘তোমাদের বাথানের দক্ষিণ কোণে ঘড়াভরতি মোহর রয়েছে, সেগুলো যদি কোন বামুনবোষ্টমকে দান কর, তাহলে তোমাদের গলাগুঁসাঁই এবং আশ্রয় সব জুটবে।’ শির গরুটি ঘোড়াদের মতোই করমুকে মোহরগুলো খুঁড়ে নিতে বলল। করমু মোহরগুলো মাটি খুঁড়ে বের করল আর ঘোড়াব পিঠে তুলে এগুতে শুরু করল। শির গরুটি বলল, ‘করমু ভাই, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব, আমাদের তুমি সঙ্গে নাও।’ বারতি-রা এবার করম ঠাকুরকে ‘দুধ ঢাল’ দাও। বারতি-রা পাত্র থেকে দুধ গড়িয়ে দেয় করম ডালের গায়ে। )

বারতি-রা শোন। করমু ঘোড়ার পিঠে চড়ে সেই বুড়ির কুটিরে এসে পৌঁছল। বুড়ি বলল, ‘করমু বাছা, আমার কথা বল রে ; আমি যে আর পারছি নে।’ করমু বলল, ‘কবে কোন্কালে তুমি কোন্ বিড়িখোরকে এক ‘তিত্‌কি’ (কাঠি) আশুন দাও নি, বরং উণ্টে উছনের আশুনের কাঠে লাখি মেরেছিলে, তাই তোমার পা-ও পোড়ে না, ধানও সেদ্ধ হয় না আর চিংড়ি মাছ বাছাও শেষ হয় না। তোমার উছনের তলায় তোমার পূর্ব-পুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তি রয়েছে ; সেগুলো বামুনবোষ্টমকে দান কোর, তুমি ভালো হয়ে উঠবে।’ বুড়ি বলল, ‘করমু, তুই খুঁড়ে নে বাছা। বামুন-বোষ্টম কোথায় খুঁজব, তুই-ই আমার বামুন-বোষ্টম।’ উছন খুঁড়ে টাকাকড়ি নেবার পর বুড়ি আবার ভালো হয়ে গেল। তার পা উছন থেকে টেনে নিল, ধান সেদ্ধ হল আর চিংড়ি মাছ বাছাও শেষ হল। বারতি-রা শবুগর ঘরে গিয়ে উছনের মুখে লাখি মের না যেন কিংবা কেউ আশুন চাইলে তাকে আশুন দিতে ভুলো না।

বুড়ির দশা দেখলে তো ; দাও, এবার ফুল দাও । ( বারতিরা আবার ঝাঁজলাভরতি ফুল ছুঁতে দেয় করম ঠাকুরের পায়ে । )

করমুর এখন প্রচুর ধনসম্পত্তি । ঘোড়াব পিঠে চড়ে আবার পথ চলতে শুরু কবল । সঙ্গে ঘোড়া এবং গরু পাল । এবার সম্মুখে পড়ল সারিসারি ডুমুর গাছ । কবমুকে দেখে ওবা সবাই একযোগে প্রশ্ন কবল, ‘করম ঠাকুরকে পেয়েছ ? আমাদের আদ্যশ শুনে কি বললেন ?’ কবমু বলল, ‘ঠাকুর বলেছেন, তোমাদের সবচেয়ে পূর্বনো গাছটিব গোড়ায় কিছু অর্থ লুকানো রয়েছে । এইগুলো কোন বামুন-বোষ্টমকে দান কবলে কাকপক্ষী তো ফল খাবেই, মানুষও খাবে ; ফলে আর পোকা থাকবে না ।’ বুড়ো গাছটি করমুকে ডেকে বলল, ‘বামুন-বোষ্টমের অপেক্ষায় থাকতে পারব না ভাই । তুমি এগুলো নিয়ে যাও, আমাদের কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দাও ।’ করমু গাছের গোড়া খুঁড়ে সমস্ত লুকানো অর্থ ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল । ডুমুরের ফল হাতে তুলে নিয়ে ভেঙে দেখল, আর পোকা নেই । বারতিরা, করম ঠাকুরের গল্প শুনছো তো ; এবাব ঠাকুরকে ফল দাও । ( বারতিরা সংগৃহীত হবিতকী এবং বেল ফল করম ডালের গোড়ায় ঝাঁজলা কবে ছুঁতে দেয় । )

করমু আবার পথ ধরল । দুব থেকে পুকুরের জল চিকচিক কবছে দেখতে পেল । পুকুরের জল ছলাং ছলাং কবে প্রশ্ন করল, ‘করমু, করম ঠাকুরের কাছে আমার আদ্যশটা কি জানিয়েছিলে ভাই ?’ করমু বলল, ‘তোমার ঘাটেব বড় পাথরের তলায় একটি মাণিক লুকানো রয়েছে, সেটি কোন বামুন বোষ্টমকে দান করে দিও—তোমাব জলে আর পোকা থাকবে না ; গরু-বাহুর মানুষ সবাই তোমাব জল খাবে ।’ পুকুরটিও অল্পদেব মতোই করমুকে মাণিকটি নিতে বলল । কবমু খুশি হয়ে পাথর সবিয়ে মাণিকটি তুলে নিল । তারপর ঝাঁজলা ভরে জল তুলে দেখে জলে আর পোকা নেই ; ঢকঢক করে ঝাঁজলার জল খেল কবমু । গরুবাহুর ঘোড়াব পাল সব ধীরে ধীরে পুকুরে নেমে জল খেয়ে তৃষ্ণা দুব কবল । বারতিরা, এবাব করম ঠাকুরকে ‘জল ঢাল’ দাও । ( বারতিরা করম ডালের গোড়ায় জল ঢেলে দেয় । )

কবমু ক্রমশঃ বাড়ির কাছাকাছি এগিয়ে আসছে । খড়ের বোঝা মাথায় লোকটিকে যেখানে ছেড়ে গিয়েছিল, দেখল তার প্রতীক্ষায় সেখানেই চক্র কাটেছে । কবমুকে ঘোড়ার পিঠে দেখে সে নিজের চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না । তাছাড়া এতো এতো গাইগরু ঘোড়ার পাল আর

ধনসম্পত্তি দেখে লোকটি বলল, ‘ভাই, ঠাকুরের কাছ থেকে আমার কথা কিছু কি জানতে পাবেছ?’ করমু বলল, ‘তুমি কবে কার মাথায় খড়ের কুটো দেখাব পরও তাকে তা বলে দাওনি; তাই তোমার এত দুর্দশা।’ লোকটি সব কথা স্বীকার করে নেওয়ার পর খড়ের বোঝা সে তার মাথা থেকে সরিয়ে নিচে নামাতে পারল। বারাতরা শুনছ তো, কাবো মাথায় খড়ের কুটো দেখেও তাকে না বলে দেওয়ার কি দুর্দশা! দেখো, যেন তোমরা কখনো এ ভুলটি না কর।

করমু এবার দু’চোখে তাব গাঁয়েব ছবি স্পষ্ট দেখতে পেল। কবমু সাথে গরু পাল ঘোড়াব পাল দেখে কেউ বিশ্বাস কবতে পাবেনি, সত্যি সত্যিই করমু ফিবে আসছে। হুব, করমু এতো গরু এত ঘোড়া কোথায় পাবে; যে খেতে পায় না. সে এসব পাবে কোথায়! কিন্তু যখন কবমু তাবের কাছে পৌঁছল, তারা দেখল কবমু সাথে শুধু গরু আব ঘোড়াব পালই নয়, ঘোড়ার পিঠে মোহর টাকাকড়ি মণিমাণিক্যের ছালা। কবমুকে ওঝা ঘিরে ধরল: কোণায় পেল তুমি এসব, কে দান কবেছে। কতো লোকের কতো কথা। কবমু তখন ওদের বুঝিয়ে বলল, ‘এগুলো সব কবম ঠাকুরের দেওয়া। ভক্তি ভাবে যে পূজো কবে, সে ধনসম্পত্তি পায়; হাসি-আনন্দও পায়।’ তাবপর কবমু ঘবে সে কি আনন্দউৎসব, হইছল্লাও! সাতদিন ধবে তাব ঘবে করম ঠাকুরের পূজো হল। হাঁড়িয়া আব মদ, মাদল আব ধম্‌সাব বাজনা, আনন্দ-উচ্ছ্বাসিত গান আব সাবা বাত ধবে নৃত্য।

বারতির শোন, ভক্তিভাবে যে পূজো কবে সে করমুর মতো ধনসম্পত্তি পায়, আনন্দ পায়। তোমরা সবাই ভক্তিভাবে পূজো করে করম ঠাকুরকে তুষ্ট কর; তোমরাও সব পাবে। বারতির এবার করম ঠাকুরকে সব ফুল দিয়ে তাঁকে শ্রণাম কর। (বাবতিবা ডালার বাকি ফুলগুলো টেলে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে শ্রণাম কবে।)১”

ব্রতকথাটি ধলভূমের চাকুলিয়া থানাব গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত। কবম পূজোর সময় ব্রতকথাটি যেভাবে কথিত হয়ে থাকে, এখানে যথাসাধ্য সেই ভঙ্গিটাই বজায় রাখার চেষ্টা কবা হয়েছে; শুধু ঝাড়খণ্ডী উপভাষার পরিবর্তে শিষ্ট

১ বঙ্কিম মাহাত্ম : ধলভূমে করম পরব (২)—ব্রতকথার কাহিনী; রবিবারের স্বাধীনতা ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২

বাংলায় পরিবেষণ করা হইল। এই একই ব্রতকথা যে সর্বত্র কথিত হয়ে থাকে, তা নয়, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহিনীর ঘটন-সংস্থানে পার্থক্য এবং বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে কাহিনীগত এই পার্থক্যের কাবণ, প্রতিটি সম্প্রদায়ই সংস্কৃতিগতভাবে নিজেদের মধ্যে একটা সীমারেখা টানার চেষ্টা করে থাকে, যদিও আচাবঅমুঠানে বা কথাবস্তুতে খুব একটা পার্থক্য লক্ষ্যগোচর হয় না; মৌল স্মৃতি সর্বত্রই প্রায় অভিন্ন বলা যেতে পারে। C. H. Bompas তাঁর Folklore of Santal Parganas গ্রন্থে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত যে কবমকথা পরিবেষণ কবেছেন, কেউ কেউ তাকেই মৌলিক এবং প্রামাণ্য বলেছেন। বম্পাস সাহেব যে-কাহিনী পরিবেষণ কবেছেন, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সম্ভবতঃ এটি কাহিনীর সাবনিয়াস মাত্র। বিশদ বিবরণের দিক দিয়ে এই কাহিনীকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। কবম ঠাকুরের গায়ে গবম ভাতেব ফেন অজ্ঞাতসাবে ছুঁড়ে ফেলার কথা ধলভূমেও শোনা যায়, তারই ফলে কবম ঠাকুরের গাত্রদাহ শুরু হয়। করম ঠাকুরের কোপে কবমের সর্বনাশ হয়। বম্পাস সাহেব শুধু নিয়াসটুকু দিয়ে বলেছেন যে, বহুকাল অত্যন্ত দুঃখে-কষ্টে দিনযাপন কববার পর কবমু আবার কবম ঠাকুরের কৃপা লাভ কবেছিল। কিন্তু কবম ঠাকুরের কৃপালাভের পথে যে দুঃগকষ্টপূর্ণ কাহিনী তার কোন উল্লেখ নেই। আমাদের পবিবেষিত ব্রতকথা কিংবা উক্তের স্মৃতির কুমার কবণ পবিবেষিত কাহিনীতে কবমের ড্র্যাড-ভেঙ্কাবে যে স্মৃতি লোককথা প্রকাশ পেয়েছে, তাই কণামাত্রও বম্পাসে দেখা যায় না। তবে ড্রা কবণ পবিবেষিত কাহিনীতে সদাগর, লক্ষ্মী, সিদ্ধদাতা গণেশ আদির অস্ত্রপ্রবেশ কাহিনীটিকে অনেক বেশি হিন্দুপ্রভাবপুষ্ট কবে তুলেছে। আমাদের পবিবেষিত কাহিনীর মধ্যে বামুনবোষ্টমেব উল্লেখ ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের কথা প্রমাণ কবে, তবে এই প্রভাব যে খুবই সাম্প্রতিক কালের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কবম ব্রত যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন কবেছিল, তাই প্রমাণ অর্বাচীন ভবিষ্যপুবাণে এবং অস্তুভুক্তি। মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু কবে সমগ্র অরণভূমি ব্যাডথগে এই উৎসব অত্যন্ত প্রাণচাঞ্চল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রী প্রফুল্ল চরণ চক্রবর্তীর 'ব্রত ও আচাব' গ্রন্থ থেকে জানা যায় কবম ঠাকুরের প্রভাব পূর্ব মৈয়মসিংহ অঞ্চলেও পড়েছে, যদিও ওখানকার ব্রতকথাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভবিষ্যপুবাণে করম-কাহিনী পাওয়া যায় বলে অনেক কবমব্রতের ওপর হিন্দু

সংস্কৃতির সরাসরি প্রভাবের কথা বলে থাকেন ; কিন্তু কথাটি মোটেই বিশ্বাস-যোগ্য নয় । বহু জনপ্রিয় লৌকিক ব্রত হিন্দু পুবাণে অংশলাভে সমর্থ হয়েছে । সত্যপীষের পূজার জনপ্রিয়তাকে অনুসরণ করে সত্যনারায়ণ ব্রতের সৃষ্টির কথা সবাবই জান । যে-কোন ব্রত বা পূজাহুষ্ঠানে যৎসামান্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলে তাকেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুরাণের অস্তিত্ব ববেছেন ; এই ভাবেই করম-ব্রতও ভবিষ্যপুবাণে স্থান লাভ কবে ।

ব্রতকথা লোককথাবই অঙ্গবিশেষ , ব্রতকথা পূজা এবং আচার-অহুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, লোককথা মনোরঞ্জনের সঙ্গে জড়িত— এই সামান্য পার্থক্য ছাড়া উভয়ের মধ্যে চরিত্রগত কোন কান অমিল দৃষ্টিগোচর হয় না । কবমকথাতে লোককথার সব বকম বৈশিষ্ট্যই বর্তমান । তাই Stith Thompson এম Motif Index অনুসারে কবমকথাও অভিপ্ৰায় বিশ্লেষণ কবা যেতে পাবে । কবমকথার মধ্যে সর্বাগ্রেই যে অভিপ্ৰায়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে তা হল কবম্বুর ভাগ্যবিপয় (Reversal of fortune), করম ঠাকুরের কোপে পড়ে করম সর্বস্বান্ত হয়ে অত্যন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ কবে । দ্বিতীয়তঃ নিষেধাজ্ঞা বা বিধি নিষেধ (Taboo), কবম-ব্রতের পাবন ‘পাখাল’ (প্রক্ষালিত) বা বাসি ভাতে কববার নিয়ম, কবম এই নিয়মের ব্যাঘ্য কবে গবম ভাতে পারণ কবে-ছিল বলে তার ভাগ্যবিপয় ঘটেছিল । তাছাড়া খড়ের বোঝা মাথায় লোকটি, উন্নুনে পা দেওয়া বুড়িও একই কারণে কষ্টভোগ কবেছিল । ঝাড়খণ্ডে কাবো মাথায় খড়কুটো দেখলে হয় টেনে ফেলে দিতে হয় নয় লোকটিকে বলে দিতে হয়, লোকটি এই নিয়ম মানে নি বলে এই শাস্তি পেয়েছিল । কেউ আশুনে চাইলে প্রত্যাগ্যান কবতে নেই, উন্নুনের মুখে দেবতা থাকেন বলে উন্নুনে লাধি মাবতে নেই, বুড়ি এই নিষেধ মানে নি বলে দুঃখ ভোগ করেছে । তৃতীয় অভিপ্ৰায় হল সুযোগ এবং ভাগ্য (Chance and Fate), কবম করম ঠাকুরের কোপে পড়লেও শেষতক অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ কববার পব লক্ষণ সম্পত্তি লাভে সমর্থ হয়েছিল । চতুর্থতঃ বিস্ময় (Marvel); কাহিনীটি আগাগোড়াই বিস্ময়ে ভবাঃ মাথা থেকে লোকটির খড়ের বোঝা নামাতে না পাবা, উন্নুনের আশুনে বুড়ি প না পোড়া, ধান সেক না হওয়া, চিংড়িমাছ বাছা শেষ না হওয়া, হাঙ্গরের জলে ডুবতে না পারা ইত্যাদি । পঞ্চমতঃ গাছ পুকুর, গরুর পাল, ঘোড়ার পাল, হাঙ্গর ইত্যাদি বাক্শক্তি Talking Tree, Animal etc বা বাক্শক্তিসম্পন্ন বৃক্ষ, প্রাণী ইত্যাদি অভিপ্ৰায়ের অন্তর্গত ।

যশ্ৰত: ইঞ্জৰাল বা ভোজবাজি (Magic); শতেশ্বৰী হাৰ উগৰে ফেলতেই হাঙ্গৰ ডুবতে পেৰেছে, ধনসম্পদ দান কৰাৰ ফলে গৰুৰ পাল, ঘোড়াৰ পাল, বুড়ি, পুকুৰ, ডুমুৰ গাছ, বোকা-মাথায় লোকটি—সবাই দুৰ্দ্ধশামুক্ত হতে পেৰেছে; সমস্ত যেন ভোজবাজিৰ মতো নিমেষেৰ মধ্যেই ষটে গেছে। ব্ৰহ্মকথাটিৰ মধ্যে আৰো কিছু বিষয় আমাদেৱ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। কাহিনীটি সম্পূৰ্ণত: কৃষকজীবননিৰ্ভৰ। সুদূৰ অতীতে গৰু, ঘোড়া আদি গৃহপালিত প্ৰাণীগুলো বহু প্ৰাণীৰ মতো অৱণ্যে ঘূৰে বেড়াত। কাহিনীটিতে আদিম মানুহেৰ বহু প্ৰাণীকে গৃহপালিত কৰে তোলাৰ ইঙ্গিত আছে। ভাসমান হাঙ্গৰেৰ উপাখ্যানে হাঙ্গৰমুখো নোঁকোৰ সাহায্যে আদিম মানুহেৰ সমুদ্ৰ বিচৰণেৰ আভাস থাকলে আশ্চৰ্যেৰ কিছু নেই। আদিম মানুহ সাধাৰণত: নদী বা ঝৰণা থেকে জল সংগ্ৰহ কৰত; এই জলই তাৰা পাবিত্ৰ এবং পানীয় মনে কৰত। কূপ পুষ্কৰিণী কৃত্ৰিম, তাই তাৰ জল ব্যবহাৰ সম্পৰ্কে সাধাৰণ মানুহেৰ দ্বিধা পাকা স্বাভাবিক; এখনো দেবপূজা কৰে পুকুৰেৰ প্ৰতিষ্ঠা না কৰা হলে কেউ জল পান কৰে না। ডুমুৰেৰ ফলেৰ ভেতৰ সাধাৰণত: পোকা বিজবিজ কৰে; আসলে বুনো ফল খাণ্ডদ্রব্য হিসাবে গ্ৰহণ কৰাৰ কথাই ডুমুৰ ফলেৰ প্ৰসঙ্গে ফুটে উঠেছে। বুড়ি এবং বোকা-মাথায় লোকটিৰ কাহিনীটিতে লোকবিশ্বাস এবং সংস্কাৰেৰ বিশিষ্ট ভূমিকা আছে; আদিম সমাজে সংস্কাৰ, বিশেষভাবে কুসংস্কাৰ, জীবনচযা নিয়ন্ত্ৰণ কৰত। এখানে এই সংস্কাৰ বা বিধিনিষেদ মানা যে যে-কোন লোকেৰ পক্ষে কল্যাণকৰ, তা লোকটিৰ এবং বুড়িৰ দুৰ্দ্ধশা থেকে সাধাৰণ মানুহকে বোকাবাৰ চেষ্টা কৰা হয়েছে বলে মনে হয়।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### পুৰাণকাথ

আদিম মানব বিশ্বচৰাচৰেৰ মধ্যে আশ্চৰ্য জীবজন্তু, গাছপাৰ্কা এবং দুৰ্জেৰ ষটনাবলীৰ সংঘটন দেখে বিশ্বয়াবিষ্ট হয়ে তােদেৰ অদিকশিত বুদ্ধিৰ সাহায্যে ষাখ্যা কৰবাৰ চেষ্টা কৰেছিল অজ্ঞ অবাস্তব কাহিনীসৃষ্টিৰ মাধ্যমে।



ইংরেজীতে এই শ্রেণীর কাহিনীকে Myth বলা হয়, বাংলায় একে পুরাকথা বলা চলে। ঝাড়খণ্ডে এই শ্রেণীর কাহিনীকেও ‘গল্প’ বা ‘কহনী’ বলা হয়। পুরাকথা প্রধানতঃ দেবদেবীগণের কার্যকলাপকে উপজীব্য করেই গড়ে ওঠে। Myth শব্দটি গ্রীক শব্দ Mythos থেকে উৎপন্ন হয়েছে; এর অর্থ ‘কোন কিছু বলা’ অর্থাৎ মুখ দিয়ে উচ্চারিত কথা, ভাষণ বা কাহিনী। কিন্তু বিশিষ্ট প্রয়োগের ক্ষেত্রে Myth দেবদেবীগণের কার্যকলাপকেই বোঝায়। পুরাকথা দেবদেবীগণকে অবলম্বন করে রচিত হয়ে থাকে বলে পুরাকাহিনী এবং ধর্ম-ভাবনা খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাধা পড়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ধর্মভাবনা সম্পূর্ণতঃ আদিম প্রকৃতির, যখন ধর্মের মধ্যে বিশ্বাসের চেয়ে আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীকায়িত ক্রিয়াকাণ্ডের গুরুত্ব ছিল সমধিক। আচার-অনুষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় রীতিবিশেষ; দেবতারা একদা যে-ভাবে ঐন্দ্রজালিক এবং অলৌকিক কার্যাবলী সম্পন্ন করতেন, আচার-অনুষ্ঠান তারই অমুকরণ-মাত্র—এর পশ্চাতে লোকবিশ্বাস এই যে, এর সাহায্যে দেবতাদের মতোই অলৌকিক এবং ঐন্দ্রজালিক কার্যাবলী সম্পন্ন করা যায়। এই বিশ্বস্ত অমুকরণের সাহায্যে যে আচার পালন করা হয়, তা ঐন্দ্রজালের রূপ লাভ কবে। কাজেই আদিম ধর্ম-ভাবনা বলতে বিশেষভাবে জীবনচর্চার উপকরণের ক্ষেত্রে মানুষ দেবতাদের মূল কাণ্ডাবলীভুক্তিভাবে যে-বিশ্বস্ত অমুকরণ করত, তাইকেই বোঝায়। আদিমতম ধর্ম, নিশ্চিতভাবে বলা চলে, আচার-মূলক ছিল। কিন্তু পুরাকথা ঠিক তা নয়। Myth, on the other hand, is in the strict sense of the term, the description of a rite, its story, the narrative linked with it. Not only so, but it possesses a mysterious virtue of its own as occasionally handing down those words of power supposed to be uttered by the god when he first celebrated the rite in question.<sup>১</sup> পুরাকথা আচারের বিবরণেব সঙ্গে সম্পর্কিত কাহিনীটিও প্রকাশ কবে থাকে। শুধু তাই নয়, পুরাকথার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট আচারটি পালনের সময় দেবতা যে সব কথা উচ্চারণ কবে-ছিলেন, তা নিহিত রয়েছে বলে কল্পনা করা হয়; তাই পুরাকথাতে একটি রহস্যময় পাবিত্রতাও সংশ্লিষ্ট থাকে। তাছাড়া পুরাকথা কোন আচার বা

সংস্কারের কোন ব্যাখ্যা দেয় না, শুধুমাত্র আচার বা সংস্কারটিকে বিবৃত করাই এব লক্ষ্য।

পূবাকথায় গ্রহণবর্জনের কোন স্থান নেই। এব ফলে পূবাকথা তাব ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা হাবিয়ে ফেলতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। Myth is, in its earliest form, the description of such rites, the story of them, “the book of words” which accompanies the dramatic representation of ritual. It jealously adheres to the letter and circumstance of that which it narrates or describes. To alter it in anyway is thought to destroy its magical or super-natural efficacy.<sup>২</sup>

পূবাকথায় আদিম মানুষের যে-চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছে, তাকে মোটেই সংগত বা যুক্তিপূর্ণ বলা চলে না। আদিম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি শিশুর মতোই সরল এবং অপরিণত ছিল; স্বভাবতঃই যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষাও তাদের আয়ত্তে ছিল না, তাই নিজেদের অভিজ্ঞতাকে বিচারবুদ্ধিব কষ্টপাণবে যাচাই করতে পাবত না, বরং কল্পনার রঙের যথেষ্ট অবলেপে অভিজ্ঞতাকে ভ্রমাত্মক এবং বিকৃত করে তুলত।

পৃথিবীর বহু রহস্যের ব্যাখ্যা করতে না পেরে আদিম মানুষ ভীতসঙ্কল্প হয়ে পড়ত এবং ভীতি-উৎপাদক বহুস্ময় বস্তুগুলোর মধ্যে অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত ক্ষমতাব অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে মানুষের মতোই জীবন্ত এবং সচেতন বলে মনে কবত। শুধু তাই নয়, তারা প্রতিটি প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে প্রাণ বা আত্মার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করত। এই বিশ্বাসকেই পণ্ডিতমণ্ডলী Animism বা সর্বপ্রাণবাদ নামে অভিহিত করেছেন। এই বিশ্বাসের জন্মই দেখা যায়, লোককথা ব্রতকথা এবং পুরাকথার মধ্যে পাথর-পাহাড় গাছপালা নদী-পুষ্করিণী জীবজন্তু সমস্তই মানুষের মতো কথা বলছে এবং মানুষের মতোই আচরণও করছে। অর্থাৎ আদিম মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুতেই ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছিল। এই সর্বপ্রাণবাদ থেকেই দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে। প্রাণময়

সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুই তখন দেবত্ব লাভ করতে শুরু করে। দেবত্বের ক্রম-বিকাশ প্রসঙ্গে অনেক ক’টি মত প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন গুণাবলীর স্মৃতিতে অচলিত ব্যক্তিপূজা থেকে দেবতার উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে; পূর্বপুরুষের পূজা, ঝাড়খণ্ডে যাদেব ‘বুঢ়াবুঢ়ী’ বলা হয়, এই ভাবেই চল হয়ে থাকে সম্ভব। দ্বিতীয় মত অনুসারে, প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তি থেকে দেবত্বের বিশ্বাসের সূত্রপাত; এই ভাবেই মেঘ-বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুৎ-অগ্নি এবং বিশিষ্ট বৃক্ষসমূহ (ঝাড়খণ্ডের করম পূজা), জীবজন্তু (ঝাড়খণ্ডের গো-মহিষের পূজা) আদি দেবত্ব অর্জন করে এবং পূজিত হতে থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, আদিম উপজাতিদের টোটেম বা কুলকেতুব প্রতি দেবত্ব আবেপের ফলেই দেবতার উদ্ভব ঘটেছিল। ঝাড়খণ্ডে টোটেম বা কুলকেতু যে দেবত্বের মর্ষাদা লাভ করে আসছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই; সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের কুলকেতুকে দেবতাজ্ঞানেই পারহার করে চলে। কুলকেতুব কোনরকম ক্ষতি সাধিত হলে গোষ্ঠীর সামূহিক সর্বনাশ হতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে। চতুর্থ মত অনুসারে দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের মনের মধ্যেই সংগঠিত ছিল। আমাদের মনে হয়, এই সমস্ত মতবাদের কোনটিই সর্বাংশে সম্পূর্ণ নয়, আবার কোনটিই একেবারে অর্যোক্তিকও নয়। এই সমস্ত মতবাদকে একত্রে সমন্বিত করে বোঝবার চেষ্টা করা হলেই বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-উপজাতিদের প্রতিটি দেবতার উদ্ভব কাহিনীর ব্যাখ্যা করা সম্ভব, অগুণা কোন একটিকে অবলম্বন করলে তা একদেশদর্শী হয়ে পড়তে বাধ্য।

সর্বপ্রাণবাদেব বিশ্বাসভূমিকে অবলম্বন করেই যে দেবত্বের উদ্ভব ঘটেছে তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু প্রাণময় সচেতন প্রাকৃতিক বস্তুর যেসব গুণে আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, দেবত্ব আরোপের পর সেই সব গুণের কার্যকারিতা, তীব্রতা এবং অমোঘতা অসীমিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল.....It tended to reveal attributes essentially different from that of body—a supernatural and inexplicable quality of awe and might, associated with magical powers, which all spirits were thought of as possessing... ..<sup>৩</sup> দেবত্ব প্রাপ্তির পর প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে

অপ্রাকৃত এবং দুজ্জৈয় ভয় এবং ক্ষমতার যেমন বৃদ্ধি ঘটেছিল, তেমনি ঐন্দ্রজালিক শক্তিব্যবহারে অভাবনীয় কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত আরু তাই তাবা দেবত্ব-প্রাপ্ত প্রাকৃতিক বস্তুগুলোকে ভয়ে-ভক্তিতে এবং বিশ্বয়ে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে পরিহার করে চলত।

পুরাকথাতে বিবৃত দেবতাদের আবির্ভাব এই ভাবেই ঘটেছিল। এবার আমরা এই সব দেবতাদের কার্যকলাপের কাহিনীর উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখব। পুরাকথা শুধুমাত্র দেবতাদের বিচিত্র অলৌকিক কার্যাবলীর বিশ্বস্ত দলিলসর্বস্ব নয়; পুরাকথার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সৃষ্টিকথা, গ্রহনক্ষত্রের কথা, পাপপুণ্যের কথা, গাছপালা-জীবজন্তু পাহাড়পর্বত-নদীনালাস জলরহস্যের কথা আদি বিচিত্র বিষয়বস্তু স্থানলাভ করে থাকে। সর্বক্ষেত্রেই অলৌকিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। দেবতারা অলৌকিক অপ্রাকৃত ঘটনা সংঘটিত করতে পাবেন, যার ফল ব্যষ্টি বা সমষ্টি-জীবনে কল্যাণকর হয়। অলৌকিক ঘটনা-সংঘটনের জন্ম কিছু আচাৰেব বিশ্বস্ত অনুকরণ একান্ত প্রয়োজন, কারণ এছাড়া ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াবাণ্ডেব অবতারণা কবা সম্ভব হয় না। আমরা আগেই দেখেছি, পুরাকথা আচার-মূলক; কাহিনীর কোন কথা বা প্রসঙ্গ গ্রহণ বা বর্জন নিমিত্ত। পুরাকথার উদ্ভব আচাৰ-অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করে ঘটে-থাকা খুবই স্বাভাবিক। ঝাড়খণ্ডের কৃষি-ভিত্তিক বিভিন্ন উৎসব এবং পূজানুষ্ঠানের আচারগুলোর কথা স্মরণে রাখলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বৃষ্টি ফসল ইত্যাদির কামনায় এই আচারগুলো পালিত হয়, প্রয়োজন পড়লে জীববলির রক্তও দেব ঠাকে দেওয়া হয়। এই সব আচারই এখানকার পুরাকথাব ভিত্তি রচনা করেছে। সর্দার-সামন্ত-রাজাদের আচারজীবনের পুরাকথা লোককথায় পরিণত হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বরং বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মতে বাস্তবে এই ঘটনাটিই ঘটেছে; তাই লোককথাকে broken down myth হিসাবেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

গল্প বলা বা রচনার ঝোঁক মানবসমাজের সর্বস্তরে লক্ষ্যগোচর হয়। তাই পুরাকথার উদ্ভব এবং বিকাশ প্রসঙ্গে গল্প বা কাহিনী রচনার ঝোঁকের কথা বিশ্বস্ত হলে চলবে না। আদিম মানুষ যে-বস্তুই-ওফান ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি, সে বস্তুর সম্পর্কে সে অলৌকিক অপ্রাকৃত কাহিনী রচনা করে ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছে। জীবন এবং ভাগ্যানিয়ন্ত্রণকারী দুজ্জৈয় অপ্রাকৃত

শক্তিগুলোর ব্যাখ্যা সে এই উপায়ে ছাড়া আর কিভাবে করতে পারত ? আসলে এই কাহিনী আবিষ্কারের কৌঁক থেকেই পুরাকথার উদ্ভব হয়েছে বলে এর উপকরণ সরাসরি লোকথার উপকরণেও পরিণত হয়েছে। তবে পুরাকথা বা লোককথা যাই হোক না কেন, এক গোষ্ঠী থেকে অল্প গোষ্ঠীতে, এক সমাজ থেকে অল্প সমাজে প্রসারিত বা প্রচারিত হবার সময় বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সমাজের রীতিরেরওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণার বিভিন্নতার জন্ম কাহিনী-বয়নে এবং চরিত্রায়ণে পরিবর্তনসাধন খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে ; দু'টি গোষ্ঠীর জীবনচর্চার মধ্যে যদি স্মৃষ্টি পার্থক্য থাকে, তাহলে সমগ্র মূল কাহিনীর এবং চরিত্রাবলীর সম্পূর্ণ বর্জন এবং নবতর রূপায়ণও অসম্ভব নয়। ব্রতকথা প্রসঙ্গে আলোচিত করম-কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি স্মৃষ্টিভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাঁওতালী কাহিনী, আমাদের সংগৃহীত ঝাড়খণ্ডী উপভাষা-ভাষীদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী এবং পূর্ব মৈমনসিংহে প্রচলিত কাহিনী ও ভবিষ্যপুবাণে উল্লেখিত কাহিনীর মধ্যে এই কারণেই এত বেশি বিভিন্নতা এবং পার্থক্য দেখা গেছে।

শুধু যে আচারমূলক প্রতীকধর্মিতা থেকেই পুরাকথার উদ্ভব ঘটেছে তা নয় ; দু'টি বস্তুর মধ্যে তুলনা করবার প্রবৃত্তি বা সামুজ্য কল্পনা থেকেও পুরাকথার উদ্ভব ঘটে। ভাবসংহতির সাহায্যে আদিম মানুষ বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বার করত এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস পেত। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, *The most common and natural Consequence of analogy is identification. Because the wind, the sea, the fire move, they must, the savage supposes, be like men ; they must be persons, individuals.*<sup>8</sup> এই জাতীয় কাহিনীকে পুরাকথা বলতে বাধা নেই, যদি কাহিনীটি আচারমূলক না হয়েও কোন দেবতার কার্যকলাপকে বিবৃত করে।

তাছাড়া একবার দেবতাদের বিশিষ্ট রূপ এবং গুণ আচারের মধ্য দিয়ে স্মৃষ্টি হয়ে উঠলে গোষ্ঠীর মধ্যে সেই দেবতাদের সম্পর্কে জনপ্রিয় কাহিনীর উদ্ভব ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। উদ্ভাবিত কাহিনীর সাহায্যে আচারের শূণ্যস্থান পূরণ করবার কৌঁক দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, তাই

দেবতাদেব চরিত্র এবং গুণাবলীর উপযুক্ত ক্রিয়া-কাণ্ডের সাহায্যে পুরাকথার সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করা হয়।

এই সমস্ত কারণ ছাড়াও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতা, অজ্ঞতাকে গোপন কবাব প্রবল ইচ্ছা, প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা-জনিত আতঙ্ক, আদিম মানুষের শিশুশুলভ বিশ্বয়বোধ আদি মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলোকেও পুরাকথার উদ্ভবের অন্ততম কারণ বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। পুরাকথার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে Lewis Spence বলেছেন : It is possible to classify myths into quite a number of divisions : those which deal with the creation of the world, with the origin of man, which treat of the heavenly bodies, of places of reward and punishment, and most important of all, perhaps, of the adventures of the gods.<sup>৫</sup> অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব, মানুষের জন্মকথা, গ্রহনক্ষত্র, স্বর্গ-নরক এবং দেবতাদের কার্যকলাপ আদি কয়েকটি শ্রেণীতে পুরাকথাকে ভাগ করা যেতে পারে। জীবজন্তু পাহাড়পর্বত, নদীসমুদ্র সম্পর্কেও যেসব কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়, সেগুলোকেও পুরাকথাব অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণে রাখা দরকার : খাঁটি এবং মৌলিক পুরাকথা গোষ্ঠীর আচারমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে অনিবার্যতঃ জড়িত থাকে, এই কাহিনীগুলো দেবতা একেবারে আদিকালে যেভাবে আচার পালন করেছিলেন তারই মোটামুটি আক্ষরিক বিবৃতি বলা যেতে পারে।

পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্যের গোপনকথা জানবার কৌতূহল সেই আদিম যুগ থেকে অছাবধি অব্যাহত আছে। পৃথিবীর কিভাবে সৃষ্টি হল কিংবা কিভাবে মানুষজন জীবজন্তুর জন্ম হল সেই দুজ্জৈয় বহুশু ভেদ করবার ইচ্ছা যুগে-যুগে মানুষের চিন্তাভাবনাকে আলোড়িত করে রেখেছে। ঝাডখণ্ডেও তাই সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্পর্কিত কিছু কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। পৃথিবী এবং জীবজগতের সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়বারিমির কথা সব দেশের পুরাকথাতে স্থান পেয়েছে। তখন মাটি বা পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল না; যে দিকে দৃষ্টি পড়ত শুধু জল আর জল। না ছিল গাছপালা, না ছিল মানুষজন জীবজন্তু। ঝাডখণ্ডের পুরাকথায় একেই বলা হয়েছে 'জনক্কার' বা জলাকার সৃষ্টি। মহাপ্রলয়

প্রসঙ্গে যে-কাহিনীটি স্তন্যতে পাওয়া যায়, তা হল এই:—আদিকালে, সেই সত্যযুগে, ঈশ্বর এই পৃথিবীকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছিলেন। মানুষজনের জীবনে হাসিখুশি ছাড়া দুঃখবেদনা ছিল না। মানুষ-দেবতাতে কোন পার্থক্য ছিল না। সুখশান্তি, ধনসম্পদ আর দীর্ঘজীবন সেদিন সৌভাগ্যের ভিত্তিমূল দৃঢ় করেছিল। কিন্তু এত সুখ বুঝি মানুষের সহ্য হল না, তাই তারা অধর্ম, অশ্রদ্ধা ছুঁচাচারে প্রবৃত্ত হল—ভগবানের কথা একেবারে ভুলে গেল। ভগবান ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে অনারুষ্টি, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে প্রাণীদের চৈতন্যহীন করে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও যখন কিছু হল না, তখন স্বর্গ থেকে ‘গজবাজ’ হাতিকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে ফেললেন। হাতির পায়ে চাপে পৃথিবী কেটে গিয়ে জলে জলে ভরে গিয়ে ‘জলক্লাব’-এর সৃষ্টি হল। পৃথিবীকে ধ্বংস কবে ভগবান নিশ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু আবার তাঁর নিজের ভুলেই পৃথিবীকে নতুন কবে সৃষ্টি কবতে হয়েছিল। সে আবার এক কাহিনী। ভগবান স্বর্গের করম গাছেব পাতায় বসে স্নান কবতেন। একদিন খেয়াল বশে তিনি ঘাস দিয়ে একটি ‘বাঁড়’ হাঁস আবার একটি ‘ঢা’ড়’ (মানী) হাঁস তৈরি কবে ফুঁ দিতেই হাঁস দুটো সজীব হয়ে স্বর্গের আকাশে উড়ে গেল। হাঁস দুটো শুধু উডতেই লাগল, কেননা আশ্রয় নেবার মতো কোন জায়গা ছিল না—পৃথিবীতে চাবপাশে শুধু জল ছাড়া আর কিছু ছিল না। হাঁস জলের জীব ভেবে ভগবান এদের পৃথিবীতেই পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এরা জলে নামলেও ডাঙার খোঁজে উড়ে বেড়াতে লাগল। ভগবান বিব্রত হলেন। কিন্তু নতুন করে আর পৃথিবী সৃষ্টি না করে তিনি জলের তলাকার একটি ঘাস থেকে একটি করম গাছেব সৃষ্টি করলেন। জলের অনেক উঁচুতে সেই ডালপালা মেলে দিল। হাঁস দুটো করম গাছে আশ্রয় নিল, বাসা বাঁধল এবং যথাসময়ে দুটো ডিম পাড়ল, বাচ্চা জন্মাবার দিন যতোই এগিয়ে আসে হাঁস দুটোর উৎকর্ষা বেড়ে যায়, মাটি নেই—বাচ্চাগুলো জলে ডুবে মরে যেতে পাবে। তাই ওরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। ভগবানের টনক নড়ল। ডাক দিলেন মারাং বুরু (বড় পাহাড়) দেবতাকে এবং তাঁরই ওপব নতুন করে পৃথিবী সৃষ্টির আদেশ দিলেন। কিন্তু মাটি কোথায় যে পৃথিবীর সৃষ্টি হবে। কিন্তু তবু তো সৃষ্টি কবতেই হবে। তাই কচ্ছপ রাজেব চারটি পা চার কোণে টেনে বাঁধা হল। কচ্ছপ আর নড়তে চড়তে পারল না, ভগবান তার দুঃখ বুঝে সান্ত্বনা দিলেন,

দশ বছরে একবার সে নড়তে পারবে। এবার বাসুকী নাগকে কচ্ছপের ওপর বসানো হল। তাকেও আশ্বাস দেওয়া হল, কচ্ছপের সঙ্গে সেও দশ বছরে একবার নড়তে পারবে। এবার নাগের মাথায় একটি বিশাল সোনার খালা বাগা হল। এই খালাব ওপর নতুন পৃথিবীই সৃষ্টি করা হবে। জলের তলা থেকে মাটি তুলতে না পারলে পৃথিবী সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাই চিংড়িকে ডাক দেওয়া হল জলের তলা থেকে মাটি তুলে এনে খালা ভরবার জন্য। কিন্তু জলের তলা থেকে চিংড়ি মাটি তুলতে পারল না, মাটি তুলে আনতে গিয়েই দেখে সব মাটি জলে ধুয়ে যাচ্ছে। তখন ডাক পড়ল কাঁকড়ার। কিন্তু কাঁকড়াও মাটি তুলতে পারল না। জলের ভেতর থেকে বেবিয়ে আসবার আগেই মাটি গলে গিয়ে জলের তলায় নেমে যেতে লাগল। এবার শেষ ভরসা কেঁচো। কেঁচো জলের তলায় ডুবে পেট ভরে মাটি গলে ওপরে ভেসে উঠে সেই খালায় মাটি উগরে ফেলতে লাগল। ধীরে ধীরে সোনার খালা মাটিতে ভরে উঠল। নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি হল। পৃথিবী তো সৃষ্টি হল কিন্তু ত্রিক আগের মত হল না। তাই ভগবান মহাদেবকে আগের মত সুন্দর করে পৃথিবীকে সাজাতে আদেশ দিলেন। 'চাঁওরা' আব 'ভাঁওবা' দুই কাড়ার (মোষ) সাথে একটি বড়ো মই জুড়ে পৃথিবীকে সমতল করার চেষ্টা করা হল। মই-এর টানে অনেক বড়ো বড়ো টেলা এক এক জায়গায় জমে গিয়ে ছোট বড়ো টিবিবর সৃষ্টি হল। এগুলোই শক্ত হয়ে গিয়ে ছোট বড়ো পাহাড়-পর্বতে পরিণত হল! টিবিগুলিকে ভেঙে ফেলবার জন্য ছোট করবার জন্য তাদের ওপর লাঙল চালানো হল। কিছু কিছু লাঙলের দাগ এতো বেশি গভীর হয়ে গেল যে মাটির তলা থেকে জল উঠে তা ভরে ফেলল। এগুলো থেকেই নদীনালাব সৃষ্টি হল। জলে-ভেজা মাটির ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হল 'দুব' (দুর্বা) ঘাসের বীজ। সারা পৃথিবী এবার সবুজ হয়ে উঠল। এখানে ওখানে 'খড় জারা' (চোবকাঁটা)-র রোপ গজিয়ে উঠল। এই রোপ ঝাড়ের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হল শাল, পিয়াল, কেঁদ, ভুড়ক, আসন, কুড়চি, মহল গাছের বীজ। পৃথিবী সৃষ্টির কাজ যেই শেষ হল, অমনি করম গাছের ডালে দুটো হাঁস আনন্দে ডেকে উঠল। ভগবান তাকিয়ে দেখেন, ডিম ফুটে দুটো বাচ্চা বেরিয়েছে; হাঁসের বাচ্চা নয়, দুটো মানুষের বাচ্চা—একটি ছেলে, অল্পট মেয়ে; এরাই হল আদি মানব আর আদি মানবী।



উদ্ধৃত পুরাকথার মধ্যে ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক উপাখ্যান বিধৃত হয়েছে। উপাখ্যানটির মধ্যে মহাপ্লাবন, পৃথিবীর সৃষ্টি এবং আদিম নরনারীর জন্মকথা সম্পর্কে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বথারূপ পেয়েছে। পাথির ডিমের মধ্য থেকে আদিম মানব মানবীর জন্মলাভ নিঃসন্দেহে অপ্রাকৃত এবং অলৌকিক ঘটনা; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় কিনা হয়। পুরাকথাটির মধ্যে যে সব প্রাণীর উল্লেখ আছে, লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে তার সব ক'টিই মূলতঃ জলপ্রাণী। হাঁস, কচ্ছপ, বাসুকী নাগ, চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, কেঁচো, সমস্তই জলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে জড়িত প্রাণী। মহাপ্লাবনের 'জলজ্বাল' এর মধ্যে এরাই জলের তলায় বাস করত। পুরাকথাটিতে পাহাড়পর্বত, নদীনালা গাছপালা, ভূগ-ওষধি আদির সৃষ্টিকথাও বিবৃত হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে গ্রহনক্ষত্র, আকাশলোক সম্পর্কেও কিছু কিছু লোকবিশ্বাসমূলক পুরাকথা শ্রুতিগোচর হয়। সূর্য ধরম করম দেবতার ছদ্মবেশে এদের সাংস্কৃতিক-জীবনকে প্রাণময় করে রেখেছে। চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধির বিচিত্র আচরণের মধ্য দিয়ে এরা উদ্ভিদ জগতের জন্ম-মৃত্যু পুনর্জন্মের রহস্যভেদ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই সূত্রেই এরা মানুষের পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এ ছাড়া রাত্রিবেলা আকাশে অজস্র নক্ষত্র দেখে ঝাড়খণ্ডী মানুষ তাদের রহস্যভেদ করার জন্য বিভিন্ন কাহিনীর সৃষ্টি করেছে। আকাশগঙ্গা (Milky way) কে ঝাড়খণ্ডে 'হাতি ডহর', কোথাও বা 'গাই ডহর' বলা হয়। এই পথ ধরে স্বর্গ থেকে হাতি নিচে নেমে আসে। মহাপ্রলয় সৃষ্টির সময় ভগবান গজরাজ হাতিকে এই পথ দিয়েই পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়েছিলেন। আকাশে এক সারিতে তিনটি তারা দেখে এরা তাদের নামকরণ করেছে 'দহিভারিয়া' বা দহিভারবহনকারী। ওরা নাকি স্বর্গে দই বিক্রি করবাব জন্য কাঁধে ভার নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আবার একগুচ্ছ তারার নাম দিয়েছে 'ছাগল বাগাল'; অজস্র নক্ষত্র যেন ছাগলের মতো মাঠে চরে বেড়াচ্ছে আর উজ্জল কয়েকটি নক্ষত্র ছাগলবাগাল, মাঠে ছাগল ছেড়ে দিয়ে পাশাপাশি বলে খেলা করছে। সপ্তর্ষি নক্ষত্রপুঞ্জের নাম এরা রেখেছে 'সাত ভাইয়া' বা 'মড়া খাটলা'। সংশ্লিষ্ট কাহিনীটি হল এট যে এই সাতভাই-এর মা মারা গেছে, খাটের চার কোণে চার ভাই কাঁধ দিয়েছে, তিনভাই পেছনে পেছনে চলেছে—কিন্তু তারা তাদের মায়ের সংকার করবে এমন ফাঁকা জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না; তাই তারা আজো কোথাও খাট নামাতে পারেনি; মায়েরও সংকার করা সম্ভব হয় নি। তাঁদের

মধ্যে গাছের মতো যে- চিত্রটি ছুটে ওঠে তাকে এবা বলে করম গাছ, করম-ঠাকুর নাকি ওখানেই থাকেন।

পুবাকথা সাধারণতঃ দেবতাদের ক্রিয়াকাণ্ডকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। ঝাড়খণ্ডে বহু লৌকিক দেবতাকে অবলম্বন করে পুবাকথার সৃষ্টি হয়েছে। ‘মাহরা’ গীত প্রসঙ্গে আংবা পবম ঠাকুরের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করেছি। ব্রতকথা প্রসঙ্গে কবম ঠাকুর সম্পর্কিত পুবাকথার আলোচনা ও বিশ্লেষণ কবেছি। করম ঠাকুরের উপাখ্যানে বহু জীবজন্তুর গৃহপালিত পশুতে পরিণত হওয়ার ইঙ্গিত যেমন আছে, তেমনি আছে বুনো ফলমূল খাওয়াব্যবাসী হিসাবে গ্রহণের কাহিনী। অতঃপর আরো কিছু লৌকিক দেবতা-সম্পর্কিত পুরাকথার আলোচনা করা হচ্ছে ধলভূমের চাকুলিয়া থানায় কামাবেশ্বর (বড় পাহাড়) এবং গোটাশিলা নামে দু’টি লৌকিক পাহাড়-দেবতার পূজা আখাট মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কানায়েশ্বর-দেবতার কোন মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় না। কানায়েশ্বর সম্পর্কিত কাহিনীটি এইরূপ : একদা দেবতা স্বমূর্তিতে পূজা গ্রহণ কবতেন, সবাইকেই তিনি দশন দান করতেন। সন্ধ্যার সময় পূজা শেষ হলে দেবতা তাঁর সহচরদের সঙ্গে সচল সজীব আকারে ভোগ গ্রহণ করতে আসতেন। একবার ‘দেহরী’ (পূজারী) তাঁর পশু বলি দেবার হাতিয়ারটা ভুলে ফেলে এসেছিল। বাড়িতে ফিরে আসবার পর হাতিয়ারটির কথা মনে পড়তেই সে তক্ষুনি আবার কানায়েশ্বর দেবতার কাছে ফিরে যায়। ভোগ গ্রহণে বাধা পড়ায় দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং হাতিয়ারটি দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, এরপর আর কেউ আমাকে দেখতে পাবে না, আমার পূজা এরপর আড়াল থেকেই কোর। কথা হবার সঙ্গে সঙ্গে মাটির তলা থেকে একটি বিশাল পাথর উঠে গুহামুখ বন্ধ করে দিল। পূজারী হাতিয়ারটা নিতে গিয়ে দেখে তা পাষণ হয়ে গেছে। আজো তা ভাগ্যানবনেরা দেখতে পায় জনশ্রুতি আছে। গোটাশিলা-সম্পর্কিত উপাখ্যানটি একটু ভিন্ন রকমের : মাটিয়া বাধি গ্রামে একদা গোটাশিলা দেবতা তাঁর বৃড়ীর সঙ্গে বাস করতেন। ‘বৃড়ীর থান’ এখনও আছে। গোটাশিলা রাত্রিবেলা ঘোড়ায় চড়ে সারা গ্রাম পাহারা দিয়ে শেষ বাত্রে ঘুমোতেন। গ্রামের ভুঁইঞারা (ছুতার) মাঝরাত্রি থেকে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চিঁড়ে কুটত বলে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হত। গ্রামের মোড়লকে বারবার স্বপ্নযোগে এই চিঁড়ে কোটা বন্ধ করিতে বলেন। কিন্তু মোড়লের পক্ষে গাঁয়ের লোকের পেশায় হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়নি বলে এক

রাত্রে গোটাশিলা চূপচাপ বুড়ীকে পেছনে ফেলে গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যান। বেশী দূর যেতে না যেতেই বুনো মোবগ ডেকে উঠে ভোব হবার আভাস দিল! গোটাশিলা বেগেমেগে মোবগটির ঘাড় মুচড়ে ফেলে দিয়ে খানিকটা পিছিয়ে এসে শালকুঞ্জে আশ্রয় নেন। ওখানেই তিনি এখনো শিবলিঙ্গের আকাবে পূজা গ্রহণ করেন। ঘাড় মোচড়ানো মোবগটি পাষণ হয়ে যায়। জনশ্রুতি আছে ভাগ্যবান হলে এখনো ওটি দেখতে পাওয়া যায়। গোটাশিলাব বুড়ী যেমন মাটিঘাবাঁধ গ্রামে আছেন, তেমন কানাখেখবের বুড়ী আছেন বৃদ্ধব নামক গ্রামে। দুটো ক্ষেত্রেই একটি নালা বুড়োবুড়ির পানকে সংযুক্ত করেছে। দুটো ক্ষেত্রেই পাবাণ বস্তুর গন্থবন্ধ আছে। এই পাবাণ বস্তুর স্তলো সম্ভবতঃ প্রস্তর যুগের চিহ্ন এবং এই স্তলোই দুটি ক্ষেত্রেই দেবতা এবং তৎসম্পর্কিত পূবা কথার মৌল প্রবণা হিসাবে কাজ করেছে। ঝাড়খণ্ডে বডাম ঠাকুদের পূজা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এহ দেবতা নাকি অত্যন্ত ভয়ংকর, এঁর পূজার ব্যত্রে সবাই দবজায় খিল এঁটে শুয়ে পড়ে—কেউ ডাকলেও সাড়া দিতে ভরসা পায না। লোকশ্রুতি এই যে, বডাম ঠাকুব ব্যত্রেবেলা নরবক্তের জন্তু প্রতিটি বাড়িব দবজায় দবজায় গিয়ে ডাকাডাকি করেন। ভুল কবে কেউ ডাকে সাড়া দিলে বডাম ঠাকুব তাব ঘাড় মটকে বক্তপান করেন।

ঝাড়খণ্ডের ভয়ংকরী দেবী হচ্ছেন বঙ্কিনী। ডঃ সুনীলকুমার কবণের গ্রন্থে বঙ্কিনী সম্পর্কে বিশদ পূবাকথার উল্লেখ আছে। বঙ্কিনী সম্ভবতঃ ভৈববী বা জৈন ডাকিনী, এঁর ভৈবব বা ডাক শিলদায় অবস্থান করেন, একপদমূর্তি। সম্ভবতঃ মূর্তিটির একটি পা সূদূর অর্তীতে ভেঙে যাওয়াব জনবিহ্বাসে ভৈরব একপদ দেবতা হিসাবে পাবিগণিত হয়েছেন। শিলদায় ভৈবব কখনো ধলভূমে ঘাটাশিলায় বঙ্কিনীসঙ্গে এক পায়ে হেঁটে হুম হুম শব্দ কবে সাবা পৃথিবী কাঁপিয়ে দেখা কবতে যান। ধলভূমে ভূমিকম্পেব কারণ হিসাবে ভৈরবেব একপদে সশব্দে গমণেব কাহিনী বিবৃত কবা হয়। অবশ্য ঝাড়খণ্ডে ভূমিকম্পেব আরো একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। পৃথিবীস্ব সৃষ্টিকালে সাহায্য কবে ভাববহনেব দায়িত্ব নিয়েছিল কচ্ছপ ও বাসুকী নাগ। প্রাতি দশ বছবে একবাব কবে এবা নড়াচড়াব অমুমতি পে'য়ছিল। তাহ ভূমিকম্প হলেই বলা হয় যে বাসুকী নাগ তাব শরীবনেডেচেডে ক্লাস্তি দূব কবছে। বঙ্কিনী সম্পর্কে অত্যন্ত সুপবিচিত পূবাকথাত ঝাড়খণ্ডেব সর্বত্রই শোনা যায়। অনেকদিন আগে শিখবভূমে বঙ্কিনী

থাকতেন। তাঁর সঙ্গে রাজ্যের বাজার চুক্তি হয়েছিল যে, বাজার প্রতিদিন বন্ধিনীর ভোগের জন্য একটি করে মানুষ পাঠাবেন, না পাঠালে রাজ্যের সর্বনাশ হবে। নিয়ম মতো প্রতিদিন বন্ধিনীর কাছে একটি করে মানুষ পাঠানো হত, বন্ধিনী মানুষটিকে ঢেঁকিতে কুটে খেয়ে ফেলতেন। একবার এক গৃহস্থের একমাত্র ছেলের পালা পড়ল, গৃহস্থকে সৌন্দর্য আকুল হতে দেখে তাব বাগাল ছেলের বদলে যেতে বাজি হল। বাগাল কৌতুহল এক পাশে লোহার ছোলা অল্পপাশে আসল ছোলা মিল। তাবপব নিশ্চিন্ত মনে আসল ছোলা চিবুতে চিবুতে বন্ধিনীর কাছে গেল। বন্ধিনী দাবি দেখে বেগে আশু। বাগাল বলল, ‘আমাকে তো খাবেই, তাব জন্মই তো এসেছি, তবে আমাকে খাবার আগে এই ছোলা ভাজা খেয়ে দাঁতগুলো শানিয়ে নাও। বাগাল বন্ধিনীকে লোহার ছোলা দিল, বন্ধিনী যেই একটি ছোলা কামড়েছে অমন একটি দাঁত ভেঙে গেল। এমনিভাবে অনেকগুলো দাঁত ভেঙে যেতে বন্ধিনী ভয় পেয়ে পালাতে লাগলেন, কাবণ যে লোক কড় কড় করে এত শব্দ ছোলা খেতে পাবে সে নিশ্চয়ই মস্ত বড় বীর। বন্ধিনীকে পালাতে দেখে বাগাল বন্ধিনীর ঢেঁকি নিয়ে পেছনে তড়া কবতে লাগল। বন্ধিনী ছুটতে ছুটতে ধলভূমে এসে ঢুকে পড়লেন। সামনেই নদীর ঘাটে এক ধোপা কাপড় কাচছিল। তাব কাছে আশ্রয় চাইলেন। ধোপা বন্ধিনীকে তাব কাপড় কাচবার পাথর তলায় লুকিয়ে ফেলল। এদিকে বাগাল এসে তাকে বন্ধিনী কোনদিকে পালিয়েছেন জিজ্ঞাস কবল। ধোপা দোটারায় পড়ল, মিথ্যে কথা বলতে তাব বাধল। তাই সে কাপড় কাচতে কাচতে শিশ দিয়ে পাথরটিকে তলাব দিকে ঠেঙিত কবতে লাগল। বাগাল বুঝতে না পেবে ফিরে গেল। তখন বন্ধিনী বেরিয়ে এসে সেই ধোপাকে বলল, ‘তুই আমার প্রাণ রক্ষা কবেছিস, তাই তোকে এই ধলভূমের রাজত্ব দিলাম, যতোদিন আমার পূজা চলবে, ততোদিন তাব বংশের কোন ক্ষতি হবে না।’ তাবপব বললেন, ‘তুই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কবেছিলি, শিশ দিয়ে বাগালকে আমার লুকানো জায়গাটি দেখিয়ে দিতে চেষ্টা কেরোছিলি, তাই আমি অভিশাপ দিচ্ছি, ধোপারা কাপড় কাচতে গেলে শিশ না দিলে তাদের অকন্যাণ হবে।’ পূবাকথাটি থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট: প্রথমত: বন্ধিনীর পূজা প্রথমে শিবভূমে হত; দ্বিতীয়ত: জৈন ডাকিনীর পূজার ওপর সেখানে আদিম জনতা মাঝমুখী হয়ে উঠেছিল; তৃতীয়ত: ধলভূমের রাজবংশ যে বজ্রবংশ এমন একটি

লোকবিশ্বাসের পবিত্র স্মৃতি ঘটেছে, চতুর্থতঃ কাপড় কাচবার সময় ধাপাবা যে শিস দেয় তাবৎ একটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

একটি পূবাকথায় দেখা যায়, প্রথমে গকব'ছুব স্বর্বে থাকত। কিন্তু কোন গোপালক না থাকায় তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দে যা হয়। প্রথমে ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল গকটি, কিন্তু ব্রাহ্মণ ঠিকমতো গো-পূজা করতে না পাবায় তাব বাড়ি ছেড়ে আবার স্বর্গে ফিরে যায়। তখন তাকে এক ক্ষত্রিয় বাজাব বাড়িতে পাঠানো হয়, কিন্তু অত্যাচারের ফলে সেখান থেকেও মহাদেবের ঘাঁড় পালিয়ে যায়। শেষতক কদাবনাথ নামে এক ক্ষত্রিয় গো-জাতির প্রতি গভীর ভক্তি জ্ঞাপন করে মাতৃতুল্য সেবায়ত্রে সন্তুষ্ট করে পৃথিবীতে গামাতাকে বেধে বাঁতে সমর্পণ হয়। যথাসময়ে শিব কদাবনাথের বাড়িতে এসে গোজাতির প্রতি তাব সেবায়ত্রে দেখে তাকে আশীর্বাদ করেন এবং গককে ঘুরিয়ে এনে সেবায়ত্রে বেধে রাখার জন্তু কদাবনাথের নতুন নাম-করণ করেন গুসাঁহবাহ, কদাবনাথের গোসেবা-পবায়ণ' স্ত্রীর নাম গোবয়া। ঝাড়খণ্ডের বাননা পর্বের গোপূজায় গুসাঁহবাহ এবং গোবয়া মুখ্য দেবদেবী।

পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পাহাড়পর্বত নদীনালাব উদ্ভব কাহিনী উল্লেখ কবেছি। অতঃপর জাবজন্তু বীষুপ আদি সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি পূবাকথাব উল্লেখ কবব। প্রথমে সাপ সম্পর্কিত পূবাকথা। হেলে সাপ সম্পর্কে বলা হয়, এবা আকাশ থেকে মাটিতে বৃষ্টির সঙ্গে পড়ে থাকে। এবা বিষাক্ত সাপ (?) হলেও সহজে কাডকেই কামডাষ না, কিন্তু একবাব কামডালে মেঘ না ডাকা পযন্ত নাকি এবা কামড ছাড়ে না এবং বিষও নামে না। 'তুতুড' নামে এক ধবনের খর্বাঙ্কতি সাপ আছে যাব লেজটি নাবীর স্তনবৃন্তের মতো। এবা নাকি স্তনুপায়ী, বাত্রিবেলা ঘবের ভেতব ঢুকে পড়ে এবং কাঁচ বাচ্চাব মায়েব বিছানায় উঠে বাচ্চাব মুখে লেজটি গুঁজে দিয়ে মুখ দিয়ে অবিকল শিশুব মতো মাতৃস্তন চুষে ছুঙ্কপান কবে। বলাবাহুল্য, সাপটি বিষাক্ত নয়। শিষাডটাঁদা বা চন্দ্রবোডা ভয়ঙ্কব বিষাক্ত সাপ, কিন্তু শোনা যায় এই সাপ সহজে কামডাষ না, পাতার খাডালে অসাবধানে মাড়িয়ে ফেললে তিনবাব শিস দিয়ে সাবধান করে দেয় এবং ছোবল মারে যার ফল, অনিগাষ মৃত্যু, এ সাপ কামডালে কুগীব গায়ে চাকা-চাকা দাগ উথলে ওঠে। শিষাডটাঁদা সম্পর্কে বলা হয়, এ সাপ বয়োবৃদ্ধিব সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে খর্বতব হতে শুরু করে এবং এক সময় খুবই ক্ষুদ্রাঙ্কতিব হয়ে পড়ে,

তখন তাব পাখা গজায় এবং আকাশে উড়ে যায়, উড্ডিত শিয়াডটাঁদাব ছায়া কারো গায়ে পড়লে তাব নাকি 'একাঙ্গী বাত' বা পক্ষাঘাত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন মাছ প্রসঙ্গেও নানা বকম কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। পৃথিবী সৃষ্টির জন্ত যে মাটি তুলতে পাববে তাকে অর্ধেক পৃথিবী আব বাজকণ্ঠা দেবাব লাভ দেখানো হয়েছিল। চিংড়ি মাছ মাটি খাবলে জলের তলা থেকে তুলে আনতে গিয়ে পাবে 'ন', ফলে অর্ধেক পৃথিবী বা বাজকণ্ঠা কিছুই লাভ কবতে পাবে না। তাই তাবা আজো মনেন দুঃখে জলের ওতবে মাটি খেয়ে ছুটো-ছুটি কবে বেডায়। কাঁকড়া মাটি তুলতে পাবে নি, তাই ওবা মনেন দুঃখে জল ছেড়ে নবম মাটিতে বাসা বাপে আব আবেশত গর্তেব ওপবে মাটি ঠেলে-ঠেলে তিবি বানায় আজো। চিং মাছেব জন্মপ্রসঙ্গে বলা হয়, এই মাছ নাকি মাঠে-খবণো মনুগ্যাবষ্টাব গর্ত থেকে জন্মগ্রহণ কবে, তাই ঝাড়খণ্ডেব অনেকে এ মাছ খাব না।

কৈচো কেন মাটি খেয়ে পৃথিবীৰ ওপবে মাটিৰ ঢেল শৈবি কবে, এব বাপায়া পৃথিবীৰ সৃষ্টিকাষে কৈচোব বিশিষ্ট ভূমকাব মধ্যো নির্মিত আছে। কৈচোহ মাটি তুলে পৃথিবীৰ সৃষ্টি কবেছিল, তাই সে মাটিব তলাকাব অর্ধেক পৃথিবী পুবস্কাব পয়েছিল। সেই আন্দে সে এখনো পৃথিবীকে নতুন কবে গড়ে তোলাব অভ্যাসে মাটি তুলে পৃথিবীৰ ওপবে ঢেলে চলেছে। গেড়ু-শামুকেব জন্ম-সম্পর্কেও একটি কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। বাজা হবিশ্চন্দ্র দান দিতে গিয়ে সবস্ব গোযাবাব পব তাঁকে ভাগ্যেব বিপাকে শূকব বক্ষণা-বক্ষণেব চংকবি মিতে হয়েছিল। প্রত্যেকদিন শূকবেব মলমূত্র পবিষ্কার কবতে তাব ভীষণ অসুবিধা হত। তাই তিনি একদিন ধর্মকে স্মরণ কবে বললেন, 'আগামীকাল থেকে আমি শূকরেব বিষ্ঠা পবিষ্কার কবব না, খোঁয়াড ঘর যেন আপনা থেকে পবিষ্কার হয়।' পয়েব দিন বাজা হবিশ্চন্দ্র সবিস্ময়ে দেখলেন শূকবেব বিষ্ঠা গেড়ুশামুকেব রূপ ধরে খোঁয়াডেব ফোকব দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কাঠবিড়ালিৰ গায়ে তিনটি ডোঁবা দাগ কন কিংবা সূউচ বৃক্ষেব মগডাল থেকে পড়লেও কাঠবিড়ালি মবে না কেন, এ সম্পর্কেও ঝাড়খণ্ডে একটি কাহিনী শোনা যায়। ঝামচন্দ্র যখন সেতু বাঁধেন, তখন কাঠবিড়ালি সমুদ্রেব জলে গা ভিজিয়ে বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে সেতুৰ কাছে গিয়ে পুয়ে ফেলত; ফলে সেতুর মধ্যকাব ছোট ছোট ফাঁক ফোকবগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ঝামচন্দ্র তাব

এই সেবার জন্ম তার পিঠে হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন ; বলেছিলেন, 'যতো উঁচু থেকেই তোরা পতন ঘটুক না কেন তোরা মৃত্যু হবে না।' তাই উঁচু মগডাল থেকে পড়লেও কাঠবিড়ালি মরে না। তার গায়ের ডোরা দাগগুলো রামচন্দ্রের আঙুলের দাগের স্মৃতি বহন করে চলেছে বলে বলা হয়।

## তৃতীয় গর্ভ

### লোকসাহিত্যে প্রকৃতি, সমাজ ও জনজীবন

সাহিত্য, তা সে শিল্পসাহিত্য হোক কিংবা লোকসাহিত্য, সমাজেব দর্পণবিশেষ। সামাজিক বীতিবেৎযাজ, দৈনন্দিন জীবনচয়, লোকভাবনা সমস্তই সাহিত্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে সমান মর্যাদাব সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে কোনও সাহিত্য খুঁটিয়ে অধ্যয়ন কবলে সংশ্লিষ্ট ভাষা-ভাষী লোকজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ সহজেই গড়ে তোলা যায়। শুধু মানুষজনের আকাব-আকৃতিই নয়, তাদের আচাব-আচরণও সাহিত্যেব মধ্য দিয়ে জীবন্ত-ভাবে প্রকাশ লাভ কবে, আমবা আমাদের চাবপাশে সাহিত্যেব পাতা থেকে হঠাৎ জেগে-ওঠা চলমান জীবনেব স্পন্দন অনুভব কবতে পারি। ঝাডখণ্ডেব লোকসাহিত্যে এই চলমান জীবন শুধু জীবন্ত অনুভবে স্পন্দিত নয়, প্রাণময় আনন্দবেদনায় একান্ত বাস্তব। লোকসাহিত্যেব গানে-গল্পে প্রত্যক্ষ অরণ্য-ভূমিব মানুষগুলো যেন তাদের সুখ-দুঃখ, লোভ ঈর্ষ্যা, হিংসা-কলহ নিয়ে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ঝাডখণ্ডেব লোকসাহিত্য শুধু সমাজেব দর্পণই নয়, সমগ্র ঝাডখণ্ড অঞ্চল তাব বিবিধ বৈচিত্র্যে এখানে বিধৃত হয়ে আছে। এখানকাব অরণ্য পাহাড়, নদী-নালা, গ্রাম-সহব, মেলা-পববটাড, সাজ-সজ্জা, গহনা-অলংকাব সবকিছুই লোকসাহিত্যেব উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গাছপালা, জীবজন্তু, মাঠঘাট ঝাডখণ্ডী মানুষেব আনন্দবেদনাব অনুভবে বিশিষ্ট স্থান পাবিকাৰ কবে আছে, কখনো মুক্তজীবনেব প্রাণময়তাব প্রতীক হিসাবে, কখনো বা মানবজীবনেব রূপক হিসাবে ঝাডখণ্ডেব প্রাকৃতিক উপকরণগুলো লোকসাহিত্যে নিজ নিজ ভূমিকা স্পষ্টভাবে পালন কবেছে।

লোকসাহিত্যকে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলেব জনজীবনকে গভীরভাবে জানবার উপকরণ হিসাবে ব্যবহাব করলে তুল কবা হবে, এব মধ্য দিয়ে একটি অঞ্চলেব সমগ্র রূপ ধবা পড়ে, তার কথাও আমাদের স্মরণে বাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলেব প্রকৃতি এবং জনজীবন এক অচ্ছেদ্য বান্দনে বান্দা থাকে, শুধু বাস্তবজীবনে নয়, সাহিত্যে প্রতিকলিত জীবনেব মধ্যেও।



বিশেষভাবে অরণ্যমামুয প্রকৃতির ওপর এতোই নির্ভরশীল এবং ভাবনাগত-ভাবে এতোই অস্তুরক যে ঝাড়খণ্ডের জনজীবনকে অরণ্যপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়।

ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যে প্রকৃতি, সমাজ ও জনজীবনের যে প্রতিকলন ঘটেছে, আমরা এই পর্বে তারই একটি ধারাবাহিক রূপরেখা রচনায় প্রয়াসী হব। তাই প্রকৃতি পর্ষায় স্থান নাম, গ্রামনাম, হাটবাজার, মেলা-পর্ব, পাহাড়-জঙ্গল, নদীপুকুর, অরণ্যপ্রকৃতি, গাছপালা, ফুল-ফল, জীবজন্তু, পাখিপাখালি আদির রূপরেখা অঙ্কনের পশাপাশি সমাজ ও জনজীবন পর্ষায় সামাজিক রীতিরেওয়াজ, পারিবারিক কাঠামো ও বিবর্তন, বিবাহিত বিবাহেতর এবং বিবাহবিচ্ছিন্ন জীবনে নরনাবী, প্রেমের বিচিত্র রূপ ও গতিপ্রকৃতি, যৌনতা, কুল ও কলঙ্কভাবনা, বিধিনিষেধ, নিষিদ্ধ অভিপ্রায়, যৌনসনন্দ, সাজসজ্জা, পোষাকপরিচ্ছদ, গহনা-অলংকার, খাওয়া ও পানীয়, পেশা-বৃত্তি আনন্দউৎসব, নৃত্যগীত আদি বিচিত্র বিষয়বস্তু এবং লোক ভাবনারও যথাসম্ভব আলোচনা করা হবে।

### প্রকৃতি পর্ষায়

ঝাড়খণ্ড নামটি যেমন বর্তমান রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, তেমনি অধিকাংশ প্রাচীন অরণ্য-রাজ্যগুলোর নামও মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না; কয়েকটি অরণ্যরাজ্যের নাম অবশ্য এখনো অরণ্য রাজ্যের নাম মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। মানচিত্র থেকে এই সব নাম মুছে গেলেও মাহুঘের মন থেকে মুছে যায় নি; এখনো মলভুঁই, সাতভুঁই, বাঁশবন, বরাভুঁই, শিখরভুঁই নামগুলো উচ্চারণ করে অরণ্যমাহুঘেরা আনন্দ পায়, রাজনীতির টানাপোড়েনে যতোই তাদের নাম বদলে যাক না কেন। লোকসংগীতের মধ্যেও এইসব ‘ভুঁই’ বা ‘বন’ রাজ্যগুলো তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১-৮ জলে কুলুপ জলে কুলুপ দিলে টুসু কি করো, চিঙ্কিগড়ের বাঁশবনে ছিলে টুসু কি করো ॥ ধলভুঁই-এ সাঁজল মলভুঁই-এ বাঁজল বাঁশবনে করম গাড়ালা, শিলদা মুলুকে নিশি পুহাল্য ॥ ধলভুঁই-এর ধবছাতা বরুহাভুঁই-এর ছিঁড়ি খাতা, ভেলের ভেল, মাথা

বাঁধিতেই দিন গেল ॥ কল্যাণপুর দহিজুড়ি বাজারে বিকায় মুষ্টি,  
দকানে দকানে বিকায় মাথার ফুহুনি ॥ রাইপুরের টাইড়ে মা গ  
হল'দ বড় বসে, সেহ হল'দ বাঁটিতে রং কত চটে ॥ যাঁয়েছিলি  
হেঁসলা কুটাই পালি বাঁশলা, কাঠ কাটা, সে ত রসিক-লাগা  
ছকরা ॥ কাশীপুরের রাজা তুমি নামটি তুমার লীলমণি,  
আঠারটি বেটা তুমার আরই খুজ পাটরানী ॥ শিখরভুঁই-এ রে  
বরদা তরি জনম রে বনহাভুঁই-এ লিলি গিরুহবাঁসা ॥

ঝাড়খণ্ডের ভৌগোলিক পটভূমি, ঐতিহ্য, জীবনচর্চা, মানুষজন, ভাষা  
ইত্যাদি যেমন বিশিষ্ট অঞ্চলের চারিত্রগুণমণ্ডিত, তেমন একটু লক্ষ্য-করে

দেখলেই বোঝা যাবে ঝাড়খণ্ডের স্থাননামগুলোরও কিছু  
গ্রাম নাম  
বৈশিষ্ট্য আছে। গ্রামনামগুলো প্রধানতঃ অরণ্যপ্রকৃতি-

কেন্দ্রিক। পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে, কয়েকটি বিশেষ ধারায় এগুলোর  
নামকরণ করা হয়েছে। গ্রামনামগুলো যেসব বিষয় বা বস্তুকে ভিত্তি করে  
গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে কয়েকটি এই ধরনের : ১. জীবজন্তুভিত্তিক, যেমন,  
ভালুকপাতড়া, ঘড়াধরা, হরিণধুকড়ি, ম'ঘজডি ইত্যাদি ; ২. মাটিপাথর-  
ভিত্তিক, যেমন, কালাপাথর, রাঁগামাটিয়া, বালিভাঙ্গা ইত্যাদি ; ৩. ঘাগ-  
ঝরণা-দহ সম্পর্কিত, যেমন, ঘাগরা, ঝরাডি, চাকদহ ইত্যাদি ; ৪. গাছপালা-  
সম্পর্কিত, যেমন, শালগাজড়ি, মহলচুঁই, কেঁদপুশি ইত্যাদি ; ৫. শস্যসম্পর্কিত,  
যেমন, লুকুইকানালি, রাহেডগড়া, বিরিহাঁড়ি ইত্যাদি ; ৬. ফুলফলসম্পর্কিত  
যেমন, কুড়চিশাহড়ি, কাঁশিডাঙ্গা, কদমডি, পিঁড়রাশল, ফুলকুসমা ইত্যাদি ;

৭. পাহাড়-বনসম্পর্কিত, যেমন, পাহাড়পুর, রেঁগডপাহাড়ী, বনগড়া, বাঁশবন  
ইত্যাদি ; ৮. জাতিসম্প্রদায়-সম্পর্কিত, যেমন, বাগালবেড়া, মাহ'তমারা,  
ভুঁইয়াসিনান, খাড়িয়াশল ইত্যাদি ; ৯. বাঁধপুকুর সম্পর্কিত, যেমন, বাঁধজড়া,  
পথরিয়া, জলডহর ইত্যাদি ; ১০. টাইড়িডিহিডাঙ্গা-সম্পর্কিত, যেমন,  
সিধাটাইড়, ছাঁচনীটাইড়, ডাঁগরডিহা, ডাঙ্গাড়ি ইত্যাদি ; ১১. জমি  
সম্পর্কিত, যেমন, কুদাকচা, চেমাইজুড়ি, চড়ইগুটা, জামিরাবাইদ, বাঁপডীশোল  
ধীরিঘুট, ভাটুবেড়া, কুঁচ্যাকানালি ইত্যাদি ; ১২. পাখিপাখালি-সম্পর্কিত,  
যেমন, খুকড়াখুঁপি, মেজুরনাচনী ইত্যাদি। গ্রামনামের উৎস এই ক'টি  
শ্রেণীর মধ্যে খোঁজ করলে ভুল করা হবে। এখানকার গ্রামের নামকরণের  
মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। আমরা মাত্র কয়েকটি শ্রেণীর উল্লেখ করে এটুকু

আভাস দেবার চেষ্টা করেছি যে, ঝাডখণ্ডের গ্রামগুলোব নামকরণের পেছনে কোন জটিল চিন্তাভাবনা নেই, সাধারণ মানুষের চোখে যেসব বাস্তব প্রাকৃতিক বস্তু ধরা পড়েছে, স্থানের নামকরণের সময় সেই সব বস্তুই প্রাধান্য লাভ করেছে। ডঃ সুধীর কুমার করণ অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে গ্রাম নাম বা স্থান নামের আলোচনা করেছেন, আবার ব্যাপকভাবে এ বিষয়ে আলোচনা কববার যথেষ্ট অবকাশ আছে—গ্রাম নাম অধ্যয়নের ফলে শুধু যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকমানসের বিশেষ ধরনের চিন্তাভাবনার সঙ্গেই পবিচিত হতে পারি তাই নয়, এই অঞ্চলের ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাসও এর ফলে আমাদের কাছে এক নবত্ব রূপে ধরা পড়ে। নিম্নোক্ত গানগুলোতে ঝাডখণ্ডের বিচিত্র নামের বিভিন্ন গ্রামের উল্লেখ রয়েছে।

২-১৫ হাঁসাপাখরের কন্যা ডুবকাড়িহির বব, সে বব ভাঙাতে কন্যাব কাঁদছে  
 অস্তব ॥ যায়েছিলি আঁগারনালী পিতলকাঁঠি ঘুব্যে আলি পাঁঠাব  
 মাথা বডই লাগে মিঠা, রে পাঝুই-এর কুটুপিতা ॥ মাটিয়াবাঁধি মাল-  
 খাম আমাভুলার গুণাবাম কাঁটাবনীৰ বিপিনবিহাবী, না দে'থলে না  
 ব'হতে পাবি ॥ ই'দখড়া বারডাংগা চৌকিচটি ছটমাডাংগা পিয়াল  
 পাকা বিকায় খালা খালা, এই ত ডাংগা দুধিয়ানালা ॥ কন্যাডিহা  
 নিশ্চিন্তা বঁধুব বহ তিনটা হেললিতা, গোপনে বাখ্যেছে আব দুটা ॥  
 বান্দা শঙ্করবনী বখিং এবিয়ায় লিল ধেরি টিলাকাটি ধারে পড়ে যায়,  
 দরখুলি গহম কিনে যায় ॥ মানভুমের পথে পথে শুটমডি পাঁচাড়া  
 গুরফা চিতাড়া বৈঁগাড়া, খারপড়া মাতালপড়া বেসরা বিড়ালিগৈড়া  
 চেপড়া ভাজেড়া, মচড খায়ে ঘুব্যে আলি ধুবহি গাঁগৈড়া। সি'দ্রী  
 চিড়কা বাগালবেড়া গামহারকুঁড়ি কুকুরগৈড়া সতের বেলগাড়া,  
 জয়নগর ভবানীপুর নিকটে ছটমুড়া। যদি হে বহত ছাড়া তার  
 পাশেতে আছে টাড়া কঁড়রা পুয়াড়া, তুলে গৃহবাস করে হলু তাঁতিব

ঝাডখণ্ডের বিভিন্ন হাটবাজারেব কথাও লোকসংগীতে স্থানলাভ করেছে। হাটে পবিচিত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত তো হয়ই, তাছাড়া প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, বিশেষভাবে শহরজাত পণ্যস্রাব, হাটবাজার ক্রয় কববার জগ্ন জ্ঞানপদ নরনাবীব মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। হাটে ধরণেরস্থালিয় বাঁধনে বাঁধা নাবীসমাজ সাময়িক মুক্তির

নিঃশ্বাস ফেলবাব অবকাশ পায়, ভালোবাসার লোকেব সঙ্গে দু'দণ্ড লুকিয়ে কথা বলবার নিবিবিলি জায়গা খুঁজে পায়, যাতায়াতের পথে নির্জনস্থানে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়। হাটেবাজারে উপহার কিনে প্রার্থিতা নাবীব হৃদয়হরণ কববাব প্রয়াস পায় প্রেমাকান্ধী তরণেবা। তাই লোকসংগীতে হাটেব প্রসঙ্গও যথেষ্টই দেখা যায়।

১৩-২০ **ঘাটার্শলার** হাটে মিঠাই দিলি কিন্তে, খনে খনে, আমার তকেই পড়ে মনে ॥ **সিঁড়িহার** হাট যাতে বাঙামালা টাঙা আছে দিদি ল, কিনে দে মোব ইন্ধিতেব মালা ॥ **সিংপুরার** হাট যাব বাছো বাছো চুডি লিব দিদি গ, তবই মতন হাত লাড়িব ॥ যায়েছিলম **ছুমকা** কিন্তে আ'নলম **ঝুমকা** সেই **ঝুমকা** পরুহাব গ তকে, যে যা বলে বলুক পাডাব লকে ॥ **কুলুঠিকরীর** হাট যাতে দেখা হল্য হুজনে, যে কথা বল্যোছিলে ভুলব নাই জীবনে ॥

হাটবাজারেব প্রসঙ্গ ছাড়াও মেলা-পরবটা'ডের কথাও লোকসংগীতে সমানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে মেলা এবং পবব অনুষ্ঠিত হয়। **ইদ**, **ছাতা**, **বিঁধা**, **পারবণ** (দুর্গাপূজা), **মেলা পবব** টুসু ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য করে মেলা বসে। পর্বোৎসবেব-সময় সামাজিক বন্ধন বিধি-নিষেধ অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ে; তাই যৌবন-বিস্বল নরনাবী পরব টা'ডে বেপরোয়া আনন্দ উপভোগ কববার অবকাশ পায়। মুক্ত জীবনেব স্বাদ পায় বলেই মেলায় পরব টা'ডে যুবকযুবতীর ভিড় সর্বাধিক লক্ষ্যগোচর হয়।

২১-২৬ **বড়কলার** গাঁজনে, বড় জাঁক লাগে শিবের পূজনে ॥ **ধ-ডাংগার** পরবে পাথরবসা চুডি, দেখে মন টল্যে গেল কই কিনে দিলি ॥ **বরাবাজারের** **ইদ**, **চাকলতড়ের** **ছাতা**, **কাশীপুর** **পারবণ** পরব লাগে মজা ॥ **বরাবাজারের** **ইদ** **গবরঘুঁষির** **ছাতা**, হাটে হাটে দেখে আল্যম কলাইবসা শাঁকা ॥ **জয়দা** যায়ে কি পানি, **সতী** গেলে পতিফল পাবি ॥ তকে হাওডায় লেগো দাবডাব, **দিগড়ি** ঘাটে **উঠাই** ডুবাব ॥

অরণ্যভূমি ঝাড়খণ্ডে ছোটখাটো বহু পাহাড়পর্বত আছে; এর সাথে আছে বনজঙ্গল। কিছু কিছু পবিচিত পাহাড়পর্বত বনজঙ্গলও লোকসংগীতের

পাহাড়-জঙ্গল

উপজীব্য হয়েছে। পাহাড়-অরণ্য শুধু যে জ্বালানি কাঠের ভাণ্ডার হিসাবেই জনজীবনে অপরিহার্য তাই নয়, আঞ্চলিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে এদের অবদান কম নয়। অরণ্যপর্বতের কাঠ, লাঙ্গা, তসর, ফলমূল, ধূপধূনো, মধু, বিভিন্ন ধরনের ওষধি শহরাঞ্চলে বিক্রী করে জানপদবর্গ অন্নের সংস্থান করে থাকে। তাছাড়া ঝাডখণ্ডী নরনারী বনে-পাহাড়ে তাদের আদিম জীবনকে সহজধারায় ফিরে পায় বলেও সংগীতে তারা এগুলোর কথা বলতে ভোলে না।

২৭-৩০ বাগমুড়ির পাহাড়ে হল'দ বড় বসে রে, চাঁপামণি হল'দ বাঁটে নাগর কেনে হাঁসে রে ॥ আহাড়ে পাহাড়ে যাব কন্ পাহাড়ে কাঠ পাব, মিরগীঝ'র পাহাড় যায়ে বেহাই বল্যে ডাক দিব ॥ লীলগিরির পাহাড়ে দিদি বাঁশেরি লাঠি, জেইদ বনে চাঁপাব ফুল ধিক ধিক ঠিয়া, ঝু নাচ-লাগাইয়া ॥ দলঝারই পাহাড়ে গাডি চলে লহরে, হু হাল কাডা মবোঁ গেল শহবে, কাজ নাই তব কাঠেব বেপারে ॥

ঝাডখণ্ডের কয়েকটি নদী বিভিন্ন শ্রেণীর লোকগীতির উপন্যবণ হয়েছে বারে বারে। শুধু নদীনালাই নয়, বাঁধ-পুকুরও গানের উপজীব্য হয়েছে সমান মর্যাদায়। 'যবুনা' নদী যে সর্বজন-পরিচিত যমুনা, তা নদীপুকুর ভাবনে ভুল করা হবে। ঝাডখণ্ডের লোকগীতির যবুনা কল্পলোকের নদী; স্থানীয় যে কোন নদীই যবুনার রূপকে ছদ্মবেশে উপস্থিত পাকে। যবুনা নদীর উল্লেখ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণে রাখা দবকাব, প্রেম-সম্পর্কিত গান ছাড়া অল্পত এ নদীর উল্লেখ করা হয় না।

৩১-৩৭ যবুনাকে জলকে গেলে পয়সা ঝলকাল্য, দাঁতে নিশি চইখে কাজল আমাকে ভুলাল্য ॥ ডু'বল ঝারি পার কর হরি, আমরা সবঝাখান্ন সিনান করি ॥ ধরসতীর বালি, অ তু'ই আশা দিয়ে' ভুলালি ॥ যথা খালে কুখা হারালি, আমি বশ্বে বশ্বে পথ ভালি ॥ আমপাত চিরিচিরি নউকা বনাব, দায়ুদর কাঁসাই লদী হেলকে পাইরাব ॥ কাঁসাই কুম্হারী লদী সে লদী পাতালভেদী লদী পারে ভুলেউ বিটি দিহ না, মরিলে খবর মিলে না ॥ মাগুড়ার বাঁধে ইজয়পি'জয় সি'দরীর বাঁধে শে'য়াল ল, বাম্হনডিহার বাম্হন বাঁধে উঠে মাগুর মাছ ॥

ঝাডখণ্ডের নরনারীর ভাবলোক-রচনায় অরণ্যপ্রকৃতি একটি বিশিষ্ট স্থান

অধিকার করে আছে। অরণ্যভূমির মানুষজনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার প্রধানতম শরিক অরণ্যপ্রকৃতি। অরণ্যপ্রকৃতির মতোই আদি এবং অকৃত্রিম আঞ্চলিক জানপদবর্গ; বিভিন্ন ঋতু-পর্যায়ের প্রকৃতিতে যে অরণ্য-প্রকৃতি সব পরিবর্তন ঘটে, তার প্রতিফলন সরাসরি জনপদ-জীবনেও ঘটে থাকে। তাই এখানকার মানুষ নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা প্রকৃতির বিচিত্র রূপালোখ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। অরণ্যপ্রকৃতি যেন তাদের সত্তাব একান্ত সহচর। স্বভাবতঃই প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তারা না পারে আনন্দের বর্ণনায় ভাবরাশির রূপায়ণ করতে, না পারে বেদনার গভীরতাকে প্রকাশ করতে। তাই আনন্দ-বেদনার সজীব চিত্র ফুটে ওঠে অরণ্য-প্রকৃতির সায়ুজ্যে অমুহুর্তে। এই জন্মই ঝাড়খণ্ডের অকৃত্রিম প্রাণময় লোকসংগীত অরণ্যপ্রকৃতি এবং ঝাড়খণ্ডী নরনারীর গভীর অন্তর-ভাবনার সমন্বয়ে এক অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। অরণ্যের হাসিকান্নার সঙ্গে কখনো জানপদবর্গ নিজেদের হাসিকান্নাকে মিশিয়ে দিয়ে একাত্মতা অমুহুর্তে করেছে, কখনো-বা জানপদবর্গের হাসিকান্নার শরিক হয়ে অরণ্যপ্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

৩৮-৪২ বাড়ির গঁদাফুল ফিরে মহকে, না; যাহ দিদি জলকে, মাথার বেগী দলকে ॥ আসন গাছ করে টলমল, বঁধু যাছ হে ছাড়িয়ে, গায়ের গামছা হাতে ধরিয়ে ॥ আসন পাত খড়মডিয়া ঝড়ি প'ড়লা, ঘন ছঁড়াটার মেঘ্যা নাই কাঁদি ম'রলা ॥ আষাঢ় শরাবন মাসে তেঁত'ল পাতে জল, শ্বশুরঘরের লক দে'থলে চ'খে পড়ে লর ॥ আষাঢ় শরাবণ মাসে নানারঙের ফুল ফুটে ফুল হেরি মনে পড়ে হরি, কেমনে যৌবন ধরি ॥

ঝাড়খণ্ডের বিচিত্র ধরনের গাছপালাও জানপদ-ভাবনার সজীব পরিমণ্ডল রচনায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ গাছপালা উৎপন্ন হয়ে থাকে। সাহিত্যে এই সব গাছ-গাছপালা<sup>১</sup> পালার প্রসঙ্গ দেখেও অনেক সময় অঞ্চলটিকে খুঁজে বার করা সম্ভব হয়। ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি সুপরিচিত গাছপালা অন্তত খুব কম লক্ষ্যগোচর হয়। দৈনন্দিন জীবনচর্চার অমুহুর্তে হিসাবে এই গাছপালাগুলো আঞ্চলিক জনজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িত হয়ে আছে। তাই লোক-সংগীতেও এই অরণ্য গাছপালাগুলো জনপদজীবনের চিত্তভাবনা সৌন্দর্যে

বিশেষ অংশগ্রহণ করেছে। এই গাছপালা কখনো তাদের রূপের মাধ্যমে লোকভাবনাকে সহজ অনাবৃতভাবে প্রকাশ লাভে সাহায্য করেছে, কখনো-বা লোকভাবনার রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৩-৪৬ বড বাঁধে উঠি ডুবি ছট বাঁধে কে তুমি, আস্তা গাছে ডাল মেলোছে  
**হস্তকী** তলে আমি ॥ আষাড শরাবণ মাসে জল পড়ে বসে বসে  
**ধাদকী** ফুল ফটে **পলাশ** গাছে, এই রিঝ্ ভা'ওব ব'শাধ মাসে ॥  
 কাল জলে **কুঁচিলা** তলে ডুবল সনাতন, অ কি আন্বাদন, কি  
 দেখায়ে ভূলালি রে মন ॥ **কৈদ** বৃদা **ভুড়ুর** বৃদা ভিনাই ভিনাই  
 যায়, যবনার জলকে গেলে ভিনাই ভিনাই যায় ॥

ঝাড়খণ্ডী নরনারী, বিশেষভাবে যুবকযুবতী, ফুল অত্যন্ত ভালোবাসে। যুবকেরা কানে গৌজে এবং যুবতীরা খোঁপাতে। তাছাড়া ফুলের মালা খোঁপায় বা গলায় পরবাব যৌকও কম নয়। ফুল না পেলে যুবতীবা স্নদৃশ্য  
 ফুল পাতা গৌজে খোঁপায়। ফুলের রং, রূপ আর গন্ধ যেমন  
 মন টানে, তেমনি বহু ক্ষেত্রে ফুল প্রেমের চুতিয়ালিও  
 করে থাকে। আসলে ফুল প্রেমেরই প্রতীক। স্মৃটযৌবন তরুণতরুণী তাই  
 ফুলের জন্তু আকুল হয়ে থাকে। খোঁপায় কিংবা কানে ফুল গৌজার অর্থই  
 হল হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস বা প্রেমভাবনাকে বাইরে প্রকাশ করা। ফুল  
 যৌবনেরই রূপ, বিশেষভাবে যৌবনপ্রাপ্ত রমণী ফুলের রূপকে যৌবনের সমগ্র  
 রূপবসগন্ধ প্রেম এবং আনন্দ নিয়ে রসিকচিত্তকে মুগ্ধ করে তোলে। তাই  
 ঝাড়খণ্ডী লোকসংগীতে কতো বিচিত্র ফুল কতো বিভিন্ন রূপে এবং ভাবনায়  
 যে মিছিলের মতো উপস্থিত হয়েছে, তাব ইয়ত্তা নেই।

৪৭-৫২ অতদিন যে দেখি কালার কানে **জাম** ফুল রে, আ'জ কেনে কালার  
 বদন মলিন রে ॥ আ'ডেগ'ড়ে ফুটে **কাঁশি** চাঁইবাসার ফাঁসি রে,  
 অনেকেদিনের ভালবাসা দেখা করে আসি ॥ **কুল্‌হি** **কুল্‌হি**  
 যা'হ না **কাগজী** ফুল তুল্য না, কাগজী ফুলের মালা শামের গলে  
 বিহ না ॥ **কুল্‌হি** **কুল্‌হি** যাতে ছিলি **চাঁপার** ফুল কুটাই পালি  
 চাঁপার কলি এতই রে স্নন্দরী, ঘরে আছে **কদমের** কলি ॥ **কিন্‌য়া**  
 ফুলটি আ'নব ভাই আ'নব ছাতার আড়ে হে, তকে দেখাব না  
 ফুল বং যাবেক ছাড়ো হে ॥ কানেতে **শুঁজিলম** **শুঁজুর** ফুল,  
 বধু হারাই আলি জাতি কুল ॥ **গৌদা** ফুল গাঁথি দে ন মকে,

হাতে ধরি চুমু খাব তকে ॥ চৈত বৈশাখ মাসে ফুটল পলাশ রে,  
 যধু খাঁয়ে, ভয়র উ'ডল আকাশ বে ॥ জাডাতল যাহ না জাড়া  
 ফুল ছুঁই না দেখ জাড়া ছিটকে পড়িবে, এই কথাটি মনে রাখিবে ॥  
 শুকনা শিমলৈর কঁটি পব কেনে কানে, পব কি আপন হয় ইহ  
 জান মনে ॥ ঝি'গা ফুল সারি সারি ডাহিন খঁসায় শুঁজ ললকাবি,  
 কাঁকড় ফুল ফটে ছলকারি ॥ ঝুরিঝুমকার ফুল ফুটে হলা আলা,  
 আমাব বঁধু ঘরে নাইখ কাবে দিব মালা ॥ কুড়ি ফুল তুলতে  
 গেলে গায়ে লাগে খিব, কি ফুল পবালি কালা লিলি জাতিকুল ॥

ঝাডখণ্ডেব লোকগীতিতে ফুল যতো বেশি স্থান লাভ করেছে, ফলের স্থান

সে তুলনায় অবশ্যই কম ; তবু অজস্র গানে বিভিন্ন ধবনের  
 ফ-ন ফলেব প্রসঙ্গ আছে । এই সব ফলেব মধ্যে সর্বত্র সু-

পরিচিত ফল যেমন আছে, তেমনি ঝাডখণ্ডেব বুনো ফলও আছে । ঝাড-  
 খণ্ডেব অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণভাবে অত্যন্ত মৈবশাজনক । এগানে  
 অধিকাংশ লোক অত্যন্ত দুঃখেগটে জীবননির্বাহ করে থাকে । বহু সংসাবে  
 একবেলাও ভাত জোটে না ; তাই অবণ্যমানুষদেব অনেকাংশে বুনো ফল-  
 মূলেব ওপব নির্ভর কবতে হয় । ফলে, বুনো ফলমূলও লোকগীতিতে স্থান  
 লাভ কববে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, ববং এটাই স্বাভাবিক , লোক-  
 জীবনেব পূর্ণাবয়ব রূপ এই ভাবেই লোকসাহিত্যে পরিষ্ফুট হয় ।

৬০-৬৭ আম গাছে আম্র নাই ফাবড কেনে মা'ব, তুমার দেশের আমি লহি  
 জাঁখি কেনে ঠাব ॥ আম ফলে ধ'কাধ'কা তেঁত'ল ফলে বাঁকা,  
 এমন সময়ে বঁধু আমায় দিল ধ'কা ॥ আম পাকা লালে লাল  
 জাম্র পাকা কাল, কাঁঠা'ল পাকা গজভরা খাতে বড মজা ॥  
 আগ ডালের মাদা'ল পাকা জাঁখি ধারো তুল'ব, ডাঁটা ন রে  
 সাইকেলবালা তব সঁগেই যাব ॥ কে কে যাবে কাঠ কূচাতে কে কে  
 যাবে বন, কাঠ পাত মিছা কথা ভুড়রু খাবার মন ॥ এ ডুংরি সে  
 ডুংরি পিয়াল পা'কল, নাই যাব রে দাদা মন ভা'ঙল ॥ কে'দ  
 পাকা বড মিঠা খাঁয়ে লে রে লাম্পট্যা, কে'দ পাকা, তকে ডালেই  
 হিলাব রে ॥ মেঘনীপুব বাজারে ভেলা বিক্রায় অজনে ঘরের  
 কথা মনে পড়ে বাজাবে, ভাব করোছি ভেলা বাগানে ॥

বন্য জীবজন্তু, সরীসৃপ, জলচর জীব আদিও লোকসাহিত্যেব উপজীব্য



হয়েছে। কখনো এইসব জীবজন্তু মানুষের শত্রু হিসাবে লোকগীতিতে উল্লেখিত হয়েছে, কখনো-বা খাওজব্যা হিসাবে; কখনো জীবজন্তু এদের আচরণ লোকভাবনায় কোঁতুকরসের সঞ্চার করেছে, কখনো-বা এরা লোককবির অস্তরভাবনার সুষ্ঠু প্রকাশের সহায়ক হয়েছে। কখনো-বা এইসব জীবজন্তু রূপক চরিত্র হিসাবে সাহিত্যরসকে ঘনীভূত করেছে।

৩৮-৭৫ অ ললিতে চাবকি লে ল কাল বিড়াল কার বঠে, উনানশালে বস্ত্রে আছে কাঁচা দুধের সর খাতে ॥ ঘরে আছে ছাগলছেড়ী বিকে কর পয়সাকড়ি তুঁই পারিস যদি কুল'্যাই গুছ্যাই লিতে, তাউ বলিস ই পরবে নাই দিব যাতে ॥ আমার লাতির বড ছাতি দুয়ারে বাধ্যছে হাতি লাগুক টাকা দিব গুণাগারী, তবু না ছাডিব জিমেদারি ॥ শাল বাকলা বলি আসন বাকলা, জামাই বলি চুমাল্য বুঢ়া লাকড়া ॥ বাগমুড়ির পাহাড়ে বাঘের বড ভয়, সনার যাদু রূপার ভাই পাছে কিছু হয় ॥ গাড্যা তলে আঁড়্যা শ'শা ভালে, আমরা বলি বুনপুকি জলে ॥ শি শি করে বনের কেঁকলা'স টি, তর গলায় লাগাব নাগ ফাঁসি ॥

ঝাড়খণ্ডে খুব বেশি নদী-নালা বাঁধ-পুকুর না থাকলেও বর্ষাকালে এখানে অল্পবিস্তর মাছের আমদানি হয়। অল্প সময় ভাগ্যবান মাছ কয়েকজন, যাদের পুকুর আছে, কিংবা জেলে—যারা নদী-কুলের বাসিন্দা, মাছ খেয়ে রসনাতৃপ্তি করতে পারে। মাছ দুশ্রাপ্য বলে এবং তবকাবি হিসাবে অভিজাত, প্রায় বিলাসের সামগ্রী বলে, বৃষ্টিবাদলে কষ্ট করে ঝাড়খণ্ডীদের মাছ ধরতে হয়। তবু আর দশটি জিনিসের মতোই খুব সহজ স্বাভাবিকভাবে মাছ তাদের গানে উপস্থিত হয়েছে।

৭৬-৮২ উই লত্ পুই লত্ অরুণদের ঘরে, ইচলা মাছের ঝল করে অনিলদের ঘরে ॥ আমার বঁধু ভাত খায় নাই গগলী তরকারি, ডাঁচাও দেখি, দুটি ডাঁড়ক্যা মাছ ধরি ॥ শোল মাছে ডেগাডেগি পুঁঠি মাছে ছলকারি, সামাল ভাই, কন্ মাছ ধারে চল্যে যায় ॥ জল পড়ে ঝরাঝর মাছ উঠে সরাসর, তিৎলা চেং পড়ই মাগুর ধরলি, উদয়্যা বুম'র গাহলি ॥ ডুব্যে ডুব্যে মাছ ধরি শুদাই পুঁঠি টে'গরা, অ ছট দেঅরা, মালি ফুলে ব'সল ভমরা ॥ শালবাঁধের

আগালে মাছ ধরি সকালে, অ মাছ ধরোছি **গেঁতা** আর **পেঁকালে** ॥ সোব মাছ খাওয়ালে বঁধু না খাওয়ালে **মুলুহি** হে আর কি ফিরিব আমি নাইকান শলের কুলুহি ॥

জীবজন্তু, সরীসৃপ,<sup>১</sup> মৎস্য আদির মতো ঝাড়খণ্ডের লোকগীতে পাখি-পাখালিও বিস্তৃত অংশ অধিকার করে আছে। পাখি-পাখালি প্রসঙ্গও কখনো নিছক বিবৃতি হিসাবে, কখনো সৌন্দর্যচেতন হিঁসাবে, আবাব কখনো বা রূপক হিসাবে লোকগীতে স্বাভাবিক ধারায় স্থান লাভ করেছে।

৮৩-২০ লদী লদী যায় বঘা বালিচরুহা খায় রে, উড়িতে না পারে বঘা উলটবাজি খায় রে ॥ দাদা দে রে বাটুলটি, বিঁধ্যে মারি শালা **শাঁকচিলটি** ॥ অ রে ময়না পাখি, পান খাবি ত আনবি বে সনার জাঁতি ॥ আল্যবেহাই গালা **খুকড়াটি**, আমার বিক্লে হপ্য, টাকা টি ॥ **কেরকেটায়** খেড ঝাঁকে কৈকলা'সে মাথা লাডে **ধলি পাঁড়কায়** ধমসা গুডে ল সজনি ॥ আ'সল রে **কারিকুরি** ব'সল রে খারাখারি, রে কারিকুরি, বসিল অগম দরয়ার মাঝে ॥ তাল গাছে **চঁটিকেরি** বাসা, বঁধু আস ভাই, হাত বাঢ়ালে লাগ পাই ॥ সাদ করে **গুঁড়ুর** পুয়েছি আমার গুঁড়ুর যুরে না, এমনি আমার ভাঙা কপাল কডিং মিলে না ॥

### সমাজ ও জনজীবন পর্যায়

আদিম সমাজ সাম্যবাদী এবং কোমবদ্ধ ছিল। আমরা অল্পত্র বারবার বলেছি যে, ঝাড়খণ্ডের সমাজব্যবস্থায় আদিম সমাজের সাম্যবাদী কোমবদ্ধ রূপটি এখনো লক্ষ্যগোচর হয়। গোষ্ঠীই একদা পরিবারের সমাজ ভূমিকা পালন করত; কোন পরিবার বা ব্যক্তির বিশেষ কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু কালক্রমে গোষ্ঠীগত পরিবার ভেঙে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরিবারের সৃষ্টি হয়। তখন একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে গোষ্ঠীপরিবারের রূপটির ক্ষুদ্র সংস্করণ বজায় রাখা হত; কিন্তু সাম্প্রতিককালে একান্নবর্তী পরিবার খুব কমই লক্ষ্যগোচর হয়। পরিবারের পুত্রসন্তানদের বিবাহ-কার্য

মিশ্র হল এবং এক আধটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা পূর্ণগন্ন হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণের জন্তু সংসামান্য জমি ভাগ দেওয়া হয়, কখনো বৃদ্ধ পিতামাতা কোন এক পুত্রের সংসারে আশ্রয় পান এবং মৃত্যু পর্যন্ত অবহেলার জীবন কাটান, কখনো-বা কোন পুত্রই তাঁদের আশ্রয় দিতে না চাইলে নিজেরাই আলাদাভাবে কষ্টের জীবন যাপন করেন। ঝাড়খণ্ডের সামাজিক রীতি অনুসারে পুত্র পৃথক হয়ে যেতে চাইলে সমাজ পিতাপুত্রের মধ্যে মধ্যস্থতা করে জমি ভাগাভাগি করে দেয়; পিতার অনিচ্ছা থাকলেও পুত্র তার গ্ৰাঘা পাওনা পাবার অধিকারী হয়ে থাকে। কন্যার যতোদিন পর্যন্ত বিবাহ না হয় ততোদিন তার সমস্ত ব্যয়ভার পিতাই বহন করেন; বিবাহের পর মাঝে মাঝে পিত্রালয় থেকে সে কাপড়চোপড় পেয়ে থাকে কিন্তু পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাকে না। কন্যা বিধবা হয়ে ফিবে এলে কিংবা স্বস্তব-বাড়ি থেকে চিরকালের মতো পালিয়ে এলে কিংবা বিবাহবিচ্ছেদ ঘটালে পিতার ওপর আবার সে ভার হয়ে চেপে বসে; পিতা তার ভরণপোষণ এবং সাঁগা বা পুনর্বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যু ঘটে থাকলে ভ্রাতার সংসারে ভগ্নীব মর্যাদা ঠিকমতো রক্ষা করা হয় না; ভ্রাতৃজায়া-শাসিত সংসারে তাকে অত্যন্ত অমর্যাদার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়।

ঝাড়খণ্ডের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সাম্যবাদের আভাসমাত্র পাওয়া গেলেও কোমবদ্ধতার রূপটি এখনো পুরোপুরি বজায় আছে। প্রতিটি গ্রামে প্রধানতঃ একটি গোষ্ঠী বা গোত্রের লোকের প্রাধান্য দেখা যায়। গোত্র বা গোষ্ঠী-প্রধান সাধারণতঃ মাহাতো বা সর্দার বা প্রধান নামে পরিচিত হয়। এই গ্রাম-প্রধানের আদেশনির্দেশ গ্রামের সবাইকেই মেনে চলতে হয়। গ্রামের মঙ্গলামঙ্গল, শাস্তি-শৃঙ্খলা, বিচার-পরামর্শ সব কিছুই দায়িত্ব বা অধিকার তার ওপরই অর্পিত থাকে। অধুনা শিক্ষার প্রসার এবং শহর-জীবনের সঙ্গে জানপদবর্ণের সরাসরি যোগাযোগ ঘটবার ফলে এই সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙনের মুখে; গ্রাম-প্রধানের ভূমিকা কোথাও কোথাও রীতিমতো প্রবলের সম্মুখীন হচ্ছে। তবু যে-সব গ্রামে ক্রীতিক্ষণত সমাজব্যবস্থা এখনো প্রচলিত আছে, সেখানে গ্রাম-প্রধানের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের আদিম সমাজে দলনায়কের শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষাত্মকমে পরম্পরা-পুষ্ট; তাই এখনো ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে গ্রাম-প্রধানের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক বিধিনিষেধের উল্লঙ্ঘন করলে কিংবা কোন দুর্কার্য করলে

গ্রাম-প্রধানই বিচার-সভা আহ্বান কবে অগ্রাণ্ডদের সহযোগিতায় বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করে।

১-৩ উপর বার ভা'পুলতুসু নাম বাধে চেউ উঠে, উঠ উঠ গায়েব মডল হে জডা পন্ন বায ভাসে ॥ কুলহি কুলহি যাতেছিলি কে দিল বে আ'খ-ডাঁড়ি, গায়েব মডল জা'নে পালে মা'রবেক ল বেঁতের ছডি ॥ মাহ্ ৩ ঘরেব দুযাবে কিসের এত লক বে, ছুতুতু বহুটাকে মারোছে ভাঙরে রে ॥ গ্রামপ্রধানের বিচারকে কেউ না মেনে অবহেলা কবলে তা'বে 'এবখবা' হতে হয়। গ্রামেব অগ্রাণ্ডদের সঙ্গে তা'ব সব বকম যোগাযোগ ছিল হয়ে যায়। ওবে আগেই বলা হয়েছে, অধুনা সমাজব্যবস্থাতে ভাঙন দেখা দিতে শুরু কবেছে। ঝাডখণ্ডের গ্রামজীবনেও দলাদলি নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ কবেছে। পবিবাবগুলো যেমন ভেঙে যাচ্ছে, ওমনি সমাজব্যবস্থাও ভেঙে যাচ্ছে। সমাজেব বিধিনিষেবগুলো সহজেই ভেঙে বেলা হচ্ছে। সমাজের বিধিনিষেধ সবাব কঠোর ছিল যৌনতার ক্ষেত্রে। গোষ্ঠীব পবিত্রতা বক্ষা কবাব জন্তু একহ গোষ্ঠীব মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কেব ক্ষেত্রে যৌনমিলন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, বর্তমানে অগম্যাগমনেব বিধিনিষেধ মেনে চলা হচ্ছে না।

মাহুবেব জীবনকে কেন্দ্র কবে প্রধানতঃ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অস্থান পালিত হয়: নস্তা, নস্তা বা নস্তা (<নববাত্র), বিবাহ এবং মৃত্যু। এই তিনটি অস্থান একটি বিশেষ পবিবাবের মধ্যে পালিত হলেও এগুলো সামাজিক অস্থান। সমস্ত খবচপত্র পবিবাব বহন কবে, বিস্ত অস্থান পবিচালনা'ব দায়িত্ব থাকে সমাজেব হাতে। সমাজেব অগ্রাণ্ড সদস্ত 'পেচ ভাত'-এব বানিয়ে সমস্ত কাজ সমাধা করে দেয়। এই সব অস্থানে আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানো'ব নিয়ম তো আছেই, তা'ব ওপব গ্রামের আখালবুদ্ধ-বানতাকে ভোজ দিতে হয়। আখিব অসঙ্গতির জন্তু কেউ ভোজ দিতে না পাবলে গ্রামপ্রধানের কাছে তা'নবেদন কবতে হয়, সমাজ সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভোজ দেবাব দায় থেকে বেহাহ দিয়ে থাকে, সমাজকে অস্বীকার কবে কোন অস্থানই করা সম্ভব নয়।

ঝাডখণ্ডের সমাজজীবনে একান্নবর্তী বৃহৎ পবিবাব বর্তমানে খুব বেশি দেখা না গেলেও একেবারে দুঃখ নয়। অতীতে যে একান্নবর্তী পবিবাবেবই প্রাধাত্ত ছিল তা আমবা জাওয়া গাঁওর আলোচনা প্রসঙ্গে পবিবাব দেখিয়েছি। সাধারণতঃ একান্নবর্তী পবিবাবগুলোতে

গৃহস্বামী এবং তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূ-পৌত্র-পৌত্রীরাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। আমরা আগেই বলেছি, এখানকার সমাজ অনেকাংশে কোমবন্ধ সমাজ। তাছাড়া এখানকার পরিবারগুলোকে কুটুম্ব-পরিবার বলা যেতে পারে; সম্প্রদায়গত কুটুম্বিতা তো আছেই, তার ওপর গোত্রগত, পরিবারগত কুটুম্বিতাও আছে। বিবাহের সূত্রেই দু'টি অপরিচিত পরিবার কুটুম্ব-পরিবারে পরিণত হয়। তাই যে-কোন পরিবারে কুটুম্ব-সংস্কার একটি অবশ্য পালনীয় পাবিবারিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব; মানমর্ষাদার বিশেষ প্রশ্ন এবং দু'টি পরিবারের মধ্যে মনোমালিঙ্গের আশঙ্কা কুটুম্বসংস্কারের তারতম্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। এ ছাড়া 'ফুল' পাতানো বা সখাসখীত্ব পাতানোর মধ্য দিয়েও দু'টি পরিবারের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়; ফলে 'ফুল' বা সখাসখীও কুটুম্বের মতোই একটি বিশিষ্ট মর্ষাদাপূর্ণ স্থান লাভ করে থাকে। গৃহস্বামীর কোন পুত্র বা কন্যার 'ফুল' তাঁর কাছে পুত্র বা কন্যা হিসাবেই স্থান পেয়ে থাকে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তার সম্পর্ক একই নিয়মানুসারে গড়ে ওঠে অর্থাৎ ফুলের মা তারও মা, দাদা-দিদিরা তারও দাদা-দিদি ইত্যাদি।

লোকসংগীতে পরিবারের বিভিন্ন জনের পরিচয় পেতে হলে অন্য পরিবার থেকে বিবাহ-সূত্রে আগত বধূ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজন; কারণ তার ফলে আমরা স্বশুর-শাশুড়ী-ভাশুর-জা-দেওর-ননদ এবং স্বামী সম্পর্কে তার মনোভাবের পরিচয় পেতে পারি। আমরা জাগিয়া গীত প্রসঙ্গে দেখেছি, এই সব একান্নবর্তী পরিবারে বধূ পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মতামতের কমবেশি গুরুত্ব ছিল। স্বশুরালয়ে বধূর চরম শত্রু ননদ, অনেকটা অহি-নকুলের সম্পর্ক। পরস্পরের মধ্যে নিত্য ঝগড়া-কলহ, প্রতিশোধ-স্পৃহা লেগেই থাকে। তাই একটি গানে দেখা যায়, বধূ স্বশুর-শাশুড়ী ভাশুর জা দেওব সবাইকে 'দহিছুধভাত' 'আর' ছলা কলাই ডা'ল' খেতে দেবার কথা বলেছে (স্বশুরকে খাতে দিব নাই ছুধ ভাত গ, গ, আর দিব ছলা কলাই ডা'ল ইত্যাদি) কিন্তু ননদের পাতে এগিয়ে দেবে উল্লুনের গবম ছাই আব তার পেছনে লেলিয়ে দেবে কুকুর (ননদকে খাতে দিব চুলুহার গরম পা'শ গ, আর দিব কুকুর লেলু'ই)। অন্য আর একটি গানে পরিবারের বিভিন্ন জনের সঙ্গে তার সম্পর্কের মাপুর্ষ এবং তিক্ততা প্রকাশ পেয়েছে: স্বশুর শাশুড়ী এবং ভাশুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক মধুর, দহিছুধ-

ভাষ্যেব মতোই ; বড জায়ের সঙ্গে যে-সম্পর্ক তার সঙ্গে হাঁড়ি-ধোয়া জলের তুলনা করা হয়েছে ; দেওবেব সঙ্গে তার হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক কিন্তু ননদের সঙ্গে যে-সম্পর্ক তা কেন্দুকার্ঠেব অগ্নিশূলিকের সঙ্গেই তুলনীয় ; আর স্বামী দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক ? প্রভাবেব সম্পর্ক ।

৭ শ্বশুর কা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে দহিদুধ-ভাত গ, সেইসনে ।  
 শাউড়ী কা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে দহিদুধ-ভাত গ, সেইসনে ।  
 ভাশুর কা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে দহিদুধ-ভাত গ, সেইসনে ।  
 জেঠানী কা বলনবসন কেইসনে যেইসনে হাঁড়ি-ধুয়া পানী গ, সেই  
 সনে । দেওর কা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে হাঁসি-টিটিলি গ,  
 সেইসনে । ননদ কা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে ফটকটি কাঠ গ,  
 সেইসনে । সঁয়াকা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে পয়নার পাহার  
 গ, সেইসনে ॥

আব একটি সুদীর্ঘ জাওয়া গীতেব মধ্য দিয়ে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে বধূব সম্পর্ক অত্যন্ত সহজ স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে । এ-গান এতোই প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব যে এ-গান বৃষ্টি-বা একমাত্র নারীসমাজেই রচিত হতে পারে । এ-গানে কোন অলংকার নেই, কোন অনাবশ্যক অস্পষ্টতা বা অস্বচ্ছতা নেই । নির্ধাতনে জর্জবিত বধূব তিব্ব অভিজ্ঞতা থেকে এ-গানের কথাবস্তুর উদ্ভব । শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, অথচ ভ্রাতৃজ্ঞান দিব্যি ভালো মানুষেব মতো পিঠেসন্দেশসহ বিদায় দেবাব জন্ম উদগ্রীব । শ্বশুর নিতে এসেছেন, বধূব কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে যাবার ইচ্ছে নেই ; কারণ শ্বশুরের সামনে সব সময়ই ষোমটা টেনে চলতে হয় । হাশুকর হলেও এই অজুহাতে বধূ চূপচাপ গুয়ে থাকে :

৫ আদাডে বাদাডে ঝিঁগা মবলি কা পাত গ, সেই পাতে ননদী ঘুমায় ।  
 উঠ উঠ উঠ ননদ শ্বশুর আলা লে'গতে গ, করে'য় দিব পিঠা কী সন্দেশ ।  
 শ্বশুরেবি স'গে হামে নাহি যাব গ, ঘণ্টা টানিতেই দিন যায় ।

শাশুড়ীব সঙ্গে যেতেও অনিচ্ছা, কারণ দাসীর মতো 'ট'কা ডালা'র ভার বহিতে হবে :...শাউড়ীর স'গে হামে নাহি যাব গ, ট'কাটা বহিতেই দিন যায় । ভাশুরের সঙ্গে পরিহারেব সম্পর্ক, তাই রাস্তা ঝড়িয়ে ছায়া-ছোয়া বাচিয়ে চলার অজুহাত :...ভাশুরের স'গে হামে নাহি যাব গ, রাস্তা কাটিতেই দিন যায় । দেওরের সঙ্গে রক্তরসিকতার সম্পর্ক, তাই হাসি আর খেলার

মধ্য দিয়ে অকারণে দিন কেটে যাবার অজুহাত :...দেওরের সঁগে হামে নাহি যাব গ, হাঁসিতে খেলিতেই দিন যায়। ননদের সঙ্গে অহি-নকুল সম্পর্ক, তাই পদদাপে পরস্পরকে শাসন আর ত্রাসনের অজুহাত... ননদেরি সঁগে হামে নাহি যাব গ, এড়ি ধমকেই দিন যায়। সর্বশেষে স্বামী, যার সঙ্গে তার প্রহারের সম্পর্ক, তাই সে স্বামীর সর্বক্ষণ লাঠি-হাতে প্রহারের হুমকির কথা তোলে :...সঁয়ারি সঁগে হামে নাহি যাব গ, পয়না বলকেই দিন যায় ॥

অতঃপর আমরা লোকসংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জীবনধারা পর্যালোচনা কবে দেখব। ঝাডখণ্ডে বিবাহবন্ধনটা একদা অনেকাংশে সন্তানোৎপাদনের চুক্তিবিশেষ ছিল বললে অতুক্তি করা হয় না। বধুর জীবন ক্রীতদাসী ব জীবন ছিল, পরিবারে সন্তানোৎপাদন এবং দাসীবৃত্ত কবা ছাড়া তার অণ্ড কোন ভূমিকা তেমন গুরুত্ব পেত না। স্বামী ইচ্ছা করলেই 'মদ্রুবা' লাঠি দিয়ে প্রহারে-প্রহারে স্ত্রীকে জর্জরিত করতে

পাবত, 'পয়না বলকে' স্ত্রীকে তটস্থ করে রাখতে পারত ;  
বিবাহিত পুরুষ

স্ত্রী ব সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল 'পয়নার পাহার' অথবা 'পানা কা শাট'—তাই যখন তখন স্ত্রী ব ওপর কিলচডঘুঁ বিবর্ষণে তার যেন মৌলিক অধিকার ছিল। বিবাহে ব আগে ভারী বধুর মন জয় করবার জন্তু নিজের ধনসম্পদের মিথ্যে রঙিন চিত্র অঙ্কনে সে যেমন পটু, তেমনি বিবাহের পরে বধুকে উপবাসী রাখবার ব্যাপারে সে প্রাতিহিংসাপরায়ণ নির্লজ্জচূডামণি। সংসারকে অতলে ডুবিয়ে সে যথেষ্ট খরচ করতে পারে। সে ইচ্ছা করলেই একাধিক নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তার ফলও তাকে ভোগ করতে হয়। সে ইচ্ছা করলে হাতের 'লহা' ছিনিয়ে নিয়ে বিবাহ-সিচ্ছেদ ঘটাতে পারে ; আবার বিবাহ কিংবা 'সঁগা' করতে পারে। অবশ্য সঁগার স্ত্রী যেমন সামাজিক কৌলীণ্য কম, তেমনি সঁগার পাত্রও স্ত্রীর কাছে নিতান্ত তাচ্ছিল্য লাভ করে থাকে।

৬-১২ ঝিলিরমিলির ঝিলিরমিলির জুসনায়, বুচায় খুঁদালায় বৃষ্টির থুতনায় ॥  
তুঁই যে বলিলি পাইখা গরুবাছুর ঢে'ররে, তিলস'রষার লেখাজমানাই।  
সকালে উঠিয়ে' দেখি বাড়িয়া বলদ রে, হাল জুড়িতে জুঁয়াল নাই,  
পাইখা পা'খ লেদারুণ ॥ এক সেরা চা'ল দিব মাড়ে-ভাতে বুঝ্যে  
লিব, পেট না ভরিলে গা'ল দিব, কা'ল তকে রাঁধনী ছাড়াব ॥ এক

বাটি আমানি তলে দুটি ভাত গ, সেহ দেখো, বল কাঁদে সাবা বা'ত  
গ ॥ যখন উডায় পয়সাকডি মীনাব বাপেব পায়ে পডি, কখন পিটে  
বিবুছি-পিটা ডাং-এ, বাজে আসি মীনাব বাপের সং-এ ॥ বেহালা  
পুকম হথা ছাতা ঢাকা নিয়ে যাতা, সাঁঘালা পুরুষেব মুখে ছাই, পেছ  
পেছ লুকুক লুকুক যায় ॥

কিন্তু সব স্বামী যে এতোগানি নিষ্ঠুরতাব প'বচয় দিত না নয়, স্ত্রীকে  
অনেকেই সপ্রিয়ত্যা ভালোবাসত। স্ত্রীর অসুখে বিশুপে তাবা উৎসর্গবোধ  
কবত, নিজেব মা বোনেব পীডনেব হাত থেকে বক্ষা কববাব জন্তু আ ডাল দিয়ে  
দাঁড়াত, স্ত্রীব হয়ে মায়েব কাছে নানান ব্যাপাবে অভিযোগ এবং সুপাবিশ  
দুইই কবত। অনেকে আবার স্ত্রী'ব হাতেব পুতুলে পবিণত তত স্ত্রী'ব  
ফাইফবমাশ গাটেতে গিয়ে হাঁকিষে উঠত। স্ত্রীকে ভয় কবে চলত এমন  
স্বামী'ব সংখ্যাও কম নয়, স্ত্রী'ব একটু আদব-সেবা পাবাব জন্তু ঊপহাবে-  
উপঢ়ো'কনে মন জয় করবাব চেষ্টা কবত, স্ত্রী'ব তর্জনেগর্জনে কখনো-কখনো  
তাকে তটস্থ হয়ে থাকতে হত—কখনো বা স্ত্রী'ব পীডনে জর্জবিত স্বামী'ও  
আত্মবিসর্জনের কথা ভাবত।

১২-১৭ দুই পালি জব আসে'য়ে তাই আসে'য়ে লিতে, বুঝাই মান'াই  
পাঠাই দে গ, চলুক দীবে ধীবে, বরং আমি পথে লিব কলে ॥ 'রাখ  
রাখ তব ঝারিপানী বাখ রাখ তব পি'টা গ, দেহি কছাব কেমনে  
শুকিল গ।' 'মা তুমা'ব বাঁধনী বহিন তুমা'ব বাঁটনী, নিতি পবতু  
পেটেব কশলা গ।' 'মা যা'ক মোর দেশ বুলি বহিন যা'ক মো'ব  
নগব বুলি, তু'ই কছা পাটেব বানী গ, তু'ই কছা বেহালী বানী  
গ ॥' ঝােছিলাম পবগণা কিন্তে আ'লম বরণা, সেই বরণা পরূহাব  
আশিনে, মৈলাম বাবা মাগীর কথা শুন্তে ॥ যখন দিই গ পয়সা-  
কডি তখন দেয় গ ভাতমুটি দু দিন কবে উপব্যা যতন, মীনা'ব মায়ে'ব  
বাঁকোই থাকে মন ॥ হাতে লিব চূণখাডি ছাড়া'ব তব নাগরালি  
অই খানকে গেছলি কি কাবণে, ভয় নাই তব বুকে'ব বেদনে ॥ আমি  
বেজার হলাম মীনা'ব মায়ে'ব সংগে, বাঁপ দিব যবুনা'ব গাঙে ॥

ওপবেব গানগুলো থেকে শুধু যে বিবাহিত পুরুষের জীবনের কথাই ব্যক্ত  
হয়েছে, তা নয়, বিবাহিতা নারী'ব ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।  
বিবাহিতা নারী'ব জীবনধা'বা শত বন্ধনে বাঁধা থাকলেও এবং তাকে প্রায়



ক্ৰীতদাসীর জীবন কাটাতে হলেও সে যে আদিম রমণীর রুক্ষতায় পুরুষকে  
 সন্ত্রস্ত করে বাখতে পাবে, তা'ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ  
 বিবাহিতা নারী পেয়েছে। আদিম নারী পুরুষের ওপর তার প্রাধাণ্য  
 বিস্তারের ক্ষমতা হারালেও সে যে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে নি, তা কয়েকটি  
 গানে পুরুষকণ্ঠের সন্ত্রস্ত উক্তি থেকে বোঝা যায়। তবু বিবাহিতা নারীর জীবন  
 যন্ত্রণার জীবন ছাড়া কিছু নয়। সেই বালিকাবয়সে তাকে 'পরের ঘর' করতে  
 যেতে হয়। একবার বিয়ে হওয়ার অর্থ পিত্রালয় থেকে চিরকালের জগ্ন বিচ্ছিন্ন  
 হয়ে পড়া। দূবদেশে বিয়ে হলে শস্তুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসবার জগ্ন লোকের  
 অভাব পড়ে। ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না ভেবে বাপ-মা তাকে যে-বাড়িতে  
 বিয়ে দেন, সে-বাড়িতে প্রতিদিনের অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে বধু তার স্বপ্ন-  
 ভঙ্গের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে। পেটে খেতে অন্ন জোটে না, প্রায়ই তাকে  
 উপবাস করে থাকতে হয়। শিশুবাল্যের আত্মীয়স্বজনও কেউ তার দুঃপে  
 সহানুভূতি জানায় না। শান্তুডী-নন্দী তাব জীবনে কুগ্রহের মতো প্রতি-  
 মুহূর্তে অনর্থসৃষ্টির জগ্ন তৎপর থাকে; তার দৈনন্দিন ঘরগেবস্থালির কাজকর্মে  
 তারা কোনরকম সামান্য তো করেই না, উপরন্তু তাকে কিভাবে বিপদে-  
 বিপাকে ফেলা যায় তারই বডযন্ত্র করে। নিজের মনের সাধআহ্লাদ মিটিয়ে  
 কিছু কেনাকাটা করবে কিংবা মেলা-পার্বণে যাবে তেমন কোন অধিকার তার  
 থাকে না। স্বামীও তাকে ভালোবাসে না, অথচ তার মন পাবার জগ্ন সে  
 কি না করে; ভালোমন্দ রাগা করে খাওয়ালেও সন্তুষ্ট হয় না—কোন কিছুতেই  
 মন ওঠে না—বরং সব সময় সাহায্য অজুহাতে কিল-চড়-লাথি-সুঁষি-চারুক-  
 বর্ষণের জগ্ন উঁচিয়ে থাকে। স্বামী সন্তানের কোন দায়িত্ব নেয় না, সন্তানের  
 খাণ্ডসংস্থানের সব দায়িত্ব যেন তারই। তার ওপর স্বামী যখন তার যৌবন, তার  
 নারীত্ব সব কিছুকে অবমাননা করে পরকীয়া প্রেমে মত্ত হয়ে ওঠে, তখন সে  
 প্রতিহিংসায় হিংস্র হয়ে ওঠে; কখনো-কখনো প্রতিহিংসা এতো বেশি তীব্র রূপ  
 ধারণ করে যে স্বামীকে ঘরের ভেতর আটকে রেখে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতেও দ্বিধা  
 করে না। আবার কখনো সে তার যন্ত্রণাজর্জর জীবন থেকে মুক্তি পাবার জগ্ন  
 বাপের বাড়ি পালিয়ে যায়; শস্তুরালয়ে ফেরার চেয়ে সে জলে ডুবে আত্মহত্যা  
 করা শ্রেয় বিবেচনা করে। নারীর জীবনটাই তার কাছে অর্থহীন ঠেকে, তাই  
 নারীজন্মের প্রতি দিক্কার জানাতে কুষ্ঠিত হয় না।

১৮-৩১ মায়ে-বাপে বেহা দিল খাপরা ঘর দেখ্যে ল, জনম গেল ঢালা মাড়

খাতে ॥ যাহাব ঘরে ননদ নাই তাহার বড় মজা রে, খনেক তাতা  
 খনেক বাসি খনেক চা'ল ভাজা ॥ কতখন অধন দিইছি চা'ল  
 মেরাতে ভুলে। গেছি, ননদ বাদী, ডুবালি আমাকে, দে ন বহিন  
 চা'ল গিলা মেরায়ে ॥ ছানা কাঁদে হরল গবল গহা'লে গবর ভরল,  
 আ'জ মছল গেল রে দু ঠেকা, শান্ত্রী ননদী বং দেখা ॥ ইদ দে'খতে  
 যাব বলি কাপড় কাচিলি, ভাল সঁয়া বে, ইদ দে'খতে কই যাতে  
 দিলি, সেহ কাপড় পাট করি পেড়িতে বাখিলি ॥ মীনার বাপের  
 কথায় চলি তাউ হলি চখোর বালি, গা'ল দিছে মাতালিয়া ঢং-এ,  
 লাচার হালি মীনার বাপের সং-এ ॥ যখন রাঁপি কচড়া পুরুষ বেজাঁই  
 খেঁচড়া, শুদাই শুদাই কিল ঘুঁষি মারে, ঘরের কথা নাই বলি ডরে ॥  
 যখন রাঁধি শ'ল্লা শাগ পুরুষের হয় বেজাঁই রাগ, পেলাঁই দিবেক খত  
 ঢডার খাবে, ঘবেব কথা নাই বলি ডরে ॥ ছানা কাঁদে মাই মাই ঘবে  
 খাতে খাবার নাই, ছানার মা ত গেল অরুণ বনে, ছানা কাঁদে  
 ধা'দকার বনে ॥ জাডে ত থুরু থুরু বুকে ছুটি হাত রে, পালঙ্কে উঠিয়া  
 দেখি নাই প্রাণনাথ ॥ গা'ল দিলি ভাল করলি পিঠ করলি রাঁগা,  
 তব বুকে পড়াই মারি কা'ল হব সাঁগা ॥ যেমন গ কাপড়ের পা'ড  
 তেমন গ পুরুষের মা'র, শিশু অঙ্গে কতই না মা'র খাব, এবার আমি  
 নামাল পালাব ॥ আঙুই আঙুই রাহেড় বাড়ি তাহার পেছু খশুর-  
 বাড়ি, নাই যাব খালভরার ঘরে, কাঁপ দিব যবুনার জলে ॥ রমণী  
 জনমে শত দিক, বেশি কথা কি কব অধিক ॥

বিবাহবন্ধন পুরুষের পরনারীগমনের পক্ষে মোটেই বাধা নয়। পুরুষ  
 বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত, তার পক্ষে পরনারীগমন মোটেই সামাজিক  
 অপরাধ নয়। পুরুষ বিবাহিত হলেও দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে  
 পরকীয়া প্রসঙ্গ  
 আনবার তার অধিকার আছে; সামান্য কলঙ্কের বিনিময়ে  
 সে পরকীয়া প্রেমেও আসক্ত হতে পারে। এর জন্ত সমাজ তার প্রতি কোন  
 রকম দণ্ডবিধান করে না। গ্রামের কোন বিবাহিতা বধু, বিবাহবিচ্ছিন্না নারী  
 কিংবা কুমারী কঙ্কার সঙ্গে তার অবৈধ সংসর্গ গড়ে উঠতে পারে।

৩২-৩৪ খালভরা হামকে সাঁতাছে, খাবার বেলা গাবারগুবুর খাছে। ঘরে  
 আছে খাছে খুছে পরের ঘরে মাউকাছে পরের ঘবে কিবা মজা পাছে।  
 দুধ মিঠা গুড় মিঠা, পরের পুরুষ মিঠা, পরের পুরুষ কি জানে মোর

বেদনা, চখোর জলে ভিজল বিছনা ॥ আর কি ভালবাসবি আমাকে,  
তর বউ আশ্বেছে মাঝ্যাকে ॥

বিবাহবন্ধন নাবীর পরপুরুষসংসর্গের পক্ষে দুর্লভ্য বাধাবিশেষ। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের আরণ্য জনজীবনে যৌনতার সবিশেষ প্রাধান্য থাকায় বিবাহিতা নারীও দুর্লভ্য বাধাকে সহজেই লঙ্ঘন কবে যায়। লোক জানাজানি হলে কলঙ্ক রটে, স্বামীর প্রহাব সহ্য করতে হয়, কখনো কুল যায়, কখনো-বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। আদিম ভূখণ্ডের রমণী তা সত্ত্বেও সমস্ত খুঁকি নিয়ে পরপুরুষ-সংসর্গ করে। কখনো-বা স্বামীর পবনারীগমনের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায়, কখনো স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আক্রোশে, কখনো-বা পরকীয় প্রেমের স্বাভাবিক আকর্ষণে বিবাহিতা নারী বিবাহের পবিত্রবন্ধনকে উল্লঙ্ঘন করে। তবে এ থেকে কেউ যেন না ভাবেন যে ঝাড়খণ্ডের নর-নারী যৌনসর্বস্ব, চরিত্রের পবিত্রতাবোধ এদেব নেই কিংবা যৌনতা এখানে একে-বাবে সংস্কারমুক্ত। রিবংসাবৃত্তির প্রাধান্য জনজীবনে থাকলেও একেবাবে অব্যবহৃত এবং বাধাবন্ধহীন নয়, এই কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার। নিচের গানগুলোতে বিবাহিতা, এমন-কি সম্ভ্রানবতী, নাবীর পরপুরুষভজনার ইঙ্গিত আছে।

৩৫-৪০ এলাচ লবং পানের খিলি কবে রে তুঁই খাওয়ালি, এমনি যে তর  
ভাবের নিশা ছ ছানার মা ভুলালি ॥ ছুটুমুটু ডিহালি কেনে ল তুঁই  
বিহালি, ছেল্যার মা ইয়ে এবার আমরাকে ভুলালি ॥ আপন  
পুরুষের লাগো কানা নেহগা শাগ ল, পরের তরে, অ তর ঝিঁগায়-  
মেশা ডা'ল ল ॥ পহিলা সাঁজের বেলা কে মারিল চালে টেলা,  
টেলা লহে গ পানের পটলা, গা'ল দিছে ননদ কুটলা ॥ যখন যাই  
জলকে খালভরায় ছলকে, পাছে কন লকের সঁগে রাজটবিষয় আছে ॥  
সনলা শাগ ভাজি ভাজি সি-পুরুষের নাই রাজি, কে পরহাল্য তকে  
লীল শাড়ি, পাড়ার লকে করে ভালাভালি ॥

ঝাড়খণ্ডের সমাজজীবনে বিবাহবন্ধন কোনক্রমেই অচ্ছেদ্যবন্ধন নয়।  
বিবাহবিচ্ছেদ পুরুষ বা নারী, যে কোন পক্ষ থেকেই ঘটানো সম্ভব। কোন  
কুমারী কন্ঠার সিঁপিতে হাটে-বাটে-ঘাটে-মেলায় একবার সিঁদুর ধবে  
বিবাহবিচ্ছেদ দিতে পারলে 'সিঁদুর-ঘষা' বিবাহরীতি অহুসারে তাকে  
যেমন সিদ্ধবিবাহ বলে মেনে নেওয়া হয়, তেমনি স্ত্রীর

সিঁপি থেকে সিঁদুর মুছে দিয়ে হাত থেকে নোয়া খুলে নিয়ে বিবাহবিচ্ছেদও ঘটানো যায়। এ ছাড়া সমাজপতিগণের মধ্যস্থতাতেও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানো হয়। কখনো কখনো সমাজপতিগণ একটি শালপাতাকে ছুঁটুকরো করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদ সিদ্ধ ঘোষণা করে। সাধারণতঃ ভবনপোষণের অক্ষমতার জন্তু, স্ত্রীচালচলন আচারব্যবহারের জন্তু, স্ত্রীর বাড়াচালাবেব জন্তু পুরুষ স্ত্রীতাগ কবে থাকে।

১১-৪৩ কুল্হিমুড়ায় টানাটানি লে লহা যাব আমি, খালভরাব এত মনে ছিল, আশিন টানে লহ লুটো লিল, আধা দিনে কূলে দাগা দিল ॥ হাতে হাতে পান দিতে দেখোছে পাড়ার লকে, চূণ দিতে দেখোছে ভাসুরে, আ'জ ধনির কি আছে কপালে, আ'জ ধনির কি জানি কি করে ॥ শালগাছে শুয়া পকা অইটাই বঠে বাবুর কাকা, দেখা পালে ব'লবে পিয়াকে, কি দষে ছাড়োছে আমাকে। জুঁঠাহাতে ভাত বাঁটা যেটা পাবি সেটাই চাটা, হাঁড়ি-খাওয়া নামটা তব উঠোছে, সেই দষে তকে ছাড়োছে ॥

অন্যদিকে স্ত্রীও স্বামীর পুরুষত্বহীনতা কিংবা পবনারীসংসর্গের জন্তু বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পাবে। ঝাড়বগের সমাজজীবনে একদা নাবীকে নির্ধাতন-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে জীবনাতিপাত করতে হত। প্রতি পদক্ষেপে আত্মীয়স্বজনের গঞ্জনা তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলত। তার ওপর ছিল স্বামীর অকথ্য অত্যাচার, প্রহারে-প্রহারে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে জর্জরিত কবে তুলত; এই জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্তু স্ত্রী পিত্রালয়ে পালিয়ে গিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাত। কষ্কার চুংথের কাহিনী শুনে মা-বাবাও আর তাকে শ্বশুরবাড়িতে ফেরৎ পাঠাতে রাজী হয় না, জামাই-এর সঙ্গে ঝগড়া করে, এমন-কি মামলামোকর্দমাতেও জড়িয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় স্ত্রী তার প্রণয়ীর হাত ধরে অজানার পথে পা বাড়ায়।

১৪-৫০ শুষণি শাগের ভাজি ই পুরুষটা বেজাঁই রাগী শিশুকালে কতই গঞ্জন সেইব, চল দেওরা নামাল পালাব ॥ বড় ঘরের বহু পালাল্য কেঁদ বনে, যাকেই শুদাই সেই বলে ভাই কে জানে ॥ বাঁধনা পরব আলা পিঠা সঁদেশ লিয়ে অঁলা, ফুলুর মা, ফুলুকে ত জামাই আলা লিতে। ফুলু আম্দের দুধের সর তাই আসোছে রাইতে জর, ফুলুর বাপ, ফুলুকে ত নাই দিব যাতে ॥ শ্বশুরঘরের খাল-

ভবারা লে'গতে আশ্বেছে, নাই যাব গ আমার মাথা দুখাছে, কা'ল সকালে জবাব দিব দেশের মাঝেতে ॥ যায়ে-বাপে বেহা দিল ঠেঁগা-ধরা বরকে, আর যাব নাই শ্বশুরঘরকে ॥ আমার টুঙ্গুর একটি ছেল্যা মানবাজারে শ্বশুরঘর, জলের ঘাটে কলসী রাখো পাল'াই আল্য বাপের ঘর। আলি বিটি ভাল করলি আর ত ছাড়ো দিব নাই, কমর বাঁধে লা'গব লিয়াই জামাই বল্যে ছা'ড়ব নাই ॥ দামপাড়ার লখিন্দর বিটিকে না কবায় ঘর, শ্বশুর-জামাই করে মকদ্দম', খা'ক বিটি না কবিব মানা ॥

বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যাবার পর নারী বধুবেশ ছেড়ে কুমাবী কণ্ঠা সাজে। সিঁথিতে থাকে না সিঁদুব, হাতে থাকে না নোয়া। বধুবেশ ছাড়লেও তখন সে যৌন-অভিজ্ঞতায় উত্তাল উদ্দাম এক নারী। অতঃপর তার স্বাধীন নায়িকা সাজবার পালনা। সমাজের অমুশাসনকে উল্লঙ্ঘন করতে সে কুঠাবোধ করে না। জাতি-কুল-কলঙ্ক ভয়ে সে কম্পিত হয় না। বিবাহবিচ্ছিন্না নারী একরকম বল্গাহীন উদ্দাম জীবন কাটায় বলে লোকে তাদের 'উদমা হুঁড়ী' বা 'উদাম বাঁড়ী' বলে তাচ্ছিল্য করে। বিবাহবিচ্ছিন্না নারীর বেশভূষা, চালচলন প্রায়শঃ রীতিবিরুদ্ধ হয়ে থাকে : শাড়ি পরবার ভঙ্গি, চল বাঁধা এবং সিঁথির ঢং, চালচলনের বকমসকম সমাজের কাছে ঐক্যমূলক চ্যালেঞ্জবিশেষ। সমাজ তাই এদের অনেক সময় একঘরে করে অথবা কুলটা আখ্যা দেয়। দেহের বিনিময়ে সে পরপুরুষের কাছ থেকে অলংকার-সাজসজ্জা সমস্তই সংগ্রহ করে নেয়। মধুলোভী পুরুষ তাদের চালচলন দেখে বুঝতে পারে, তারা বিবাহবিচ্ছিন্না নারী। সমাজের কর্তারা তাদের দিক্কার দেয় কিন্তু তাবা নির্বিকার, তারা তাদের চালচলনে সাজসজ্জায় মহাভারত অশুদ্ধ হবার মতো কিছু খুঁজে পায় না। সৌভাগ্যক্রমে এদের সাঁগা হলে এবা কোথাও আশ্রয় পায়, অথবা যৌবন অতিক্রান্ত হলে অত্যন্ত হেনস্থার জীবন কাটাতে হয় ; কটাভানারি করে কিংবা পরের বাড়িতে বি-কামিনেব কাজ করে উদরান্নেব সংস্থান করতে হয়।

৫১-৫৮ ভাড়া ঘরে থঁজা রলা কতই হিয়ায় সহিব, বেহাল্যা পুরুষ ছাড়ো আমি কতই বৈধ ধ'রব ॥ উতুরে ফেলিল মাটি নাচনীদেব সনার কাঁঠি, অ উদাম বাঁড়ী, কতই বা পর'হাব শাঁকাশাড়ি ॥ পাঁড়ুদহা যাতে যাতে চাইলে চিন্হেছি তকে, নাখে বেসর কানে মাকড়ি দলকে,

অকালে পুরুষ ছাড়োঁছে ॥ শুকনা হস্তকী খাড়া যত ছুঁড়ী ভাতার-  
ছাড়া, ভাতাব-ছাড়া নাম তাদের গেল না, যিক রে জীবন  
বাথ না ॥ লকে বলে ছি ছি আমি বা করোছি কি, নাখে লোলোক  
হাতে শাঁখা প'বহেঁছি, বেহাল্যা পুরুষ ছাড়োঁছি ॥ সকালে উঠোঁছি  
আমি বা করোঁছি কি, সকালে উঠোঁই সীতা কাটোঁছি, বিকালে  
বাজাব বলেঁছি ॥ হেন যৌবন চ'দিন তবে হবি গ পরেব অধীন,  
যৌবন গেলে ছুবে না কেউ সজনি, তখন তুঁই খাটো খাবি কামিনী।  
হায় গ সাধেব রমণী, ফুল ফুটলে হবেক মলিন ॥ পাহাড়ে পরবতে  
ঘব তাই আশ্রেছে সাঁঘাব বর, বর দেখো কইনা বেয়াকুল গ,  
থশুবে-জামাই-এ গৌঁদাফুল ॥

নারীকে যতোই শাসন-অমুশাসনেব বাধনে বেঁধে রাখবাব চেষ্টা করা হোক  
না কেন, তারা কিন্তু আর অবলা সবলা বালা হয়ে থাকতে বাজি হয়নি।  
পুরুষেব নিয়ন্ত্রণেব সমস্ত ক্ষমতাকে তারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন কবে যেন অনেকটা  
আত্মনিয়ন্ত্রণেব দাবিতে অথবা যুগধর্মেব বিচিত্র আকর্ষণে  
বিন্দোহিনী নারী  
দুঃসাহসিকাব পদক্ষেপে সম্মুখে এগিয়ে এসেছে। যুগ-  
যুগান্তবেব ক্রীতদাসীব জীবন কাটিয়ে উঠে তা'বা বর্তমানে অনেকাংশে স্বাধীনতা  
অর্জন কবেছে, বহুক্ষেত্রে পুরুষ আজ তাদের কুশ্লিগত। তাদের এই দুঃসাহসিক  
পদপাতকে রক্ষণশীল, এবং বলতে গেলে পরাজিত, পুরুষসমাজ সহজ মনে  
মেনে নিতে পাবে নি। তাই তারা আধুনিক নারীদের গানে-গীতে ভীক্ষ  
বিদ্রুপে বিদ্ধ কববাব চেষ্টা কবেছে। যে-কোন সমাজে অস্তঃপুরটা অত্যন্ত  
পেছনে পড়ে থাকে; সমাজেব সত্যিকারেব বিবর্তন এবং রূপপরিবর্তন  
তখনই ঘটতে পারে যখন নারীসমাজের নিভৃত অস্তঃপুরেও পরিবর্তনের  
দোলা লাগে। ঝাড়খণ্ডেব জগদ্দল আদিম সমাজে পরিবর্তনের হাওয়া  
লেগেছে; ঝাড়খণ্ডী নারীবাও কিছুটা শিক্ষার স্বাদ পেয়েছে এবং নাগরিক  
সভ্যতাকে পল্লীর অস্তঃপুরেও টেনে নিয়ে গেছে। এটা ভালো কি মন্দ  
হয়েছে, আমবা তার বিচার করব না। কিন্তু ঝাড়খণ্ডী নারীসমাজ যে শত  
সহস্র বৎসরের স্থবিরতা কাটিয়ে উঠে গতিশীল হয়ে উঠছে, এটাই আশার  
কথা। পুরুষেব স্বার্থপ্রণোদিত অমুশাসনেব বেড়ি তারা লঙ্ঘন করতে পেরেছে  
এবং বেশবাসে চালচলনে রক্ষণশীল পুরুষের দৃষ্টিকে বাঙ্গ করে চলতে পেরেছে  
—এইই মধ্য দিয়ে তাদের প্রাণের আকৃতি এবং পরিবর্তন-কামনায় বৈপ্রবিক

চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। পুরুষেরা যতোই কলিকালের দোহাই পেড়ে বিদ্রূপ করুক, ঝাড়খণ্ডের নারীসমাজের চলিতরূপের মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবর্তনই সূচিত হচ্ছে।

৫২-৬২ কা'ল আছোছি পরের বিট কাঁপাই দিল মাঝার মাটি, কলি হল্য ভোর, মায়েবাপে না করে কদর ॥ চৈত্ গাঁজনে, কতই গরব নারীর বেশভূষণে। পেছাপাঢ়া লীলশাড়ি পবুহল ডেটি করি চাভি ঝুলনে। হাতে উলুকির ছটা কপালে সিঁদুরের ফঁটা বেসর ঝুলনে। রায় হাড়িরামে গায় এনারীকে পারা দায় লুলুক দলনে, ছাতিয়া ফুল্‌য়াে চলে গজগমনে ॥ ঘোর কালতে বিবাহ করা কেবল যন্ত্রণা। বিধবাদের হাতে চুড়ি সখবাদের হাতে চুড়ি কে বুড়ি কে ছুঁড়ি চিনতে পারি না। উন্টা গোটে প্রাণকাঁটাতে সকল মজা লিলেক লুটে, তারা পরে শাড়ি বারণসী ঢাকাই শাড়ি বই পরে না। তারা চাবিকাঠি খুঁটে বেঁধে অনন্ত বই পরে না ॥ কলিকালের বহুবিট উলটি ঝাঞ্চিল খুঁটি, আঙসালে আয়না বাখি গুঁজল বেলকঁটি। আঙপেছু চাহি দেখে মোকে ক্যায়সন সাজলি, য্যায়সন চমকে বিজলি। পায়ে আলতা পরে ধনি ঝাঁকা সীঁতা কাটে ধনি, কপালে সিঁদুরের টিকলি গলায় মাতুলি। শায়া লেলী শেমিজ শেলী ফেচাপাড়্যা শাড়ি লেলী, দুজনেতে বাজার যাব কিনব আঁচলি। রায় হাড়িরামের বাণী কলিযুগের সকল জানি, বেহাল্যা পুরুব ছাডো সাঁগায় মজলি ॥

অতঃপর লোকসংগীতের সর্বব্যাপী বিষয়বস্তু প্রেম সম্পর্কে ঝাড়খণ্ডী লোক-ভাবনা বিচার করে দেখা যেতে পারে। পরিশীলিত সমাজে প্রেমও একটি উজ্জ্বল নির্মল পরিশীলিত রূপ ধারণ করেছে। নিরবয়ব প্রেমের ভাবনায়

উচ্চতর জনমানস যেমন পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনি

উচ্চতর সাহিত্য প্রেমের নব নব রূপ এবং ভঙ্গিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। পরিশীলিত মন পরিশীলিত ভাষায় প্রেম-ভাবনাকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। তবে মানস প্রেম বা নিষ্কাম প্রেম বা Platonic love বলতে যা বোঝায় তা কতোখানি বাস্তবসত্য ঘটনা, তা রীতিমতো বিতর্কিত ব্যাপার। রক্তমাংসের নরনারীর প্রেম শরীর-নিরপেক্ষ হতে পারে, আদর্শবাদের বুলি আউড়ে এমন কথা বলা চলে কিন্তু বাস্তবে

যে শব্দীভেদে জগতই আর্ত হাহাকাব তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। শাবীভিক মিলনেব পথে যেখানে বাধা সেখানে বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাসকে অবলম্বন করে নিষ্কাম, প্রেমে তুষ্ট থাকে ছাড়া গত্যন্তব থাকে না, কিন্তু তমুব জগতই যে মানসিক তাওব তা প্রেমিক প্রেমিকারা ভালো করেই বোঝে। ঝাডথণ্ডে শবীর-নিবপেক্ষ প্রেমের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। আদিম মর-নাবী সৃষ্টির আনন্দেই পবস্পব পবস্পবেব প্রতি আকৃষ্ট হয়, দেহকে উপবাসী বেখে বিনা সংসর্গে সৃষ্টি সম্ভব নয় বলে তাবা শুধুমাত্র বাক্‌নিভর প্রেমে ছলনার আশ্রয় নেয় না। দৈহিক প্রেমের ক্ষেত্রে বাক্‌পট্‌তাৰ চেয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকাবইঙ্গিত অনেক বেশি প্রাণময়, অর্থবহ এবং ব্যঞ্জনামধুব। সামান্য ক্রবিলাস, চকিত চাহনি, ইশাবাইঙ্গিত প্রেমের ব্যঞ্জনাকে যতোবেশি গভীৰ এবং মর্মাভেদী কবে প্রকাশ কবতে পাবে, দিস্তা দিস্তা প্রেমলিপিব সাচাযোঙ তা প্রকাশ কবা সম্ভব হয় না। তাই ঝাডথণ্ডের প্রেমসংগীতে বাবে-বাবে চকিত চাহনি চোখ ঠাবাঠাবি এবং এবং ইশাবাইঙ্গিতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

যৌবনাগমেব অল্পবিস্তব শাবীরিক চিহ্ন কিশোবীদেহে পরিস্ফুট হতে না হতেই তাকে ঘিবে প্রেমাকাঙ্ক্ষী তকণদেব গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। কিশোরী কণ্ঠাব মধ্যেও মানসিক পবিবস্তন ঘটতে শুরু করে। মাত্র কিছুকাল আগে যখন সে বালিকা ছিল, তখন তার দিকে কাবো নজর বারাসন্ধি পড়ে নি, অথচ এখন যৌবনোন্মেঘেব আভাসেই তাব চারপাশে প্রেমলুক্ক যুবকদেব ভিড বাডতে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। প্রেমিকদেব সে তাই মিনতি কবে জানায় যে, সে এখনো অপ্রাপ্তবয়স্কা, এমন কবে প্রলুক্ক কবে তাবা যেন তাকে অকালে নষ্ট না করে, যৌবনের পূর্ণতা না এলে মিলনেব আনন্দ মধুব হয় না। প্রাক্‌যৌবনেব প্রেমগুঞ্জনেব বিভিন্ন ভাবনাও তাই লোকসংগীতেব মধ্যে সাদবে স্থানলাভ কবেছে।

৩৩ ৩২ যখন ছিলি এতটুকু রা-উ কা'ডও নাই কেউ মু-টায় টুকু, এখন দিদি হয়ে'ছি ডাগব গ, পেছুই পেছুই যু'বছে নাগর ॥ কঁচি কদমেব কলি কর্য না গ ভালাভালি পা'কলে কদমেব আশ্বাদন, কঁচি কদম ছু'ইনা এখন ॥ দেখে বাঢ়ালি তুকে তু'ই না দিলে আমাকে, বুকের মাঝে শিম'লকঁচি দলকে, সেইদেখে মন ললকে ॥ যখন ছিলি ছুটুমুটু খায়েছিলি জন্‌হা'র হুটু, এবাব দাদা হয়ে'ছি



ডাগর, কত ছলে ভা'লছে নাগর ॥ মধু খাতে আলা বঁধু মধু খাতে  
দিব নাই, যোল বছর বয়স আমার এ কলঙখ লিব নাই ॥ কত  
ছলে কথা বলে বাঁ চ'থটা ঠারিয়া, লাজ নাহি লাগে রে নিঠুর  
কালিয়া ॥ আষাড শরাবণ মাসে বাদ প'থ'র ভর্যে গেছে, বুলানে  
বা'হরাছে জল উছলিয়া যাছে, কাঁচা শবীর নবীন বয়সে ॥

যৌবনসমাগম ঘটবার পর ঝাড়খণ্ডের যুবকযুবতী আদিম জীবনের মুক্ত  
প্রেমের আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে। দেহজ স্নুখের প্রাবল্যে পরস্পর  
প'রস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যৌবন যতোদিন, ততোদিনই দেহের  
আনন্দ, জীবনের আনন্দ। ফুলের রূপরসগন্ধ ততোক্ষণই মনকে মাতায়  
যতোক্ষণ তা টাটকা থাকে, ঝিমিয়ে-পড়া কিংবা শুকনো ফুলের না থাকে  
যৌবন-ভাবনা সৌন্দর্য, আর না থাকে রূপরসগন্ধ। তাই যৌবন যতো-

দিন ততোদিনই নারীদেহেব সৌন্দর্য, ততোদিনই তার  
প্রতি প্রেমাকাজক্ষী পুরুষের আকর্ষণ এবং মধুস্ববে গুঞ্জন, একবার যৌবন  
গত হলে কোন পুরুষই তার প্রতি দৃকপাত কবে না। তাই শরীরকে উপবাসী  
রেখে বাকসর্বস্ব প্রেমে ঝাড়খণ্ডী যুবতী আস্থা রাখতে পারে না। স্বল্পায়ু  
জীবনে প্রেমের দিন আরো স্বল্পতর, জ্যাংস্নার আলো নিভলেই অন্ধকার,  
তাই যোগ্য প্রেমিক নির্বাচন করে প্রেমের সমস্ত রস নিংড়ে আকর্ষণ পান  
করার পক্ষপাতী তারা। ঝাড়খণ্ডী লোকমানসের এমনিভাবে যৌবনভাবনা  
বহু গানের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশ লাভ করেছে।

৭০-৭৪ শি'ঝাকুইলের কাঁটা বঁধুর লাগিল হিয়ায়, জাতি ছাড়া যায় হে বঁধু  
পিরিতি ছাড়া দায় ॥ আউশ ধান কাটিকুটি পুয়ালের গাদি,  
ভর যৌবনের বেলা যম হলায় বাদী ॥ জুসনা ডুবিলে অন্ধকার,  
ভবে কেবা কার, এই ছুদিন প্রেমেরি বাজার ॥ ধনযৌবন আড়াই  
দিন নজর ভর্যে মানুষ চিন, দিনা চারি, দুতি প্রেমেরি বাজার গ ॥  
এদেশেতে না রহিব পিরিতি নগরে যাব, আমি বাছ্যে লিব রসিক  
একজননা হে, পিরিতি রতন কাঁচা সনা। কেউ যদি করে মানা  
কারই মানা শুনিব না, গোপন পিরিত রা'খব দুজননা ॥

আমরা আগেই বলেছি, ঝাড়খণ্ডের আদিম জীবনে প্রেম মানেই দেহজ প্রেম,  
কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এব মধ্যে মন জানাজানি, ভালোলাগা, অল্পরাগ  
ভালোবাসা একেবারে অল্পপস্থিত থাকে। এখানে যুবকযুবতীর পারস্পরিক

সাহিত্যিক প্রেম

সম্পর্কের একটাই লক্ষ্যবস্তু থাকে : শারীরিক মিলন। কখনো এই সম্পর্ক নিছক দৈহিক প্রবৃত্তির তাড়নায় সংঘটিত হয়ে থাকে ; কখনো-বা এই সম্পর্ক অর্থ বা উপহার সামগ্রীর বিনিময়ে গড়ে ওঠে ; আবার কখনো-বা নিছক অল্পরাগের ফলেই যুবতী নারী প্রার্থিত ভালোবাসার পুরুষটির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

৭৫-৮০ নরসিংগড়ের চাথালে পাঁয়েছিল মাতালে, সে যে কি দুখ দিয়েছিল ব'লব কা'ল সকালে ॥ আষাড়ে বুনিলম ধান লাল বং-এর শি'ব, খই খাতে দিব ধনি আমার সঁগে শু'স ॥ শাঁকাবীরা শাঁকা কাটে, কাটে গ কদমকলি, ইন্দ্রিতে পরোছি শাঁকা কলেব বাবু দেয় টাকা ॥ শালুক ফুলের বুদ্ধি নাই রাইতে শালুক ফুটে, যার সঁগে যার গোপন পিবিতি অরাই মজা লুটে ॥ তুমি আমাব পরাণ বঁধু চুহে চুহে খাও হে মধু, আমার মধুভরা ফুল বিনে অলিকুল বিফলে শুকায়ে যায় হে ॥ শনিবারের মিঠাইখালা ধর ব'লতে ধবে'ছি, ছাড় ব'ললে কি ছাড়া যায় গ বহুত দিনের পিবিতি ॥

ঝাড়খণ্ডী যুবতীর প্রেমচেতনায় পরিচিত জনেব চেয়ে অপরিচিত জনেরা কোন অংশে কম চাক্ষুণ্য সৃষ্টি করে না। বরং বলা যেতে পারে, পরিচিত জনের চেয়ে অপরিচিত জনের প্রতি কৌতুহল যেমন সীমাহীন, তেমনি তীব্রতাও প্রচণ্ড এবং আকর্ষণ দুর্দমনীয় হয়। এই সব অপরিচিতদের মধ্যে বিদেশী এবং ব্যবসায়ীরা তাদের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। কখনো রূপ, কখনো পুরুষালি আকর্ষণ, কখনো-বা ব্যবসায়ীর টাকাকড়ির কাছে তারা নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়। কখনো-বা এদের সঙ্গেই এরা কুলত্যাগ, গৃহত্যাগ করে বেবিয়ে যায়।

৮১-৮৪ এতটুকু পা'খটি কি সুন্দর নেজটি, দেখ ন গ দিদি কে বঠে লকটি ॥ অ দিদি নাই র'হব ঘরে, ছাগল-বেপারী সঁগে যাব ধীরে ধীরে ॥ গাড়ারগুড়ুর বহুট জড়া রে কলসী, মা'রব বাঁশির ফাবড় ভা'ঙব কলসী, কদমের ডালে বশো ভা'বছে বিদেশী ॥ চা'র কুছা পথ'রটি লবঙলতায় ঘেরা রে, ডাল ভাঙি ফুল তুলে বিদেশী ভমরা ॥

ঝাড়খণ্ডের প্রেমসংগীতে প্রেমের বিভিন্ন স্তরগুলো সুস্পষ্টভাবে রূপলাভ করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর রসতত্ত্বের জটিল বিভাজন প্রেমবৈচিত্র্য এর মধ্যে তেমনটা বিকশিত হয়ে না উঠলেও সাধারণ-

ভাবে প্রেমের মৌল স্তরগুলো অবশ্যই গীতবদ্ধ হয়েছে। বিপ্রলজ্জ শূদ্রার বা বিরহ এবং সন্তোষ শূদ্রার বা মিলনের বিভিন্ন প্রেমানুভূতি ঝাড়খণ্ডী লোক-গীতিতে আশ্চর্য সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, ঝাড়খণ্ডের প্রেমগীতি বৈষ্ণব পদাবলীর উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। ভণিতায়ুক্ত ঝুমুর প্রসঙ্গে একথা আংশিকভাবে স্বীকার করা গেলেও লোকায়ত গানের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের প্রভাব বা অহুর্করণের কথা স্বীকার করা যায় না। লোকায়ত গানের প্রেম-ভাবনা এতোই আদিম প্রকৃতির দেহজ সুখের উল্লাসে ভরপুর যে, কোন বৈষ্ণবেব পক্ষেই এসব গানকে পদাবলীর উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ঝুমুব পদাবলীর অহুর্করণে রচিত এবং রাধাকৃষ্ণ-ভাবনায় অল্পপ্রাণিত হলেও এম মথো যে প্রেম রূপলাভ কবেছে, তা কোনক্রমেই বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের গুণয়লীলার যথাযথ রূপ নয়, বরং ঝাড়খণ্ডের অবণ্য-আদিম প্রেম-ভাবনাই এম মথো দিয়ে প্রকাশ লাভ কবেছে। আমরা ঝুমুব প্রসঙ্গে এদিকটি আলোচনা করেছি। এখানে আমাদের আন্দোচনা সম্পূর্ণতঃ লোকভাষায় রচিত লোকায়ত গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

ঝাড়খণ্ডের লৌকিক প্রেমের মধ্যেও অলংকারশাস্ত্রসম্মত প্রেমের বিভিন্ন স্তর দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কিন্তু ঝাড়খণ্ডেব প্রেমগীতি কোনক্রমেই অলংকারশাস্ত্র কিংবা উজ্জলনীলমণির বিধিনির্দেশ অহুসারে রচিত হয়নি। প্রেম, তা সে লৌকিক হোক কিংবা শিষ্ট, কতকগুলো সুস্পষ্ট স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ; এম মথো পূর্ববাগ-অহুরাগ, অভিসার, মান, মিলন, বিরহ, বিচ্ছেদ স্তরগুলো বিশিষ্ট; প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনে এই স্তরগুলো অনিবার্ণতঃ এসে থাকে; বলাবাহুল্য, এই স্তরগুলো শাস্ত্রের নির্দেশাহুসারে তারা অতিক্রম করে না, বরং এই হল প্রেমের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি। তাই লৌকিক প্রেমগীতিতে এই সব স্তর দেখা গেলে অনেকেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমসম্পর্কিত পদাবলীর সন্তাব্য প্রভাবের কথা চিন্তা করতে প্রলুক হন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের ভিত্তিমূল যে লৌকিক প্রেমের গভীরেই নিহিত এবং বিদ্বজ্জনের প্রেমসম্পর্কিত বিধিনির্দেশগুলো যে লৌকিক প্রেমের আধারেই রচিত এবং ভক্তিরসে জারিত, সেকথা মনে রাখলে লৌকিক প্রেমগীতিকে বৈষ্ণব-পদাবলীর বিশ্বস্ত অহুকৃতি বলে ভাববার কোন সংগত কারণ থাকে না। আমরা এম পূর্বে বিভিন্ন গান আলোচনা প্রসঙ্গে ঝাড়খণ্ডের প্রেমধারা সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। এখানে আমরা প্রেমের বিভিন্ন ভাব-বিভাবসম্পর্কিত গানগুলো উদ্ধৃত করছি মাত্র।

৮৫-৯১ পূর্বরাগ-অশুরাগ : জ'ড় গাছের আগডালে হল'দ বরন পা'খটি, দেখ ন ল দিদি কে বঠে লকটি ॥ না'চতে বা'হরালে তরা বদন তদের গরি, কার ঘরের নারী তরহা চিনিতে না পারি ॥ তাল গাছে তাল পংডা কদম গাছে কলি রে, বঁধার গায়ে লাল গামছা চটক দেখ্যে মরি রে ॥ আড় বাঁশি না বাজাও মোর জীবন না কাঁদাও, বনফুলে মনভুলে, মনকে মোব ভুলালি কত ছিলে ॥ ছটমট পাখিটা বিজুবনে চরে রে, ডা'কছে গলার মালা মন কেমন করে বে ॥ বঁধুব বাড়ির কালা ফুল আঁপি ঠারো' তুলব, লিলজ বঁধয়ার লাগি জলে ডুবৈ ম'রব ॥ পাত তুলতে যায়ে'ছিলি তুল্যে আনলি লতা, বঁধুব সঙ্গে দেখা নাই স্বপনে হয় কথা ॥

৯২-৯৯ অশিসার : থিড়কি ছয়ারে কুকুব সদবে ভাঙ্গুর রে, কি করে বাহির হল ছ'পায়ে নপুর রে ॥ কাচা কাপড় জুসনা রা'ত বঁধু সময় জানো আ'সবে, দিন কর না আনাগনা লকে কি বলিবে, কাচা কাপড় জুসনা বা'ত বঁধু সেদিন কবে আ'সবে ॥ ফিং ফিং জুসনা আঁধার ঘরে শু'সনা, তকে ত কাজলে সাজে জলে ধু'য়ে দিস না ॥ বঁধুকে তর কথা দিয়ে' কপাট দিয়ে' শু'সনা, ভালবাসা মনে রাখিস ঘুমাই মরো যা'স না ॥ বঁধু আ'সবেক বল্যে কপাট না দিলম ঘরে, বঁধু হে, সরবস নিয়ে গেল চবে ॥ তালপাতের আঙুড়টি খাড়ারবিড়ির করে রে, আ'জ ফিরে যাও প্রাণের বঁধু মনেতে ভাবিয়ে' রে ॥ আমার বঁধু রা'তকানা বাড়িবাটে আনাগনা, দেখ বঁধু গবরগাঢ়ায় ঢুক না, অই পিরিতির মরম জান না, বচনে কি মন মানে দবশন বিনা ॥ বাঁশি শুক্লো গ আমার মন মানে না বাখ'ল ঘরে, বারেবারে বা'জছে বাঁশি বা'হরা বা'হরা বল্যো ॥

১০০-১০৮ ঋগ্গিতা-কলহাস্তুরিতা-মান : কুইলিনী বিরহিনী চলিল নৈহর, কেন পিয় না আইল এখন, বুঝিলি রে পিয় বাসিল পর ॥ পলাশ ফুলের মধু রে ভাই পড়ে ঝরাঝর, সারা নিশি রইলম জাগিনাই আলা নাগর ॥ এত রা'ত ছিলে কার ঘরে, পানের ছিট লা'গল চাদরে ॥ কাঁসা ভা'ঙলে কাঁসা জড়ে মন ভা'ঙলে নাই জড়ে, জড়ালে নাই জড়ে বৃক্ষের পাতা হে, যাও হে বঁধু নিশি ছিলে যথা ॥ সাঁজে ফুটিল ফুল সকালে মলিন, কার কুঞ্জে ছিলে বঁধু হল্য এত দিন ॥ তুমার

পিরিত জানা গেল এত দিনে, মিছাই দেখা মনবাখা নয়নে নয়নে ॥  
 গুন অহে রসিকজন বুঝো লিলম তুমাব মন হাঁসি হাঁসি ফুল  
 মালা পরহালে, সাদা গায়ে কালি যে দিলে ॥ গাছেতে উঠিয়া  
 মূলে দেয় ছেদন, বুঝা গেল বঁধু তুমাবি মন ॥ মাণিকপাডাব  
 রোডে যাতে তামুক বগ্গে দিব তকে, আব দিব ডবল খিলির  
 পান, কথা বল শাম, না বলিলে কঁাদিছে পবাণ ॥

১০৯ ১২৩ **বিব্রহ:** অ প্রাণ ককিলা বে এত রাইতে কেনে ডাক দিলি,  
 নিভেছিল মনেব আগুন কেনে বা জ্বালালি ॥ আকাশেতে চাঁদ  
 নাই কি কবিবে তাবা রে, বঁধুব মন চন্ডল ছাডি যাবাব পাৰা ॥  
 আম পাকে লালে লাল পিষাল পাকে কাল, কন দেশে গেল বঁধু  
 দেখা নাহি দিল ॥ আষাড মাসে পিয়া পববাসে, জাহুমণি বে,  
 অ মন ভাঙিল কিসে । ইসে নাই তিসে ঘেবিল বিসে, বলো দিবি  
 গ যেন নাগব আসে ॥ আষাড শ্রাবণ মাসে নব ঘন মেঘ ডাকে  
 আব কি তব মনে নাই বে আমাবে, প্রাণ কঁাদে ঘুমবে ঘুমবে ॥  
 আলতি পাতেব সবসবানি কাল্পাপাতেব ঘি, অনেক দিনেব  
 ছাড়াছাডি ভা'বলে হবেক কি ॥ আ'জ নিশি অবসবে সব  
 বলিব তবে কেনে পব বাসিছ আমায় গ, কত দুঃখ সহিব আর ॥  
 আদাডে বাদাডে ঝি'গা ঝি'গায় জালি দিল নাই, এত বড  
 পববে গ বঁধু আমাব আলা নাই ॥ আদল বাদল ক'বল  
 নিদিবিদি খবা দিল, হায় বে মবমে দাগা দিল, নবীন বয়সে  
 আমার শামে ছাড়ে গেল ॥ এতটুকু সুখ ছিল কে বে লুকায়ে  
 দিল, চইখে-উ দেখি নাই কানে-উ গুনি নাই, এমনি লম্পট্যা বঁধু  
 ফিবে চা'হল নাই ॥ এমন কে জানে, বঁধু গেলে ভা'বতে হয়  
 মনে, ভাদর সাদর মাইরি গেল অকারণে ॥ কুলহি বেড়াতে  
 গেলে বসে বসে প্রাণ কঁাদে, নবীন প্রেম রে, দীতে নিশি গেল  
 বিফলে ॥ ঝি'গা ফুল সারিসাবি বঁধু বিনে ব'হ'তে নাবি, সহচরি,  
 দ্বিবানিশি অই ভাবনায় বুঝো মরি ॥ ডেড পহব বাতি তডপি  
 উঠত ছাতি পতি নাই যোর পালঙ্ক উপরে, দহে প্রাণ মদনের  
 শবে ॥ পথ'বেতে জল নাই কমল কেনে ভাঁসে রে, বঁধুর সঁগে  
 দেখা নাই লক কেমে হাঁসে রে ॥ লকে বলে ভুল ভুল কেমনে

ভূনিব বল ভুলিলে কি আর ভূলা যায় গ, দিবানিশি জা'গছে  
হিয়ার ॥

১২৪-১২৭ **মিলন** : আস বঁধু তেল মাখ আমার বচন রাখ সিনাই আস অই  
যবুনার ষাটে, দই চিড়া চিনি দিব খাতে ॥ আমি পূজা করিব  
তর গ, আ'জ নিশি নাই হবেক ভোর ॥ চৈত বৈশাখ মাসে ভেলা  
পাকৈ লাল হয়ে'ছে, অই ভেলা দিব শামের মুখেতে, তবু না  
ছাড়িব শাম তকে ॥ আগ্র বঁধু বস হেথা ব'লব মনের কথা  
অনেকদিনে পায়ৈছি হে দেখা, এতদিন ছিলে বল কুথা ॥

১২৮-১৩০ **বিস্লেহ** : ইদে পরিলি শাঁখা জিতুয়াই ভাঙিল বে, হাতের শাঁখা  
বিজড হল্য পিরিতি ভাঙিল রে ॥ পান খিলি তর জাঁকাবঁকা  
জাঁতি-কাটা স্পারি, এত গ তর ভালবাসা আ'জকে তু'ই জবাব  
দিলি ॥ সাখের টকটকি, সত্যি কথায় দিলি রে ফাঁকি, টেলকা  
জাঁকা ব'হ'ল পিরিতি ॥

ওপরে উদ্ধৃত প্রেমের গানগুলো একটু খুঁটিয়ে বিচার করে দেখলেই বোঝা  
যাবে, এব মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের গান খুব কমই আছে। আসলে প্রাকৃত  
প্রেমেব গান মুক্ত প্রেম এবং পরকীয়া প্রেমবই নিখুঁত অন্তবঙ্গ চিত্র তুলে  
ধবে। দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে শালীন সংঘমেব বিশেষ ভূমিকা থাকায় মুক্ত  
পরকীয়া প্রেমের মতো বিহবল রসের সঞ্চার করতে পারে না। তাই  
শুধু ঝাডখণ্ডী লোকগীতি কেন, সব দেশের লোকগীতিতেই মুক্ত পরকীয়া প্রেম-  
প্রসঙ্গ সর্বাধিক স্থান লাভ করেছে। নীতিবাগীশ রক্ষণশীল সমাজপতির।  
যতোই এ প্রেমের বিরুদ্ধাচরণ করুন না কেন, বাস্তব জীবনে যেমন সাহিত্যেও  
তেমনি এই প্রেম নিজস্ব মাধুর্য এবং সৌন্দর্যগুণে বিশিষ্ট ভূমিকা অর্জনে সমর্থ  
হয়েছে। মুক্ত এবং পরকীয়া প্রেম গোপনচারী; লোকদৃষ্টির আড়ালে এর  
লীলাখেলা। অন্তের দৃষ্টিকে এড়িয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা চোখের ইশারায়  
পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেম নিবেদন কবে ('কুল্হি কুল্হি যাতেছিলি বঁধু  
করেভালাভালি'; 'চ'খের চাহনি মুখের ভাব রাখি, আমি একবেলা বা'হরাই  
দেখি'); কথা না বলে গোপন চোরা মুচকি হাসি দিয়ে প্রেমকে পল্লবিত  
করে ('আমি রা কাটি নাই লক বাদী, মুহে হাঁসি চ'হ'খে ভাব রাখি'),  
গ্রামের কুল্হি পথে বাড়ির পেছনে হাটে-মেলায় তাদের দেখাসাক্ষাত ঘটে  
(কুল্হি কুল্হি যাতে ছিলি কুল্হির মুড়ায় দেখা পালি নাগর আমায় দিল

আঁধি ঠাবি', 'বাড়িবাটে আনাগনা কতই বা করিব মানা ঝিকি ফুল, দেখ যেন না ডুবাহ কুল', 'কুলঠিকবির হাতে যাতে দেখা হলা দু'জনাতে'; 'মাঘের এই দিনে, দেখা হবেক মকর সিনানে')। এ প্রেমের মিলনস্থল কখনো অন্ধকার গৃহকোণ ('বঁধু আসিবেক বলো কপাট না দিলম ঘরে'; 'টিনেব কপাট জানালায় ভালি, তুই আ'সব বলো কই আলি', আমি শুব জানালার গডাতে, খঁচা দিয়ে উঠাবে আমাকে'), তবে বেশি ৩গ ক্ষেত্র এ-প্রেমের মিলনস্থল অবগা ঝোপঝাড়, অন্ধকার বৃক্ষতল, নির্জন মাঠ; শয্যা ভূমি-শয্যা অথবা ডালপাতার আশ্রয় ('আ'সব বলো আশা দিয়ে' ল বৃদাতলে বা'ত গেছে, তুই আসবি টুকু সাজ হলে, কুলহি মুডাব গুলাচ গাছতলে')।

বলাবাহুল্য, পবকীষাচর্চা কিংবা মুক্ত প্রেম সমাজে কোনদিনই স্বীকৃতি লাভ করতে পারে নি, বং এ প্রেম চিবকাল নিন্দা এবং শাস্তি লাভ কবে এসেছে। এ-প্রেম জানাজানি হয়ে গেলে প্রেমিক-প্রেমিকার সমাজে নিন্দা বটে, কলঙ্ক হয়, কুল নিয়ে টানাটানি পড়ে। কুলত্যাগিনীর স্থান সমাজে হয় না, তাই তাকে গৃহত্যাগ কবে চলে যেতে হয়। কখনো কখনো প্রেমিকা স্বেচ্ছায় প্রেমিকের হাত ধবে গৃহত্যাগ কুলত্যাগ করে কুশ ও কলঙ্কভাবনা বেবিযে যায়, কখনো শশুবালয়েব গঞ্জনায় কুলত্যাগ কবে, কখনো-বা পিত্রালয়ের দুঃখকষ্টে জর্জরিত যুবতী কল্যাণ ঘব ছেড়ে বেবিযে যায়। ঝাডখণ্ডী উপভাষায় কুলত্যাগ করাকে 'বা'হবাঁই যাওয়া' বলা হয়। নিম্নোক্ত গানগুলোতে কুল এবং কলঙ্কভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

১৩১-১৩৬ জলকে যে গেলি ধনি ফুল কুথায় পালি গে, পাছে ধনি গুণমণি কুল হাবাঁই আলি গে ॥ তুই ন কি ছিলি সতী কেনে হলা এমন মতি সাদা গায়ে কালি কুথায় লিলি গে, তুই ধনি কলঙ্ক ঘটালি ॥ আমবা কুলবালা জানি নাই কন জ'লা, সাদা গায়ে কাঁদা দিহ না, খাঁটি মালে মাটি দিহ না ॥ হাট গেলি বাজার গেলি কিনো আনলি ঝিলপি মিঠাই, খায়ে মন ভুলালি, জাতি কুল সকলি গুচালি ॥ বেনাবসী শাড়ি লিব বেনারসী শায়া লিব কালববন জাকিট লিব, ই কুলেতে র'হব নাই গ বা'হবাঁই যাব ॥ মায়ে বাপে গা'ল দিল কিবা আমার দম্ব হলা, বা'হবাঁই যাছি গ মা কুলে কালি দিয়ে, একদিন হলেউ কাঁদবি গ মা সিংহাসন উপরে, অ মা নিরলে বসিয়ে ॥

মানব ইতিহাসের আদিমতম অন্ধকার দিনগুলোতে নরনারী নিরঙ্কুশ যৌনজীবন যাপন করত। তখন পুরুষ শুধু পুরুষ এবং নারী শুধু নারী হিসাবেই পরিচিত ছিল। একজন সন্তানোৎপাদনের যন্ত্রী এবং অগুজন যন্ত্র ছিল। তখন নর-নারীর মধ্যে অল্প কোন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। ধীরে ধীরে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষাব জ্ঞান একই বংশের মধ্যে সম্পর্কনির্বিষেযে যৌন যোগাযোগ সীমিত করা হল। ক্রমে বিধিনিষেধ যোনতা

সৃষ্টি হওয়ায় জনক-দুহিতা, জননী-পুত্র সংসর্গ নিষিদ্ধ হল। ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক এবং বিবাহবন্ধন সামাজিক সনন্দপুষ্ট থাকলেও কালক্রমে এটিও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। গোষ্ঠী-বিবাহের যুগে মাতৃ-তন্ত্রেব প্রাধান্য ছিল, তাই বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকে গোত্রাস্তরে অর্থাৎ স্ত্রীর গোত্রে চলে যেতে হত। তখন জীবনধারা সাম্যতন্ত্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। সম্পত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের কোন অধিকার ছিল না। সমস্ত সমষ্টির বা গোত্রের অধিকারে থাকত। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটল, তখন সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ত্বের জ্ঞান মাতৃ-অধিকার বিনষ্ট করে পিতৃ-অধিকার আত্মপ্রকাশ করল। এই সময়েই এক-বিবাহ রীতি (Monogamy) দেখা গেল। স্ত্রী বা পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জ্ঞান স্বামী বা পিতার অবাধ্য হতে পারত না। পরকীয়া চর্চা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়ে গেল; কিন্তু পুরুষদের বেলায় এ নিয়ম থাকল না। তারা পরকীয়া সংসর্গ করতে পাবত। ফলে এক-বিবাহ বা এক-পুরুষ ভজনা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও পুরুষদের ক্ষেত্রে হল না। মাতৃতন্ত্রেব অবসানের ফলে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস বিপুলভাবে প্রভাবিত হল। এ-প্রসঙ্গে এঙ্গেলস্ এর উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে : **The over-throw of mother-right was the defeat of the female sex, an event effecting the history of the world. The men seized the reins in the house also, the woman was degraded, enslaved, the slave of man's lust, a mere instrument for breeding children.**<sup>১</sup> নারী ঘরে বাইরে সর্বত্র তার অধিকার হারাল। বিশেষ করে যৌনসংসর্গের ব্যাপারে তাকে নিষ্ঠুর যৌবন-যন্ত্রণা ভোগ করতে হল। ফলে নারীর মধ্যেও প্রতিশোধ-স্পৃহা দেখা দিল।

১ F. Engels—The Origin of the Family. P৪2, Moscow 1948



স্বামীকে প্রভারিত করে সময় সুযোগ মতো অল্প পুরুষের সাথে সংসর্গ করতে লাগল। বিশেষভাবে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এইসব ঘটনা ঘটতে লাগল। উত্তরাধিকার-সূত্রে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী এ সব পরিবারে নামমাত্র সম্পত্তিই পেয়ে থাকে। স্বভাবতঃই এই সব পরিবারে যৌননিধি নিষেধগুলো বারবার উল্লঙ্ঘিত হতে লাগল। প্রাচীন নিবন্ধুশ যৌনজীবন ও কখনো-কখনো উঁকি দিত; কোন সম্পর্কই যেন সাস্থিক ভাবাবেগের মুহূর্তে বিচার্য বস্তু হত না। সমাজের অনুশাসিত নিষিদ্ধ অভিপ্রায়গুলো সংগোপনে ব্যক্তিবিশেষের কাছে সনন্দধন্য হয়ে পড়ত। বহু ক্ষেত্রেই গোপন সম্পর্ক প্রকাশ পেলে স্ত্রীকে শাণ্ডীক পীড়ন, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। বিবাহবিচ্ছেদ আদি নানা শাস্তি পেতে হত। পুরুষের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কলঙ্কই ঘটত, নারীর মতো তাকে সামাজিক শাসনে পীড়িত হতে হত না।

আমরা এর আগে দাম্পত্য জীবন, পবকীয়া চর্চা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনার সময় ঝাড়খণ্ডের সমাজে এবং পরিবারে নারীর স্থান, তাদের যন্ত্রণাজর্জর জীবনকাহিনী, তাদের বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহ, পরকীয়া প্রেম, সামাজিক অনুশাসনের উল্লঙ্ঘন ইত্যাদি বিষয় লোকগীতির পর্যাপ্ত উদাহরণসহ সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। এবার বিভিন্ন লোকগীতিতে প্রতিকলিত নিষিদ্ধ অভিপ্রায় এবং যৌন সনন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

নিষিদ্ধ অভিপ্রায়ের মধ্যে জনকজননীর সঙ্গে পুত্রকন্যার দৈহিক সম্পর্ক সর্বাধিক গর্হিত, নিন্দিত এবং কলঙ্কজনক পাপাচার হিসাবে সর্বদেশে সর্বসমাজে বর্তমান কালে পরিগণিত। ঝাড়খণ্ডের আদিম জনসমাজ এর নিষিদ্ধ অভিপ্রায়

ব্যতিক্রম নয়; এখানে এই ধরনের সংসর্গ যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্তু পরিহারের সুকঠোর বিধিনিষেধ আছে। সাধারণতঃ পুত্রকন্যার যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জনকজননীর সঙ্গে তাদের শারীরিক সংস্পর্শ দুরাশ্রিত হয়ে পড়ে; তৃতীয় জনের অবর্তমানে একই গৃহে রাত্রিযাপন কিংবা একসঙ্গে নির্জন পথ হেঁটে দূর স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ; গভীর শোক কিংবা চরম ভাবাবেগের মুহূর্তেও শারীরিক সান্নিধ্য কল্পনা করা যায় না। যেহেতু ইতিহাসের অঙ্ককার যুগেই এ-ধরনের সংসর্গ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, তাই সাহিত্যে এই নিষিদ্ধ অভিপ্রায়টি কদাচিৎ স্থান লাভ করে। ঝাড়খণ্ডের লোকগীতি, লোককথা বা প্রবাদ-প্রবচন কোথাও এই সম্পর্কটির প্রতিকলন লক্ষ্যগোচর হয় না। শুধুমাত্র ‘বাপভাতারী’ ‘বেটাভাতারী’, ‘মা-মাউগা’

আদি গালির মধ্যে এই নিষিদ্ধ অভিপ্রায়টির ইঙ্গিত মেলে মাত্র ; এ ধরনের গালি বেওয়ার অর্থেই হল চরম অপমান করা ।

ভ্রাতা-ভগ্নীর সংসর্গও নিষিদ্ধ অভিপ্রায়ের পর্যায়ে পড়ে । যৌবনোদ্যমের প্রাক্কাল থেকেই ভ্রাতাভগ্নীর মধুর সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান রচিত হতে থাকে । যৌবনে পরস্পর গা বেঁবে বসা, একই বিছানায় বসা বা শোয়া, তৃতীয় ব্যক্তি ছাড়া একই গৃহে, রাজস্বাপন, দুরের পথে দু'জনে যাত্রা, বোনের গায়ে ইচ্ছে করে হাত রাখা কিংবা তার চুল ধরে টানা বা চড়-চাপড় কষানো নিষিদ্ধ । একদা ভ্রাতাভগ্নীর যৌনসংসর্গ এবং বিবাহ সনন্দপুষ্ট ছিল । এই সম্পর্কের মধ্যে দৈহিক আকর্ষণ সবচেয়ে তীব্র কিন্তু সামাজিক বিধিনিষেধের ফলে যৌবনকালে অবিবাহিত ভ্রাতাভগ্নীর সম্পর্ক অত্যন্ত দুঃখিগম্য হয়ে পড়ে । ভ্রাতাভগ্নী সংসর্গও অত্যন্ত নিন্দনীয়, কলঙ্কজনক এবং অক্ষম সামাজিক পাপাচার হিসাবে গণ্য করা হয় । রূপকথাব 'কলাবতী' কাহিনীতে এই অভিপ্রায়টি আছে । কয়েকটি লোকগীতে এই নিষিদ্ধ সম্পর্কটি আভাসিত হয়েছে মাত্র ।

১৩৭-১৩৯ যবুনার জল কাল সে জলে সিনান ভাল নন্দ ছিল সতীন হয়ে  
গেল, কদমতলায় কে আছে আর বল ॥ ই চালের পুই সে  
চালের পুই পুই-এ মারে মেচড়ি, তরা ল সব ভাইভাতারী মাকে  
বলিস শাউড়ী ॥ তাদের ভাই-বহিনের পিবিতি, কাতলা মাছে  
পাতলা বেসাতি ॥

শুগুর-শাউড়ী পিতৃমাতৃস্থানীয়, তাই পুত্রবধু কিংবা জামাতার সঙ্গে সংসর্গ সর্বতোভাবে পরিহার করা হয় । এটিও নিষিদ্ধ অভিপ্রায়ের পর্যায়ে পড়ে এবং এ-ধরনের সম্পর্কও নিন্দনীয়, কলঙ্কজনক পাপাচার হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে । তবে এই পরিহারের সম্পর্কটি লোকসংগীতে কটাক্ষের বিষয় হয়েছে :

১৪০-১৪২ তাদের ভাল গাছে তালের মহা, শুগুর অঝা বউ কেনে বাঁঝা ॥  
হঁকা কাটা কঁলকা বুচা জাড়া খাড়ার নল, অই দেখ তর জামাই  
আল্য তামুক খাতে বল, শাউড়ী হয়ে হঁকা লাগায় জামাই হয়ে  
হাত বাঢ়ায় ॥ সিংভুঁই চাঁইবাসা, শাউড়ী-জামাই-এ করে  
ভামাসা ॥

মামা-ভাগ্নী সম্পর্কটিও নিষিদ্ধ সম্পর্ক । মেঘবুটি বজ্রপাতের সময় মামা-ভাগ্নীর এক গৃহে থাকা নিষিদ্ধ । মামা-ভাগ্নী সম্পর্কটিও একই ধরনের নিষিদ্ধ

সম্পর্ক। মায়াশুভ্র এবং ভাগ্নে-বউ সম্পর্কটি ঝাড়খণ্ডে ভাস্কর ভাদ্রনধু সম্পর্কের মতোই অত্যন্ত বেশি বকমের পরিহারের সম্পর্ক। মায়াশুভ্রকে স্পর্শ করা তো হুরের কথা, তার ছায়া মাডানোও নিষিদ্ধ। একই ভাবে ভাদ্রনধুও ভাস্করকে স্পর্শ করা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি তার ছায়া মাডানোও অকল্পনীয় সামাজিক অপরাধ এবং পাপ। অণ্ড ২জার কথা এই যে, ঝাড়খণ্ডের লোকসংগীতে এই দুটি সম্পর্কে কেন্দ্র করে অল্পশ গীত বচিত হয়েছে, বিধিনিষেধের বক্তৃ-  
 আঁটনির জগ্গাই সম্ভবতঃ এইসব সম্পর্কের মধ্যে যৌন আকর্ষণ তীব্রতম, তাই লোককটাক্ষও সবস গানের মধ্যে কোঁতুকেব বাজনা ঘুটিয়ে তুলেছে।

১৪৩-১৫০. মামীর গলায় জড়া মাতুলি, ধাবে ধাবে লেখা আছে ল ভাগ্না-  
 ভাতাবী। মামী কি কবলি ল লক হাঁসি, বিনা ছুঁকে বাজে  
 জড বাঁশি ॥ উপর পাডায় দেখো আল্যম ছ গাছিব চুল বাঁধা,  
 চুল বাঁধা উল্টায়েঁ দেখ মামশুভ্রবেব নাম লেখা। মাথায়  
 কাগজকাটা, দিনে বাইতে উঠছে ল তদেব কথা ॥ গাঁকে আল্য  
 গাঁকে আল্য আমডা বকুল বালা ফুল, গাইঠেব পয়সা খুল মাম-  
 শুভ্র, আমি বাছে লিব কাল্লা ফুল ॥ খুকডাখুঁপিব দবানে  
 ভীষণ কেবাসিন বে, আল' জাল্যে দবান চালায় ভাসুব  
 বোয়াসিন রে ॥ চুলহাশালে বসিয়া মাছ খাল্যম ঠাসিয়া,  
 ভাসুর হয়ে, আমাব গালে দিল ধাসিয়া ॥ ছুটুগুটু আখড়া  
 চার্য কুণে ভাসুবা, লাজ লাগে, মকে ছলকি নাচিতে গ ॥ যেমনি  
 গ সাপের ফেণী তেমনি গ মাথার বেণী, মাথায় আছে যোল শ  
 হুঁশুর, মাথা বাঁধায় না মানে ভাসুব ॥ আঁধার ঘরে ইচ গুলোছি  
 ভাসুব বল্যে জানি নাই, অ ভাসুর তব পায়ে পড়ি পাডাতে  
 গোল কব্য নাই ; ছি ছি লাজে মবি, আমবা হলে লিখি ল গলায়  
 দডি ॥

‘ঠাকুর বি’ বা ঝাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজার সঙ্গে ‘বহিন-জামাই’ বা ভদ্রি-জামাতার  
 অবৈধ সংসর্গকে ঝাড়খণ্ডে নিষিদ্ধ এবং কলঙ্কজনক পাপাচার বলে গণ্য করা  
 হয়। এই সম্পর্কটি ঝাড়খণ্ডে মোটেই রক্তরসিকতার সম্পর্ক নয়, বরং পরিহারের  
 সম্পর্ক। বোন-জামাই-এর গৃহে রাত্রিযাপনও অনেক সময় লঙ্কা এবং  
 কলঙ্কের কারণ হয়ে থাকে।

১৫১-১৫২ ঝাড়গাঁর হাট যাতে কেউ নাই মোর সঙ্গে সাথে রা'ত ছিছি

বহিন-জামাই ঘরে, পানের খিব লা'গল চাদরে ॥ ইদ দে'খতে  
 ধায়েছিল বড কষ্ট পায়েছিলি বা'ত ছিলি বহিন-জামাই ঘরে,  
 তাই ত ল'কে লিলজ বলে ॥

ঝাড়খণ্ডে কয়েকটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক যৌন-সনন্দ লক্ষ্য করা যায়।  
 প্রধানতঃ দেববের সঙ্গে ভ্রাতৃজাযাব এবং তাব ভগ্নীর, শ্যালিকাব সঙ্গে ভগ্নি-  
 পতিব এবং তাব ভ্রাতার, বৈবাহিক-বৈবাহিকাব, পিতা-  
 যৌন সম্বন্ধ মহ-মাতামহব সঙ্গে পৌত্রী-দৌহিত্রীব সংসর্গ সামাজিক  
 অনুশাসন স্বীকৃত। বলাবাহুল্য, এই ধবনের সংসর্গ নিঃসন্দেহে অসামাজিক  
 প্রেমের পর্ষায়ই পড়ে, কিন্তু এই সম্পর্কগুলো নিষিদ্ধ অভিপ্রায়ের পর্ষায় পড়ে  
 না। অসামাজিক প্রেমমাত্রই নিন্দনীয়, কলঙ্কজনক হয়ে থাকে কিন্তু অগম্যা-  
 গমন পাপাচাব বলতে যে-ধবনের সংসর্গকে বোঝায় উল্লিখিত সম্পর্কগুলো  
 তেমন দোষনীয় নয়। অল্প কথায় বলা যেতে পারে, এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে  
 পরকীয়া চর্চা যেমন সম্ভব তেমনি বিবাহবন্ধনও সম্ভব। বিশেষভাবে দেবর-  
 ভাজ সম্পর্কটি ঝাড়খণ্ডে প্রায়শঃই গোপন প্রেমপুষ্ট হয়ে থাকে। দেবব এবং  
 বিববা ভাজের মধ্যে সাঁগা বা দ্বিতীয় বিবাহ ঝাড়খণ্ডে এখনো প্রচলিত আছে।  
 নিচের গানগুলোতে সনন্দপুষ্ট সম্পর্কগুলোর গোপন সংসর্গের আভাস আছে।

১৫৩-১৬২ বাডি নামব শল জমি ভাঙব বাঁধা দিব আমি পুরুষকে ত দিব  
 জিহল ঘরে, দে'বকে ত বা'খব মহল ঘরে ॥ মনে করি  
 শুব্বঘব ঘাব, গাঁইঠে লিব সুরু চিডা দে'বকে দিব। আমি  
 দে'বের মন জগাব, কলের পুরুষকে বনবাস দিব ॥ ছট দে'ওর  
 সনাব চাঁদ এখন ত বে তু'ই যগ্যবান, পান সাজেঁ দিব তকে  
 যতনে, পিবিতি ভাই বা'খবে গোপনে, পাড়াপডশী যেমন কেউ  
 না জানে ॥ যাতেছিলি দ'খনা সড়পে, উল্টা পেঁচেব মাথা বাঁধা  
 ল দে'খল দে'বে, অ দে'ওব বলা না তদের দাদাকে, পা'কলে  
 ডালিম দিব তুমাকে ॥ ঘরে কুলুপ দিয়ে' ধনি ঘরেব্ টালে  
 দিল আশুনি দে'ওর সঁগে পালান্য নামালে, পুরুষকে ত পড়াল্য  
 আশুনে ॥ বড দাদার ছট শালী আসোঁছু আমাদের বাড়ি  
 লাগুক টাকা কিন্তে দিব গহনা, আব তকে যাতে দিব না ॥  
 তকে পান দিলটা কে বঠে, ভাই-এর শালা সাঁগাত-এই বঠে ॥  
 মাগি ঘাটি আ'নলম বাবা পইলা ছয়েক ধান গ, কু'টতে গেলম

পশুিত ধরের ঢেঁকি । কন দিগের লে আলা বাবা মাঝলি বহর  
ভাই গ, লিলেক বাবা খামচা তিনেক চামল ॥ ঝিক ফুল কানে  
শুঁজলি, বেহাইকে রাসি মদে ভুলালি ॥ ক'লকাতার পানসুপারী  
বহুমানের জাঁতি, কি পান খাওয়ালি লাতি, আমার যুম ধরে  
না সারা রাতি ॥

নর-নারীর দৈনন্দিন জীবনে রূপচর্চার একটি অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে ।  
বিশেষভাবে যুবক-যুবতীর জীবনচর্চায় রূপচর্চার প্রসঙ্গ বাদ দেবার কথা কল্পনাও  
করা যায় না । ঝাড়খণ্ডের তরুণতরুণীবাও দৈনন্দিন রূপ-  
রূপচর্চা

চর্চা না করে পারে না । তরুণ-তরুণীর রূপচর্চার প্রসাধন-  
দ্রব্য অবশ্যই আলাদা হয়ে থাকে । যুবকদেব সাধারণতঃ তেল ছাড়া অল্প  
কোন অঙ্গুরাগ ব্যবহার করতে দেখা যায় না ; যুবতীরা তেলের সঙ্গে হলুদও  
ব্যবহার করে থাকে । বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ফুল-নস্কার 'খদা' বা উচ্চি  
সাধারণতঃ নারীসমাজেই সর্বাধিক লক্ষ্যগোচর হয় । চোখে কাজল এবং দাঁতে  
'নিশি' (=মিশি) নরনারী উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবহার করলেও নারীসমাজে  
এর প্রভাব অত্যন্ত বেশি । কেশচর্চায় নারীই বৈচিত্র্যের অধিকারিনী ; টেরি  
কাটা, বাবরী চুল রাখা ইত্যাদিই পুরুষের একমাত্র কেশচর্চা । নারীর বাড়তি  
প্রসাধন সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ এবং পায়ে আলতা । নিয়োক্ত  
গানগুলোতে যুবকযুবতীর রূপচর্চার বিভিন্ন বিষয়বস্তু স্থান লাভ করেছে ।

১৬৩-১৭৪ কথা হল'দ মাখবি যদি নামবি লদৌর কিনারে, জড়া শিমলে, বুঢ়া  
যৌবনে তর কেউ যদি ভুলে ॥ কপাল মাঝে উলুধি আমার সে  
কি ধুলে ধুয়া যায়, শাম কলঙ্কেব ডালি আমার র'হল মাথায় ॥  
অ ঝিঁগা ফুল অ ঝিঁগা ফুল কন্ ঘাটে জল ডুবাব, চইথের কাজল  
ঝিকিমিকি পায়ের আলতা ধুয়াব ॥ আয়না কিনতে বায়না  
দিলম তবু আয়না পাল্যম না, দাঁতে নিশি চইথে কাজল মুখ  
দেখিতে পাল্যম না ॥ দাঁতে নিশি চইথে কাজল আগ দাঁতে  
তার ছাঁচি পান, মার্য না নয়নবাণ, প্রেমের লদী বইছে কুল  
উজান ॥ বাড়ি নাময় ধানেব গাছি ভালছিস কি নহর যাছি,  
খাবি দাবি টেরি কাটবি ভাবিস না শুকাই যাবি ॥ তকে ভালি  
নাই রে রূপ দেখো, ভালছি টাঁচর চুল দেখো ॥ সাত ল  
বামহনের বিটি মাথা বাঁধতে বইছেছে, কালা কুঁটি মমের বাড়ি

টিকলি সিঁদুর সাজ্যেছে ॥ অ মালিনী অ মালিনী তর হাতে  
চিকনি, ভাল করো বাঁধবে মাথা যেমন থাকে কনকুনি ॥ শুদা  
চুলে মাথা বাঁধে ভিতরে লিলি লীল দড়ি, ধারে কাঁটা মাঝে  
কাঁটা পাড়ার লককে খুরালি ॥ ডহরে লহরে যাব আহড়ে মন  
মজাব, ঝপা-বাঁধা খঁপাতে তর চাঁপাকলি পব্হাব ॥ ফুলাম তেলের  
শিশি-ভরা চুল হল্য বাসি, মাথা বাঁধে দে গ মাসি মেজুরা  
বাঁটি ॥

নরনারীর রূপচর্চায় ফুল এবং ফুলের মালারও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে ।  
পুরুষ সাধাবণতঃ কানে ফুল গোঁজে, নারী খোঁপায় ফুল গোঁজে । ফুলের  
মালা প্রধানতঃ নারীরা ব্যবহার করে থাকে । খাতুনির্মিত অলংকারের  
অভাব ফুলের মালা পরে মেটাবার চেষ্টা করে ঝাড়খণ্ডী নারী । নিচের গান-  
গুলোতে ফুলের মালার বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে ।

১৭৫-১৭৭ টুসুর টিকলি মালা, গাঁথো গাঁথো হল্য গ বিকাল বেলা ॥ কিয়া  
রজনী ফুলে, হার গাঁথোছি দিব গ টুসুর গলে ॥ জাঁত ফুলের  
মালা, টুসুর গা কবে আলাঝালা ॥

নবনারীর পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যেও পার্থক্য থাকে । তরুণ-তরুণী  
পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সাজসজ্জায় পোষাক-পরিচ্ছদে কোন রকম  
ক্রটি রাখে না । পুরুষের ধুতি আর নারীর শাড়ি—কতো  
পোষাক-পরিচ্ছদ  
না তাদের বৈচিত্র্য ; রঙের বাহার, পাড়ের নক্সা, সূতোর  
রকমারি সবকিছু প্রকাশ পেয়েছে অজস্র লোকসংগীতের মধ্য দিয়ে ।

১৭৮-১৮৬ বাবুর মাথায় টুপি, বাবুর গায়ে চিকপাঢ়া ফুলাম ধুতি ॥  
লদী ধারে লীল ব্রুছেছি লীলে শুঁট খরে না, ঘরে আছে ছট  
দেওর লীল ধুতি বই পরে না ॥ ডাঙুরা লকের অলমা ধুতি  
জুতা বিহু সাজে না, ভাল করো চলবি ডাঙুরা লকে যেমন চুবে  
না ॥ আমার বঁধু পান খায় ছাতিয়া শুকায়ে ঘায়, বঁধু হে,  
পারে লিহ শীতলী গামছা ॥ লাল গামছা দীঘল কাঁচা রাস্তা  
চলো ঘায়, সনার পদক দুটি দলছে গলায় ॥ অরে অরে তুরকা  
শালা কিরে কপাট খুল দেখি, তর দকানে পাটের শাড়ি টুসু  
বিদায় কর দেখি ॥ হাতে বাটে সস্তা দরে উঠোঁছে লাইলন  
শাড়ি, কিনে দে মা লাইলনের শাড়ি, না'হলে যাব না খণ্ডর-

বাড়ি ॥ রিমিঝিমি বিমিঝিমি পানী বরবে, ছাতা ধর ধর হে  
দেওর', ধান ঢাকা রাঙা শাড়ি জলে ভিজি গেল ॥

নারীৰ প্রধান ভূষণ হল অলংকাব। গহনাপত্রের প্রতি লোভ নারীৰ  
চিবকালের ; গহনায়-অলংকাবে মিজিব শবীরকে সজ্জিত করতে না পারলে  
অলংকাব

নারী তৃপ্তিলাভ কবতে পারে না। ঝাড়খণ্ডের নারীও এব  
ব্যতিক্রম নয়। ঝাড়খণ্ডের নবনারীৰ আর্থিক দশা  
সাপাৰণ : বিপন্ন হলেও গহনা তাদেরও একান্ত দবকারি জিনিস। সোনার  
গহনা তাদের ভাগ্যে না জুটলেও কপো পতলেব গহনা তাদের গায়ে শোভা  
পেত (বর্তমানে অবশ্য রূপো এবং পতলের গহনা উঠে যাচ্ছে, পরিবর্তে  
সোনার গহনা তার স্থান দখল কবছে)। ঝাড়খণ্ডী নারীৰ প্রতিটি অঙ্গ-  
প্রত্যঙ্গে কতো না নামেব কতো না ধবনেব কতো বিচিত্র গহনা যে শোভা  
পেত (এখনো বহু অঞ্চলে এই সব ঐতিহ্যবাহী অলংকাবেব চলন আছে),  
তার ইয়ত্তা নেই : খোপায় কঁচি, বেলকঁচি, পানকাঁটা, তাবা কাঁটা,  
গলায় গজমোতি, চাঁপাকলি, চাঁদমালা, হাসলি, ডুমবা, মাদলি, মহব,  
পদক ; কানে কানপাশা, কানবাঁলি, কানফুল, কাপ, গাঁঠা, ফিবফিরি,  
ঝুমকা, তিলমাকড়ি, পাষবা, নাকে নাকফুল, কাল্লাফুল, বাবাফুল, সুবস',  
লোপ, নাকছাবি, বেসব, লোলক, মাকড়ি, গুলাপ ; বাহুে বাজু, ঝাঁপা,  
ঝাষাঝাবি, তাবিজ, তক্তি ; হাতে চুব, চুড, বালা (দুধবালা, তাডবালা,  
আগবালা), চুডি, শাঁখা, পলা, পয়চা, আঙুলে আংঠি, শিবিমুদি ; কোমরে  
বিছাহাব, চন্দ্রহাব, বেট, গোট, বাক ; পায়ে খাড়ুয়া, মল, নেপুব, তড়া,  
পঁইবী, পাঁযজন, পাঁযজব, পাঁযলিযা, পাঁযেব আঙুলে ঝাঁট্যা, আঁগট্ ইত্যাদি।  
লোকগীতিতে ঐতিহ্যবাহী এইসব গহনা-অলংকাবেব ভূবি ভূরি উল্লেখ মেলে।

১৮৭২০৭ চাঁদমালা তর চাদবে গাথা, মালা গাঁপ রে শিকায় তুলা ॥  
তেঁত'ল পাত মাকড়ি কাগজে ভবা, ছট লক কিনতে গেলে দর  
কবে চটা ॥ মেদিনপুবে দেখে আলি হালায় হালায় দুধবালা,  
তব কপালে নাইখ ছানা ল কারে দিবি দুধবালা ॥ হাতির  
উপব বাম চাপোছে গলায় তিনটি মাদলি, ধুরের থাক্যে চিনতে  
নাবি চাদবে মালুম করি ॥ খাঁকড়িলের মাকড়ি বনাই দে,  
আমি প'বব নাই পেলাই দে ॥ তুই বাখিস না মনেব আশা,  
পর্যাই লে ন পিতল কানপাশা ॥ তর বাক পিঁধে পেছা ভারি,

চ'লতে লারিস লে ঠেলাগাড়ি ॥ তু'ই বা'হ'রা ল সাঁগা দিব,  
 সিলিক শাড়ি পায়ে মল দিব ॥ যেমন জুসনা রাইতে কিং  
 ফুটে, টাকার বালা রিং রিংগাই উঠে ॥ বুঢ়া কই দিলি কানে  
 সনা, বুঢ়ার মনে নাই বিবচনা ॥ উড়কি ধানের মুড়কি কলজি  
 ধানের খই, চুড়ি দিলিস রে বুঢ়া খাডু দিলিস কই ॥ চাকুল্যার  
 হাট যাতে চলনে চিন্‌হেছি তকে নাখে লোত্-হাতে বাজু  
 বুলালি, অকালে সক'ল গুচালি ॥ জুসনা বাতিয়া ছদকে উঠে  
 ছাতিয়া, ছুমুক ছুমুক, বাজে পায়ের পায়লিয়া ॥ কানের  
 মুমকা ধনি চরে নিয়ে যায়, ভেলে ধনিব ঘুম গে, খঁপাটি চরে  
 নিয়ে যায় ॥ তব সঁগে নাই যাব যবনার জলকে, জলকে  
 যাবার বেলা ল তব নাকফুলটা বাল্‌কে ॥ শাঁথা দিলি শাড়ি  
 দিলি নাই সা'জল, উপর কানের ফিরফিরিটি বড সা'জল ॥  
 হাতে ত চুরবালা কমরে ত গট, রিষাঁই মরে, অ'ত্র উপ'রা  
 সতীন ল ॥ কাঁদ না কাঁদ না বহু গায়ে বসে হাট, কিন্তে দিব  
 অ গ বহু গজমতির হার ॥ পেছাপাঢ়া লীল শাড়ি বাঁধল  
 ডেঢ়ি করি লোলক দলনে কি বাজু দলনে, কতই গরব নারীর  
 বেশভূষণে ॥ পুকুল্যার হাট যাতে চলনে চিন্‌হেছি তকে নাখে  
 লুলুক কানে পাশা দ'লছে, তখে ল সবাই ভা'লছে ॥ বাড়ি নাময়  
 মহল গাছ মহল কুটায় লিল্‌হ, দাদা, তরে বহব পাঁ'জ, খুঁটিয়ার  
 পাঁ'জ বসে থা'জে থা'জ ॥

অতঃপর ঝাড়খণ্ডের খাণ্ডদ্রব্য এবং পানীয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে ।  
 আমরা বার বার বলেছি, ঝাড়খণ্ড অরণ্যপাহাড়-ঘেরা অঞ্চল বলে এখানে  
 রক্ষ মাটির বৃকে তেমন ফসল ফলানো সম্ভব হয় না । তাই এখানকার মানুষ  
 খাণ্ডদ্রব্য এবং পানীয় স্বাভাবিকভাবেই বিপর্ষস্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হয় ।  
 এমন অর্থনৈতিক দুর্দশা খুব কম অঞ্চলেই দেখা যাবে :  
 শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনগ্রসর অঞ্চল এই ঝাড়খণ্ড । অথচ  
 আশ্চর্যের ব্যাপার, খনিজসম্পদ কলকারখানার দিক দিয়ে এই অঞ্চলটি  
 ভারতবর্ষে মধ্যে প্রধানতম রত্নভাণ্ডার বললে অত্যুক্তি করা হয় না । ঝাড়খণ্ডে  
 বহিরাগত উচ্চবর্ণের লোকেরা প্রতিদিন ধনসম্পদে স্ফীত হয়ে প্রাসাদোপম  
 অট্টালিকায় নগরগুলোকে ভরে তুলছেন, অত্ৰদিকে স্থানীয় আদিম অধি-  
 বাসীদের জমিজেরাত তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, পাতার কুটিরগুলো



ক্রমশঃই খুলোর সাথে মিশে যাচ্ছে। ঝাড়খণ্ডের আদিম অধিবাসীদের জীবন এবং সংস্কৃতি আরো কতোকাল টিকে থাকতে পারবে, তা যথেষ্ট সংশয়জনক। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিপেষণে রুদ্ধকণ্ঠ মানুষগুলো বলির পশুর মতো অস্তিম যুদ্ধের প্রতীক্ষা করছে যেন। স্বভাবতঃই স্বাধীনতাপ্রিয় বিদ্রোহী বীর অরণ্যসন্তানেরা মারণ-উচাটনের মস্ত্রে নির্বাক, নিজীব, পরকল্পনাজীবী হয়ে পড়েছে। এরা না পারছে পুরনো ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করতে, কিংবা ঐতিহ্যেব অবশিষ্ট ছিঁটেফোটা পরম বিশ্বাসে অবলম্বন করতে, না পারছে নতুন যুগের আলোকে নিজেদের উজ্জল শাণিত করে তুলতে। তাই এদের আর্থিক জীবন সর্বাংশে নির্ভর করে আছে আদিম জীবনের ফলমূল আহরণ, পশুপালন আব কৃষিরীতির ওপর। সঙ্গত কারণেই এদের খাণ্ডদ্রব্য এবং পানীয় বলতে বুনো ফলমূল, জীবজন্তুর মাংস আব কৃষিজাত বিভিন্ন ধরনের খাবার এবং মদ-হাঁড়িয়াকেই বোঝায়। আমবা এর আগে ফলের আলোচনা প্রসঙ্গে বুনো ফলের কথা বলেছি; জীবজন্তুর কথাও বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। কৃষিজাত খাণ্ড বলতে সাধারণতঃ ভাতকেই বোঝায়; চালের ভাত বাদ দিলেও ঝাড়খণ্ডের মানুষেরা খেড়ীপুঁ দলীব ভাত, কদ ভাতও খেয়ে থাকে। এ ছাড়া মহলসেদ্ধ, মহলভাজা, চালভাজাব সঙ্গে মহলভাজা ঢেঁকিতে কুটে তৈরি 'মহল লাঠা'-ও এদের কৃষিবৃত্তি কবে। লতাপাতার শাক, কানা শাক, শুবণি, সজনে, কচু শাক আদিও এদের খাণ্ডতালিকার অপবিহার্য বস্তু। ঝিঙে, সীম. লাউ, করলা, কুঁদবী আদি তরিতবকারিও এদের উদবপূরণে সাহায্য করে। এ ছাড়া আছে মুড়ি, চিঁড়ে, ছাতু। ভুট্টা ঝাড়খণ্ডীদের গম এবং ধানের অভাব মেটায়; ভুট্টা পুড়িয়ে, সেদ্ধ করে, ভেজে এবং ঢেঁকিতে কুটে 'লেট' রেঁধে খেয়ে অনেক পরিবার জীবননির্বাহ কবে। এ ছাড়া আছে মাছ এবং বন ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর মাংস। ঝাড়খণ্ডে তাড়ির ব্যবহার কম কিন্তু মদ এবং হাঁড়িয়া পানীয় হিসাবে সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। আমরা কয়েকটি নির্বাচিত গান উদ্ধৃত করে এখানকার খাণ্ড ও পানীয়ের অভ্যাসের একটা আভাস দিতে চেষ্টা করছি মাত্র।

২০৮-২৩০. যার হাতে কেঁদ পাকা সে ত বটে ছাল্যার কাকা, ছাল্যা কাঁদে  
 ধাদকীর বনে, কাকা থুজে অরুণ বনে ॥ মাদা'ল পাকার বাঁচ  
 কাল দেখিতে সুন্দর ভাল, মাদা'ল পাকা, ননদ খাঁয়ে লে ল  
 লজিতা ॥ ভাদর মাসে আল্য জামাই খাতে দিব কি, ভাল

পাকা গাদর- জগ্‌হা'র আর গাওয়া বি ॥ দাদাকে খাতে দিব  
 দহি-দুখ-ভাত গ, সঁয়াকে খাতে দিব খেড়ী শু'দলীর ভাত ॥  
 ধলভুঁই-এর ধল রাজা খাঁয়ে গেল মহল সিজা, বঁধু হে.  
 গামছাটি দিয়ে' গেছে বাঁধা ॥ আইল ঝাড়গাঁর রাজা খাঁয়ে  
 গেল মহল ভাজা, আ'জ রাজা বিপদে পড়ে'ছে, গায়ের চাদর  
 বন্ধক দিয়ে' গেছে ॥ অ দিদি ডুবালি গে ধনি, কানা শাগে  
 ঘট ছয়েক পানী ॥ মা-বিটি রাঁধনী গুণি শাগ তুলনী, বাদাড  
 গডায়, বি'গা ল'ডকোছে সজনি ॥ হকডবা'দের ধকড় শাগ  
 নাচনীবা'দের কচু শাগ, কাকী শাস, তদের বেটায় খুজে বাসি  
 ভাত ॥ চিংড়ি মাছে বুঢ়া বি'গায় মে'শল না, স্বশুর গা'ল দিহ  
 না, আর এমন ক'রব না ॥ আদাডে বাদাডে বি'গা কাঁকের  
 মধ্যে সীম, সীম দাদা বড মিঠা আরই খুজে নীম ॥ শাগ  
 ভাজায় রশুন ফডন তবুহা জান নাই, কাল্লা কুঁদবীর ভাজা আই ত  
 তরকারির মজা তবুহা জান নাই ॥ ভাদব মাসে গাদর জন্‌হা'র  
 আশিন মাসে খই গ, কান্তিকে জন্‌হা'র লেট তায় চেকা দই ॥  
 জন্‌হা'র ফুটে ফাটফুট মার বিটি কুঁচা কুট, ভাদব মাসে, খরখশ্রা  
 জামাই আলা লিতে ॥ লাডু পিঠা গটা পিঠা চাটু পিঠা বাঁজরা,  
 কামাব ঘরে বা'জছে জডা নাগরা ॥ মেজুরা রে কাটিকুট  
 করলম গ ঝল, স্বশুর ভাশুর খাঁয়ে গেল দেওর মাগে ঝল ॥  
 সবাই গেল উঁদুর খাতে শাম মোদের গেল না, উঁদুর পিঠা বড  
 মিঠা শামকে দিয়া হল্য না ॥ গগলী কুঁচাতে গেল নন্দ বাগ্‌হার  
 বি, মাথায় আছে গগলী ঠেকা উপরে উঁডে চিল ॥ গেঁচা  
 ছাড়া'স না সক'ল, সকাল হলে কা'টব ছাগল ॥ এক বাটি  
 চা'ল দিব দু ঘট পানী, চা'র পয়সার বাখর কিন্তে হাঁড়িয়, ধর গ  
 তুমি, সুরধনি গুণমণি, চিরকদিনের মাতাল আমি গ জান  
 তুমি ॥ চা'ল দিলে চা'ল লিব পয়সা দিলে মদ খাব, ঘর খাঁয়ে  
 খুকড়া মরাব, রে জীবন ধন, হাঁড্যা খাতেই বড মন ॥ ভাটিশাল  
 যা'হ না জাওয়! হাঁডি ছু'হ না, যাচিলে ফুলের মাল্য লিহ না,  
 চেকা মদে দাম দিহ না ॥ মদ আছে বতুলে ছলাভাজা গ আঁচালে,  
 ভাটিশালে, বঁধু দেখা হবেক সকালে ॥

এবারে পেশা ও বৃত্তি সম্পর্কিত আলোচনা। কৃষিই ঝাড়খণ্ডের সর্বপ্রধান, বলতে গেলে একমাত্র পেশা। কৃষির ওপর নির্ভর করে আছে ঝাড়খণ্ডের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন। কৃষির সাফল্য-অসাফল্য তাই পেশা ও বৃত্তি ঝাড়খণ্ডীদের কাছে জীবনমরণ সমস্যা বললে অতুক্তি করা হয় না। রোদ্ধুবে গলদর্শন হয়ে এবং বৃষ্টিতে সিক্ত হয়ে তাদের হলচালনা করতে হয়। উগাল, সামাল, তেউড, চাষ—চাববাব জমি চষে চারা পুঁতলে তবেই ভালো ফসল পাওয়া যেতে পারে। ফসলের জন্ম বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন, অন্যবৃষ্টিতে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হাহাকাব পড়ে যায়। বৃষ্টিব জল পেলে তবেই জমি কাদা কবে ধাত্তরোপণ করা সম্ভব। তাই বৃষ্টি হলে চাষার মুখ হাসিতে ভরে যায়, আবার ধরণ হলে মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। শুধু চাষ করলেই ভালো ফসল হয় না, আগাছা তুলে ফেলাব ব্যবস্থা করতে হয়, সকাল বিকাল ঘুরে ফিরে জমিব ফসলের দেখাশোনা করতে হয়। কোথায় জলের প্রয়োজন, কোন জমি থেকে জল বের কবে দেওয়া দবকার—চাষীকে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। জমিব আল নষ্ট হয়ে গেলে তা বেঁধে না দিলে জমির সব জল বেরিয়ে যেতে পারে। এর ওপর ধানের শত্রু আছে গরুবাছুর, বুনো হাতি, পাখিপাখালি—সেদিকেও নজব রাখতে হয়। চাষের জন্ম সব সময়ই মুনিস-কামিনেব সাহায্য দবকাব, এদের খুশি বেখে কাজ করিয়ে নিতে হয়; অনেক সময়ই বড বড চাষীবা কামিন-মুনিসদের কম পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেয় বলে তাবা ক্ষুব্ধ হয়। ধান পেপে গেলে ষতোক্ষণ না খামারে তোলা যাচ্ছে ততোক্ষণ স্বস্তি নেই, পাখিপাখালি গরুবাছুর তো আছেই, তার ওপর আছে চোবেব ভয়। কৃষিকার্ষ-সংশ্লিষ্ট আনন্দ-বেদনাব রোদ্ধু-ছায়াব খেলা নিচের গানগুলোতে সুন্দরভাবে প্রকাশ লাভ কবেছে।

২৩১-২৭২ আমার বঁধু হাল কবে বাড়ি নামর খেতে, গরা গায়ে খরা লাগে বড দয়া লাগে। মুডেব ঘাম টুঁড়ে পড়ে দেখে নয়ন ঝুবে, অ নরদী ল, আমি ঘাব নিজে বাস্তাম দিতে ॥ উগাল সামাল তেউড চাব জমিনে যেমন না হয় ঘাঁস, ঘাঁস হলে আবাদ হবেক কেমনে, দুইটি বলদ চালাও সমানে ॥ শালকাঠের হালটি কুসুম কাঠের বঁটা, বঁকা বঁটা লাগাই করে ক'রব হেটা টাটা, হাল্যা, চলবি চলবি রে, আমি আলগা মুঠে হাল ধর্যেছি ॥ স্কক স্কক

ধান বু'নলম টিয়ান খুঁটো খায়, রাজার বিটি তুলালী বাড়ি বাটে  
 যায় ॥ রহিনে বু'নলম ধান গাছি হল্য মাহুব পরমাণ, আষাড  
 শবাবণ মাসে না গেল কাটান, মামা কে জান, কিরুপে বাঁচিবে  
 পবাণ ॥ • আষাটে বু'নল ধান শবাবণে গাছি রে, গাছি দেখ্যে  
 চাষী ভাই-এব উলসিত মন রে ॥ উপর বিলে হাল দাদার নাম  
 বিলে কামিন রে, কন বিলে কইব দাদা কামিন কাজল ধান রে ॥  
 দে ন দিদি ছিঁ'ড়া ঘংটা, বাড়ি নাময় লাগাঁই দিব ভুতমুড়ি  
 ধানটা ॥ ই ববিষে দেখি খেতী চাষীর আনন্দ অতি বরিষার না  
 হইল টান গ, টাঁইডে-টিকবে হইল ধান । কিছু খেতে শুকে জল  
 ঘাঁস হল্য প্রবল কেবা কবে দহরা নিকান গ । যার আছে  
 বেভানাডী মনে মনে মুড়ে দাচি সময়েতে হইল কাটান গ ॥  
 বারেবাবে কবি মানা ডাঁগা জমি লিছ না, খাঁদেব কদা'ল খাঁদে  
 বহিল, ডাঁগা খেতে জল নাই গেল ॥ বাইদে ত কাটিফুটি বহালে  
 উঠিল ছাতি এমন ধরণ দেখি নাই ভাই গি'য়ানে, জল ক'বল  
 অজ্ঞ বিহানে ॥ বাইদে ত জল নাই বহালে সাঁতার রে, কাল  
 মেঘে জল নাই কব্যোছে আঁধার বে ॥ আইদে বশ্তে নুরত নয়ান,  
 কিসে বাঁচে পরাণ, মাহাজনকে কি দিব জবান । যাউ ছিল  
 শু'ডিভাঁডি তাউ লিল লখ্যা শু'ডি মাহাজনকে কি দিব জবান ॥  
 হাতে লিব চুটিট কাঁধে লিব কদা'লটি স'কসক্যা খাঁয়ে লিব বাসিটি,  
 লহকে ধবিব আ'ড দুটি ॥ হিডটা ত ধ'বলে বেশ জলটা ত না হয়  
 শেঁষ, শেঁষ হলে আবাদ হবেক কেমনে, দুটি বলদ চালাও সমানে ॥  
 পাহাড় কচাব চাষ না কবিহ আশ রে, হাডাব হুড়ুর, হাতি আ'সছে  
 সারা রা'ত ॥ সুরুসুরু কানালি গড়া ধানের চাষ, খালভরা ঘরে  
 ঘুমায় চরে কাটে ধান ॥ ভোর সকালের বেলা কামিন ডাকিতে  
 গেলি, কাঁকড়াটি কামডাল্য হাতে, মনে হল্য পাখাল ভাতে ॥  
 পইল্য থুকড়া ডাকে মোর সইয়ায় হাঁক মারে, নাই যাব সইয়া কাজ  
 কবিতে, কাঁসাই লদী ভবা ডাক দিছে ॥ গেল বছর আকালে  
 পইলা ধান খাটালে তরা নিজে ডিঁলি মবাই বসালে, ভকারাকে  
 শ'বে মরালে ॥ সুরুসুরু কানালি ধানলাগা করালি, ঝিলপি  
 মিঠাই দিব বল্যে জন্হা'র পড়ায় তুলালি ॥ আষাড মাসে রথের

মেলা তরাই টানাতে তলা, তিন পাই ধান দিব বল্যে দিলে নাই,  
তদের ঘর ভাই আর যাব নাই ॥

কৃষিবৃত্তি ছাড়াও অল্পবৃত্তির লোকেদের কথাও লোকসংগীতে স্থানলাভ করেছে। তবে কৃষকের আনন্দ-বেদনার কথা যেভাবে এবং যতো বেশি পরিসরে প্রকাশ লাভ করেছে এদের কথা তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি। ঝাড়খণ্ডের আদিম সমাজে যেমন বনচারী খাড়িয়া-লোখাদের স্থান আছে, তেমনি কামার-কুমোর তাঁতী-মুচি হাড়ি ডোম-ভুঁইয়া (ছুতার) ঠেটরী (পিতলকার) ধরা (নদী পারাপাবকাবী মাঝি) আদি ভিন্নবৃত্তির সম্প্রদায়ের লোকেরাও মিলেমিশে একটি সুসম সংহত সমাজ রচনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ২৫৩ ২৬৬ সকালে উঠিয়া খাড়া ভাবনা কবিছে, কাঁখে ঠেকা হাতে খনতা চলে বনে বনে ॥ কুল্‌হিমুডায় কামাবঘব আঁগাব গুডায় ছলাছল ঝিঁগা বিচিব মতন দাত গাবাব, সুরু কাপড় কুঁচি ছাড়িব ॥ আইল কামাব ছঁড়া লহাকে করিল গুঁড়া গরম লহা জুড়ে খনে খনে, মোর মন ভাই তর ঠিনে ॥ কুল্‌হিমুডায় তাঁতি ঘব কাপড় বনে ছরছব মাব তাঁত্যান বল্যে দিবি তাঁতিকে, আঁচলে কদম ফুল দিতে ॥ আমাব বঁধু সদাগব কাপড় বনে সরসব, সদাগর, কই দিলি বিলাতি চাদর ॥ চিটামাটির খোলটি হনুমানের তালাটি, ভালাই মুচি বে, অ তুঁই সংসাব নাচালি রে ॥ বাঁশ কাঁটেতে গেল ডম বাঁশবনের ঝাড়ে, বাঁশ আগায় বরহ'ল ছিল বিধল ডমের মুখে। অ বাঁশ কাটবি কখন, টঁকা বুনবি কখন, বেলা গেল গ মাথা বাঁধবি কখন ॥ অ ল ছুতারের ঝি আঁচলে বাঁধোছ কি, আঁচলে বাঁধোছি সুরু চিড়া, পান খাতে যাবে আমার পাড় ॥ বড সড ঘর দেখ্যে কামিলা সামালা ঘরে, ঘরে লক নাই, আমবা গহনা গঢাখি হে ॥ আমাব বঁধু শাম সিং পিতল পিটে সারাদিন, দকান খুলিয়ে কুম'র বলে, হেঙ্কিয়ে কদম-তলে ॥ আইল কারিকব বনাল্য মন্দির ঘর কারিকরের ঘর কুপায় ছিল গ, কেমনে মন্দির বনাইল ॥ পাহাড়ের কাছাজল নদী-এ নামহিল রে, ধবা ভাষার মরণ হলা নউকা ডুবিল রে ॥ ধরা পাড়ায় ধবধবানি ব'ষ্টম পাড়ায় লীল খুতি, তাঁতি পাড়াই দেখ্যে আলায় তাঁত গাচায় ঠেং দুটি। চল যাব তাঁতি দরশন,

কাপড় দিব গ মনের মতন ॥ শাঁকারীরা শাঁকা কাটে ধারে  
ধারে শালকলি, সেই শাঁকাতে লেখা আছে রাখা শাম কলজিনী ॥

ঝাড়খণ্ডের অর্থনৈতিক জীবন অত্যন্ত করণ, বেদনায়ম—একথা আমরা  
বাববার উল্লেখ করেছি। সূর্যোদয় হতে না হতে ক্ষুধার্ত শিশুর কারায়  
মাতৃহৃদয় নিরুপায় যন্ত্রণায় সজল হয়ে ওঠে। সকাল সকাল লোকজন চারপাশে  
বেবিয়ে পড়ে দু'মুঠো অন্ন সংগ্রহের জন্ত, কখনো কাজ  
অর্থনৈতিক জীবন মেলে কখনো মেলে না। কখনো কখনো ভাতও জোটে  
না, তখন বুনো ফলমূলের ওপব ভবসা করতে হয়। ক্ষুধার জ্বালায় কখনো  
গৃহিনী লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁড়ির ভাত খেয়ে শেষ কবে ফেলে। অর্থনৈতিক  
দুববস্থা নাবীকে বিপথে নামতে প্রলুব্ধ করে। গায়ে তাদের কাপড় জোটে  
না, হেঁড়া কানি টানাটানি কবতে গিয়ে আরো বেশি চিড়ে যায়; গহনার  
কথা তো ভাবাই যায় না। অথচ অন্নের যেমন দরকার, তেমনি দরকাব  
গায়েব কাপড়। কেননা, 'অন্নর জ্বালা গ পরভু বহুত জ্বালা গ, বস্তুর বিনে  
বড মানে হীন'। তাই নিরুপায় নাবীকে দেহেব বিনিময়ে অন্ন বস্ত্র এবং  
এবং ছোটখাটো গহনাব সংস্থান কবতে হয়। এমন সুপ্রকট দারিদ্র্য  
যেমন অল্পত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না, তেমনি দারিদ্র্যের জন্ত নারীত্বের এমন  
অর্ধমাননা অল্পত্র বিবল বলে মনে হয়: 'পামান্ন পয়সার জন্ত পেটের অন্নর  
জন্ত নাবীমাংসে হেন মহোৎসব, বুঝি বা তা একমাত্র ঝাড়খণ্ডে সম্ভব।'।  
তাছাড়া আছে সাহকার-বানিয়া-মহাজনের অকথ্য অমানুষিক শোষণ। বহু  
পবিবারই বাগাল. ভাতুয়া, মুনিস, কামিন খেটে কিংবা কটাভানারি করে  
অন্নসংগ্রহের চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের সহস্র প্রয়াস শেষ তক কপোত-  
বৃত্তিতেই নিঃশেষিত হয়—অন্নর জন্ত হাহাকার কোনদিন খামে না।

২৬৭-২৭৭ ধরে খাতে কিছু নাই চল যাব বাঁওলা কুড়িতে, ছাল্যা ছুটা  
ভকে কাঁদিয়ে ॥ ঝা'টপা'টের বেলা হলা বাস্তাম নাই ধরে,  
আমার বঁধুয় খাতে খুজে সকাল পহরে, আমার গা কাঁ'পছে ডরে ॥  
বেলা উঠে ঝিকিমিকি বাজার দিগে যাব ন কি, কাম পালে  
কাম-অ করিব, পয়সা পালে মদটুকু খাব ॥ হাঁটু গাড়ি বসবি  
আটপাটু চাটুটাকে ধরবি, টুকু বাঁটি টুকু খাবি টুকু বাসি রাখবি,  
সকাল হলেই ছাল্যা কাঁদা মনে রাখবি ॥ শাগ রাঁধতে  
খলোয়ছিলিন কচু রাঁধোছে, সআদে সআদে বৃষ্টি খায়ে

রাখোছে ॥ দশ হাত ছিঁড়া ভূনি মা-বিটি টানাটানি, বেজারে-বেজারে ঘুম ভা'ঙল, শেষ রা'তে কমরদুখা ধ'রল ॥ ছুলালি গ ছুলালি ধান দুটি উল্হালি, টেকিশালের পাটরা কুঁড়া সকল লিয়ে পালালি ॥ নামপাড়া গে'ছলৈ টুসু কার বাকত ধন আছে, কি বলব ধনের কথা ভাঁচা কুটো দিন যাছে ॥ সন্ন্য-খাড়ার খুঁচি বঁধু কাঁটাবেড়ের ঘর, ঘণ্টা নিতে বনে না শাম ছিঁড়োছে কাপড ॥ যাব না যাব না আমি গয়ঠা কুচাতে, হতভাগা শালার বেটা পয়সা লাচাছে ॥ কেইসে বাঁচে প্রাণ, সাঁঝে খাল্যে বিহানে হয় টান । পরের ঘরের পর খাটালি সকাল হলো যায় বাগালি, টাঁকে মুড়ে ঠুঁকাই হলে পিঠে পড়ে ঘাম । বরাভুঁই-এর কুটুম আলা খাওয়াদাওয়া সিরাই গেল, না খাওয়ালেও হব অপমান । যাউ ছিল শুঁড়াশুঁড়ি তাউ লিল লখ্যা শুঁড়ি মহাজনকে কি দিব জবান ॥

কিন্তু ঝাড়খণ্ডীদের জীবনে দারিদ্র্যই থাক আর দিনযাপনের গ্লানিই থাক, আনন্দরস এদের জীবন থেকে কোনদিনই লুপ্ত হয়ে যায় নি । উদরে

ক্ষুধাগ্নির জ্বালা থাকলেও জ্যোৎস্নারাত্রি এদের পাগল করে  
নৃত্যগীতবাণ

তোলে । আখড়ায় আখড়ায় মাদল বাজে, নৃত্যচঞ্চল পায়ে পায়ল নূপ্ব ছমছম করে বাজে ; বাজনা আর নাচ ক্ষুধা ভোলায় দুঃখ ভোলায়—সারা সত্তা জুড়ে তখন উখালপাখাল বিহ্বলতা । নরনারী নৃত্য-গীতের মধ্যে পরস্পরকে গভীরভাবে পায়, উদরপুরণের চিন্তা আর দৈনন্দিন ব্যর্থতা তখন নিতাস্তই তুচ্ছ হয়ে যায় । তাই দিনের বেলাকার রুক্ষ কুশ্রী ক্ষুধার্ত ঝাড়খণ্ডের রূপ যেন রাত্রিবেলা ঐন্দ্রজালিক মস্ত্রে পরিবর্তিত হয় ; রাতের ঝাড়খণ্ড নৃত্য-গীতে বাজনা-কোলাহলে প্রেমের আলাপে-প্রলাপে এক স্বপ্নলোকে পরিণত হয় ।

২৭৮-২৯২' উপব কুল্হি মাদ'ল বাজে নাম কুল্হি লাচ লাগে, নিদ নাই মোহব আঁখিতে, চল যাবে লেগি রাখিতে । কালিয়া রে কালিয়া লাল পাগড়িয়া, ছলে কলে মাদ'ল বাজায় ববুহাভুঁইয়া মাদল্যা ॥ বা'ল বাজে বাম্পা বাজে বাজে করতাল, আশি কশে মাদ'ল বাজে রে রাজার ডুয়ার ॥ নাচিতে জানি নাই টাঙে আঙেছে, অ খালভরা রে, না'চব ত ছালা ধরো দে ॥ নাচ

দে'খতে যাইছিলি কি ব'লব নাচের কথা, কেউ ডা'ঢ়াই কেউ  
বশ্তে আছে গ সজনি ॥ নাচনীরা খারাখা'র মা'দল্যারা গটা  
চা'র নাচনীরা গেল কন্ পথে, লাগ লিব গুণাদার ঘাটে ॥  
পুরুল্যা বাজারে ঘুরি মাদ'ল বাজা শিক্ষা করি, মাদ'ল বাজা'ই  
করি বাবুগিরি, অ গ ধনি থাক ধনি আমাকে মনে করি ॥  
ভাদর মাসে আদল বাদল দাদার কাঁধে বাজে মাদ'ল, তালে-  
তালে, দাদা ঠুঁকত মাদলিয়া ॥ যাইছিলি ঘটডুবা নাচ লাগে  
উখাড়ুবা, নাচনীকে জল মাগো খাওয়াব, তবু আমরা নাচ  
লাগাব ॥ বুঢ়া নাচে খাপাকথুপুক ডা'ঢ়াই নাচে ছুঁড়া যে,  
বঁধুয়ার নাচা আমার দে'খবার বড় মজা রে ॥ বুঢ়াবুঢ়ি হাট  
ষায় চা'র পয়সার মুঢ়ি খায়, শিয়ালভাঁগায়, বুঢ়া লাগাই দিল  
ঝুমরী ॥ কুল্‌হি কুল্‌হি যাতে ছিলি নাচ শুণ্ডে ঘুরো আলি,  
তদেব পাড়ায় দিনেই কিসের নাচ, অঁচালে বাঁধ্যোছি মাগুর  
মাছ ॥ আখড়া ত সাঁই সাঁই মা'দল্যা ত ঘরে নাই,  
মা'দল্যাকে মাদ মাগো খাওয়াব, তবু আমরা নাচ লাগাব ॥  
ভদের পাড়ায় নাচ লাগে, আমদের পাড়ায় নাই লাগে, তরা  
মেশাবে ন নাই ল, কে জানে ॥ পাকা বাঁশেব ঠেঁকাডালা পিঠ  
বাঁশের কুলা রে, ভকে-শ'ষে গীত গা'হলে লকে বলে ফুলা ॥

এ ছাড়া আছে বার মাসে তের পবব । ঝাড়খণ্ডেব জাওয়া-করম, ভাহু-ছাতা  
ইদ-বঁধা-জিতিয়া বাঁধনা-টুসু-ভগ'তা ( চডক ) প্রায় সারা বছর ধরেই জন-  
জীবনকে উৎসবমুখর করে রাখে । করম-বাঁধনা-টুসু  
উৎসব পরবের, বিশেষভাবে টুসু পরবের, জাতীয় পর্যায়ে প্রাণ-  
চাঞ্চল্য এবং উৎসবের ব্যাপকতা যিনি লক্ষ্য করেন নি, তাঁকে ঝাড়খণ্ডের  
মাহুঘের ওপর 'পরব-তোঁহার'-এর যে কি প্রভাব তা বোঝানো যাবে না ।  
উৎসবপ্রিয় ঝাড়খণ্ডীরা যে তাদের গানেও উৎসবের কথা ভোলে না, তার  
নজির নিম্নোক্ত গানগুলো ।

২২৩-৩০১ অ দ্বিদি চিলকির গড়ে, হাতির উপরে রাজা ঘুরে ; যখন উঠে  
ইদটি তখন ভাঙে নিদটি, চিলকির গড়ে ॥ অ'হল বাঁধনা পরব  
খুকড়া কাটিব রে, জড়া ঠেং পড়া পিঠা র'হল বাদাড়ে ॥ ইদ  
দে'খতে যায়েছিলি বড় কষ্ট পায়েছিলি, বইরার শলে, ঠেং টা



চুকিল মুটার তলে ॥ কালা বুটার বিটি তাকে সাজে বুঝা নিশি,  
 অই নিশি কাকে সাজে, নীরকে, চল নীর রাস দেখিতে ॥ ১৮৭  
 পরবের ছাতুঁকুঁচা চালেই শুকাল্য, কা'ল ঘে বঁধু মারোছিল  
 আইজ-অ দুখালা ॥ বড় বছর দাঁতে নিশি দুখুবাবুর বড খুশি.  
 বি'ধা টাইডে কিগ্লে দিব গহনা, আর তকে ছাড়ো দিব না ॥  
 বারিপাদার রথে যাতে কেউ নাই মোর স'ঙ্গে সাথে, আ'জ কে  
 রে মহনী দিল মতে, দেখা হবেক বারিপাদার রথে ॥ আইল পোষ  
 পরব কি করো কি করি, ঘরে নাই বাবুর বাপ ভাবিয়েই মরি ॥

আনন্দবেদনাময় জীবনের ওপর মধ্য-মধ্যে বৈরাগ্যের ছায়া পড়ে।  
 তখন অল্প আর এক পৃথিবীর কথা চকিতে মনের মধ্যে উদ্ভিত হয়। তখন  
 এই পৃথিবীর আনন্দবেদনা, দৈনন্দিন প্রাণধারণের মানি, প্রেম ভালোবাসা,  
 বৈরাগ্যভাবনা

প্রিয় পরিজন সব কিছু মিথ্যা মনে হয়। দিনগুলো  
 রাতগুলো অকারণে অপব্যয়িত হয়েছে ভেবে মনের কোণে  
 ক্ষোভ জমে, বিষয়-আসক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। ঝাড়খণ্ডের মানুষজনের  
 ভাবনাতেও এসব চিন্তা ধরা পড়ে। ঝাড়খণ্ডের গানেও তাই বিষয়-বৈরাগ্য  
 স্বাভাবিকভাবেই স্থান লাভ করেছে। তবে এই সব গানের বিষয়বস্তুতে  
 যে বৈষ্ণব প্রভাব পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ-পর্বের উপসংহারে  
 এমনি ধরনের কিছু বৈরাগ্যভাবনাশ্রয়ী গান উদ্ধৃত করা হল।

৩০২-৩১০. কেনে মর চিরদুখে রে সামান্তের সুখে, ক্ষণমাত্র সাজ রাজা অলীক  
 মজার জনম সাজা রে, হলি রে তু'ই যমের ভেজা গেলি অই ঝঁকে ॥  
 ঘরে সামাল্য চর নাই মানে অবসর, মন রে, দেখ বেন থাকিবে  
 সত্তর; চর আছে ছয় জনা সি'দ কাটো লিবেক সনা, নয়ন  
 প্রহরী দিয়ে চরকে রাখ ভুলাইয়ে ॥ সেখানে কি বল্যে আলি  
 কন বিষয়ে ভুল্যে রহ'লি রাখা কষ্ট হরি'নাম তু'ই মুখে না বলিলি,  
 পাগল মন রে, মিছা মায়া মোহে ভুলিলি ॥ মাঝম জনম ভাই  
 বি'গাফুলের জালি, দিন গেল চলি, অ তু'ই বেকামে  
 ঘুমালি ॥ কি ভাব্যে আলে মন কি কাজ করিলে, সরবরে  
 ডুব্যে ধন উকুড়ু খালে ॥ আ'সতেউ একা যাতেউ একা কেবল  
 মাত্র পথের দেখা শূন্য পথে যাতে হবেক একা, আর কি এমন  
 হবে দেখা ॥

## চতুর্থ পর্ব রূপ ও রীতি

রূপকথা, ব্রতকথা, প্রবাদ, ধাঁধা আদির গঠনভঙ্গি মোটামুটিভাবে আলোচনা করেছি। এই পর্বে লোকসাহিত্যের ছন্দোবদ্ধ উপকবণগুলোর, প্রধানতঃ সংগীত ও ছড়ার, রূপ ও রীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হবে।

লোকসাহিত্য এবং লোকসংগীতের সংজ্ঞা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে এবং ভাষায় দিয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বে কয়েকজন পণ্ডিতের সংজ্ঞা লোকসাহিত্য এবং সংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছি। এই সব সংজ্ঞা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, তাঁরা প্রধানতঃ লোকসাহিত্য বা সংগীতের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাঁদের সংজ্ঞা রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য, সব বিষয়েব সত্য অন্তর্ভুক্ত উপাদানের মধ্যেই নিহিত থাকে। শুধুমাত্র এই কাবণেই বহিঃরূপ রূপ ও রীতিকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়াটাও মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করলে কারো অন্তর্নিহিত সত্তার সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতি, চাল-চলন আদি বহিঃরূপ উপাদান থেকেই ব্যক্তিবিশেষের সনাক্তকরণ সম্ভব। লোকসংগীতেও কিছু বিশিষ্ট রূপ ও রীতি আছে, যা দেখে তাকে লোকগীতি হিসাবে সনাক্ত করা যায়। স্বভাবতঃই লোকসংগীতের সংজ্ঞাও এইসব বাহ্যিক উপাদানকে ভিত্তি করে রচনা করা যায়। লোকসংগীতমাত্রই যেহেতু গায়, তাই বাহ্যরূপ বলতে শুধু পাঠরূপ বোঝায় না, তাঁর সঙ্গে সুরের রূপটিও বোঝায়। লোকগীতির গঠনে শব্দের টানা-পোড়েনকে সুর যেমন ভরাট করে, তেমনি বাড়তি শব্দকেও দ্রুতলয়ের মাধ্যমে একটি সুন্দর রূপ দান করে থাকে। সংগীত সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও আমাদের আছে তাঁরা জানেন যে, লোকগীতির সুর মানেই তা লৌকিক সুর, গায়নরীতির দিক দিয়ে যা লোকগীতিকে অন্যান্য শ্রেণীর গান থেকে একটি পৃথক সত্তার অধিকারী করেছে। লোকগীতির ভাষাও প্রধানতঃ লৌকিক ভাষা হয়ে থাকে, শিষ্ট ভাষায় রচিত লোকগীতির মধ্যে

লোক-চাষিও বা -ধর্ম মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় না। লোকগীতির কবিগণ সাধারণতঃ লৌকিক সুর থেকেই এসে থাকে। তারা নিজেদের মৌখিক লোকভাষায় গান রচনা করে থাকে। প্রথমে উঠতে পারে, শিষ্ট ভাষায় রচিত হলে তা কি লোকগীতি হবে না? তাহলে বুঝুর, ঢুয়া বা বাউল গান কি লোকগীতি নয়? আমরা তা বলি না। গানটি শিষ্ট ভাষায় রচিত হলেও তার সুরটি যদি লৌকিক সুর হয় এবং লোকগীতিব রূপ ও রীতির অঙ্গসারী হয় তবে তা অবশ্যই লোকগীতি হবে এবং এই কারণেই বুঝুর বা ঢুয়া গান বা আধুনিক কালে স্বল্পশিক্ষিত কবির রচিত টুঙ্গ গীত লোকগীতি। কিন্তু যেহেতু এগুলো শিষ্ট ভাষায় রচিত হয়, তাই এগুলো লোকভাষায় রচিত গানের মতো জনমানসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয়। শিষ্ট ভাষায় রচিত লোকগীতি যখনই লোকপ্রিয় হয়েছে তখনই তা জনতার মুখে মুখে আবৃত্তির পথে লোকভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। তখন সেগুলো ব্যক্তি-কবির রচিত মূল গান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপৌরুষেয় লোকায়ত গানে পরিণত হয়। বুঝুর বহু জনপ্রিয় কলি বা স্তবক এইভাবেই করম নাচের গানে পবিণত হয়েছে। ভণিতায়ুক্ত বুঝুর, ঢুয়া, টুঙ্গ গীত ইত্যাদি আঞ্চলিক পল্লীকবিদের সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসেব ফল বলালে ভুল বলা হয় না। লোকভাষায় রচিত গানে লোকভাবনাব সংজ্ঞা স্বচ্ছন্দ নিরাবরণ এবং নিবাভরণ ভঙ্গি কিংবা বাস্তবতা, প্রত্যক্ষত, ঋজুতা যতো উজ্জ্বল রেখায় প্রকাশলাভ করে, পল্লীকবি-রচিত ভণিতায়ুক্ত গানে লোকসংগীতের এই সব বৈশিষ্ট্য তেমনভাবে প্রকাশলাভ করে না। তাই লোকসংগীতেব রূপ ও রীতিব উপকরণ হিসাবে লোকভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রূপ ও রীতির দিক দিয়ে লোকসংগীতের সংজ্ঞা দেবাব প্রয়াস পেলে এইভাবে বলা যেতে পারে : যে সংগীতে লৌকিক সুর এবং প্রধানতঃ লোকভাষায় ব্যবহার করা হয়, যার গঠনরীতিতে ধুয়া বা রং এবং পুনরাবৃত্তিব অপরিহার্য ভূমিকা থাকে, অর্থহীন পদ, পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশের সাহায্যে যার পঙ্কতির পাদপূরণ করা হয়; যার বাক্যগঠনে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে; সর্বত্র না হলেও বহু ক্ষেত্রে উক্তি-প্রত্যাঙ্কি বা প্রশ্নোত্তরের ব্যবহার যে-গানে করা হয়; যা লোকমানসের উপযোগী সাদৃশ্য-কল্পনা, সাক্ষেতিকতা, উপমা-অলংকারের বিশিষ্ট প্রয়োগে উজ্জ্বল এবং প্রায় সর্বত্রই স্বাভাষাতপ্রধান ছন্দে, খুব কম ক্ষেত্রে ধ্বনিপ্রধান বা তানপ্রধান ছন্দে রচিত হয়, তাকেই লোকসংগীত বলা যেতে পারে।

অতঃপর এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো লোকগীতির উদাহরণসহ বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। লোকগীতিতে ব্যবহৃত সুর এবং তার সংগীত-মূল্য সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ এখানে কম বলে আমরা সে-সম্পর্কে আলোচনা করব না। আমরা শুধুমাত্র সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে রূপ লোকভাষা

ও রীতি সম্পর্কিত উপকরণগুলো নিয়েই বিশ্লেষণ করে দেখব। সেদিক দিখে প্রথম বিচার্য বিষয় হল, লোকসংগীতের ভাষা। আমরা আগেই বলেছি যে, লোকসংগীতের ভাষা সাধাবণতঃ মৌখিক লোকভাষা হয়ে থাকে। আলোচ্য অঞ্চলের লোকসংগীত ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় রচিত। কেউ কেউ মনে কবেন, ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত বাঙলা উপভাষা সমতল বাংলা থেকে আগত লোকজনের কথাভাষার সাক্ষাৎ প্রভাবেব ফলে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ তাঁদের কথা মেনে নিতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে, মুষ্টিমেয় লোকেব মুখের ভাষা এক বিপুল জনতাব মুখের ভাষাকে লুপ্ত কবে দিয়ে তাদের সম্পূর্ণভাবে ভাষান্তরিত কবতে সক্ষম হয়েছে, যা অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমরা অগ্ণত বলেছি যে, আলোচ্য অঞ্চলের লোকসাহিত্যের প্রধানতম শবিক হল কুম্ভি-মাহাত সম্প্রদায়। এদের নিজস্ব উপভাষাব নাম কুম্ভালি, এমন কি যেখানে এবা ঝাড়খণ্ডী উপভাষা ব্যবহার করে থাকে (বলাবাহুল্য, এই উপভাষাভাষী কুম্ভির সংখ্যা এই সম্প্রদায়েব মোট সংখ্যার অর্ধেকেবও বেশি বললে অতুক্তি কবা হয় না), সেখানেও এদের নাসিকাক্ষনি-প্রধান ঝাড়খণ্ডী উপভাষাকে ‘মাহত ভাষা’ বলে চিহ্নিত কবতে শোনা যায়। কুম্ভালি উপভাষাব সরাসবি যোগসূত্র এখনো জাওয়া গীত, বিয়ের গান, আহীবা পান আদি আচাবমূলক রক্ষণশীল লোকগীতিব মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। পাঁচপবগণায় যেমন কুম্ভালি উপভাষাই মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে, তেমনি ঝাড়খণ্ডী উপভাষাতেও কুম্ভি-মাহাতদের কথাভাষাবই প্রাধান্ত দৃষ্টগোচর হয়। যেখানে পল্লীকবি শিষ্ট বাঙলায় গান রচনা করেছে, লোকপ্রিয়তার জন্ত তাও বিবর্তিত হয়ে ঝাড়খণ্ডী লোকভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। লোকভাষাই যে লোকসংগীতের আসল রূপের চাবিকাঠি তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকভাষাই লোকসংগীতকে তাব নিজস্ব রূপ এবং চবিত্র দান কবে থাকে। নিম্নোক্ত গানগুলোতে লোকভাষাব প্রয়োগ এগুলোকে আঞ্চলিক লোকগীতি হিসাবে একট বিশিষ্ট রূপ এবং চবিত্র দান করেছে।

১-৫ নদীয়া কে ধারে ধারে কে কাড়া চরায় গ, কাহার তিরিয়া তাঁশে যায়।

ভাঁশে ভাঁশে আস বাছা আস কাঁথি ধার গ, জঁটে ধরো উঠাইব  
 ষাট ॥ ভাই-এ যে দিল গ পরভু কহুঝু রে ছাষড়া, খুড়া যে দিলেন  
 পরভু টহবর বে বাজনা । জেঠা যে দিলেন পথভু কহবর রে রাতিয়া,  
 বাবা যে দিলেন পরভু জড়িজড়া রে পায়রা ॥ দে ন গ আশুনটুকু  
 র'স ন হে খনিকটুকু, সৈগেল সাকাম যতনে বা'র করি, তামুক বিনে  
 র'হতে না পারি ॥ ববুহাভু'ই-এ দেখো আলি পালই খাড়ার ঘর গ,  
 চালের উপরে কাঁটা টাকুড়া সমান ॥ দিদি হায় গ, সতীন 'বাদী  
 ডুবালি আমায় । শন্লা শাগে ঢালা মাডে রাঁধ ছটকী টাড়েমাড়ে,  
 না'হলে বড়্কারা যাবেন রাগাঁই ॥

ধূয়া বা বং লোকগীতির রূপ ও বীতির একটি বিশিষ্ট উপকরণ । গানের  
 অল্প পঙ্ক্তিশুলো একবার মাত্র আবৃত্তি করা হলেও ধূয়া বা বং বাবে বারে  
 আবৃত্তি করা হয় । নৃত্যসম্পর্কিত কিছু কিছু গানে নৃত্য-  
 ধূয়া বা বং  
 কাবী বা কাবিনীরা শুধুমাত্র ধূয়াটিই গেয়ে থাকে । অবশ্য  
 ঝাড়খণ্ডের সব শ্রেণীর গানে ধূয়া বা বং-এব ব্যবহার হয় না । জাওয়া গীত,  
 বিয়ের গান আদিত্তে বং-এব ব্যবহার হয় না । আহীরা গানেবও সঠিক অর্থে  
 ধূয়া বা বং নেই ; তবে এ গানে পঙ্ক্তিশৃঙ্গলের প্রথম পঙ্ক্তিব শেষাংশটুকু  
 দ্বিতীয়বার ঘুরিয়ে গাইতে শোনা যায় । ধূয়া বা বং-এর ব্যবহার কবম নাচেব  
 গান, ভাছ গান, টুসু গীত, রুম্ব ও চুয়া গানে অপবিহার্য । টুসু গীতের বহু  
 রং মূল গান থেকে বিচ্ছিন্ন করেও গাওয়া হয় ।

৬-২ ছালা ছালা কব তরা ছালাব বেদন কি জান, পরের ছালা কলে  
 লিলে মায়ের মন কেমন কবে । বল বাছাধন চাঁদ কুথায় পাব, গাছের  
 ফল লহে তুলো্যে দিব ॥ বড বাঁধের আগালে মাছ ধরোছি সকালে,  
 বাঁধুর তরে, অ মাছ রাখো'ছ ভাই অঁচালে ॥ মাছ পড়াটি বাথো-  
 ছিলি ঝনকার উপরে, কতখনে খায়ে গেল ছচরা বিরালে । আমার পা  
 কাঁপছে ডরে, মোর স'য়া খাতে খুজে সকাল পুহাঙ্কে ॥ আবাড়  
 মাসে হল্য দেখা খঁচলে তর আম পাকা গ, যাব বল্যে কই গেলি অ  
 ভু'ই দিলি না ঠিকানা । এবার গেল গ জানা, রাং পিতলে মজলি  
 খনি চিনজি না সন্য । মুয়াগডের সুরু চিড়া বাঁধের ঘাটে খালি কিরা গ,  
 বল্যেছিলি কনকালে ভুয়া ছা'ড়ব না । টিমা ভাব্যে হয় গ জরা মগিহারা  
 কণির পারা গ, চিটা গুড়ে মন মিশিলে চিনির পান্হার মিশে ক্ষা- ॥

পুনর্যাবৃত্তি লোকসংগীতের একটি অত্যন্ত সুপরিচিত রীতি ; প্রধানতম বৈশিষ্ট্যগুলোর অঙ্কনতম বলা যেতে পারে । একই গানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের পুনর্যাবৃত্তির ব্যবহার লক্ষ্যগোচর হয় । কখনো পুনর্যাবৃত্তি গানের এক একটি পঙ্ক্তির, কখনো পঙ্ক্তির অংশ-বিশেষের পুনর্যাবৃত্তি করা হয় ।

১০-১৪ পাখবার হাতে দেখে আলি আনায় মিঠাই তিন খালা, আনায় মিঠাই তিন খালা । অই মিঠাই কি খাবার বঠে ল গপিনীদের মন-ভুলা, অই মিঠাই কি খাবার বঠে ল গপিনীদের মন-ভুলা ॥ জুরগুণ্ডাব বনে জুরগুণ্ডার বনে অ রে বালা রানী হারা হল্য, সাত সিপাই নিয়ে অ রে বালা বানী খুজে ॥ লাউপাত্টি কাল বলি লাউপাত্টি কাল রে, আমাব দাদার দুটা বউ খান কু'টেতে ভাল রে ॥ বিপিরবিপিব জল বববে তেঁত'ল তলে, হায় হায় তেঁত'ল তলে, কানের ঝুমকা ধনি চরে নিয়ে যায়, ভেলে ধনির ঘুম গে, খঁপাটি চবে নিয়ে যায় ॥ বাঁশ পাল্‌হা বলি বে বাঁশ পাল্‌হা পাল্‌হা, বাড়ি বাটে বা'হব'াই দেখ মালিফুলের হালা ॥

পুনর্যাবৃত্তির মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় । কখনো কখনো একই শ্রেণীর ভাবানুসঙ্গের বা বস্তু পুনর্যাবৃত্তি করা হয়, এই ধরনের পুনর্যাবৃত্তিকে সম-ভাবার্থক পুনর্যাবৃত্তি বলা যেতে পারে ।

১৫-১৬ আঁচিরে পাঁচিরে ঘর তাই সামাল্য চর, ধনদবিব সক'ল আছে, আমার ধন চুবি যাছে, আমদের ধনি চুরি যাছে । আঁচিরে পাঁচিরে ঘর তাই সামাল্য চর, ঘটিবাটি সক'ল আছে, আমার ধনি চুরি যাছে, আমদের ধনি চুরি যাছে ॥ স্বপ্তরকে খাতে দিব দহিছুখভাত গ, আর দিব ছলাকলাই ডা'ল । শাউড়ীকে খাতে দিব দহিছুখভাত গ, আর দিব ছলাকলাই ডা'ল । ভাগুরকে খাতে দিব দহিছুখভাত গ, আর দিব ছলাকলাই ডা'ল । জেঠানীকে খাতে দিব দহিছুখভাত গ, আর দিব ছলাকলাই ডা'ল । দেওরকে খাতে দিব দহিছুখভাত গ, আর দিব ছলাকলাই ডা'ল । ননদকে খাতে দিব চুল্‌হার গরম পাংশ গ, আর দিব কুকুর জেল্‌হাঁই ॥

কখনো কখনো পুনর্যাবৃত্তির সর্ময় বিপবীত ভাবানুসঙ্গ বা বিষয় উল্লেখিত হয় । এই ধরনের পুনর্যাবৃত্তিকে বিপবীতার্থক পুনর্যাবৃত্তি বলা যেতে পারে ।

১৭-১৮ উঁচু ডুঁগুরি কা ষড় কাটালি গ নিচু ডুঁগুরিকেরি বাঁশ। সেই বাঁশে  
ছাহলি আশি কশ মাড়ওয়া, সারিসুগায় সাজে বরিয়াত। উঁচু  
ডুঁগুরি কা ষড় কাটাল নিচু ডুঁগুরিকেরি বাঁশ, সেই বাঁশে  
ছাহলি আশি কশ মাড়ওয়া, তবু নাই গ সাজে বরিয়াত। কচা  
বাড়ির ভিতরে গুলাংফুলের গাছ, ডাল ভাঙে ফুল তুলে বিদেশী  
ভমবা। সে ফুলের হাব গাঁথো দিল রানীর গলে, ফুলের মালা গলে  
দিয়ে দিল গিবুহজালা। নাই লিব ফুলের মালা নাই লিব  
গিবুহজালা, গিবুহজালা বড় জালা নয়নে বহে ধারা।

কখনো কখনো সংখ্যার প্রয়োগেব সাহায্যে পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়ে  
থাকে, যে রীতিকে সংখ্যাবাচক পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে।

১৯-২০ এক মা'র সইলম দু মা'র সইলম তিন মা'র আর সইব না, সাধী  
থাক ছট দেওব তব ভাই-এব ঘব ক'বব না। এক সড়পে দু সড়পে  
তিন সড়পে লক চলে, আমার বঁধু একলা চলে বিন বাসাতে গা  
দলে ॥ এক শ টাকা দু শ টাকা তিন শ টাকার আগবালা, আগ-  
খালাটি ভাঙে গেলে ষা'কবে শুধু হাত লাডা ॥ এক কশ গেলে  
বাজা দুই কশ গেলে হে, তিন কশে উডিল মেজুর। এক চালান  
চালালম দুই চালান চালালম তিন চালানে পডিল মেজুব ॥  
বিজুবনে পাকিল পিয়াল, এক খাঁড়্যা মারিব দুই খাঁড়্যা মারিব  
তিন খাঁড়্যায় ভুঁই-এ ছলাছল, পিয়াল কে খায় ॥

লোকগীতিব বচনারীতির অগ্ৰতম বৈশিষ্ট্য হল, অনেক সময় অর্থহীন পদ,

অর্থহীন পদ, পদগুচ্ছ পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশ দিয়ে পঙ্ক্তির পাদপূরণ করা হয়ে  
বাক্যাংশ সহযোগে থাকে। অনেক সময় দু'পঙ্ক্তির গানের একটি পঙ্ক্তির  
পাদপূরণ সঙ্গে অত্র পঙ্ক্তিব অর্থের কোন সামঞ্জস্য থাকে না।

কখনো কখনো একটি পুরো পঙ্ক্তিই অর্থহীন পদসমষ্টি দিয়ে রচিত হয়ে  
থাকে। গানে অর্থহীন শব্দ বা পদ কিংবা পদসমষ্টি বা বাক্যাংশের প্রয়োগ  
থাকলেও অর্থপ্রকাশের ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা দেখা দেয় না।  
কারণ লোককবি কখনো ছন্দ বন্ধার জন্য কখনো পবিত্র রচনার জন্য গানের  
মধ্যে অর্থহীন পদগুচ্ছের ব্যবহার করলেও তার আসল বক্তব্য একটি পঙ্ক্তির  
মধ্য দিয়েই স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। যেখানে গানের আয়তন  
দু'পঙ্ক্তির সেখানে সাধারণতঃ প্রথম পঙ্ক্তিটিই অর্থহীন পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশের

সাহায্যে রচিত হয়ে থাকে। কখনো বা অর্থযুক্ত পদসমষ্টি দিয়ে রচিত ছু'টি পঙক্তির মধ্যে অর্থের সংগতি খুঁজে পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও সংগতি যথেষ্ট দুর্ভাগ্যী হয়ে পড়ে; তবে সব সময়ই গানের আসল বক্তব্য দ্বিতীয় পঙক্তিতেই বিধৃত থাকে।

২৪-৩০ অ তর বাড়ি নামর ককশিমা, জ'লছে আশুন জল দিয়ে নিম্‌হা ॥  
এলাচলবং পানের খিলি জাঁতিকটা সুপারী, চিরকালের ভাল-  
বাসা আ'জ কেনে মুখ ঘুবালি ॥ অড় ল টড় ল বালি টড় ল পাহাড়ে  
গ, খিপাল ধপল বাঁশ গড়ে গ। বাঁশ গড়ে বাঁশ নাই, লিঘাভাঁগা  
সাজে নাই, পাখবাঘাটিব ফবফনি গেল নাই ॥ একটা মাত্র পুঁঠি  
মাছ মাখান্ন শুঁজ্যে রা'খব, খণ্ডবঘরেব কথা গিলা হিয়ায় গাঁথ্যে  
বা'খব ॥ কার ঘরে ডি'গা ডি'গা কার ঘরে ডাল মুরগা, সরপ  
সরপ, বাহিব কব আন ত দেগিব, খাড়িকুচা সিকি সের লিব ॥  
ধা তিন তিন বার নেতান তিন তের, তুমি নিয়োগ সখি হবে  
আঠার, কি বার সতর ॥ বাসি ভাত চেকা চেকা মাছ রে ভাই  
শেকা, কি তিনিং ডেগের ডেগা ॥

লোকগীতির প্রকাশভঙ্গি মধ্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্যগোচর হয়। লোকগীতির সচেতন শ্রোতা, পাঠক বা গবেষকের দৃষ্টিতে এব বাক্যগঠনের বিশেষত্বগুলো সহজেই ধরা পড়ে। কখনো দেখা যায়, সমাসবন্ধ পদের বাক্যগঠনে বিশেষত্ব

একাংশের অল্পলেখের ঝাঁক (‘আয় রে ময়রা ধর বে ঝাঁজরা দে রে হুচির সব করো, আম্‌দেব টুসু শ্বশুর যাবে দে বে হুচিব সব কব্যে। ময়রা সৈক বে কটি, আম্‌দের টুসু শ্বশুর যায় গুটি গুটি ॥’) আবার কখনো-বা যষ্ঠীতৎপুরুষের সমাসবন্ধতার চেয়ে অলুক রূপেব ব্যবহারের দিকে সবিশেষ ঝাঁক লক্ষ্য করা যায় (‘তরোয়াল যে কিকিমিকি রকতেবি ছট গ, উপরে উড়িল রাজার হাঁস’; নাগপুরে রে বেপারী বলদ ডাললি ভাই, চটকে বিকাল্য মতির হার’)। সমপবিমিত শব্দযুগ্মে অল্পপ্রাসসৃষ্টির ঝাঁক লোক-গীতির অল্পতম বিশিষ্ট লক্ষণ। ছু'টি শব্দের অল্পপ্রাসের মধ্যে সমতা এতো বেশি পরিমাণে থাকে যে একটি অক্ষর তুলে নিলে বা বদলে নিলে ছু'টো পৃথক শব্দ একই শব্দে পরিণত হতে পারে।

৩১-৩৮ আমড়া জাঁঠি দাতন কাঠি ধটি-মাজা পাত্‌খানি, আমরা মায়ের কুলকামিনী আদালতের কি জানি ॥ আলতা পাতে ঢালতা



পাতে বিনদ পাতে মেল্যেছে, টুঙ্গ নকি রাজার বিটি সই পাতাতে  
 আস্যেছে ॥ অহে কাকা দে হে টাকা কিনব হে খুরানিশি, বস্ত্রে  
 বস্ত্রে দাঁত গাবাব হাঁসলে যেমন পাই সিকি ॥ আদা বনের সাদা  
 কাপড় কষতা ছালে গাবাব, অই কাপড়টি পর্যে আশ্তে পাডার  
 লককে খুরাব ॥ আয়না চাই না পায়না চাই না চাই হে বঁধু তুমারে,  
 বিদেশ গেলে চাকরী পালে বা'থবে মনে আমারে ॥ শাদর মাসের  
 গাদর জন্‌হা'র চকলি খাতে ভাল ল, ইদ দে'থতে যাবার বেলা ব'লব  
 মনেব কথা ল ॥ আসন তলে বাসনকুসন তরুতলে ঝাড়ি, যার  
 ঘরে সুন্দরী নাবী তার ঘরে যায় চুবি ॥ ডুবকা বনে কুমকা  
 হারালি, ছট ননদ ল, গটা বন ঘুবি ঘুবি কয়া কেঁদ খাওয়ালি ॥

লোকগীতির বাক্যগঠনে শব্দদ্বিত্ব বা দ্বিরুক্তিব প্রয়োগও প্রচুর পরিমাণে  
 দেখা যায়। এই সব শব্দযুগ্ম কখনো একই শব্দের সমাহারে গড়ে ওঠে,  
 কখনো প্রায় সমধ্বন্যাত্মক দু'টি শব্দের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে গড়ে ওঠে।  
 সব সময়ই যে শব্দযুগ্মের উভয় পদই সার্থক হয়ে থাকে, তা নয়, বহু ক্ষেত্রে  
 একটি পদ নিতান্তই নিরর্থক হয়ে থাকে, কখনো কখনো ধ্বন্যাত্মক নিরর্থক  
 শব্দযুগ্মের সার্থক প্রয়োগের ফলে তাব মধ্যে অর্থের ব্যঞ্জনাও ফুটিয়ে তোলা  
 হয়।

৩২-৪৪ বাজারে বাজারে যাব কন্ বাজাবে পান পাব, যন্ বাজারে পান  
 পাব ল সে বাজারে লুট লিব ॥ সড়পে সড়পে যাব কন্ সড়পে  
 ডাঁঢ়াব, যাব দে'থব বঁকা সী'তা তাব স'গে ফুল পাতাব ॥ শালুক  
 নাচার ঘর তুল্যেছি হেঁকেল পেঁকেল কবে গ, কা'ল আশ্তেছি  
 পরের বিটি পাছে জাঁকাই মরে ॥ ঘরেব শভা আঁচির পাঁচির  
 লহার বাসঘর, বাসঘবে চাভি দিয়ে' গেছে বাপের ঘর ॥ ঝাঁগাল  
 ঝুঁগুল ভাতুয়াটি খিচাং খাচাং চলে, গলা ঘরে সারা দিন ফির-  
 ফিরায়' চলে ॥ আদল বাদল ক'রল এক চিডাক বোদ দিল,  
 ঝি'গা ফুল, ঝি'গা ফুল শুকিল রে ॥

লোকগীতির বাগভঙ্গিতে ধ্বনিসমতাও সবিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে।  
 স্বভাবতঃই অল্পপ্রাসবহুল গান, পঙক্তি বা বাক্যাংশের প্রয়োগ যত্নতন্ত্র সর্বত্রই  
 লক্ষ্যগোচর হয়। ধ্বনিসামঞ্জস্বেব প্রতি লোকমানসের একটা স্বাভাবিক  
 প্রবণতা আছে; তাই প্রয়োজনে তো বটেই, অপ্রয়োজনেও সমধ্বনির শব্দ-

প্রয়োগের জগৎ লোকগীতির রচয়িতারা যেন একটু বেশিই প্রলুব্ধ হয়ে থাকে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে ধ্বনিসমতাই কবিতা বা গানের সৌন্দর্যকে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। লোকগীতিতে এর বহুল প্রয়োগ লোকগীতিকে শুধু সৌন্দর্যমণ্ডিতই করে না, সহজ স্বাভাবিক সাংগীতিক ধ্বনিসৃষ্টিতেও সাহায্য করে। অবশ্য এই অনুপ্রাসসৃষ্টি বা ধ্বনিসমতা কোন অলংকারশাস্ত্রের প্রতি অনুগতের ফল নয়; কঠে সংগীত যেমন আপনা থেকে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, সম্ভবতঃ লোককবিদেব মুখেও তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই সুষম ধ্বনি বা অনুপ্রাস বণিত হয়ে ওঠে।

৪৫-৫১ একশ টাকার গাছ কা'টলম ঠেক চালাবাব হডবডি, ইউট পডাবার তরসুত্রি কবকটায় পিটন দিলি ॥ চা'ব চালা চণ্ডীমেলা বাসফুলের বিছনা, ঝি'ঝির কাটো জল সামালা ভিজল টুসুব বিছনা ॥ অ মা অ মা ফুল করিব ফুলকে আমার কি দিব, আমার ফুলের চুল বাঢ়ে না ফুলকে ফুলাম তেল দিব ॥ বই লিলম শেলেট লিলম চ'ললম আমরা ইস্কুলে, সুরু হাতে সুরু শাকা সুরু মুখে ঘাম ঝরে। আমবা করি মানা, রোদ মুহানায় যা'সনা ইস্কুল মেলা ॥ কুল্হি কুল্হি যাতেছিলি ধুলা দিল, ধুলা লহে গ কুলে কালি দিল ॥ যখন ছিলি গাভার গুড়ুর তখন মারি তিত্তির গু'ড়ুর, এবার দাদা হয়ে'ছি ডাগর, কাঁশির কাঁড়ে বি'ধব ঘাগর ॥ লাল ঘড়ার লাল ছাতা মঙ্গল-মারীর ছঁড়ীর খাতা, ছঁড়ীর খাতায় না মানে' সব্ব ল, মাথা বাঁধায় বা'জছে ঘুঁগুর ॥

লোকগীতির গঠনরীতিতে প্রশ্নোত্তর বা উক্তি-প্রত্যুক্তিরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সব গানে এর প্রয়োগ না থাকলেও আচারধর্মী জাওয়া গীত আহীরা গান এবং বিয়ের গানে উক্তি-প্রত্যুক্তির ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্যগোচর হয়। এ ছাড়া সাথী গানে, করম নাচের গানেও এর ব্যবহার অপ্রতুল নয়। লোকগীতির রূপ ও রীতির ক্ষেত্রে এটি যে একটি অপরিহার্য উপকরণ ভাবে কোন সন্দেহ নেই।

৫২-৫৫ 'কন্ পরবে দাদা আনবে লেগবে রে, কন্ পরবে দাশা করবে বিদায় ?' 'করম পরবে বহিন আনব লেগব রে, জিতিয়া পরবে বহিন করব বিদায়'। কিয়া খাওয়াবে দাদা কিয়া পি'খাইবে রে, কিয়া দিয়ে' গ বা।—২৮

দাদা করবে বিদায় ?' 'ভাত খাওয়ার বহিন লুঁগা পিঁধাইব রে, ডম  
 ঘরের ডালা দিয়ে' করব বিদায়' ॥ 'মহমহ সাবন বালা শিঁশিভবা  
 তেল, বালা চলো যাও ন যবুনা সিনাতে। সিনান করো আলে  
 বালা নাহান করো আলে, বালা পবের ঝিকে ভুলায়ে' আনিলে'  
 'ভুলায়ে' নাই আনি মা গ ডাকিয়ে' নাই আনি গ, মা গ রূপ দেখো  
 গডায়ে' আসিল।' 'গড়াই আলে ভাল ক'বলে দুয়াবে ডাঁঢ়ালে,  
 ধনি দশ কুটুমের মান সম্মান রাখিবে, তবে ধনি হবে শিরোমণি ॥'  
 'কন কা পাত ভালা উলটি পালটি রে কন পাত বডই গস্তীর, কন  
 কা পাত ভালা প্রতি সেবাই লাগে কন পাত ঝাঁকে বে তবাল ?'  
 'জ'ড যে পাত ভালা উলটি পালটি রে বড্ পাত বডই রে গস্তীর,  
 তুলসী কা পাত ভালা প্রতি সেবাই লাগে বে আ'খ পাতে ঝাঁকে  
 রে তরা'ল ॥' 'তুমি যে যাবে বাবু পুকলিয়া দেশ, বাবু, ঘরে থরচ  
 দিয়ে' যাও।' 'পুডায যে আছে ভাউজী সুরু গেঁতই চা'ল,  
 ভাউজী, হাঁডি-এ আছে বিরুহিব ডা'ল। বাসায় যে আছে ভাউজী  
 শায়া শেমিজ শাড়ি, ভাউজী, সূটকেসে আছে ফুলাম তেল ॥'

কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে সাদৃশ্যের বিচারে  
 সেগুলোকে একটি গানের মধ্যে মালার মতো গ্রথিত করবার ঝাঁক লোক-  
 সাদৃশ্য গীতিতে দেখা যায়। বিভিন্ন বস্তু বা ভাবের মধ্যে সমতা,  
 তুল্যতা বা সাদৃশ্য খুঁজে বের করে অজস্র গান এবং  
 প্রবাদেব মধ্যে সেগুলোকে বিধৃত করা হয়েছে। লোকসাহিত্যের রূপ ও  
 রীতির উপকরণ হিসাবে সাদৃশ্যেব ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক বস্তু  
 বা ভাবের মধ্যে যে মুহূর্তে এই সাদৃশ্যের যোগসূত্রটি স্থাপন করা হয়, তখনই তা  
 লোকমানসে আবিষ্কারের একটি চূর্ণিত রসাস্বাদ বহন করে নিয়ে আসে। সব  
 সাদৃশ্য কল্পনাই যে সোনায় সোহাগাব মতো হয়, তা নয়, তবে -কোথাও  
 একেবারে কষ্টকল্পিত দুরাস্বাদী সাদৃশ্যের প্রয়োগ করা হয় না। অল্প ভাষাসংস্কৃতির  
 লোকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব সাদৃশ্যের ব্যবহার বেশ কৌতুককর মনে হতে  
 পারে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ঝাড়খণ্ডী লোককবির নিতান্ত  
 সরল মানসবৃত্তির অধিকারী হলেও সাদৃশ্যের যোগসূত্র রচনায় যথেষ্ট বুদ্ধি-  
 প্রৌঢ়তাব পরিচয় দিয়েছে।

৫৬-৬৩ অযধ্যাতে রাম রাজা লঙ্কাতে রাবণ, গুলে গবিন্দ রাজা সাজ্যেছে

কেমন ॥ গঠের মধ্যে গাই ভাল ধবলী শামলী, গড়ের মধ্যে রাজা ভাল শ্রীবামলক্ষণ ॥ ঘবের বাদী ননদী বাহিরের বাদী পর, যবুনা ঘাটের বাদী শাম নটবর ॥ বাসিভাতে হুন মিঠা পানের মিঠা চূণ, শিশুকালে পিরিত মিঠা যৌবন যতদিন ॥ পিঠার মজা দুধ চিনি পানের মজা চূণ, পিরিত ক'ববার মজা যৌবন যতদিন ॥ মুচির মজা কাঁচালছা মুচির মজা তরকারি, নইতন পিবিতিব মজা চ'খ ঠাঠাঠারি ॥ শাম আমার আটাপাটা শাম আমাব মাথাব কাঁটা শামকে মাথায় শু'জ্যে রা'পব, চাভিখাডি আঁচলে দলাব ॥ বঁধু আমার পিয় সখা বঁধু আমার মাথার ফিতা, গ সজনি, বঁধু আমার আয়না চিরুনি ॥

লোকগীতির আর একটি বিশিষ্ট বীতি হল সাঙ্কেতিকতা। সাঙ্কেতিকতা রহস্যের গভীরতা সৃষ্টিতে যেমন সহায়তা করে, তেমনই রসোপলক্ষিকে আরো বেশি ঘন ও মিবিড় কবে তোলে। যখনই কোন বিষয় সাঙ্কেতিকতা

বা ভাব সরাসরি প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে কোন বাধা বা দ্বিধা বা শালীনতার প্রশ্ন দেখা দেয়, তখনই তা ইশারা-ইঙ্গিত বা সঙ্কেতের কিংবা রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করবার ঝোঁক দেখা দেয়। আবার অনেক সময় বস্তু বা ভাবের প্রতীক হিসাবে অন্য কোন বস্তুর উল্লেখ করে দু'টি বস্তুর মধ্যে গভীর সামঞ্জস্যের উপলক্ষির ছোঁতনা ফুটিয়ে তোলা হয়। কখনো কখনো এই প্রতীকের ব্যবহার এতোই সূক্ষ্ম হয়ে থাকে যে তা আমাদের চেতনার মধ্যে এক রহস্যময় উপলক্ষিব অথবা বাজনা ফুটিয়ে তোলে। বাজনা যখন বাচার্থকে ছাড়িয়ে চেতনার মধ্যে এক রসমধুব অনুরণন সৃষ্টি করে, তখনই সাঙ্কেতিকতা সার্থক হয়ে ওঠে। লোকগীতিতে ব্যবহৃত রূপক এবং প্রতীক একান্তভাবে লোকমানসের উপযোগী; সূক্ষ্মতার পরিবর্তে স্থূল-বস্তুর প্রাধান্য থাকলেও সূক্ষ্মবসের বাজনা একেবারে অনুপস্থিত থাকে না। জর্নৈক বিশিষ্ট লোকশ্রুতিবিদ্ পণ্ডিত মনে করেন, রূপকের ব্যবহার একটি উচ্চতর শিল্পবোধ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, সহজ এবং সরল জীবনের মধ্য থেকে এর প্রেরণা নাকি আসতে পারে না, কারণ নিরক্ষর সমাজে অল্পভূতির প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তিই স্বাভাবিক; অপ্রত্যক্ষ রূপাঙ্গ একান্ত স্বাভাবিক হয় না। বাংলার লোকসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর এই মত সত্য হতে পারে কিন্তু বাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর মত একেবারেই গ্রহণযোগ্য

নয়। ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে সাঙ্কেতিকতার ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। সাধারণতঃ প্রেমসম্পর্কিত, বিশেষভাবে দৈহিক প্রেমসম্পর্কিত, গানেই সাঙ্কেতিকতার ভূরিপ্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

৬৪-৭৬ আম গাছে আম বকুল দেখে গেল ভমর বিদেশে, আম পাকো আম পড়ো গেল তবু ভমর আলা না ॥ ইতুটুকু মরিচ গাছে কতই জন চা'লব. মাব ন দিদি তাহেই বাল ধুবেই সাঁগা ক'রব ॥ কুলুহি কুলুহি যা'হনা ছাইরা পায়ে বস্যা না, ছাইরা পায়ে পিবিভ মনে কব্য না, ই জীবনে আর হবে না ॥ ফুল গাছটি লাগাই ছিল ধূলামাটি দিয়ে, সে ফুল ফুটিয়ে গেল সংসাব জুড়িয়ে ॥ ছানার মা থালা ঝিঁগা ছানা হল্য তিরিং ঝিঁগা ছানার মাকে পিঁড্‌হায় শুভে মানা, মেজকাটা লাকডাটি কবে আনাগনা ॥ শালুক ফুলটি ভাল ছিল পরের কথায় চলি গেল, দেশে দেশে করে অপমান, আ'জ ফুলকে ধরে' আন, আ'জ ফুলের বধিব পরাণ ॥ চৈত বৈশাখ মাসে কাঁচা বাঁশে ভমব বসে, ভাব্যে দেখ এ ভব সংসাবে, আব কি রহিবে বাপ হবে ॥ কাঁচা কদমেব কলি ধনি বসেব শিজ্রাবে, ভাব কব হে বঁধু মধু জমোছে ভাণ্ডাবে ॥ কাঁচি কদমের কলি ফুল ফু'টেতে নাইথ দেবি, অ তুমার পায়ে ধবি, যা'হ নাই শাম আশু ঘুরি ॥ ছাবপকা বড় বকা দিনের বেলা ঘুমায় একা রা'ত হলে থুহুস থুজ্যে পায়, দাদা হে, সারা রা'ত ঘুমাতে দেয় নাই ॥ আমার বঁধুর বাড়ি-এ বাবমাশ্রা বে'ল, সেহ বে'ল খায়ে বঁধু বৃকে মারে শে'ল ॥ ই ঘর খুজি সে ঘর খুজি পাই না থকীকে, কাদের ঘরে যায়ে করো হাঁড়্যা পাকাছে ॥ তর কাপডেব পা'ড় ভাল ল, তার কাপডে জড়া পান খিলি ॥

রসসৃষ্টির জগু ছন্দাবদ্ধ সাহিত্য-উপকরণের পক্ষে উপমা-অলংকারের প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য, লোকগীতির ক্ষেত্রে উপমা-অলংকার ঠিক ততোখানি অপরিহার্য না হলেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কাব্যসাহিত্যে উপমা-অলংকার উপমা-অলংকারের যেমন সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, লোকগীতিতে তেমন উজ্জল শাণিত উপমা-অলংকারের প্রয়োগ বড়ো একটা দেখা যায় না। তবে লোককবিরা যেসব উপমা-অলংকার ব্যবহার করে তা কখনোই উদ্ভট নয়, বরং প্রায় সময়ই সেগুলো অত্যন্ত

সহজ সবল, যৌলিক এবং হৃদয়সংবেদী। পবিত্রশ্রম্যান পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে আত্মত সাদামাটা উপমাব মধ্যেও লোকজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার দর্শনলাভ ঘটে। উপমা অলংকার রসস্থিতিতে সাহায্য কবে মাত্র, উপমা-অলংকার বস নয়; তাই বসস্থিতির জন্তু এগুলো অপরিহার্য এ কথা বলা চলে না। আমরা ইতিপূর্বে অনুপ্রাসের প্রয়োগ সবিস্তাবে দেখিয়েছি। এখানে কয়েকটি উপমা অলংকারের প্রয়োগ দেখানো হল।

১৭-২০ উপব কাল ভিতর কাল সর্বাপ কালয় ভবা, টাটকা ফুলের মধু খায়ে কয়লাব মতন চেহাৰা ॥ কি ব'লব কপেব বদিমা অমাবস্কাব বাত্রিসমা, কবা যায় না কল্পনা নাই তুলনা এমন, বলি অ ধন কাল জাম পাকাব মতন, মচকে কবব ভাবি লচকে যৌবন। কাল মেঘেব মতন চুল খঁপাব উপব কাঁশি ফুল, কানে দুলে সনাব দুল পায়ে নুপ্ব বমবম ॥ তুমি কঁচি আমেব মুকুল আমি কোকিল বেয়াকুল, মুকুলের বসে আকুল তোমাব খেয়ানে, কেবল ভালাভালি করে না মিটে পিযাসা নৌতন যৌবনে ॥ ফুলাম শাড়িব লীল আঁচলে ক্লনপুকিব আল' জলে, সে আলব তেজে ধনি আমার নয়ন ঝলসিল, কপালে সিঁদুবেব টিপ আমাব মনে জালে প্রদীপ, কাজল কাল চ'খে তুমার বিজলি চমকিল ॥ আম পাকাব মতন বং দেখিলে জুডায় জীবন, জাম পাকাব মত কাল চুলে শ্রাবণের ঘটা, অ তব সী'তার সিঁদুব চমকে গ যেমন বিজলিব ছটা। কাজল কাল আল' করা নয়নে জলিছে তাবা, যৌবন সবোবব মাঝে ফুল ফুটেছে দুটা ॥ এই ত বছর বোল যৌবন আমাব বলমল, চঞ্চল কব না ভাই ভমরা, পিরিত্তি কাঁঠা'লের লাঠা ছাডিলে না ছাডে লেঠা লাগে অসঠা আঁথিঠারা ॥ যেমন পুষ্টিমা চাঁদেব আল, কিষ্ট কাল বাথিকা ভাল ॥ পস্ত কঁাদে গোল আলুব ডবে, আমাব মন কঁাদে খস্তর ঘরে ॥ ভাই ভাল ত ভাউজে গা'ল দিছে, যেমন স্তকনা কাঠে জা'ল দিছে ॥ তরা যতই সাজা, তদের টুসুর চ'খ দুটা পিয়াজ ভাজা ॥ যেমন গবম খলায় থই ফুটে, তেমনি শ্রামের গা জল্যে উঠে ॥ যেমন ডিংলা ভিতর করা, তদেব মিছাই হে ভাব করা ॥ শিশিবে ত চিডা ভিজে না, তর ঢং দেখো মন মজে না ॥ টুসুর গানে এমনি ভাব আছে, যেমন ভরা লদী ঢেউ দিছে ॥

সবশেষে ছন্দ-প্রসঙ্গ। একেবারে আদিকালে ছন্দের দোলা বা স্পন্দন সম্পর্কে আদিম মানুষের খুব একটা সুস্পষ্ট ধারণা না-থাকাটাই স্বাভাবিক।

তখন ভাঙা-ভাঙা ছন্দে অথবা নিছক গল্পরীতিতে ছন্দ লোকগীতি রচিত হয়ে-থাকা অস্বাভাবিক নয়, ছন্দের অভাব তারা সুরের সাহায্যে সম্ভবতঃ পূরণ করত; কখনো বিলম্বিত, কখনো দ্রুত লয়ের সুরের সাহায্যে পদসমূহ বা বাক্যাংশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হত। তখন সবাসবি মুখের ভাষাকেই গানের ভাষায় রূপান্তরিত করা হত বলে মনে হয়। লোকগীতিতে কথাবস্তুর নিতাস্ত্র অবহেলার না হলেও সুরের ভূমিকা নিঃসন্দেহে বিশিষ্টতম ছিল। পবিত্রকালে কল্পনাশক্তির বিকাশের ফলে এবং কাব্যভাবনা ও সৌন্দর্যভাবনা দানা বেঁধে উঠলে লোকগীতির মধ্যে কথাবস্তুর প্রাধান্যও স্বীকৃত হতে থাকে। তখন শব্দনির্বাচনে, শব্দের ব্যঞ্জনা-আবিষ্কারে লোককবিদের যত্নবান হতে হয়েছিল, সন্দেহ নেই। এই সময়ই লোকগীতিতে ছন্দ অপরিহার্য বলে বিবেচিত হতে থাকে। একেবারে আদিকালের লোকগীতির নিদর্শন বর্তমানে দুর্লভ হলেও বিদ্যমান। এই ধরনের দু'একটি গান উদ্ধৃত করা হল; সবাসবি মুখেই ভাষার ব্যবহার এবং ভাঙাভাঙা ছন্দ সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে।

১১-১২ চলিতে বুলিতে ধনি ঢল্যে পড়ে, | চলিতে বুলিতে ধনি ঘুমাঁই পড়ে, | উঠ ধনি বর আল্য গ। কেনে মা গ কাঁচা ঘুমে উঠালি, | মোর জঁথের বর লহে গ। বাল্য আল্য পেলিয়েঁ | বাল্য মা গ ধুলায় ধুসুরে। বাল্য লাগি বাহিব কর, | বাল্য মা গ আতর গলাপ তেল, | বাল্য মা গ মহমহ তেল।

ক্রমশঃ ছন্দ যখন লোককবির অঙ্গিগত হল, তখন স্বাসাধাতপ্রধান ছন্দই সে সর্বপ্রথম আয়ত্ত করতে পেরেছিল বলে মনে হয়। দুই-তৃতীয়াংশের মতো লোকগীতি স্বাসাধাতপ্রধান ছন্দে রচিত হয়েছে। পর্ব, চরণ বা পঙ্ক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর গানে বিভিন্ন ধরনের স্তবক ব্যবহার করা হয়েছে, একই শ্রেণীর গানের মধ্যেও স্তবক-সঙ্কায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই সব গানে প্রায় সর্বত্রই স্বাসাধাতপ্রধান ছন্দের ব্যবহার আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। জাওয়ানী, টুঙ্গী, ছাড়া ইত্যাদি স্বাসাধাতপ্রধান ছন্দেই রচিত হয়েছে। কন্ন নাচের গান, ছো নাচের গান ইত্যাদিতে প্রধানতঃ স্বাসাধাতপ্রধান ছন্দের ব্যবহার

করা হয়ে থাকলেও তানপ্রধান ছন্দও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। পর্ববিশ্লেষণ করে সবিস্তারে আলোচনা করার অবকাশ এখানে অত্যন্ত কম। তাই আমরা বিভিন্ন ছন্দে রচিত গানের উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হব। গানগুলো লক্ষ্য করে দেখলেই বোঝা যাবে প্রতিটি পঙ্ক্তিতেই চার মাত্রার চারটি করে পর্ব আছে, কোন কোন গানের শেষ পর্বটি অপূর্ণ।

- ২৩ যন বনে | যন বনে | পিঁপড়া না | চলে গ  
সেহ বনে | ভাই চলি | যায়।  
ফির ফির | কিব ভাই | লিহ ঝারি | পানী রে  
থায় লিহ | দহি দুধ | ভাত ॥ (জাওয়া গীত)
- ২৪ আর্শি চুডি | ফার্সি চুডি | প'রবার বড় | মন ছিল,  
কালিমাটি | ইস্তিশেনে | বশে সারা | রা'ত গেল ॥
- ২৫ আঁচিরে ধান | পাঁচিরে ধান | ধান খালা | হাঁসে,  
হাঁসের বাগাল | হাঁস ঘুবাঘ নাই | কিয়া কেত'কীর | বাসে ॥ (টুসু গীত)
- ২৬ সাঁজের বেলা | কুল্‌হি বুলা | ঘামে সর | বর।  
এমন বল্যে | কে জানে ভাই | সামনে শ্বশুর | ঘর ॥ (ছো নাচের গান)
- ২৭ খড়্‌গপুরে | বা'জল বাঁশি | মেদিনপুরে | শুতোছি,  
আর বাজ্য না | শামের বাঁশি | ধুলায় লুটো | কাঁছেছি ॥  
(নাচনী ঝুমুরের রং)
- ২৮ টেংরা হাটের | মিঠাই খালা | ধর ব'লতে | পরোছি,  
ছাডালে কি | ছাড়া যায় গ | শিশুকালের | পিরিতি ॥
- ২৯ আমার বঁধু | কাঠ কাটে | গটা বনের | সলগন ,  
আশ্র বঁধু | খাতে দিব | চুল্‌হার আঙন | সলগন ॥ (করম নাচের গান)
- ১০০ ধুর দেশের | শশুরাল বালা | পায়ে লাগে | ধুলা,  
ধুর দেশের | শশুরাল বালা | গায়ে লাগে | থরা।  
শ্বশুরকে যে | মা'গবে বালা | পায়ে জঁখা | জুতা।  
শ্বশুরকে যে | মা'গবে বালা | হাতে জঁখা | ছাতা ॥ (বিয়ের গান)
- ১০১ মাথা বাঁধে | ফুল পরোছি | তদের গেল | কি,  
তদের পাড়া ! ধাই না বল্যে ! রিষাই মর | কি ॥ (ছড়া)

খাসাঘাতপ্রধান ছন্দের পাশাপাশি ধীরে ধীরে তানপ্রধান ছন্দ জেগে উঠেছে। প্রথমে পরারের ডঙ্কিটি ফুটে ওঠে; পাকাপোক নিয়মে চৌক



অক্ষরের বাঁধনে পয়ার বাঁধা পড়বার আগে কখনো কম কখনো বেশি অক্ষরে রচিত হয়েছে। কোন কোন স্থলে তানপ্রধান ছন্দে রচিত পয়ারের অংশবিশেষে স্বাসাধাতের সুস্পষ্ট আভাস মেলে।

- ১০২ ঔগনী ঝাট্যাতে ভালা বাঢ়নী থিয়াল্য  
 শাশুড়ী ননদী দিল গা'ল,  
 না শাসু গা'ল দিহ না শাসু মা'র্য গ  
 নেহর গেলে আ'নব বাঢ়নী ॥ (জাওয়া গীত)
- ১০৩ এক তাঁতি হরবর তিন তাঁতি জড,  
 বুনিতে টানিতে তাঁতি ঘামে সরবর ॥ (বিয়ের গান)
- ১০৪ একটা ফুলের জন্তু হলি অপমান,  
 দুয়ারে লাগাঁই দিব ফুলেরি বাগান ॥
- ১০৫ কুল্‌হি কুল্‌হি বুলে নটবর,  
 বহুত আনন্দে বেহাঘর ॥ (করম নাচের গান)

পয়ারের ছয়, আট, দশ অক্ষরের পর্ববিভাগ সম্পর্কে সচেতন হবার পরই সম্ভবতঃ লোককবিরা ত্রিপদীর ব্যবহার করতে শুরু করে। বলাবাহুল্য, তানপ্রধান ছন্দ হলেও ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে যে ত্রিপদীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তা পয়ারের মতোই স্থানে স্থানে স্বাসাধাতের স্বাক্ষর বহন করে। গায়নরীতির প্রতি আনুগত্যের ফলে সম্-এর প্রয়োজনে পঙ্ক্তির মধ্যস্থলে বিরতির জন্তু যতিপাত করা হয়ে থাকে প্রায় গানেই। সাধারণতঃ ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে দীর্ঘ ত্রিপদীরই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, লঘু ত্রিপদীর প্রয়োগ লোকায়ত গানে বিরলদর্শন বললেও ভুল বলা হয় না। তবে আহীরা গানে একটি বিচিত্র ত্রিপদীর ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যার প্রথম দু'টি পদ ছয় অক্ষরের কিন্তু শেষ পদটি দশ অক্ষরের; ফলে এটিকে লঘু, ললিত বা দীর্ঘ কোন ধরনের ত্রিপদী হিসাবেই সনাক্ত করা যায় না, এটিকে মিশ্র ত্রিপদী বলা যেতে পারে।

- ১০৬ ধলভুঁই-এর ধব ছাতা | ববুহাভুঁই-এর ছুঁড়ী খাতা  
 ভেলের ভেল, মাথা বাঁধিতেই দিন গেল ॥
- ১০৭ যবুনার জল কাল | সে জলে সিনাতে ভাল  
 মাজিতে ঘঁষিতে বেলা গেল,  
 কদমতলায় কে আছে ভাই বল ॥

- ১০৮ ছুটুমুটু ডিহালি | কেনে ল তুই বিহালি  
 জুনার লেট খায়ে তুই | কেনে এত শুখালি ॥ (করম নাচের গান)
- ১০৯ কাকে সাজে ভালো | ঠেঁগা বল ছাতা | কাকেউ ত সাজে জামাজড়া,  
 কাকেউ ত সাজে | হল'দলু'গা ঠেঁটি | আব সাজে টিকলি সিঁদুর।  
 বাগালকে সাজে | ঠেঁগা বল ছাতা | গলাকে ত সাজে জামাজড়া,  
 গুলিনকে ত সাজে | হল'দলু'গা ঠেঁটি | আর সাজে টিকলি সিঁদুর ॥  
 (আহীবা গান)

## পঞ্চম পর্ব

### বিষয়টবেচিত্র্য ও মূল্যায়ন

লোকসাহিত্যেব মধ্যে নাগৰিক সাহিত্য বা শিল্পসাহিত্যেব মতো সাহিত্য-গুণ প্রত্যাশা করা সংগত নয়। শিল্পসাহিত্য সচেতন সৃষ্টির ফসল; সাহিত্যকেব সম্মুখে শিল্পসাহিত্যেব বিভিন্ন আদর্শ এবং তত্ত্ব তর্জনী উত্তত কবে দাঁড়িয়ে থাকে, সাহিত্যিক তাই সাহিত্যেব প্রতিষ্ঠিত মূল্য-

শিল্পসাহিত্য ও  
লোকসাহিত্য

মান এবং রীতিরেওয়াজকে সর্বাঙ্গঃকবণে পালন না কবে পাবেন না। নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন কবতে হলে

তাঁকে সচেতনভাবে যুক্তিতর্কেব পরিপ্রেক্ষিতে ভাবসাম্য স্থির বেখে তত্ত্বেব রূপবেখা অঙ্কন কবতে হয়। শিল্পসাহিত্যেব মৌল বৈশিষ্ট্যই হল এব মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত সচেতন সাহিত্যিকের স্বরূপেব পবিপূর্ণ প্রাতফলন। সচেতন তাই শিল্পসাহিত্যেব সার্থক সৃষ্টিব প্রধানতম গুণ হলেও লোকসাহিত্যেব পক্ষে এই সচেতনতা অত্যন্ত ক্ষতিকব। লোকসাহিত্য কখনই সচেতনভাবে সৃষ্ট হয় না। লোকসাহিত্যেব সম্মুখে কোন নন্দনতত্ত্বেব আদর্শ থাকে না, কোন অলংকাবশাস্ত্ৰেব প্রতি আত্মগতোর নির্দেশ থাকে না। লোকসাহিত্য লোকমানসেব নিবাবরণ এবং নিরাভবণ রূপেব স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। কোন তত্ত্ব বা শাস্ত্ৰেব প্রতি জবাবদিহি বরবার দায়দায়িত্ব থাকে না বলে লোকসাহিত্য সহজতম ভাষায় মানবসমাজেব খাঁটি চাবিত্রধর্মকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। জীবনেব সব বকম আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনার কথা অকৃত্রিম ভাষায় লোকসাহিত্যে প্রকাশ লাভের সুযোগ পায়। সাহিত্যেব অত্ততম শ্রেষ্ঠ গুণ হল জীবনধর্মিতা। সাহিত্য জীবনবসের কাববার কবে। জীবনরস শুধু যে শিল্পসাহিত্যেই লভ্য তা নয়, লোকসাহিত্যেও তার প্রাচূর্ষ অপবিসীম; বলা যেতে পারে, লোকসাহিত্যে শুধুমাত্র জীবনের কবাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। লোকসাহিত্যে কল্পনাপ্রবণতা বা সৌন্দর্ষবিলাসিতা বিরলদর্শন বললেও চলে। অন্ততঃ ঝাডখণ্ডের লোকসাহিত্যে এ সবেব দর্শন ক্চিৎ কদাচিৎ মেলে। স্বাভাবিক সৌন্দর্ষ প্রসাধন ছাড়াও যেমন নয়নতৃপ্তিকর এবং রম্য হয়ে থাকে, ঝাডখণ্ডের

লোকসাহিত্যেও তেমনি এক ধরনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখা যায় যা উগ্র প্রসাধনে অভ্যস্তদের হৃদয়গ্রাহী না হলেও সৌন্দর্যের স্বাভাবিকতায় বিশ্বাসীদের আনন্দদানে সমর্থ হয়। তবে উদ্ভাল, টগবগে, উফ প্রাণময়তায় ভরা জীবন ঝাডখণ্ডেব যে-কোন গানের মধোই খুঁজে পাওয়া যায়। ঝাডখণ্ডের বিভিন্ন শ্রেণীর গানের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জীবনধর্মিতার বিশিষ্ট দিক-গুলো দেখাবার চেষ্টা করেছি। লোকসাহিত্যের মধ্যে বাস্তবতা, প্রত্যক্ষতা, ঝজুতা ইত্যাদি গুণগুলো যতোখানি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ লাভ করে, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। আমরা ইতিপূর্বে ভূবি ভূবি উদাহরণের সাহায্যে এগুলোও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি।

শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের আবেদন একটু দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। শিল্পসাহিত্য লিখিত সাহিত্য, স্তব্ধতাং তাব পবিবর্তিত হবার কোন অবকাশ থাকে না; ফলে যুগের পবিবর্তন এবং ভাবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসাহিত্য প্রাচীনত্ব লাভ করতে বাধ্য। কিন্তু যেহেতু লোকসাহিত্য অলিখিত সাহিত্য, তাই এর পরিবর্তিত হবার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। যুগের পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর অংশবিশেষ পবিবর্তিত হয়ে যুগোপযোগী রূপ লাভ করে, ভাষা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে যুগোপযোগী ভাষার সঙ্গে ঝাল রেখে চলে। লোকসাহিত্য তাই চিবপুরাতন হয়েও চিবনূতন। তত্বদিকে শিল্পসাহিত্যের ভাববস্তু চিরনূতন হলেও তা কালক্রমে পুরাতন হয়ে পড়ে। শিল্পসাহিত্যে যেমন জীবনের সামগ্রিকতা প্রতিফলিত হয়ে থাকে, লোকসাহিত্যে তাব ব্যতিক্রম নয়। পারিপার্শ্বিক জগৎ এবং জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না, তা সে শিল্পসাহিত্য হোক কিংবা লোকসাহিত্য, সর্বত্রই জগৎ এবং জীবন অনুপ্রবেশ করে থাকে। জগৎ এবং জীবন লোক-অভিজ্ঞতায় বিচিত্র রূপে বরা পড়ে। প্রঃবেশী অন্তঃসম্প্রদায়ের কথা, তাদের ধর্ম, সমাজ ও জীবনের কথা, তাদের প্রভাব ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসাহিত্যের মধ্যে ধরা পড়ে, ফলে লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পায়। আমরা অন্তঃসম্প্রদায়ের কথা, ঝাডখণ্ডেব লোকসাহিত্যে তত্ত্বাণ্ট উচ্চতর সম্প্রদায়ের লোকের ধর্ম সমাজ ও জীবনের কথা এবং তাদের প্রভাব কি ভাবে পড়েছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব লোকসাহিত্যে এবং জীবনে সমানভাবে পড়েছে। সংস্কৃতি-সমস্বয় সর্বাংশে সাবিত না হলেও ভাসা-ভাসা প্রভাব থেকে ঝাডখণ্ডেব লোকজীবন এবং সাহিত্য মুক্ত থাকতে পারেনি।

কতো বিচিত্র বিষয়বস্তু যে ঝাডথণ্ডের লোকসাহিত্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার সীমা-পরিসীমা নেই। আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়বস্তু

উপকরণেব ওপর আলোকপাত কবেছি। অস্বীকার কববাব উপায় নেই যে, বিষয়বৈচিত্র্যই ঝাডথণ্ডেব লোকসাহিত্যেব রসবৈচিত্র্য বাড়িয়েছে। শিল্পসাহিত্যেব মূল্যমানেব নিরীখে এতদঞ্চলের লোকসাহিত্যে কবিত্তেব ঘটতি আছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ঘটতি জীবনপাত্তের উছলে-পড়া বসে যে পূরণ হয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই। যে জীবনধর্মিতা সাহিত্যেব প্রধানতম গুণ, ঝাডথণ্ডেব লোকসাহিত্যে তা ভূবি পরিমাণেই পাওয়া যায়।

আমবা এখানে ঝাডথণ্ডেব লোকসাহিত্যেব বিচিত্র বিষয়বস্তুর মধ্যে যেকয়েকটি বিষয় নিয়ে বিচাব বিশ্লেষণ কবে দেখব, সেগুলো হল : বঙ্গবান্দ, বিশ্বয় ও হাশুবস, সামাজিক ঘটনায় ব্যঙ্গবিদ্রুপ, আধুনিক সমাজসভ্যতা (যন্ত্র সভ্যতা), সাময়িক ঘটনাপ্রবাহ, ইতিহাসচেতনা, বাধাক্ষয় প্রসঙ্গ এবং বামাযণ-প্রসঙ্গ।

যে কোন ধবনের বিকৃতিই হাশুেব স্টংপত্তিব কাবণ হতে পাবে। সাধাবণ আকৃতি প্রকৃতি আমাদেব হাশুেব স্ট্রেক কবে না, কিন্তু আকৃতিব মন্যে যৎসামান্য বিকৃতি দেখলেই আমবা হাশুেব স্ট্রেক হয়ে উঠি। শুধু আকৃতিগত বিকৃতিই

নয়, আচাবব্যবহাবে, লোকচবিত্তে, স্বভাবগুণে যে কোন বঙ্গবান্দ, বিশ্বয় ও হাশুবস বকম বিকৃতি ঘটলেও তা প্রচুব পরিমাণে হাশুবসের

জোগান দেখ। গভীব জীবনদৃষ্টি, বস্তদৃষ্টি, লোকচবিত্তে সম্পর্কে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ইত্যাদি গুণ থাকলে তবেই হাশুবসদৃষ্টি লাভ করা যায়। লোককবিদের মধ্যে এং রসদৃষ্টিব যে অভাব ছিল না, তা ভূবি ভূরি লোকগীতি থেকে সপ্রমাণ হয়। বঙ্গবান্দ কোঁতুক বিশ্বয়কব ঘটনা ইত্যাদিব মধ্য দিয়ে হাশুবস উজ্জ্বল বৌদ্ধবাব মতো আমাদেব স্নাত কবে তোলে। কখনো- বা শৃঙ্গাববসেব সঙ্গে হাশুবস মিলেমিশে এক অভাবিত-দূর্ব অনাধ্বাদিত রস-অভিজ্ঞতার সৃষ্টি কবে। ব্যঙ্গেব সাহায্যেও যে নির্মল হাশুবসের সৃষ্টি সম্ভব ঝাডথণ্ডেব লোকসাহিত্যে তাবও নিদর্শন মেলে। তাছাড়া অনেক সময় বঙ্গবান্দেব সাহায্যেও বংবসের সৃষ্টি করা হয়। জীবজন্তু পশুপাখি সম্পর্কিত বহু গনে তাদেব চাবিত্তধর্মেব বিকৃতি দেখানো হয়; সাধাবণতঃ এই সব গানে দেখা যায় যে, পশুপাখিবা মানুষেব মতোই আচরণ কবছে, যা তাদেব

চাবিত্রধর্মের বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়, ফলে বঙ্গবঙ্গের সংমিশ্রণে হাশুরসের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে; এই সব গানে বিশ্বয় বহু ক্ষেত্রে fantasy-র দিকে অঙ্কুলি সঙ্কত করে। রঙ্গবঙ্গ-কৌতুক-বিশ্বয়-fantasy-সম্পন্ন হাশুরসোজ্জ্বল কয়েকটি গান নিচে উদ্ধৃত করা হল।

১-১৫ গপালপুবে দেখ্যে আলায়ম বড় তলে সুবকিব ঘানি, এমন সাহেব কল কবোছে আমলাবা টানে ঘানি ॥ চাঁশ মাছিব গাজনা লাল গামছার বিছনা, দিব বল্যে দিলি না আমাব কি দিন গেল না ॥ পুঁঠি মাছ গীত গায় শোল মাছ সেবেঞ বাজায়, মামা কাঁদে গ, মামী-এ ভিন্ন বাঁধি পায় ॥ শিয়াল কবে জয়া হুয়া কুব বলে কন শালা, এসা পেদা পে'দব শিয়াল উগাল গাট .ন'লওলা ॥ ডাঁ'ডকা মাছ উভা ঝিটে শিয়ালে গাহে গান, লব'লতা হে, শিয়ালের নেজ কেনে কাঁকা ॥ ডাঁ'ডকা মাছে ডাঁডি ধবে পুঁঠি মাছে গীত গাহে শোল মাছে খঞ্জরী বাজায়, বে ভাবতভাই, উডাকলে মুজুক বেটায় ॥ বঘাবধী হাল কবে শিয়ালে বনে ধান, বুটা ভালুক হুড়া ঝাড়ে আশি কুড়ি ধান ॥ শিয়ালে হাল বাছে পেচায় বনে ধান, বনেব হুড়া হুড়া ঝাড়ে পেচায় কিসায় ॥ বাতায় বাতায় উঁদুব যায় উঁদুবে কি বিবাল খায়, মাঝি ভাই, ভাড়া নউকা অগম দবিয়ায়, ভাড়া নউকায় কি হয়ে পাইরায় ॥ বিলেব দিগে যাহ না বেঁগে মাবে লাগি, উলটি কাচাড খাঁয়ে ভা'ওল কলসী ॥ কাঠপকায় গববপকায় কবে একাদশী, কাব্বা বিড়ালে বলে সব পবব বাসি ॥ মেদিনপুবে দেখ্যে আলায়ম দালানে ধান পাকোছে, এমনি চায়া চাষ কবোছে শিয়ালে ধান মাডোছে ॥ মেদিনপুবে দেখ্যে আলায়ম বেঁগের শাতে কাছাবি, সাপ দেখ্যে বেঙ পলাই গেল পড্যে ব'হল কাছারি ॥ মেদিনপুবে দেখ্যে আলায়ম কাওয়াতে গাহনা কবে, বাঁদবে খঞ্জরি বাজায় ধুঁদুব পেচায় লাচ কবে ॥ মেদিনপুবে দেখ্যে আলায়ম কঠার উপর বাঘবসা, সে বাঘেতে মাগুস খায় না দেখনা পাখব তামাসা ॥

স্বাভাবিক জীবন বা ঘটনা কখনই ব্যঙ্গবিদ্রোপের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত

হয় না। ব্যঙ্গবিদ্রোপের ক্ষেত্রেও বিকৃতিই প্রধান ভূমিকা

সামাজিক ঘটনায়  
ব্যঙ্গবিদ্রোপ

গ্রহণ কবে থাকে। এই বিকৃতি দেখলেই কবিমানস ব্যঙ্গ-বিদ্রোপে ঝলসে ওঠে। সমাজের বিভিন্ন লোকচিত্রে,

তাদের আচারব্যবহারে সামান্যতম বিকৃতি ঘটলেও তাদের ব্যক্তিগত জীবনের শিকার হতে হয়। অসাধু উপায়ে অর্জিত সম্পদে ভূঁইফোড় বড়োলোক, দুষ্কৃতির পরিণাম, কৃষিনির্ভর জীবনে চাকুরিবৃত্তি সমস্তই ব্যক্তিগত জীবনের উপকরণ হয়ে থাকে। তাছাড়া সমাজজীবনের, পারিবারিক জীবনের নানান ঘটনাও ব্যক্তিগত লক্ষ্য হয়। নারীসমাজের আচারআচরণ, চালচলন, তাদের ব্যক্তিগত ইত্যাদির ওপর ব্যক্তিগত শাসিত চাবুক বারংবার বর্ষিত হয়ে থাকে।

১৬-২২ এ তখন যে দেখি গকুল খড়ের ঘর ছিল বে, এবার কেনে গকুল টালি উবড়াই দিল রে। যখন টালি উবড়ালি কাঁটাবনীর বন পালি কাঁটাবনীর হাজরী খাতায় চালানি। নবসিংগড়ে টাকা পেরমেট পালি বে, যখন টাকা পালি টালি উবড়ালি রে ॥ শালই লাগা গাঁইঠে কডি বামে ভিজিস শাড়ি, শালই-লাগা সাদ না মিটল, হাড়িরামের চাকরি চলি গেল ॥ ঝুঁ ঝুঁ মোব হখা চাষী বিলে ঝাড় দেখা পাখি, চাকর্যা কুকুরেব মতন যায় হে, ছ মাসে ল মাসে দেখা পাই ॥ ধলভুঁই-এর বাঁগা মাটি কার পালায় বত বিটি কার পালায় বেহালা পুরুষ, দিদি যা'হ না ধলভুঁই কঠিন মূলুক, কুলুপ লাগাই পডাল্য পুরুষ ॥ শিলদা সাতভুঁই-এ ঘব ধলভুঁইকে কিসের ডর সিপাইকে ত করো'ছি পাগল, দাবগা ত নয়নের কাজল ॥ আম ফলে ধ'পা ধ'পা তেঁত'ল ফলে বাঁকা, পুরুষ দেশে যায়ে দেখ হাঁড়ীর হাতে শাঁকা ॥ শাউড়ীকে পরো দাডে কিল্লাই দিল টিকি হাড়ে দাত দুটা পড়িয়ে রহিল, ভাবিতে গুণিতে দিন গেল ॥

আধুনিক সভ্যতাকে যন্ত্রসভ্যতা নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। যন্ত্রসভ্যতা শুধু নাগরিক জীবনকেই প্রভাবিত করে নি, পল্লীর লোকজীবনও কমবেশি প্রভাবিত হয়েছে। অরণ্যভূমি ঝাড়খণ্ডের জনজীবনের অসাধারণ স্থবিরতাকেও যন্ত্রসভ্যতা নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা ঝাড়খণ্ডের বুক চিরে রেলপথ, রাজপথ বহু পর্বেই স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তখন তা নিতান্তই বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছিল। যন্ত্রসভ্যতা এখানের জনজীবনে সর্বাধিক প্রভাব ফেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। এখানে-ওখানে বিমানবাঁটি উঠি কবা হবেছিল তখন, আকাশে পাখির মতো ডানা মেলে দিয়ে অজস্র উড়োজাহাজ যার কর্ণশব্দে ওড়াউড়ি করে জনজীবনকে সদাসর্বদা সচকিত করে রেখেছিল। উড়োজাহাজ মোটর গাড়ি তখন অরণ্য-

ভূমির প্রত্যন্তবাসীর কাছেও আর অপরিচিত থাকে নি। উডোজাহাজে ওড়বার সৌভাগ্য ঝাড়খণ্ডীদের না হলেও কুলিকামিনের কাজ নিয়ে তারা মোটর গাড়িতে চড়ার দুর্ভাগ্য আনন্দ তখনই লাভ করতে পেরেছিল। প্রত্যক্ষ সংসারের এই সব যন্ত্রণা সম্পর্কে তাই লোককবিরা উদাসীন থাকতে পারে নি। অজস্র গানে এই সমস্ত যন্ত্রণার কথা বিবৃত হয়েছে; পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে লোকসাহিত্যে যে নির্বিকার থাকে না এগুলো থেকেই তা সপ্রমাণ হয়। ধানের কল, উডোজাহাজ, বেলগাড়ি, মোটর গাড়ি, বিজলী বাতি, কলকাথানা সব কিছুই স্বাভাবিকভাবেই লোকসাহিত্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৩-৩২ চাকুল্যাতে দেখো আলাম চুঁয়র জলে কল চলে, ইষ্টিমাতে ধান ঢালোছে চা'ল পড়ে মিশিন তলে। একদাব ইষ্টিম হলে, পা'ছডাতে হয় না গ কলের চা'লে ॥ উ'ডল উডাকল, ভালো ব'হল দেশের লক সকল ॥ আলা গাড়ি দুমদুমায়ে' অ গাড়ি তর ঘব কুপা, টিপ্নি কলটা টিপে দিব সজা বাস্তা; ক'লকাতা ॥ আইল মালগাড়ি গেল বে ভাই তাডাতাড়ি, পাইটমেন দিল হাত লাডি, পবন বেগে ছুটোলা ডাকগাড়ি ॥ মাগুই মাগুই বেলগাড়ি তাব পেছুই ঠেঁলাগাড়ি তাব পেছুই জড়া পাসিঞ্জর, মকে লাগে ডর, ক'লবাতা কঠিন শহব ॥ কালিমাটি আনাগনা মুসাবনীর কারখানা মুসাবনীর বিজলী বাতি, বিনা তেলে জ'লছে গ সারারাতি ॥ মুসাবনীর কা'বখানা পাথর বা'হরায় সনার পাবা, গবরমে'টেব ভাল হইল, তারে তাবে আল জালালা ॥ কন মাগীদের বিটি মাগ্যে লিল শা'থা ছুটি, অডন পি'ধন টসর শাড়ি, টা'ডকে উঠিল রেলগাড়ি ॥ ভালুক'বি'পায় কাম হল্য ছানায়ায় সক'ল গেল বুটী ঠেঁডী সক'ল লিল শাড়ি, মটবে চটিল হাত লাডি ॥ বারে বারে বারুণ করি ঘাট খা'টেতে যা'হনা, ঘাটি-খাটা বড় কষ্ট গায়ের বরন কিরে না ॥

লোকমানস অত্যন্ত ঘটনা-গ্রাহী হয়ে থাকে। জনজীবনে যে ঘটনাই স্পন্দন তোলে তাই মানসরসে জারিত হয়ে লোকসাহিত্যের উপকরণে পরিণত হয়। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যেও সাময়িক সাময়িক ঘটনাপ্রবাহ ঘটনাপ্রবাহের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। প্রাকস্বাধীনতা যুগের সংরক্ষিত অরণ্যগুলো স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সরকারী নিয়ন্ত্রণে কেটে



কেটে ধ্বংস করে নতুনভাবে অরণ্যসৃষ্টির জন্ত প্রান্টেশানের পরিকল্পনা কি-ভাবে ব্যর্থ হল, চারপাশে কাঁটাতাবের বেড়া দিয়ে গরুবাছুর মানুষজনের অরণ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল; দু'দু'বার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় কলাইকুণ্ডা বিমানঘাঁটির প্রথমতঃ সস্ত্রস্ত্র অবস্থা জনমানসে কি ধরনের প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল ইত্যাদি সাময়িক ঘটনা নিয়োদ্ধিত গানগুলোতে বিধৃত হয়েছে।

৩৩-৩৫ যখন ধলভূঁই রিজাফ ছিল খুকডাখুঁপী ভালই ছিল, এবার ধলভূঁই-এ পেলেনটেসান হল্য, ধারে ধারে খাম খুঁটা দিল, ধন্য বেজার তর মুরাদ ছিল ॥ খড়পুপুরের পচ্ছিম্বে ঘাট কলাইকুণ্ডা, বম ফে'লল দুপহরে পাকিস্থানেব গুণ্ডা। ঘাটির কাজ বন্দ হল্য ভয়ে লক দেশ ছাড়িল, কলাইকুণ্ডাকে বুঝিবা উডায় ॥ ভারত আর পাকিস্থানে যুদ্ধ হয়েছিল, দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ দু'নম্ববে গেল। সাড়ে দশটার সময় কায়ার করেছিল, পালাতে পালাতে একজনা আম গাছটায় পড়িল। অ কি মজা হল্য, বম গিলা ফুটিতে লাগিল ॥

লোকসাহিত্যেব গানে-গল্পে ইতিহাসেব হিঁটেফোটা বিধৃত হয়ে আছে। বহু প্রসঙ্গ এতোই ধূসর বিবর্ণ হয়ে গেছে যে, আর তাদের সঠিকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। ঝাড়াখণ্ডের বিভিন্ন রাজা-জমিদারদের প্রসঙ্গ প্রচুব পরিমাণে লোকগীতিব মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও ইতিহাস-চেতন।

কোন রাজার নামটি পর্যন্ত উল্লেখ কবা হয়নি, ব্যতিক্রম শুধুমাত্র 'লীলমণি' এবং 'রাজা নরসিংবর'। বৃটিশদের পদপাতের পূর্বে ঝাড়াখণ্ডের জনজীবনে সম্পদে, আচারব্যবহারে রাজার স্থান এতোই উঁচুতে ছিল যে প্রজারা বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাই ঝাড়াখণ্ডের রাজাদের প্রসঙ্গ লোকগীতিতে বারবার এসেছে; এগুলোর মধ্যে ইতিহাসচেতনাবশুই আছে, কিন্তু ইতিহাস রচনার কোন সচেতন প্রয়াস বা বাসনা এগুলোর মধ্যে খুঁজতে যাওয়া নিতাসুই বাতুলতা মাত্র। লোককবি কখনোই কোন গান সচেতনভাবে রচনা করে না। ইতিহাসচেতনার ছাপ আরো অনেক প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়: মুসলমান আমলে স্বাধীন ঝাড়াখণ্ডে মুসলমানদের হামলার কথা, ছেলেখবাদের বিভীষিকার কথা, বর্গী হাঙ্গামার কথা, নীলচাষের কথা এবং নীলকরদের কাছে বাধ্যতামূলক কাজের কথা, খাজনার জন্ত ইংরাজদের চাপ এবং অত্যাচারের কথা, রাজাদের রাজত্ব বিকিয়ে

যাওয়ার কথা—অস্পষ্টভাবে হলেও এখনো লোকগীতিতে খুঁজে পাওয়া যায় ।

৩৬-৪৬ ডুঁঙবি কাখারে ধাবে কে বে কাঁটি কাটে, আমি বঠি শতপতি রাজাব বেটা বাছো বাছো কাটি ॥ বাবমু ৬৮ পাঠাতে কিসেব ধুলা উড়ে রে, বাজার বেটা দুববাজ খডমে চলিছে ॥ মল হুঁই-এর মল বাজা খায় গেল জনহাব, বাজা, আ'জ বাজ বিপদে পড়েছে, গায়েব গামছা বন্ধক দায়ে' গছে ॥ যখন বাজা ছটা ছিনা শাহিড়ে গহড়ে বাট ছিল, এবাব বাজা বড হন্য দলদলি সডপ দিল ॥ কহমশাল কলাবনী যেখান পা'কতে শদ শুন পাকাব উপব জাদ' নলেব কল, রাজা নবসিবব, কা'ডগ গ্রামে কবে ঝলমল ॥ বাইদে বহালে মাছ কপা পাশায় লিতে' নাচ, আখডায় সামালা বুটা মুসলমান নিশি দাটি বুকেব সমান ॥ আম কলে ধ'কা ধ'কা কমবে বাবল ট'কা, ননদ ল, বাজাবে সামালা ছানাধবা ॥ উপব কুলহি হডহডানি নাম কুলহি টডা, কি কব্যে পাঠবাব দাদা ছুঠে' যে খড' ॥ অননদী দেখ, দেখ ল বগী' কত ধুবে, বগী' আ'ল্য লক পালালা বগী' কত ধুবে ॥ এতটুকু শাহেব ছাটি নীল কুঠিব নাবে, হাটু গাডা বন্ধক চালায় বগড ভাঙে পড়ে ॥ নীল কাটো নীল বহতে গেলম শাপলমাবির কুঠিতে, এমন নীলেব ববা ভাবি ঘাডে দবজ লাগোছে ॥ গাকে আলা বেলি সংহেব পাজনাব বড হডবডি, আই ন শান্ত গায়ের মডল বাড়ি বাটে গডবডি ॥

ঐতিহ্যবাহুদের একদা এই ঝাডখণ্ডেব 'ভিল্পথায়' আদিম অধিবাসীদেরও

বৈষ্ণবধর্ম ও ঝাডখণ্ড তাঁব প্রেমমঞ্জে সঞ্জীবিত কবেছিলেন । বস্তুতঃ অগ্নাঙ্ক আর্ষধর্ম—হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন—কে ঝাডখণ্ডের আদিবাসীবা স্মৃণাব দৃষ্টিতে দেপে বজন কবে থাকলেও বৈষ্ণবধর্মের জাতিহীনতা শ্রেণীহীনতা তাদের কিছুটা আকৃষ্ট কবেছিল । বিশেষভাবে আদিবাসী বাজাজমিদাব সামন্তবা যথেষ্ট পবিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল । তাদের মাধ্যমেই আপামব জনসাধাবণেব মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আপাত আকৃগত্য দেখা দেয় এবং হবিনাম সংকীর্তন মাহাত-ভুমিজ আদি সম্প্রদায়েব মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয় । হরিনাম এবং পদাবলী কীর্তন ঝাডখণ্ডে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং কীর্তনে ঝাডখণ্ডী ধারা গড়ে ওঠে । তবে এর ফলে

যে স্থানীয় অধিবাসীরা সম্পূর্ণ বৈষ্ণব বনে গিয়েছিল এমন কথা ভাবা একান্তই ভ্রান্ত। ঝাডথণ্ডের বাসিন্দারা তাদের ঐতিহ্যসূচী বীতিবেড়ায়াজকে কোনদিনই বর্জন করে নি, আবার হবিনাম সংকীর্ণনেও তাদের অনীহা দেখা যায় নি। ভাবা যেতে পারে যে এব ফলে এখানে সংস্কৃতি-সমন্বয় সাধিত হয়েছে। কিন্তু সে কথাও সত্য নয়। সমন্বয় তখনই সম্ভব যখন কোন সম্প্রদায় নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে বহিঃবাগত সংস্কৃতিকেও আত্মস্থ কবে নেয়। বৈষ্ণবধর্মকে ঝাডথণ্ডের অধিবাসীরা প্রাণ দিয়ে গ্রহণ কবে আত্মস্থ কবে নেয় নি, শুধুমাত্র 'ব'স্টম' (<বৈষ্ণব) নামে একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তাবা ৬ যে সব সময় বৈষ্ণবোচিত জীবন কাটায় না তা 'ব'স্টম টম টম, হাঁড়ির ভিত্তব পইতা বাথ্যে খুকুড়া খাবাব মন' শ্লেষাত্মক প্রবাদবাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বৈষ্ণবধর্ম জনমানসেব গভীরে প্রভাব ফেলেতে অসমর্থ হলেও বাধাক্ষেত্র ঝাডথণ্ডের লোকগীতিতে ঝাডথণ্ডীদেব পবম শাস্ত্রীযেব রাধাক্ষেত্র ও লৌকিক মতো একটি পীতিমধুব স্থান কবে নিতে পেবেছে। পবম প্রেমিকা প্রেমিকা আত্মীয়ই বলা ভালো, কাবণ ঝাডথণ্ডের লৌকিক প্রেমিক শ্রেমিকাব সঙ্গে বাধাক্ষেত্র সম্পর্কিত হবিহব-আত্মাব মতোই। ঝাডথণ্ডের লোকগীতিতে যে বাধাক্ষেত্র দশন মেলে পদাবলীর বাধাক্ষেত্র সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। পদাবলীর বাধাক্ষেত্র বর্হিবঙ্গ রূপটা পদাবলীর অক্ষম অক্ষরণে বচিত বুমুবে হয়তো-বা কিছুটা পাওয়া যাবে, কিন্তু - স্তবঙ্গ কপেব দিক দিয়ে বুমুবেব বাধাক্ষেত্র সঙ্গে পদাবলীর বাধাক্ষেত্র আকাশপাতাল ব্যবধান। আন্তব ধর্মেব দিক দিয়ে লোকাযত গানেব বাধাক্ষেত্র মতোই বুমুবেব বাধাক্ষেত্র ঝাডথণ্ডের নির্বিশেষ লৌকিক প্রেমিকপ্রেমিকাব বিশেষ রূপ ছাড়া কিছু নয়। লোকাযত গানেব বাধাক্ষেত্র সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব বাধাক্ষেত্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। লৌকিক জৈব প্রেম উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানতম ভূমিকা গ্রহণ কবে আছে। ঝাডথণ্ডের লোকগীতি এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাধাক্ষেত্র পদাবলীর বাধাক্ষেত্র মতো নিবন্ধ ভাবমূর্তি মাত্র নয়। লৌকিক জগতেব প্রেমিকপ্রেমিকায়ুগলেব মতোই এবা সরঞ্জ, চঞ্চল, কামনা-বাসনা দৈহিক ক্ষুধায় অস্থির। দেহকে উপবাসী বেখে শুধু প্রেমের ভাবমূর্তিকে আশ্রয় করে এরা মানসিক শান্তি পায় না। কেউ কেউ মনে কবেন, ঝাডথণ্ডের আদি-বাসীদের মুক্ত প্রেমই বাধাক্ষেত্র প্রেমলীলার উৎস, হাতে বাঁশি, গলায়

বনফুলের মালা, পরনে হলুদ-ছোপানো কাপড়, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ—ঝাড়খণ্ডের বাপাল বালকের এই সাজ পদাবলী ব্রীক্ষের কপ কল্পনায় যে প্রেবণা জোগায় নি, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না; গোপিনীবিহাবের মতো রাখাল বালকের ঝাড়খণ্ডী কিশোরীদৈব সঙ্গে মুক্ত প্রেমবিহাব আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতেও বাগালের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তাব বংশীধ্বনি গৃহকোণে আবদ্ধা যুবতী নারী এবং কুলবধদের উন্মনন কবে তোলে, মিলনের সন্তা তাবা আকুল হয়ে ওঠে; গৃহকর্মে ঝাধা পাকায় তাবা অবগাপণে বেবিযে পড়তে না পাবার ক্ষোভে দীর্ঘশ্বাসে ঘবের বাতাসকে ভাবি কবে, তাধার মতোই প্রেমের অশ্রুকে ধোঁয়াব জ্বালাব জল বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা কবে। তাই বাধাক্ষয় বৈষ্ণবধর্মের পসাব এবং পদাবলীব জনপ্রিয়তার পণ বেয়ে লোকায়ত্ত গানে অল্পপ্রবৃষ্টি হয়েছে, এমন কথা ভবে নিতে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিগা দেখা দেয়।

এমন-কি ব্রীক্ষকীর্তনের বাধাক্ষয়ই এখানকার লোকগীতিতে স্থান কবে নিয়েছে, তা'এ ছোর কবে বলা যায় না। ব্রীক্ষকীর্তনের তাব ও ভাষাব সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির তাব ও ভাষাব যথেষ্ট মিল রয়েছে, তা'এ লক্ষ্য কবে দেখা দবকার। ব্রীক্ষকীর্তনের ওপব ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির প্রভাব পড়েছে নাকি ব্রীক্ষকীর্তনই এখানকার লোকগীতির ওপব প্রভাব ফেলেছে তা বীতিমতো বিতর্কিত ব্যাপাব হতে বাধা। যদি ধবে নেওয়া যায়, ব্রীক্ষকীর্তনই ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির ওপব প্রভাব ফেলেছে, তাহলে এটাও ধবে নিতে হবে যে এই অঞ্চলে ব্রীক্ষকীর্তন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল; এই সস্তাবনাটি অনেকাংশে গ্রহণ-যোগ্য এই কারণে যে ব্রীক্ষকীর্তনের একমাত্র পুঁথিটি ঝাড়খণ্ডের পূর্ব প্রত্যন্তে পাওয়া গেছে এবং গ্রন্থটির ভাষায় ঝাড়খণ্ডী উপভাবার যথেষ্ট ছাপ থেকে গেছে। তাছাড়া ব্রীক্ষকীর্তনের ভাবধণ্ড, নৌকাধণ্ড (যাকে কেউ কেউ পাবধণ্ড-ও বলেছেন) এবং বংশীধণ্ডের বংশীচুবি প্রসঙ্গগুলো হস্তাত্ত তুল'ভ হলেও ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে পাওয়া যায়। ভাবধণ্ড ও নৌকাধণ্ডের প্রসঙ্গ মেয়েদেব নিজস্ব গীত জাওয়া গীতে দেখতে পাওয়া যায়। অন্দবমহলে এমনিতেই বাইরের প্রভাব পড়ে কম; তাব ওপব যে ঝাড়খণ্ড উচ্চধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবোধ বচনা কবেছে যুগ যুগ ধবে, সেই ঝাড়খণ্ডের নারীসমাজ যেখানে আজো নিজেদের বৈষ্ণববাদ থেকে দুবেসবিযে বেখেছে—তাদের গানে

ব্রীক্ষকীর্তন ও  
সঙ্গীতি

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পড়েছে এমন কথা স্বীকার করে নেওয়া বস্তুত। এখানে ভারতগু, নৌকাখণ্ড এবং বংশীগণ্ডেব প্রসঙ্গ-সংবলিত কয়েকটি গান উদ্ধৃত করা হল।

৪৭-৫৩ কিয়াকার্টের বাঁহকখানি হিহড লভেব শি'ক', কিষ্টর কাঁধে ভব দিয়ে' চলোছেন রাধিকা। আণ্ডয় আণ্ডয় যাবেন কিষ্ট পিছনে বাপিকা, লক শুধালে ব'লবেন কিষ্ট বাদিকাব বেগাব, মথুবাসে যাবেন কিষ্ট হইবে উদ্ধাব, লক শুধালে ব'লবেন কিষ্ট বাদিকাব বেগাব ॥ আমপাত্ চিবিচিবি মউকা বনাব, সেহ মউকায় নদী পাইবাব। সোব লককে পাব ক'বব লিব আনা আনা, বাধিকাকে পাব ক'বতে লিব কামেব সনা ॥ আসৌছি বাস্তা ভুল্যে বসেয় আছি নদীব কূলে বাপ দিলে ডুবিয়ে' মবিব, কমনে নদীয়া পাব হব। যে কাববে নদী পাব তাকে দিব গলার হাব ॥ ই কুল উ কুল নদী বহিছে পাতলাভদি কাঁপ দিলে ডুবিয়ে মবিব, কমনে নদীয়া পাব হব ॥ উ'গিয়া ম'গিয়া ঘাটে কে বে উ'গিয়া বঠে কিয়া নাম কাহাবে শুপাব, কমনে নদীয়া পাব হব। য ক'বকে নদী পাব তাকে দিব গলার হাব আধা প্রাণ তাহাবে সঁপিব ॥ ই'সে হাশ্তে রাজায় বাঁশি নিঠুব কালিয়া, জলে পাব কবা'য়ে দে আর্মি যাব মথুরা ॥ একডা কদম তলে কৃষ্ণ ঘুমাল্য কলে না জানি শাম ঘুমেবি ঘবে, বাঁশিটা যে নিয়ে' গেল চবে ॥ ঠ'চি কদমেব তলে কিবণ ঘুমাল্য কলে হাতেব বাঁশনি লিল চবে, নাট জানি নাট ঘুমেব ঘবে ॥

তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পঞ্চাশতাব সঙ্কে সবাসবি যাগ আছে এমন লোকগীতির সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। পর্বোক্ত নির্দেশেব ওপব ঠনতব কবলে ঝাডগণ্ডেব প্রকীর্ণ লোকগীতিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব আত্মিক যোগাযোগ যে খুবই নিবিড় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আসলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব বাধাকৃষ্ণেব প্রেমলীলা একান্তভাবে লৌকিক প্রেমেব বিচিত্র বসসস্তাব ছাড়া কিছু নয়। ঝাডগণ্ডেব লোকগীতিতে একই দবনেব লৌকিক প্রেমেব জয়গ সোচ্চাব কণ্ঠে ঘোষণা কবা হযেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব প্রভাব এখানকাব লোকগীতিব ওপব পড়েছে নাকি এহসব প্রকীর্ণ লোকগীতিই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব কাঠামো রচনায় সাহায্য কবেছে, সে বিতর্কেব মধ্যে প্রবেশের কোন প্রয়োজন দেখি না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব একমাত্র পুঁথি মাত্র ষাট বছর আগে আবিষ্কৃত হযেছে,

যাব অস্তিত্বের কথা এগনো বহু তথাকথিত শিক্ষিত লোকই জানেন না। সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ লাভের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল্য জনসাধারণের নাগালের মধ্যে কোনদিনই পাবে নি। অন্য কথায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মোটেই বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় গ্রন্থ হলে উঠতে পাবে নি। এমনি অবস্থায় ঝাড়পুণ্ডেব লোকমানসকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গান পবিবাপ্ত কববার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছে এমন কথাও ভাবা চলে না। 'আব যদি বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব ঝাড়পুণ্ডেব লোকগীতির ওপর সত্যিসত্যিই পড়েছে, 'শহলে ধবে নিতে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁপি আবিষ্কৃত হবার বহু আগে থেকেই, বলতে গেলে মধ্যযুগ থেকে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঝাড়পুণ্ডে অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ ছিল; সে ক্ষেত্রে স্বীকার কবতে হয় গ্রন্থটি ঝাড়পুণ্ডেই রচিত এবং ঝাড়পুণ্ডের প্রেমভাবনাই তাব মনো বিধৃত হয়ে আছে। অন্যভাবেও ভাবা যেতে পাবে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে পল্লীসাহিত্য বা লোকসাহিত্যের পর্যায়েও ফেলা যেতে পাবে। লৌকিক কথা কাহিনী, প্রবাদ এবং গান লৌকিক কাব্যবচনায় প্রবেশা যেমন জুগিয়েছে, তেমনি কাঠামো বচনাত্মক সাহিত্য কবেছে। ঝাড়পুণ্ডেব প্রেমভাবনা, লোকচিত্র এবং প্রেমগীতি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বচনায় অন্তর্প্রবেশা জোগায় নি কিংবা তাব কাঠামো বচনায় সাহিত্য কবেনি, তা'ও কি জোব কবে বলা যায়? ঝাড়পুণ্ডেব কয়েকটি লোকগীতি উদ্ধৃত কবা হল, বিচার-বিশ্লেষণ ববে দেগলে দেখা যাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পঙ্ক্তিৰ সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

৫৪-৫২ 'তবল দেগো উঠলম গাছে গাড়তলেতে লক আছে, তব দুজন সাগী  
থাক ডাল ভাঙো পড়ি পাছে। বনঝন ঝড় বাসাতে, সে-ডাল  
পবি সেই ডালেই ভাঙি পড়ে ॥ বাউ নাই বাসাক নাই ডাল কেনে  
লড়ে, অভাগা কদমের ডাল পাছে ভাঙো পড়ে ॥ আগ ডালের  
কুইলী ম'ম ডালে বাসা, ভাঙলে বিবিগের ডাল জীবনের নাই  
আশা ॥ আকাশেতে চাঁদ নাই কি কববে তাবা, যাব ঘরে  
পুকব নাই জীষন্তে সে মবা ॥ কদমদুল ময়ানি গেল সেবু পঁপু নাই  
আলা, কানের ফুল কানেই শুকাল্য, শাম নাগব বড় দাগা দিল ॥  
আষাড শবাবণ মাসে কাঁচা বাঁশে ভগব বসে, আমাব পঁপু ব'হল  
বিদশে, কাল মেঘ গ'ডচে আকাশে ॥

উল্লেখিত গানগুলোর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিগুলোর তুলনা করলেই মিলটা বোঝা যাবে।

যে ডালে করে মো ভর সে ডাল ভাঙিঞ। পড়ে নাছি হেন ডাল যাত  
করো বিসরামে ॥ নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী । জিএ  
সে যাহার পাসত পুরুষ নাছি ॥ ফুটিল কদম ফুল ভরে নোঁআইল  
ডাল । এভেঁা গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥ জেঠ মাস গেল  
আসাত্ পরবেশ । সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥ আসাত্ মাসে  
নবমেঘ গরজএ । মদন কদনে মোর নয়ন বুঝএ ॥ ( রাধাবিরহ খণ্ড )

আমবা অতুল্য লৌকিক প্রেমের ক্ষেত্রেও যে পূর্বরাগ-অনুরাগ বিরহ-মিলন  
ইত্যাদি পর্যায়ক্রম আছে, তা বিস্তর উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছি । এবারে  
আমরা রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত কিছু নির্বাচিত গান উৎকলিত কবে দেখাবাব চেষ্টা  
করব যে, এ গানের রাধাকৃষ্ণ মোটেই পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ নয় কিংবা যে-প্রেমেব  
বিভিন্ন অবস্থা গানগুলোর মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে তা উজ্জলনীলমণি অথবা  
বৈষ্ণব বসন্তব-নির্দেশিত প্রেমলীলা নয়, বরং একান্তভাবে লৌকিক প্রেম ।  
সেদিক দিয়ে দেখে গভীরভাবে বিচার করলে এগানগুলোও যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের  
সঙ্গে সম্পর্কিত তাতেও সন্দেহ থাকে না । কোন কোন গানে পদাবলীর ছায়া  
থাকা একেবারে অসম্ভব এমন কথা বলি না । ‘দাঁডায়ে নন্দেব আগে গপাল  
কাঁদে অনুরাগে’ গানটি যে বলবাম দাসের বাৎসলাবসাম্প্রিত নিখ্যাত পদটির  
সরাসরি ব্যবহার তাতে কোন সন্দেহ নেই ।

৬০ **বাল্যলীলা** : দাঁডায়ে নন্দেব আগে গপাল কাঁদে অনুরাগে, হে গ বুক  
বহিয়ে পড়ে লর । না রহিব তব ঘবে অপযশ দেহ মোবে, হে গ  
মা ইঁইয়ে বলে ননীচর । বলাই খায়েছে ননী মিছাই চোব বলে  
রানী, হে গ মা ইঁইয়ে বলে ননীচব ।

৬১-৬৬ **গোষ্ঠলীলা** : নদীব কিনাবে দুবলা কবে লহ লহ, হে গ কাহা কৃষ্ণয়  
বাহুবী চরায় ॥ অ রে কান্হাই ভাই যতনে চরাবি গাই কতি ধুরে  
পাব গয়ালিনী, আন্তে দিব বসিকা রঙ্গিনী ॥ উঠ বাছা রাম রাম  
উঠ বাছা বলবাম উঠ বাছা বেলা বিহানে, যশদা কাঁদিছে বনে  
বনে ॥ নদী কা ধারে কৃষ্ণ গগন চবায়, বাঁশি রা।' বংধা বল্যে  
বা'জছে সদাই ॥ এক কণা খেজাড়ি নাই যাব বাগালি, মাই গ  
মাই, চর'খা খেহু না'রব ঘুরাতে ॥ ভাঙা কাঁকই পানেব ধন শিঙ্গারে  
মজোছে মন মা গ মা, চূড়াটি ঠাঁপিয়ে দে মোর মাখে । ভকে অন্তর  
জলে আঁখি ছলছল করে চর'খা খেহু না'রব ঘুরাতে ॥

- ৬৭-৬৮ **দানলীলা :** আমরা গোয়ালা জাতি দধি বিকি নিতি নিতি দধি ছলে মথুরাতে যাব, দধি ছলে কৃষ্ণ দেখা হবে ॥ প্রভাতে উঠিয়া রাই সাজাল্য'পসরা, মনে উলসিত বড় যাইবে মথুরা। সাজিল সাজিল গ, দধির পসরা মাখে সাজিল গ ॥
- ৬২-৭০ **যমুনা-প্রসঙ্গ :** যাইতে যবুনার জলে কত ছলে কথা বলে, কলসী না ডুবাতে দেয় ফলে, উ বড় লম্পট্যা বঠে ॥ যাইতে যবুনার জলে শ্রীরাধা সগিবে বলে, কদমতলে কালিয়া ডাঁটায়, একা কেহসে যাব যবুনায ॥
- ৭১-৭৮ **অশুরাগ :** উঠ গ ধুতি দেখিয়েঁ আসি যবুনা বহিছে নিরাধার, বামে হেলাইয়েঁ চরণ দলায়েঁ আছেন কি ন আছেন প্রাণনাথ ॥ চাঁদ কবে ঝিকমিকি সুরুজ কবে আলা, কন বনে বাঁশুরি বাজায় আমাব কাল ॥ দেখ সখি ছড়াছল বাইরে সুবাল্য জল ত্রৈ জলেতে চিন্তামণি হেলে, যেন সেই কদমের তলে গ মন গেছে ভুলো ॥ বাঁশি বাজে বেরি বেরি আর ঘবেতে রইতে নারি, বাঁশিটাকে, আমি কাটো লিব জনমকে ॥ যত সখি জড় হয়েঁ জল আনিতে গেলে, কালার সঙ্গে দেখা হলা সেই কদমতলে, বাঁশিটি রাখানাম বলে। কেউ হাঁসে কেউ কঁাদে কেউ নামহেঁছে জলে, শামেব মাথায মেজুর পাঙখা দলে ॥ যমুনা কী ভীবে পানী আনিবারে, কদমতলে, রূপ দেখি গে মেয়া ভ্রমর: গুঞ্জরে, কদমতলে ॥ কালিয়া বাঁশির সুরে যায়েছিলি সরবরে, কালিয়া বাঁশির সুরে আমার মন ত মানে না, ভাব করে ভাব রাখলি না রে ॥ বাঁশি কি মস্তুর জানে, বাঁশের বাঁশি কিবা জানে গ সখি বিঁধিছে হিয়ায়, দিবানিশি গ আমার জাগিছে হিয়ায় ॥
- ৭৯-৮২ **বসন্তহরণ-প্রসঙ্গ :** নন্দের বেটা বড় ঠেঁটা লাগাল্য বিষম লেঠা বসন নিয়েঁ উ'ঠল কদমে, কইসে রাখব ভরমে ॥ যত সখি ঝিলিমিলি যবুনা সিনাতে গেলি, গায়ের বসন লিল চুরি করি, সখিরা সব জলের ভিতর লাজে মরি ॥ ভারি গাছোয়াল হয়েঁছে রে তরই গপাল, সখীদের লুঁগা লুটো ফরকো উঠেঁ অই কদমের ডাল ॥
- ৮৩-৮৫ **কুটীলা-প্রসঙ্গ :** খাম তর ভা'ঙব টিটলি, দাদা আলে কইেঁ দিব সকলি ॥ দাদা কি ব'লব তরে, শ্রীরাধিকার গুণের কথা পাবে



ব্রজপুবে। সকাল বেলা জলকে গেলে ঘব ঘুরে রাই সক্ষ্যা হলে  
কদমতলায় ডাঁটাই থাকে কালা দে'খবাব তবে, কালার সাডা পালে  
পরে কে বাথে দাদা রাহকে ধবে কদমতলায়... ॥ যবুনার জল  
যাতে তলে তাতা বালি বে, ললিতা, গা'ল দিছে ননদ বিবালি ॥

৮৬-৯০ **বংশী-প্রসঙ্গ** : অকাতে বন চালা কানা কদমতলায় করে থানা,  
মাবাং বুরু বাঁশবি বাজায়, কি দিলে মিলিবে শাম বায় ॥ আহলে  
বিনদ রাজ মুখেতে না কব লাজ, শাম নাগব বলিযে ডাকিব, দে হে  
তুমাব বাঁশিটি বলাব ॥ আউল আউল বেণী অভিমানে বসে ধনি,  
বাঁশেব বাঁশি কি জানে বেদন গ, বাজুক বাঁশ জুডাক জীবন ॥  
আমাব বচন বাথ নটবব বেশ ধব নারীবেশ থুল অঙ্গ হতে, হাবিলে  
হার লিব জিতিলে মুবলী দিব তবে ত মুবলী দিব হাতে ॥ শুকনা  
বাঁশেব বাঁশি বাজিছে বিশাল, ঘবে না ঠহবে মন কি হলা জঞ্জাল ॥  
শুকনা কাঠেব বাঁশি বাজে ঝঞ্জকাব. ঘবে না ত বহে প্রাণ কি হলা

৯১-৯৭ **অভিসার** : কুপায় যাছ গ হল'দববন ধুতি কমবে গুঁজল বাঁশি,  
বাঁদ ঘাটে পথ'ব ঘাটে না বাজাও বাঁশি, কলসী কাঁথে আসি,  
কলসী বাখে হাসি ॥ কালাচাঁদ যখন বাজায় বাঁশি কাঁচ কদমের  
তলে, তখন আমি বন্ধনে বস্বেছি। বাঁধাবাটা ছাডো দিযে  
যাথ যবুনাতে, সখি কাজ নাঠ পিবিতে ॥ চল সখি জলকে সেই  
কদমতলাকে, দেখবি যদি ধনি নীলকমলকে ॥ চল ধনি জলকে  
জুডা কদমতলাকে, শামেব বাঁশি না বাজিলে না ঘুবিব ঘবকে ॥ শামে  
বাজালে বাঁশি তখন আমবা জলকে আসি, বাঁশি বাজাতে বারুণ  
কর, বাঁশি বাজালে হবে সর ॥ বনেতে বাজিল বাঁশি মনেতে  
লাগিল খুশি, ঝাঁগল চিডা মাখায় ঘটি পানী, বঁধুয়ার গুণ আমি  
জানি ॥ কাল জলে গেলে বাখে হহযে পুবেশ, কেনে ভিজা গায়ের  
বসন কেনে ভিজা কেশ। যবুনার ডেউ দেখ্যে আমবা ভয়ে মবি,  
ভিজল গায়ের বসন ভা'ঙল কলসী ॥

৯৮-১০৬ **বিপ্রলদ্ধা-খাঁণ্ডিতা** : কাল কাল বল না কাল জলে নাম না, কাল  
জলে হে'ল মাব না ॥ কাল বসন না পরিব কাল মুখ না হেরিব কাল  
জলে কেমনে পার হব ॥ তবে কেনে বেশ কর প্যাবি আজি ন;

আসিবেন হরি, যায়েছিলম গ আমরা বুলিতে নগরে, দেখে আলাম  
 চন্দ্রাবলী ব ঘরে । শুয়েছিল গ তারা পালঙ্ক উপবে, দুজনতে গ  
 তারা নানা খেলা করে ॥ ভোব সকালবেলা ঘুমাই উঠে বাজবালা,  
 আঁখি ছুটি তুলতুল মুখে নাই তাব কথা, ঘুবো যাতে বল গ লালিতা ॥  
 শুন হে কপট বঁধু বাসি ফুলে নাই হে মধু কার কুঞ্জে কবো আলে  
 খেলা, বাসি হল্য ফুলমালা ॥ শাম র'হল আ'ঙনায় বসিয়ে',  
 উঠে যাতে বল তদেব শামকে আসিয়ে' ॥ শাজে ফুটিল ফুল  
 সকালে মলিন, কার কুঞ্জে ছিলে বঁধু হল্য এত দিন ॥ কাল কাল বল  
 না কাল চুড়ি পব্হ না কাল চুড়ি ছেঁচিয়ে ভাঙিব, কাল রূপ আব না  
 হে বিব ॥ ভোব সন্ধ্যার বেলা আহল চিকণ কালা, আঁখি ছলছল  
 মুঁহে নাই কথা, ঘুবো'ই যাতে বল গ লালিতা ।

১০৭-১২৪ **বিবাহ :** আষ বে সুবন ব'লব কথ হৃদয় মনেব কথা বে, আমা  
 কেনে না আইল রসিকা ব' দিয়া । যখন শামেবে মনে পড়ে আমার  
 ইচ্ছবি বিচ্ছবি উঠে হিষ' ॥ উড় উড় কবে মন কত সইব জ্বালাতন,  
 কাঁদে প্রাণ নিবলে বসিয়ে', গেল কা'লা কুলে কালি দিয়ে' ॥ গলে  
 বনফুল মালা দেখে চিকণ কালা বামে চূড়া হেলাস্তয়ে' আছে, দেখা  
 হলে ব'লবে আসিতে ॥ কাঠকেব বিদেশী তবা মথুবাতে যাবে  
 পাবা, শাম নাগব গোছ মথুবাতে, দখা হলে ব'লবে আসিতে ॥  
 চলিতে চবণ বাঁকা বাঁকা চূড়া বামে হেলিছে, দেখা পালে ব'লবে  
 আসিতে, মহন মুবলী তাব তাতে ॥ ছিল রাগাল হলে বাজা বিষয়  
 বড ভারি, মথুবায় বাজা হলে কুবুজা স্তনবী । অ তাই বলি গ,  
 যাবে কি না যাবে ব'শীধারী ॥ ছিলে ছিলে বঁধু ছিলে আমার  
 পবদেশে যায়ে হলে কাহাব, আষাডেতে ববিষা শরাবণে নদিয়া,  
 নাই আলা আমার শাম শুক বঁধুবা, কই আলা আমার শাম শুক  
 বঁধুয়া ॥ যবুনাতে জলকে গেলে কিসেব কাঁদনা পায় গ, বাঁদিস না গ  
 ভাবিস না তব শাম আনিতে যাই ॥ যবুনাব জল আ'নতে গেলে  
 পিছলে পড়ে পা, মনে পড়ে, আমার নিষ্ঠুর বঁধুয়াব কথা, মনে পড়ে ॥  
 লকে বলে কাল কাল কালই আমার ছিল ভাল, কাল বঁধু কন পথে  
 গেল, জীবন যৌবন কাঁদাইল ॥ যেমনি গ পুন্নিমাব চাঁদ তেমনি  
 ছিল আমার শাম, শাম আমার কুথায় চল্যে গেল, আল ঘর আঁধাব

হয়ে গেল ॥ মুড়কাটা নাং-এর বেটা কপালে মাণিকের ফটা মোরে ছাড়্যে মধুপুবে গেল, জীবনে ঘোঁবনেই দাগা দিল ॥ শাম বিনে গ আমার বিঁধিছে হিয়ায়, শামকে আমার আন্তে দে তরা য' গ মথুরায় ॥ কাঁদিব কাঁদিব সখি বিরলেতৈ বসিয়া, শেষে প্রাণ তেয়াগিব শামের নাম ধরিয়া ॥ আম পাণ্ডের শিবে শিরে কাজলেরই লেখা, কন্ পথে গেলে শাম নাই হলা দেখা ॥ একে ত অবলা নারী প্রাণে ধৈর্য ধ'রতে নারি প্রাণ দহে মদনের শরে, সখি রে, কেমনে রহিব শূন্য ঘবে ॥ গত হলা কতদিন এই কি আসিবার চিন, কা'ল বল্যে নাগর আমার গেছে, বঁধুয়াকে বাঘুয়ায় ধবোছে ॥ পথে ঘাটে দেখা হলে কালাচাঁদে দিবে বলো যদি কবু আসে কদমতলে, শামকে সাজাবই বনফুলে ॥

১২৫-১২৮ **মিলন** : কালিয়া কালিয়া বলি কালাব লাগ্যে বুব্যে মবি, আলা কালা র'চল বা'ত ঘবে, পিবিতিব দাগ লা'গল চাদবে ॥ লীলপাতা তফলতা হিয়াব মাঝে, আ'জ লৌতন খেলা খে'লব হে শাম কালিধাব সাথে ॥ হবষিতে বিনদিনী আধা আধা কহেন বাণী, কত না সুখ মুখ দরশনে, প্রথমে মিলন হয় নখনে নখনে ॥ আমি হে কুসুমকলি তুমি হে ত বনমালী, তুমাব প্রাণসুতায় আমাব মন-সুতায় মালা গাঁ'থব গাঁ'থব, দুজনে মিলে ব'হব ॥

ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে বামায়ণ-প্রসঙ্গ যথেষ্ট পবিমাণেই লক্ষ্যগোচর হয় । সাধাবণতঃ করমনাচের গান, টুসু গীত, ছো নাচের গান এবং রিয়েব গীতেই বামায়ণের উপকরণ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় । বামায়ণের উপকরণের জন মানসে ব্যাপক প্রভাবের একটি কাবণ হতে পারে—কৃত্তিবাসী বামায়ণের বিপুল জনপ্রিয়তা । ঝাড়খণ্ডে বামায়ণ পুঁথিব চল বিপুল পবিমাণে ছিল বলে মনে হয় । কৃত্তিবাসী বামায়ণ আপামর জনসাধারণের হৃদয়হরণ কবেছিল । এখনো ঝাড়খণ্ডে বহু শাঞ্চলে গ্রীষ্মেব দুপুব বেলা এবং সন্ধ্যাবেলা বামায়ণ বামায়ণ-প্রসঙ্গ পাঠেব আসব বসতে দেখা যায় । সে তুলনা'র কাশিদাসী মহাভারত ঝাড়খণ্ডে তেমনটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি, মনে হয় । কারণ লোকায়ত গানে মহাভারত-প্রসঙ্গ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি । ঝুমুর-কবির ঝুমুরে মহাভারতের কিছু কিছু উপাখ্যান পালাবদ্ধ করেছে মাত্র । বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাবের ফলে বামায়ণের জনপ্রিয়তা—এমন কথা বলা যায় না । তাহলে

বৈষ্ণবদের উপাস্ত দেবতা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মহাভারত জনপ্রিয় হল না কেন? আসলে বামায়ণের কাহিনীর আবেদন মহাভাবতের কাহিনীর চেয়ে তীব্রতর, কাহিনীতেও খুব বেশি জটিলতা নেই। সীতা যেন ঝাউখণ্টী জনতার সমস্ত সহানুভূতি, মমতা তাব প্রাতি আকর্ষণ করেছিল। লোকগীতের বামায়ণ-প্রসঙ্গ কথাগুলো বিস্তারিত কবে দেখলেও দেখা যাবে মানবিক আবেদনে-ভরা নাটকীয় মুহূর্তগুলোই গীতবিন্দু হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকগীতির মধ্যে নিবন্ধ বামায়ণী কথাগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বামায়ণের কাহিনীটি যথাসম্ভব গড়ে তুলে দেখানো হল।

১২২-১৬৫ বাব বচ্চব অনাবিষ্টি জনক রাজাব দেশে। দিনে-দিনে মনে-মনে জনক বাজা ভাবিতে লাগিল। তখন মুনি-দেবস্তা বব যে দিলেন। যদি বাজা লাঙল চব বৃষ্টি যে হইবে। মনে কন চিন্তা কব না বৃষ্টি যে হইবে। লাঙল চবিলে বাজা বৃষ্টি যে ববষিবে। শুন শুন শুন মুন বলি গ তুমাৰে। আমবা হছি বাজবংশ লাঙল না চষি। শুন শুন শুন বাজা বলি এক কথা। কবু যদি না চষ লাঙল আ'জ চষিতে হবে। তখনি জনক বাজা লাঙল ধবিল। এক বেটা ঘুবালা দুই বেটা ফুবালা। তিন বেচায় উষ্টি গেল সীতার সিদ্ধুক। তখন জনক রাজা সিদ্ধুক খুলিল। সিদ্ধুক খুলিয়া দেখে আচ্চা সীতা কন্যা। একমনে জনক বাজা কলেতে লইল। একমনে বলে জনক কার কন্যা বটে। তখনি মুনি-দেবস্তা আর বব দিলেন, কাব কন্যা লহে জনক তুমারি অদিষ্টে ছিল। এই সীতা কন্যা তখনি জনক বাজা কলেতে লইল। কলেতে লইয়া বাজা গেলেন নিজ স্থানে। তখনই মহলেব লক করে ছিছিক্কারি। শুন শুন শুন বানী কবি এই বাণী। চণ্ডালেব নাই চুয়াডেব নাই আমার অদিষ্টে ছিল এই সীতা কন্যা ॥ তখনি মহলে বানী পালঙ্ক বিছনা কবিল। লকলক্ষব বাজবাজনা করে'য় মহলে লেগিল। দিনে দিনে সীতা কন্যা বাড়িতে লাগিল, তখনি জনক রাজাব চিন্তা যে হইল। কি হল্য কি হল্য বানী আমার কপালে, উপযুক্ত কন্যা আমাব বহিল মহলে। তখনি মুনি-দেবস্তা আর বব দিলেন। কেনে বাজা ভাবিছ কন চিন্তা কব, পেছুক ভাঙা পণে ইয়াব হবেক বিভা দান। সেই শুন্তো বাবণ বাজা আটল

ধাইয়া, চল মামা সঙ্গে চল পাব কন্যা দান। আশি হাতের বাঁশ ভা'গনা বিশ হাতের কাঁড়, সে ধেহুক না ভাঙিলে না পাবে গ দান। তখনি রাবণ বলে শুন মামা বলি, কৈলাস ভাঙেছি মামা ধেহুক ভাঙিব। আশ্বে আশ্বে রাবণ রাজা যাইয়ে ডাঁঢ়াল্য। চা'র ধারে লকলঙ্কর মধ্যতে ধেহুক, যত শক্তি লাগায় রাবণ লাড়িতে না পারে। আড় নয়নে সীতা কন্যা চাহিয়ে দেখিল, ই বর মোর যগা না হইতে পারে। তখন বাবণ রাজা বলিতে লাগিল, কন্ কন্যা দানে দিছ দিহ ন আমাবে, যাত্রাকালে ধেহুক ভাঙে যাব নিঙ্ক ঘবে। তখনি জনক রাজা বলিতে লাগিল, শুন শুন রাবণ বাজা বলি গ তুমারে। মুনির বর-দিয়া ধেহুক-ভাঙা পণ, মুনির বাখ্য রাজা না কব লজ্জন। তখনি রাবণ রাজা গেল নিঙ্ক ঘরে। তখনি জনক রাজা ভাবিতে লাগিল, কি হল্য কি হল্য বিদি আমার কপালে, উপযুক্ত কন্যা আমার রহিল মহলে। তখনি মুনি-দেবস্তা আর বর দিলেন, কেনে রাজা ভাবিছ কেনে চিন্তা কর, সীতার যগা বব যে এখন নাই আসে। তখনি জনক রাজা ছাড়িলেন চিঠি, সে চিঠি পড়িয়ে গেল দশরথের হাতে। তখন দশবথ রাজা ধাইয়ে আইল, রামকে কলে নিয়ে ধাইয়ে আইল। আসিয়ে ডাঁঢ়াল্য দশরথ ধেহুকের কাছে। চা'রধারে লকলঙ্কর মধ্যতে ধেহুক। তখনি দশরথ বাজা বলিতে লাগিল, দিহ ন আন সখক্ষী তর কন্যা মোরে দিহ দানে। তখনি সীতা কন্যা আড় নয়নে চাহে, ই ত বর মোর যগা হইতে বা পারে। তখনি রাম ডাঁঢ়াল্য ধেহুকের কাছে, বাঁ হাতের এক আঙ্গুল লাগাল্য ধেহুকে। এক অঙ্গুলিতে ধেহুক করে খান খান, দশরথের পুত্র রাম পালেন কন্যা দান। কন্যা দান দিলে রাজা দেও মোরে বিদায়, যাহা দিতে হয় দেও দেও কন্যা বিদাই। তখনি জনক রাজা সাজিতে লাগিল, লকলঙ্কর হাতি-ঘড়া সাজন সাজিল। মহলের ভিতর রানী করিছেন রদন, এই যে যাইছ সীতা কবে যে কিরিবে। এক মুষ্টি কাঁকাল সীতাব সনার বরন দেহ, চরণের অঙ্গুলি সীতার হিঙ্গুল বরন। কেমনে ভুলিব সীতা তুমার বদন, কত যে তপিষ্টে সীতা পায়ছি তুমাকে। রাজার মহল সীতা শূন্য করো

যাবে, রামকে পায়েছ সীতা আর কি রহিবে। রাম হল্য মোর গুণের নাগর রাম হল্য মোর স্বামী, রাম হল্য মোর নিজের পরভূ আধা অঞ্জের ভারি। আর কি রহিতে পারি মা বাপের মহলে, যা দিতে হয় দিহ মা গ বিদাই দিহ আমারে। যাত্রা কবো বিদাই দেখ মা যাই গ নিজের ঘরে ॥ ( বিয়ের গীত )

অ রামেন মা অ রামেব মা রামের বিভা দিলি নাই, রামের বিভা জনকপুরে জনক রাজার বিটিকে ॥ জনক রাজায় পণ করিল হাতে লে রে গণ্ডীর বাণ। এ গণ্ডীর বাণ যে ভাঙিবেক তাকেই দিব সীতা দান ॥ রাম ন কি রে রাজা হবি আ'জ ন কি তর অধিবাস, চৌকাঠেতে লেখা আছে চ'ন্দ বছর বনবাস ॥ কি সত্য করিলে রাজা কৈকেয়ীর সনে, রাজ্য ছাড়ি রাম লক্ষণ চলিলেন বনে ॥ রাম লক্ষণ বনে যায় সত্যের পালন, দুয়ারে ডাঁঢ়ায়ে দেখে কপাটে লিখন ॥ রাম যাবেন বনে রে লক্ষণ যাবেন বনে. জনকনন্দিনী সীতা সেহ যাবেন বনে, কত দুঃখমনে ॥ শুন মাতা ঠাকুরানী রামে কহিছে বাণী আমার লাগি না কঁাদ মা অকারণ, আমি মা ত চলিলাম বন, সাথে যাবে ভাই ত লক্ষণ, অ মা না করিহ রদন ॥ ভরতকে রাজ্য দিয়ে রাম গেলেন বনে, কঁাদেন রাজা দশরথ রঘুনাথ বিনে ॥ হাতিশালে হাতি কঁাদে ঘড়ায় না খায় পানী, অযধ্যা ভিতরে কঁাদে কশল্যা জননী। অ আমার রাম কুথায় গেলি রে, অযধ্যা নগর শূণ্য হল্য ॥ হাটে কঁাদে হাটুল্যা বাটে কঁাদে বাটুল্যা, মহল ভিতরে কঁাদে বড়রানী কশল্যা ॥ আশুয় আশুয় রামচন্দ্র পিছনে লক্ষণ, মধ্যখানে সীতারানী করিছে রদন ॥ আর কি প্রাণে ধৈর্য ধরা যায়, সে ত রামসীতা বনেতে যায় ॥ অ রামের মা অ রামের মা রামের কিবা দুখদশা, বস্তুর বিনে গাছের বাকল তেল বিনে মাথায় জঁটা ॥ সগগে শিম'ল ফুল ছিল যোল যোজন বাস গেল, সীতার সাক্ষী মিছা হল্য ভমরে ত্যজ্য দিল। সীতার শাঁপ লাগিল, সুগন্ধ ফুল নিগন্ধ হয়ে গেল। নাককান কাটা সূৰ্পনখা রাবণকে যাই দিল দেখা, গ গুড়ি হায় হায়, শুন ভাই দশানন লঙ্কেশ্বর দশানন, সুন্দর বমণী এক গহন কানন ॥ পঞ্চবটী বনে রাম বাঁধে কুঁড়্যা খানি, কাল দবে আল্য এক সনার

হরিণী। লক্ষণ ধর্যে দেও ভাই, সনার হরিণী আমায় ধর্যে দেও ভাই ॥ হংসগমনে চলে কপালে মাণিক জলে, রঘুবর, হরিণ ধরিয়ে দেও মোরে ॥ পিতৃসত্য পালিবারে রাম গেলেন বনবাসে, কাননে হেরিল সীতা রাবণ রাক্ষসে, হায় কপালের দখে ॥ অশোকবনের পাতে কুণ্ডল ভিক্ষা দেও মা জননী, আমি ভিক্ষা দিব নাই হে ঘবে নাই রাম রঘুমণি ॥ ভিক্ষা দাও জননী, ভিক্ষা দিলে চল্যে যাব এখনি ॥ আইল রাবণ রাজা যগী ভেঁশ নিয়ে'রে, দুয়ারে বসিয়ে' রাবণ ভিক মাগিছে। ভিক নাহি লেই রাবণ দুয়ার না ছাড়ে রে, হাতে হাতে রাবণ ভিক মাগিছে। হাতে হাতে ভিক দিতে টানিয়ে' চাপালা রখে, বাবণ লঙ্কাব মুখে ছুটাইল রথ। হবিল রাবণ সীতাবে হরিল রাবণ, শূন্য ধরে পায়ে সীতা হরিল রাবণ ॥ হাতে হাতে ভিক দিতে টাঙে উঠালা রখে, রথ উড়িল বিনা শূনে, কাঁদেন সীতা বগ্ননাথ বিনে ॥ অশোকবনে পাতে কুণ্ডলসীতায় পাশা খেল্যেছে, যগী ভেঁশে রাবণ আস্যে সীতায় চুবি কর্যেছে ॥ কুঠি শূন্য হেরি, অ ভাই লক্ষণ কুথায় কন্যা স্তন্দরী ॥ সীতার অঘেঘণে, লঙ্কাপুরী গেল হনু দক্ষিণে ॥ ডালে ডালে হনু চলে বাদরের কি গা জলে, লেজে কর্যে অগ্নি তুল্যে লঙ্কাকে ডাহান কবে ॥ সীতা চুরি করিস বাবণ রাখবি রে যতন করে', দেখবি দেখবি সনার লঙ্কা দিব রে উহন করে' ॥ রাবণ দেখব তরে, সনার লঙ্কা রাখবি রে কেমন কর্যে ॥ এতটুকু হনু গিলা নদা নদা পেট, অ বাছা হনু রে, সাগর ডেজিতে মাথা হেঁট ॥ পব নারী, বাবণ নাই তব ভয় বে। আন্যেছ রামের সীতা কি কবিবে ইন্দ্রজিতা, রাবণ, লঙ্কাগড় করে টলমল ॥ শুন অছে প্রাণনাথ তুমারে বুঝাব কত, পরনারী কেনে কর চুরি, ফিবায়ে' দাও রামের স্তন্দরী ॥ সিংহাসনে বসে বাম ধাবেতে লক্ষণ, মধ্যেতে জানকী সীতা সাজ্যেছে কেমন ॥ রাম ছাড়্যেছেন যজ্ঞের ঘড়া তপবনেতে, লবকুশে নৈধ্যে রাখে দুখিলতাতে ॥ রাম ছাড়্যেছে যজ্ঞের ঘড়া তপবনের সে ধারে। লবকুশে ধব্যেছে ঘড়া সীতা বলে দাও ছাড়্যে ॥ অ বাম খেছকধারী, বনের মাঝে কেমনে ধৈর্ষ ধবি ॥ অরুণবনে তরণ লতা গ তার তলে সীতার বনবাস, সীতা যে কাঁদে মা লর নাহি পুঁছে গ সামটি না বাঁধে নবীন কেশ ॥

## গ্রন্থপঞ্জী

বৃহৎ সংহিতা—বরাহমিহির  
মার্কণ্ডেয় পুরাণ  
ভবিষ্যপুরাণ  
ধর্মমঙ্গল—রামকান্ত রায়  
রূপবামের ধর্মমঙ্গল—ডঃ শুকুমার সেন সম্পাদিত  
শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ  
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বড় চণ্ডীদাস  
লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
ভাষাবৈজ্ঞানিক—ডঃ শুকুমার সেন  
ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্ধভাষা—ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাত্তা  
বিচিত্র শ্রবন্ধ—ডঃ শুকুমার সেন  
বাংলা সাহিত্যের কথা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়  
বাংলার লোকসাহিত্য (১ম—৩ষ্ঠ খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য  
লোকসংগীতরচয়িতা (৩য় খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য  
সীমান্ত বাংলার লোকসাহিত্য—ডঃ শ্রীকুমার কবণ  
বাংলাদেশী লোকভাষার গান—ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাত্তা  
বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি—শ্রীরাধাগোবিন্দ মাহাত  
পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য—শ্রীমুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়  
পূজাপাষণ—যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি  
ব্রহ্ম ও আচার—প্রফুল্লচন্দ্র জেবতী  
শুকুমণ্ডির ছড়া—যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত  
বাংলাদেশের ছড়া—ভবভারতী দত্ত সম্পাদিত  
আদিবাসীর কণকথা—শঙ্কীশ মুখোপাধ্যায়

মুর্বিবারের স্বাধীনতা—কলকাতা,  
চতুর্দশ—কলকাতা  
মথুরা—কলকাতা,  
পুকলিয়া (টুঙ্গ সংখ্যা)—পুকলিয়া,  
ছত্রাক—পুকলিয়া  
টুঙ্গ স্মারক—চাকুলিয়া

Delhi Sultanate (Vol. VI)

History and Culture of the Indian People—Cambridge History of India

History of Bengal and Bihar through Ages—Dr. Qanungo

Chhotanagpur Raj—P. B. Chakraborty

Manbhum District Gazetteer—(1911)

Mundas and their Country—S. C. Roy

Aboriginals of Central India—B. C. Majumdar



- Aborigines—so-called and their future—Prof. G. S. Ghurye  
 Descriptive Ethnology of Bengal—E. T. Dalton  
 The Bhumij Revolt—Dr. J. C. Jha  
 Religion of the Semites—Dr. Cook  
 Primitive Religion—Sir E. B. Tylor  
 The Golden Bough—James Frazer  
 Ancient Art and Ritual—J. E. Harrison  
 The Origin of the Family the Private Property and the State—F. Engels  
 Encyclopaedia Britannica—14th Edition 1932  
 The Outlines of Mythology—Lewis Spence  
 The Companion Guide to World Literature—Mentor Book  
 The Sacred Wood—T. S. Eliot  
 Folklore of Santal Parganas—C. H. Bompas  
 The Folktale—Stith Thompson  
 Indian Fairy Tales—Maive Stokes 1880  
 Romantic Tales from the Punjab—Charles Swynnerton  
 Oriental Proverbs—Ed. Dr. Mahadev Prasad Saha  
 Oral Literature in Africa—Ruth Finnegan  
 Memorandum to S. R. C—Kurni Panch of Chhotanagpur 1956

মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড—গোরখপুর

প্রাঙ্কমৌর্য বিহার—ডা. দেবসহায় ত্রিবেদী

মুঘল সম্রাট হুমায়ূঁ—ডা. হরিশংকর শ্রীবাস্তব

নাগপুরী ভাষা আৰু সাহিত্য—ডা. শ্ৰবণ কুমার গোস্বামী

ছোটানাগপুর-সাঁতাল পরগণা কুর্মি-মহাসভা স্মারিকা

## নির্বাচিত শব্দসূচী

অবাই : বমি ।

ঔচাল : ঔচল , কৌচড ।

অদা : অর্দ্র, ভেজা ।

অধন < ওদন : ভাতের জল ।

অকন : বন ।

অলমা : অ'লস্থিত ।

অসঠা : অসহ ।

অহীবা : গোশাল ।

আউদান : বিনাশ , খতম ।

আওয়া : আতপ ।

ঔকছুয়ার : ফটক , সদব দবজা ।

আগনী : আঙিনা ।

আগাল : বাঁধের ওপর দিকের সংকীর্ণ  
অংশ ।

আগসাব : অগ্রসব ।

আগুড : আগল, কবাট ।

আগামদিগাম : অগ্রপশ্চাৎ ।

আঘা : ক্ষুণ্ণিরন্তি হওয়া ।

আটুপাটু : তাডাতাড়ি ।

ঔটাটা : সংকুলান হওয়া ।

আড্টি : ভোজে যারা পবিবেষণ  
করে ।

আটা : আদেশ করা ।

আদাশী : প্রার্থী, আন্দোনকারী

আনলা : আনুনি ।

আফাই : বি দ, সংকট ।

আবাণ কাল : ছেলেবেলা ।

আমঠা : স্কাশয় ।

আমানি : বাসি মাড় ।

আজা : অজন করা ।

আলতি : বচ ।

আল'চাল, ধাল : আতপ চাল, ধান

আলাপালি : পালা ববে ।

আলা'আলা : আলো'আলো ।

আশাব : আশ্রয় ।

আহড : আডাল ।

ইচলা, ইচলি : চিংড়ি মাছ ।

উইমেকা : উই-এব বাসা ।

উকুবুকু : হাবুড়বু ।

উখাডুবা . তুলকালাস, উদাম ।

উচন-পিঁধন : আবরণ- বিধান ।

উনহান : উনোন ।

উফ'ল : লাফ ।

উলটবাজি : ডিগবাজি ।

উলখী, উলুখী : উক্কি ।

উশাস : অসখসে, তালকা মাটি ।

এডি : গোড়ালি ।

কদ : শস্যবিশেষ ।

কডার : প্রতিশ্রুতি ।

কচা : সংবর্ধ জমি ।

কববরি : দাগাবাজি ; ফুলবিশেষ ।

কজ্জি : কলজে ।

কপ্তী : ঘুঘু ।

কল্গা : পালক ।

কশলা : কফট ।

কম্ভা : বেগুনী ।

কটোরা : বাটি, পাত্র ।

কঁকই : চিকনি ।

কাড : ভীব ।

কাব্বা : বলবণ ।

কাললা : কবলা ।

কাল্হা : ঠাণ্ডা ।

কাডা : পুকষ মোষ ।

কাঠাড : গোমালের বেড

বাকাদচাং : কডকডে ওবনো

বাসাড : তাছাড ।

কানা : ফুটো , অন্ধ ।

কাথি : নদীপুকুবেব বিপাংবা ।

কামিলা, কামলা : স্বর্ণকাব ।

কামিন : নাবাশমিক ।

কাম্বিকুম্ব : নাবালক শিশু ।

কুণ্ডল : কুটিব ।

কুন্দবী : তেলাকুচা ।

কুইলা : কালো ।

কুড্যা, কুটী : আলসে ।

কুট্যা : মাংসের টুকবো ।

কুডা : খনন কবা ।

কুইলী, কুইলিনী (স্ত্রীং) : কোকিল ।

কুল্হি : গাঁয়ের পথ ।

কুচি : ক'চা ।

কুথি : ডালবিশেষ ।

কেডরু : মোষ বাচ্চা ।

কেঁহু : কেন্দু, বুনো ফল ।

খঁচল : কোঁচড ।

খঁচ : মজয়ার রস্তু ।

খতডা : গোববগাদা ।

খঁদ : শস্য ।

খখব : জাং . ফোঁপরা ।

খজ : খেঁজ

খঁচা : খোচ , তেল ।

খবখস্যা : কর্বশ , বস্ম'হী ।

খঁজা : জোডা দেওয়া ।

খঁমা : খোঁপা ।

খব : বান ।

খাং : পাং

খা'মচা : মুঠো ।

খাচবা : অনাচ্ছ দিও, বিছান'হাঁন

খাঁক : বঙ্গদেশ ।

খাজাডি, খেজাডি : মুড়ি ।

খাটালি : খাটুনি মজুবগিবি ।

খাতা : পর্ডাক, দল ।

খালা : দোনা, ঠোঙা ।

খাঁডা : ২৬ কান্তেব টিল ।

খাঁডা : দাঁচা ।

খিজা : কঁদা ।

খিব : গাছেব আঠালো বস ।

খিষা : ক্ষয় পাওয়া ।

খুকডী : ব্যাঙেব ছাতা ।

খুঁদা : মুখে খুঁষি মাবা ।

খুরা : খাটের পায়া ।

গুনুস : হজুহাত ; সুযোগ ।	গুজুক : ছোট, সক ।
গেঁচবা : খোঁচা দেওয়া ।	গুলা'চ, গুলা'ত : কাঠগোলাপ ।
গেড : ঘাসবিশেষ ।	গুবা : ছোট পুকুর ; ডোবা ।
গেঁটন : পেটভাত, খাওয়া-দাওয়া ।	গুডা : পিটানো, বাজানো ।
গে চড়া : বদবাগী ।	গুলিন : গৃহস্থামিনী ।
গেটা : খবগোশ ।	গুটা : মাদী গক ।
গেডা : সঙ্গী, সহ-খেলোয়াড় ।	গেডা : বেঁটে ।
গে ডী গুঁদলী : শস্যবিশেষ ।	গেঁটা : গেঁটা, শামুক ।
গেওব : শবাব, শক্তি ।	গো'ড : গোয়ালো ।
গেডবডি : পলায়ন ।	ঘ'ড : ঘড়া ।
গেঁডরানি : লাগি ।	ঘ° : রক্ষিত-বাবক > এ আব'বগী ।
গেটই : নেঠা মাছ ।	ঘংটা : ঘোমটা ।
গেমলা : বাগী পুণিমা ।	ঘাঘব : পাখিবিশেষ ।
গেজধপ : অথব ।	ঘুসুব : শকব ।
গেভবি : পেটের অপবিক্ক ভুজুদ্রবা ।	চখা : শানানো, পান'ল ।
গেজ : কৌণিক ।	চপা : পোশা ।
গেজ্ : খিল ।	চ'ঘ'বা : চমুকে চুমুকে খাওয়া ।
গেলা : গৃহস্থামী ।	চাওলা : মাডাশখ ।
গেগান : উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করা ।	চাকাটা'দা : গোলকপাখা, হতভম্ব
গে'ডব : সজনে গাছের পোকা ।	চাচব : কুঞ্চিত ।
গাদব : ডাঁশা, আধপাকা ।	চাড : অভিমান ।
গাইদ : গানা, প্রচুব ।	চাডমাড : তাডাতাডি ।
গাডা : পোঁতা ।	চাট্টু : হাতা ; তাওয়া ।
গাটা : গর্ত ।	চাব'কি : ঘনুসি, কোমরদডি ।
গাড্যা : ছোট পুকুর, ডোবা ।	চিডড : বুশোলতা ।
গাদাবগুঁদুব : নিয়কণ্ঠে কথাবার্তা ।	চিমটি : পিঁপড়ে ।
গিজ্‌ডা : দাঁত বের করে হাসা ।	চিটা : আঠালো ।
গিলাপ : চাদববিশেষ ।	চিপা : পিষ্ট কর ।
গুঁদলু : শস্যবিশেষ ।	চু'খা : কুয়ো ।
গুডরু : বেঁটে ।	চু'চ্যা : নে'টি ইঁদুব ।

চুটি : হাতে-পাকানো বিড়ি ।	ঝড়া : ঝরা ।
চুহা : চোষা ।	ঝরিঝম্পা : গহনাবিশেষ ।
চেকা : টক ।	ডহর : রাস্তা ।
চেন্দড় : ভীতু ; কাণ্ডজ্ঞানহীন ।	ডঁগা : ছোট নৌকো ।
ছঁচ : গোবর জল ।	ডঁডা : কালো পিঁপড়ে ।
ছচরা : লোভী ।	ডাঙুয়া, ডাঁগুয়া : অবিবাহিত ।
ছঁড : অনাথ শিশু ।	ডাং, ডাঁগ : লাঠি, দণ্ড ।
ছাতু : ব্যাণ্ডের ছাতা ।	ডাঁড়ি : হাতল ; দণ্ড ।
ছাহা, ছাঁইরা, ছাঁহিরা : ছায়া ।	ডাংরা ( সা ) : গরু ।
ছাপর : খাপরা ; নিচু ।	ডাঠিন : ডাইনী ।
ছাকড : বাচ্চা ছেলে ।	ডিঁগা : গাদা ।
ছিঁটা : ছেঁড়া ।	ডিংলা : কুমড়া ।
ছিনার : অশালীন ; বেশ্যা ।।	ডুঁড়কা : জলে পুড়ে যাওয়া ।
জঁয়া : কালো বিষ পিঁপড়ে ।	ডুব্কা : অনতি উচ্চ ঝোপের বন ।
জল্গা : তাঁতি ।	ডুমকা : গোলগাল, ফোলা ।
জবরা : আবর্জনা ।	ডেগাডেগি : লাফালাফি ।
জখ্ : মাপ ।	ডডর : গর্ত, কোটর ।
জলঘাট : পায়খানা ।	ডরকা : চোখ জলে ভরে ওঠা ।
জভি : আগাছাভরা জলা জমি ।	ডর রা : ফোঁপবা ; কোটিবগত ।
জাড : শীত ।	ডড়া : নিচু, গত ।
জাঁকা : চাপা দেওয়া ।	ডাডা : লাঠি দিয়ে আঘাত করা ।
জাহিরা : আদব ; দাপট ।	ডাঁগা : দীর্ঘদেহী, লম্বা ।
জিব্ৰপা : খোঁড়া, অথর্ব ।	ডিটলি : ধ্বংসতা, জুফামি ।
জিয়া : জীবন্ত ; বাঁচা ।	ডেঁড : বদমাস ।
জিগির : উৎপাত ; কামনা ।	ডেলকা : ঢেলা, টিল ।
জুঁঠা : ঐটো ।	ডেকা : ভাতের জমাট পিণ্ড ।
জুমডা, জুমঢা : জলন্ত কাঠপণ্ড ।	ডা" বড়া : উপুড় ।
জুরগুণ্ডা : চোরকাঁটা ।	ডাতা : গরম ।
ঝঁট ( ঝঁটমট ) : তাডাতাড়ি ।	ডিরি, ডিরিয়া : স্ত্রী ।
ঝবরা : ঝুঁকে পড়া ।	ডিরিংরিংগা : লম্বা ; বদরাগী ।

তুঁড : মুগ ।  
 খপ্না : খোঁকা ।  
 খড বা : পিচলানো ।  
 খলা : গুচ্ছ ।  
 খান : দেবস্থান ।  
 খানা : দেখা, আশ্রয় ।  
 খুণা, খুতুনা, মুগ ।  
 দলক : দোলা ( ক্রি ) ।  
 দদলি : নবম কাঁদা ।  
 দবজ : বাধা ।  
 দ'স্না : ঠোঁঠা ।  
 দুখা : বাদা কবা ।  
 দুব । গ : সুববাজ ।  
 দৌড়া : বড়ো ডালাবিশেষ ।  
 ধব : শাদা ।  
 মকড, মক্ড়া : পুবনো কাপড ।  
 মস্কা : পসে যাওয়া ।  
 মকা, ম্পা : গুচ্ছ, স্তবক ।  
 মজা : চড়া, শীর্ষ ।  
 মবা : নেয়ে ; নৌজীবী ।  
 মুনা : মাটি খোঁড়া ; গকো গুতো  
 মা বা ।  
 মুমকুম : গাঁটা ; মাবপিট ।  
 মুতি : দূতী, কাপড ।  
 নিচা : নিবেট, নিশিচ্ছ ।  
 নিদা : ঘুমানো ।  
 নিশা : নেশা ।  
 নিশি : মিশি ।  
 নেচী : পাছা, নিতম্ব ।  
 নেগুড : লেজ ।

নেহগা : নিকৃষ্ট শাকবিশেষ ।  
 পইলা : শস্য মাপবাব পাত্র ।  
 পরগল : প্রজ্জলিত ।  
 পরশা : পবিবেষণ কবা ।  
 পলম : বিলম্ব ।  
 পস্না : লাঠি ।  
 পং, পংড়া : চারা, অক্ষুব ।  
 পলা : বিনামূলো, ফোকটে ।  
 পাশাল : বাসি ভাত ।  
 পাঘা : গকবাচুব বাঁধবাব দড়ি ।  
 পাঁছ : পয়েব ছাপ ।  
 পাজা : শান দেওয়া ।  
 পাবা : মতো ।  
 পালই : খেজুব পাণ ।  
 পানহা : বস ।  
 পালতা : পাতা ।  
 পায্না : চিকুনি ।  
 পাণা ( সা ) : মেলা ।  
 পাঁতা : পুঞ্জি ।  
 পানাদ, পিঁদাদ : বাসগহের পেছন  
 দিক ।  
 পিঁধা : পবিমান কবা ।  
 পুতনী : পতঙ্গ ।  
 পুটিক : ছোট ।  
 পুষাতী : অস্ত সত্তা ।  
 পেডি : বাঁশেব তৈরি পেটিকা ।  
 পেঁদ : মিথ্যা কথা ; স্ত্রী জননেন্দ্রিয় ।  
 পেংঘা : পঙ্গু ।  
 ফফশ : ফুসফুস ।  
 ফবফদি : চালবাজি ।

ফরা : ফোঁপরা ।	ভালা : দেপা, তাকানো ।
ফাবড : ঢিল ।	ভালা — ভদ্র : সম্বোধনসূচক শব্দ
ফিঁচা : পাছা ।	ভাবনী : কৃষ্ণিত চুল ।
ফুচি : ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেষ ।	ভাঁওনব : দেপাশোনা, পরিচর্যা ।
ফুলছড়ি : ফুলঝুরি ।	ভুলুক : ছিদ্রপথ ।
ফুলা : ফুলবাবু ; ফুল ধরা ।	ভুনি : দুটাঁশাডি ।
ফুড্রা : দস্ত করা ।	ভেকা : মাছেব টকবো ।
বহাল : আমন ধানের ক্ষেত ।	ভেঁঠর : প্রচ ।
বনি : শালিখ ।	ভেজা : লম্বাবস্ত্র ।
বতর : সময়, সুযোগ ।	মহড়া : চহারা, আদল ।
বঁটা : লাঙলের হাতল ।	মলকা : আনন্দে ছুটোছুটি করা ।
বাউডানি : বিলাপ ।	মাউকা : কৈ প্রহোড় করা ।
বাকুন : বেডাব লম্বা বাঁশ ।	মাগনা : পিনি পয়সায় ।
বাখ'ল : কোঠাবাডি ।	মাদার : আন্ধাবা ।
বাচনী : বাঁচা ।	মাবা' বুক ( সা ) : বড় দরতা ;
বাঁকক : বাক, ভাব ।	কুপা ।
বাখান : গোলি ।	মুসিয়ান : মুখগাজি ।
বাটুলা : পখিক ।	মুড়া : শেষ সোনা ।
বিঁঝা : বীজ ।	মুচা : গাছেব গুড়ি ; ভেঁতা ।
বিচন : বীজ, বীচ ।	মুকন : মণাল ; পদ্ম ।
বিষপিতা : তিজবিতজ ।	মুজি : বীচ ।
বিহান : ভোব বেলা ।	মেচডি : গুঁই-এব ফুলবল ।
বুচা : কোণাভাঙা ; ভেঁতা ।	মেহবালু : স্ত্রী ।
বুতল : ক্ষমতা ।	বঁদ : বেড়া ।
বুদা : অত্যাচার ।	রকা : টাটকা, তাজা ।
বুড়িয়া : কুড়ুল ।	রাডারাম্পা : বিশালাকার ।
বেড়া : জলাজমি ।	রাহেড : অডহব ।
বেসাতি : তরকাবি ।	রাজট : কথাবার্তা, আলাপ ।
ভজকট : কাজের ভিড় ; বাস্ততা ।	রাসি মদ : নিজলা মদ ।
ভং : ফুটে ।	রিজ, রিব : আনন্দ, খুশি ।

বিষ : ঔষধি তত্ত্ব ।

রিচু : কুর্মা তত্ত্ব, চট্টো খেলা ।

বীতক : প্রাণকাল ।

ক' : বেতা বেতা ।

কষ : কষ্ট তত্ত্ব ।

কচা : কচি তত্ত্ব ।

ক' : কক্ষ, ক' ।

ক' : কলনা, কল ।

কলকা : প্রলোক তত্ত্ব ।

কলক : কল ।

ক' : কুলে প' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

ক' : ক' ।

শিশুকাল : খোবন ।

স' : জাগুন জল ।

স' : স্বামী ; প্রিয়তম ।

স' : সঙ্গীসাথী ।

স' : সাবধান, স' সিবাব ।

স' : কৃপণ ।

সাকাম ( স' ) : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

সেগেল ( স' ) : স' ।

সেবেগ ( স' ) : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।

স' : স' ।





## শুদ্ধিপত্র

আছে	পৃষ্ঠা/পঙক্তি	হবে	আছে	পৃষ্ঠা পঙক্তি	হবে
ইয়দা	১১৫	ইয়দা	ইয়ত	১৫১২	ইয়ত
এ জয়'ভূক্ত	১৭১১	এজ্জপী'ভূক্ত	গীত	১৫২১১১	গী.
সম্প্রদায়	১১১১৯	সম্প্রদায়	বোহিত...কপাণ	১৫৮১২৬	কপাঙ্...বোহিতিন
স্বাক্ষর	২২১প'দী.	স্বাক্ষর	বাস্তবানুগ	১৮১১৫	বাস্তবানুগ
নর্বাঙ্ক	৫৫	নর্বাঙ্ক	অসকনবাবস্থাপ	১৮১১১৫	অসকনবাবস্থাপ
কর্বাঙ্ক	২৫১২৫	কর্বাঙ্ক	চ'চ'চ'চ'চ'	১৮১১১০	চ'চ'চ'চ'চ'
প'প'প'	২৮১১০	প'প'প'	পাঠিন...	১৮১১২০	পাঠিন...দিল
১১১১১১১	৩০১১৫	১১১১১১১	১ ম দ	১৯১১১১	১ ম দ
প'প'প'প'	৩৪১৫	প'প'প'প'	সঙ্ক	২০১১১৬	সঙ্ক
প'প'প'প'	৪০১১২	প'প'প'প'	সঙ্ক	২১০১১৭	সঙ্ক
সুভাব	৪১১১২	সুভাব	উদ্য.	২১৮১১৮	উদ্য.
১১১১১১১	৪১১১২	১১১১১১১	ধর্মমঙ্গল	২১১১১১১	ধর্মমঙ্গল
অধ্যায়	৪৫১১২	অধ্যায়	বক্তব্য	২২১১১১	বক্তব্য
১১	৪৫১১৫	১১	নাম	২২৮১১	নাম
প'প'প'প'	৫৫১১১	প'প'প'প'	ক'ক'ক'	২৩১১১	ক'ক'ক'
গোপিনী	৫৫১১৫	গোপিনী	ভা	২৩১১১১	ভা
সদাচরণ	৫৫১১০	সদাচরণ	ক'ক'ক'	২৩১১১০	ক'ক'ক'
প'প'প'প'	৬৮১১৮	প'প'প'প'	গায়ন	২৩১১১১	গায়ন
স'স'স'	১০৪১১২	স'স'স'	অ'অ'অ'	২৪১১১১	অ'অ'অ'
নয়	১১২১১৬	নয়	সুভা	৪৮১১৮	সুভা
১১১১১	১১১১১	১১১১১	ক'ক'ক'	২৫১১১১	ক'ক'ক'
১১১১১	১২০১১	১১১১১	শাস্ত্র	২৫৮১১০	শাস্ত্র
ধর্ম	১২১১১৪	ধর্ম	প'প'প'	২৬১১১১	প'প'প'
১১	১২১১১৭	১১	প্রমাণ	২৭১১১১	প্রমাণ
প'প'প'প'	১৩১১১৫	প'প'প'প'	চ'চ'চ'	২৭১১১০	চ'চ'চ'
বাস্তব	১৫১১১১	বাস্তব	ম'ম'ম'	২৭১১১০	ম'ম'ম'
অ'অ'অ'	১৪১১১৩	অ'অ'অ'	গ'গ'গ'	২৮১১১৫	গ'গ'গ'
ঘাট	১৫১১১০	ঘাট	১১১১১০	১৮১১১৫	১১১১১০
প'প'প'প'	১৪১১১৬	প'প'প'প'	ক'ক'ক'	২৭১১১৬	ক'ক'ক'
Cuntre	১৪১১১৫	Countries	ক'ক'ক'	২৮১১১৩	ক'ক'ক'
১১১১১	১৫১১১৫	১১১১১	প'প'প'	২৮১১১৪	প'প'প'
bird	১৪১১১১	bird	১১	২৮১১১৭	১১
১১	১৫১১১৫	১১	১ ম	২৯১১১৬	১ ম
১১	১৫৮১১৮	১১	অ'অ'অ'	২৯১১১৬	অ'অ'অ'
শ'শ'শ'	১৬১১১৫	শ'শ'শ'	১১	২৯১১১০	১১
শ'শ'শ'	১৬৬১১৯	শ'শ'শ'	উ'উ'উ'	২৯১১১৩	উ'উ'উ'

আছে	পৃষ্ঠা/পঙক্তি	হবে
কু'খবল	২৯৯।১	কু'খি
তাড়াতাড়ি	২৯৮।১৭	ত'ড়িতাড়ি
ডাঙড (৩)	৩০০।৬	ঝা'ঙড (৩)
পো	৩০০।১৭	পা
প্রাশ্নোত্তরমূলক	৩০২।৭	পশ্নে'ত্তরমূলক
প্রাশ্নপু	৩০৪।পা'টি	প্রাশ্নপু
aphorigm	৩০৫।১১	aphorism
এব	৩০৬।১০	নব
অ'নাথ'না	৩০৭।১০	অ'নাথ'না
ঘন	৩০৭।১১	ঘ'ন
বাটে	৩১২।২১	চাটে *
এখন	৩১২।২৪	এখন
শ'নেব	৩১৭।৭	শ'নেব
আইডে	৩১৯।১৪	আইডে
লোভন	৩১৯।১৮	লোভন
যায	৩২১।২৪	যায
কার্তৃযায	৩২৫।২	কার্তৃযায
	৩২৮।১২	,
কপকথাব	৩৪৬।২৮	কপকথাব

আছে	পৃষ্ঠা/পঙক্তি	হবে
কবাবব	৩৫২।২	কবাবাব
দেওয়া	৩৫২।১৬	দেখা
ম'নুযেবা	৩৫৫।৪	মু'নিসবা
সুমুদ্রল	৩৫৮।৩০	সমুদ্র'ল
সংগী'ত	৩৬৪।২৫	সংগী'ত
destriy	৩৬৯।৯	destroy
efficacy	৩৬৯।১০	efficacy
এবৎ	৩৭২।২৫	এবৎ
পু'খিব'তে	৩৭৪।৭	পু'খিব'ত
পু'খিব'ই	৩৭৫।৪	পু'খিব'ই
কামা'বশ্বয	৩৭৭।১০	কান'যে'শ্বয
গমনেব	৩৭৮।২৫	গমনেব
ধ'বো	৩৯১।২*	ধ'বো
লাম্পটা	৩৯২।২৭	লম্পটা
স'হাযা	৪০০।১৫	স'হাযা
সাহাযা	৪০০।২০	সাহাযা
প্র'কৃ'তি	৪২৫।শী'স'ক	প্র'কৃ'তি
জগ'হাব	৪২৫।১	জ'ন'হা'ব
চাল'তা	৪৩৯।১০	চাল'তা

